

দাম : ৭০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪২৯।। ১৯ সেপ্টেম্বর - ২০২২

With Best Compliments from -

Krishna

ENGINEERING

L-623/1, Odhav G. I.D. C.,
Opp. Police Station
Odhav, Ahmedabad - 382415
E-mail ; sales.krishnaeng@gmail.com
paresh.krishnaeng@gmail.com
Web. : www.krishnaengineeringindia.com


PEACOCK MEDIA
9830234034
Mala
SAREES & SUITS
শ্রী SAVYA
SHREE BALAJI (MALA) TEXTILES PVT. LTD.
65, SIR HARIRAM GOENKA STREET, GROUND FLOOR, BANGUR ARCADE, KOLKATA - 700007
MOBILE- 98301-35800, 98300-45198









Delivering Quality, Powering Lives.

In a short span of three decades, Skipper Limited has rapidly risen to the top. As one of the most preferred brands in the sector, we are committed to delivering true value to our customers.

Manufactured using state–of–the-art processes and materials, all our products conform to international standards & norms. Skipper's product portfolio includes Towers & Distribution structures used for Power Transmission & Lighting, as well as EPC projects and Polymer Pipes & Fittings for water supply & irrigation systems.

Today, Skipper stands among India's largest, and among top 10 globally in terms of manufacturing capacity in the engineering products segment. We are also one of the fastest growing Polymer Pipes & Fittings manufacturing co. in the country.

SKIPPER Limited

TOWERS | POLES | POLYMER PIPES
BATH FITTINGS | TANK

Registered Office
3A, Loudon Street, Kolkata- 700017, West Bengal, India
Phone: +91 33 2289 5731/32 | Fax: +91 33 2289 5733
E mail@skipperlimited.com | www.skipperlimited.com



SANGAM TRADERS

Specialist in :
Cotton Printed Sarees & Fabrics Materials

201-B, Mahatma Gandhi Road
(Sadasukh Katra, 1st Floor)
Kolkata - 700 007

Shop : 22696744, Mobile : 9831681885

M : 9903505575





ओमप्रकाश गोयनका
9810011579



Rasila
Mango Extravaganza
Alphonso Mango Jalebi
Alphonso Mango Burfi
Alphonso Mango Sandwich

Rasila Mango Bar EXPORT QUALITY
LNG MANGO BAR
दुर्गा लाजवाब आम पापड़
1 TRIPPLE ONE
Dilbahar's

DURGA TRADERS

IMPORTERS & EXPORTERS
SPECIALIST IN : AAMPAPAR & DIGESTIVE CHURAN GOLI

188, Tilak Bazar, Delhi-110006
Tel.: 23978222, 23913150, 23954012, 23921464
E-mail : durgatraders188@hotmail.com

With Best Compliments from -

Ganapati Tradelink

Kolkata



The Forest Friendly Company
Duroply Industries Limited
BLOCK BOARD · PLYWOOD · VENEERS · DOORS

Toll Free: 1800-345-3876 (DURO) | **Website:** www.duroply.in
E-Mail: corp@duroply.com | **Find us on:**

Disclaimer: The actual product may vary from the product shown as veneers are natural products and designs are unique and naturally evolved.
EURIGATO DYED CRYSTAL GREY

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.



PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

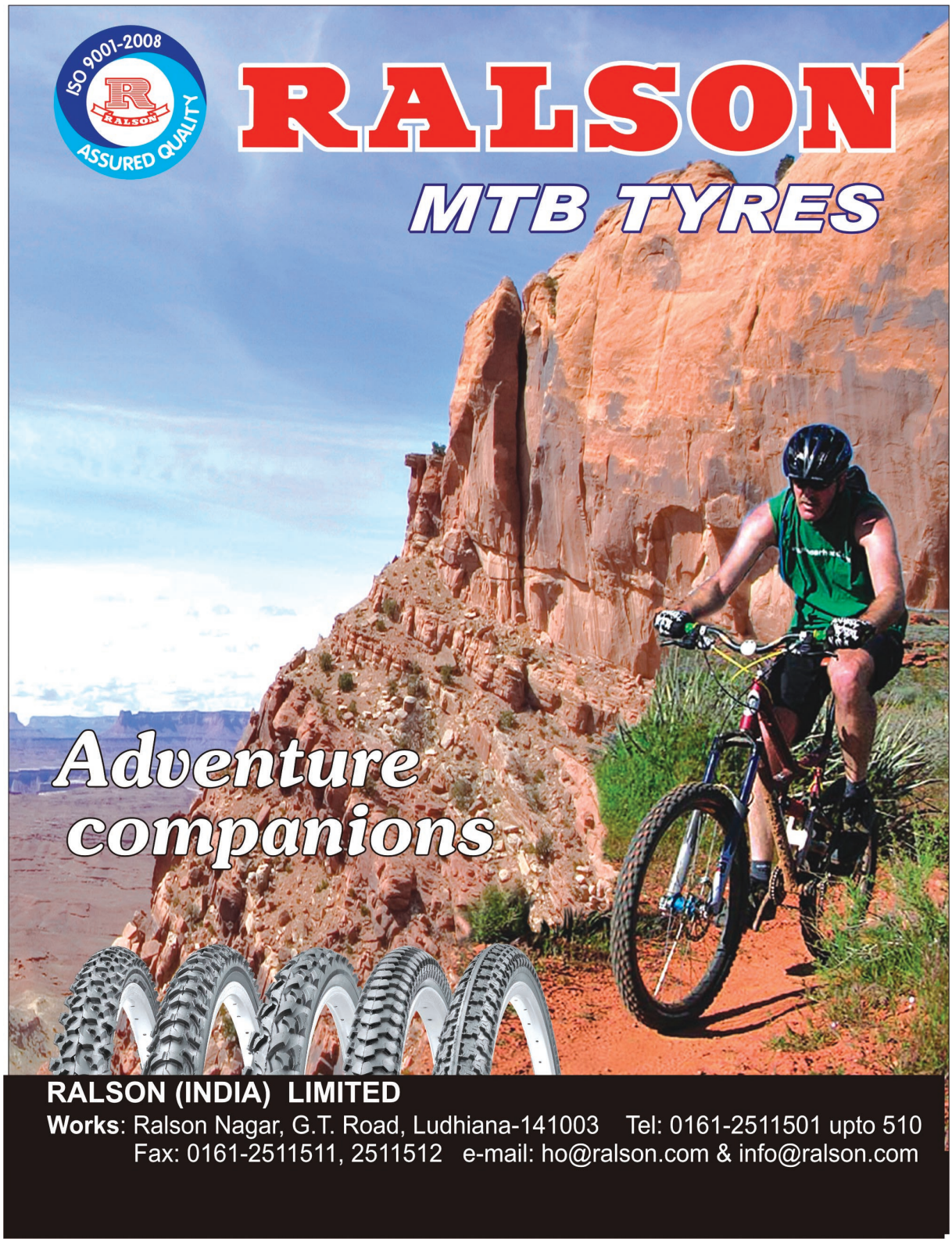
ISO 9001-2008
RALSON
ASSURED QUALITY
RALSON
MTB TYRES
Adventure companions
RALSON (INDIA) LIMITED
Works: Ralson Nagar, G.T. Road, Ludhiana-141003 Tel: 0161-2511501 upto 510
Fax: 0161-2511511, 2511512 e-mail: ho@ralson.com & info@ralson.com

JANAK
-customers are our pride
(An ISO 9001:2008 Co.)

SURVEYING INSTRUMENT



TOTAL STATIONS
CONSTRUCTION LASERS
GIS/GPS HANDHELDS
GNSS REFERENCE STATIONS

CONSTRUCTION LASERS
GPS/GNSS SURVEYING SYSTEMS
LASER DISTANCE METER
LEVELS

SURVEYING ACCESSORIES
THEODOLITES

JANAK POSITIONING & SURVEYING SYSTEMS (PVT) LTD.

304-B, Pal Mohan Plaza, 11/56,D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi- 11000
Mobile: 9818108317, 9810738317, 9873145755
Tel : 011-23515400, 23515399, 23617190

B-28, Sector - 4, Noida
Tel : 120 4221720, 4221820, 2544445
Email : janakji@janaksurvey.in , janak.ji@yahoo.com
Website : www.janaksurvey.com

www.amdindustries.com

AMD Industries Limited



An ISO 9001:2008 & FSSC:22000 Certified

AMD Industries Limited
First Floor,18-Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi: 110 005
Tel: 0091-11-46830202 (30 Lines) Fax: 0091-11-2875 3591
Email: amdgroup@amdindustries.com or Visit us at: www.amdindustries.com

M2K®
Swastik

IPL BIOLOGICALS
LIMITED



IPL biologicals Limited - India's leading microbial solutions company that offers 50+ innovative microbial solutions by "**Unlocking the power of indigenous microbes**" help farmers in soil regeneration while increasing the productivity of their crops, delivering safe, healthy, and nutritious food to the end consumer's table. "Our revolutionary microbial solutions with high CFU count, help farmers to achieve sustainable growth from seeds to harvest". We Formulate – Microbial innovations for a Better World"

Bio-fertilizers | Bio-fungicides | Bio-insecticides | Bio-stimulants

Corporate Office: M2K Corporate Park, Sector - 51, Mayfield Garden, Gurugram, Haryana - 122003, India.
TOLL-FREE NO. : 1800 137 2277 | E-MAIL: customerservices@iplbiologicals.com | Website : www.iplbiologicals.com
Find us at

अब बार-बार बल्ब बदलने के झंझट से छुटकारा...



Surya Introduces
LED Lamps with
DMOV
TECHNOLOGY
मतलब दोगुनी सुरक्षा

DOUBLE PROTECTION
Fights High Voltage
and Electric Surges
like a Champion

SURYA LED
HOME, COMMERCIAL & INDUSTRIAL LIGHTING SOLUTIONS





*available in selected models only

SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni

With Best
Compliments from



A
Well
Wisher



Exclusive
Wedding
Collection

যা কিছু শুভ

SINCE 1939

P. C. CHANDRA
JEWELLERS

A jewel of jewels

পশ্চিমবঙ্গের শোরুমগুলি

Bowbazar | Gariahat | Chowringhee | Ultadanga | Hatibagan | Behala | Garia | Jadavpur | New Town | Nager Bazar | Vivekananda Road (Astral Gems & Silver Jewellery Only) | Sealdah | Howrah | Barasat | Sodepur | Habra | Barrackpore | Uttarpara | Serampore | Chandannagar | Arambagh | Baruipur | Kanchrapara | Asansol | Bankura | Balurghat | Berhampore | Burdwan | Cooch Behar | Durgapur (Benachity and City Centre) | Krishnanagar | Katwa | Malda | Midnapore (Sahabharang Bazar & Keranitala) | Purulia | Raiganj | Rampurhat | Siliguri | Suri | Tamluk

অন্যান্য রাজ্যের শোরুমগুলি

Agartala | Bhubaneswar | Bengaluru (Ulsoor & Koramangala) | Delhi | Jamshedpur | Mumbai | Noida | Ranchi | Patna

PCC Lites- প্রতিদিনের stylish গয়নার exclusive শোরুম Mani Square Mall-এ

আমাদের সকল স্টাফ ভ্যাক্সিনেটেড। সমস্ত কোভিড বিধি মেনে চলা হয়।

pcchandraindia.com | amazon | | TATA CLiQ | | Follow us on | Customer Care: +918010700400 (Except Sunday)

sosideas

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

পূজা সংখ্যা

৭৫ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ২ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৯ সেপ্টেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ৭০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

দেবী প্রসঙ্গ



শক্তি ও সমন্বয়ের সাধনা দুর্গাপুজো

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ— ১৯

উপন্যাস

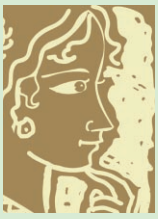

স্বপ্ন ধরার জন্য

সুমিত্রা ঘোষ — ৩৩



একটি কাল্পনিক কাহিনি

এষা দে — ৬৯



বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে

প্রবাল — ১৯৭

বড়ো গল্প



বাঁধন

সন্দীপ চক্রবর্তী— ১৩৮

গল্প



নীল মেঘের চিঠি
নিখিল চিত্রকর — ৫৩



কাবুলিওয়ালা
রাকেশ দাস — ৬৪



ভোটরঙ্গ ও কয়েকজন কুশীলব
শেখর সেনগুপ্ত — ১২৫



মেছো ভূত
দীপ্তাস্য যশ — ১৬৯



রক্তাক্ত লক্ষণাবতী
গোপাল চক্রবর্তী — ১৮৫



ছেলেটা
সিদ্ধার্থ সিংহ — ২৫৩

প্রবন্ধ



মাতৃশক্তি মাতৃসাধনা
নন্দলাল ভট্টাচার্য — ২৩

উত্তর পূর্ব ভারতে মা দুর্গার বিভিন্ন রূপ :একটি ঐতিহাসিক অন্বেষণ
সুজিত কুমার ঘোষ — ৬১



লোকবিস্মৃত কেশব ভারতী
প্রবীর আচার্য — ১০৫



হিন্দুত্ব সতত গতিশীল, তার গন্তব্য পূর্ণতার দিকে
শ্রীরঙ্গাহরি — ১৩১



উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক প্রহরী
বিজয় আঢ্য — ১৬১



জীবনানন্দ আবহমান
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৭৭





মহাভারতের সমাজ
ড. জয়ন্ত কুশারী — ১৮৯



অদ্বিতীয়া কাদম্বিনীর অনন্যা হওয়ার কথা
ড. রাজলক্ষ্মী বসু — ২৩৩



গোপাল ভাঁড়ের গল্প অন্য চোখে
সুজিত রায়— ২৩৯



শক্তি ও সমন্বয়ের সাধনা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সূচনা : দুর্গাপূজা বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব—এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু কোন সময় এবং কোথায় এ পূজা-উৎসবের সূচনা হয়েছে তা নির্ণয় করা দুরূহ। ঋক্‌বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে শক্তি আরাধনার উল্লেখ রয়েছে। শ্রীশ্রী চণ্ডী ও গীতাতেও মায়া, মহামায়া ইত্যাদির উল্লেখের মধ্য দিয়ে দেবীর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। চণ্ডীতে আছে, ''তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণা।।'' শ্রীভগবান গীতামুখে বলছেন, 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।'' এবং ''মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'' পুরাণে দেখা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দেবীপূজা করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিজয় কামনায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন ও পাণ্ডবগণ সফল অজ্ঞাতবাসের আশায় শ্রীশ্রীদুর্গার স্তব করেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের দ্বারা

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে শ্রীশ্রীদুর্গার আরাধনা করে পুনরায় স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করার কথা বলা হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মধু-কৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্য বিনাশের জন্য দেবীর আরাধনার উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য দেবীর মাহাত্ম্যের কথা শুনে নিজ নিজ মনোভীষ্ট সিদ্ধ করার জন্য দেবীর আরাধনায় ব্রতী হন। কিন্তু এযাবৎ কথিত শক্তিপূজার কোনোটিই ইতিহাস-স্বীকৃত নয়। তবে ইতিহাস থেকে যতটা জানা যায় তাতে শ্রীহট্টের রাজা গণেশ পঞ্চদশ শতকে মূর্তিতে দুর্গাপূজা করেন। ষোড়শ শতকে রাজশাহীর রাজা কংসনারায়ণও মূর্তির্তে দুর্গাপূজা করেছিলেন বলে জানা যায়। এরপর থেকে বঙ্গদেশের জমিদারশ্রেণী তাঁদের ধর্মীয় আকুতির নিরসন ও আভিজাত্যের প্রকাশক হিসাবে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করে আসছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যেও মধ্যযুগে হিন্দু জমিদারশ্রেণী এই পূজার আয়োজন করতেন বলে জানা যায়।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা—শক্তিসাধনা : উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই দেবীকে সকল শক্তির আধার বলে মনে করে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য পূজার আয়োজন করা হয়েছে। মর্ত্যমানব আমরা নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, কায়িক-বল, বন্ধু-বল, শস্ত্র-বল সবকিছু থাকা সত্ত্বেও একসময় সহজেই বুঝতে পারি যে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাশক্তির কাছে এসবই অতি নগণ্য। যে কোনো সময়েই এ সব বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত ও বলের সমস্ত অহংকার ফুৎকারে বিলীন হয়ে যেতে পারে। তাই অসহায়, দুর্বল মানব তার অজ্ঞাতসারেই কোনো সময় মগ্ন হয় শক্তির আরাধনায়। এ আরাধনা তাই অনেক সময়েই কেবল লোকচক্ষুগোচর বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ মূর্তিপূজাই নয়, এ আরাধনা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত এক স্বতঃস্ফূর্ত আকুতি ও স্বতোৎসারিত আকুল মানবিক আবেদন। এই অর্থে পৃথিবীতে কেউই নাস্তিক নেই, সকলেই আস্তিক। এস্থলে কোনোরূপ রাজনৈতিক বিশ্বাসই মানুষের মহাশক্তিনির্ভরতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। কারণ যে কোনো ব্যক্তিই, যিনি নিজ সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন এবং যিনি নিজ পুরুষকার দিয়ে সকল শক্তিকে সংহত ও আয়ত্ত করতে অপরাগ বা অসমর্থ তিনি শক্তিসঞ্চয় মানসে কোনো না কোনো ভাবে জগতের মহাশক্তির মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য। কেউ এটি সত্যের অনুরোধে সহজে ও সরলভাবে একবাক্যে স্বীকার করেন, কেউ অহংকার বা ভ্রান্তিবশত অস্বীকার করেন। যাইহোক, এ জগতে এমন কেউই নেই যিনি কোনো না কোনোও প্রকারে শক্তিলাভ করতে আগ্রহী নন। সে অর্থে আমরা বিশ্বমানব সকলেই শক্তি-আকাঙ্ক্ষী, শক্তি-সন্ধানী ও শক্তির পূজারি। আমরা কেউই দুর্বল হতে বা দুর্বল থাকতে চাই না। আমরা চাই মহতো মহীয়ান্ হতে। শাস্ত্রে আছে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। আমরা বলহীন দুর্বল হতে চাই না, কারণ আমাদের স্বরূপই হলো শক্তি ও বলবীর্য। আমরা সেই মহাশক্তিরই অংশ বা আমরা শক্তিস্বরূপই । কারণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। আবার ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তাই শক্তি ও আমাতে ভেদ নেই। এ অর্থেও আমরা শক্তির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হয়েও শক্তির পূজারি, সর্বদাই শক্তি আকাঙ্ক্ষী।

সমন্বয়ের ভূমিকায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার দেবদেবীগণ ঃ দেবী দুর্গা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার প্রধানা দেবী হলেও বঙ্গদেশে তিনি সপরিবারে পূজিতা হন। এ যেন বঙ্গদেশের যৌথপরিবারেরই প্রতিচ্ছায়া। দেবী যেকোনো সাধারণ বাঙ্গালি পরিবারের গৃহকর্ত্রী, মমতাময়ী, সন্তানবৎসলা মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণা। এখানে তিনি এসেছেন পুত্র কার্তিক-গণেশ ও কন্যা লক্ষ্মী-সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে। পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে আবার এসেছে তাদের পোষ্য—ময়ূর, ইঁদুর, পেচক ও হাঁস। একই কাঠমোর মধ্যে সকলের আসন। উপরে চালচিত্রে রয়েছেন স্বামী মহাদেব শিব। সেখানে রয়েছেন তেত্রিশকোটি দেবদেবী। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য সকল মতের দেবদেবী ও সাধককুলেরই সম্মিলিত উপস্থিতি ওই অপূর্ব চালচিত্রে। দেবী সিংহবাহনা। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ ও বিক্রমশালী হিংসাশ্রয়ী সিংহ এখানে পরম মিত্র। সে মায়ের একান্ত অনুগত অনুচর। নিজের জীবন পণ করেও দেবী ও তাঁর সন্তানসন্ততীদের রক্ষাকার্যেই যেন সদা নিরত। সে যেন অতন্দ্র প্রহরী। মায়ের অসুরবিনাশকারী ভূমিকায় সেই প্রধান সহযোগী। দুর্গাপ্রতিমার কাঠামোর সমগ্র পরিকল্পনাটিতেই রয়েছে এক অপূর্ব সমন্বয়ের ভাব। এখানে কেউই বাদ যায়নি। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠসৃষ্টি সভ্যমানুষ থেকে বনের পশুপাখি এবং অসভ্য দুরাচার অসুর বা দানব পর্যন্ত এখানে স্থান লাভ করেছে। দেবী দুর্গা ঈশ্বরীরূপে যেমন পূজিতা, তেমনি শত্রু হলেও অসুরকেও সমান শ্রদ্ধায় অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। পশুরাজ সিংহ বলবিক্রমের প্রতীক হিসাবে আমাদের সসম্ভ্রম পূজা পেতেই পারেন—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই কিন্তু গৃহের অনিষ্টকারী ইঁদুরও সমানভাবে এখানে পূজিত। হাঁস গৃহপালিত উপকারী নিরীহ প্রাণী হিসাবে আমাদের ভালোবাসা দাবি করতেই পারে কিন্তু ভীতিপ্রদ নিশাচর পেচকও তো এখানে বাদ যায়নি। বাদ যায়নি বনপ্রান্তরে বিচরণকারী ময়ূরও। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই পূজায় সিংহ বনের হিংস্র প্রাণীদের প্রতিনিধি, ময়ূর পক্ষীকুলের, পেচক নিশাচর প্রাণীদের, ইঁদুর স্থলচর কীটপতঙ্গের এবং হাঁস জলচর প্রাণীদের প্রতিনিধি। এভাবে তাদের পূজিতের আসনে আসীন করা হয়েছে। তাদের সামগ্রিকভাবে জগতে দৃষ্ট সকল প্রজাতির প্রাণীদের মধ্য হতে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। স্থলচর, জলচর, খেচর, উভচর কেউই এখানে বাদ যায়নি। তবে একটি বিষয় যুগের বিবর্তনে বেশ পরিবর্তিত রূপ নিয়েই আমাদের সামনে উপস্থিত। সেটি হলো এই অনুচ্ছেদের শুরুতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম একই কাঠামোতে সকল দেবদেবীর উপস্থিতি আমাদের বঙ্গদেশের যৌথ পরিবারের প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিরূপই যেন ফুটে উঠেছে।

কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার প্রভাবে যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে গিয়ে যেমন পৃথক সত্তা নিয়ে পরিবারগুলি আত্মপ্রকাশ করছে, তেমনি বারোয়ারি পূজাগুলিতে দেবদেবীর প্রতিমাগুলিও পৃথক স্থানে পৃথক আসনে আসীন। এ যেন সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূজার শৈলীতেও রূপান্তর বা বিবর্তন।

পুজোপকরণ নির্বাচনে সমন্বয়ের আদর্শ অনুসরণ ঃ তবে নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন সত্ত্বেও আজও একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই সমন্বয়ের পূজায় বনের মহীরুহ থেকে লতাগুল্ম পর্যন্ত কেউই বাদ যায়নি। এখানে রয়েছে অশ্বত্থ ও বটের শাখা, আম্রপল্লব, রয়েছে ধানের শীষ, রয়েছে অপরাজিতালতা, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র ইত্যাদি বনস্পতি, উদ্ভিদ ও লতাগুল্মর প্রতিনিধিরা। নবপত্রিকাপূজা ভারতের চিরন্তন কৃষিসম্পদনির্ভর সমাজব্যবস্থার দ্যোতক। এই পূজায় প্রয়োজন হয় মরু-পাহাড়-পর্বত-সমভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তীর্থরাজির পবিত্র মৃত্তিকা। এতে প্রয়োজন হয় নদ-নদী, ঝরনা, সরোবর, সাগর-মহাসাগর, পুষ্করিণী ইত্যাদি নানা জলাশয়ের জল। প্রয়োজন হয় সবুজ ঘাসের সূক্ষ্মশীর্ষে জমে থাকা শুদ্ধ স্ফটিক শিশিরবিন্দুর। এই নানা তীর্থমৃত্তিকা ও বিভিন্ন জলাশয়ের জল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন সমগ্র ভারত পরিক্রমার। কে জানে প্রাচীন বুদ্ধমণ্ডলী বর্তমানযুগের তথাকথিত জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা বা দেশাত্মবোধ সঞ্চারের কোনো গূঢ় অভিপ্রায় নিয়ে এসব পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা। যদি তা নাও হয় তবুও বর্তমান অস্থিরতার যুগের পুজোপকরণ সংগ্রহকল্পে ভারতভ্রমণ বিধান নিঃসন্দেহে দেশপ্রেম জাগরণে পরম সহায়ক।

এখানে উপকরণ নির্বাচনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো ভেদই করা হয়নি বরং অতি নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে যেন নিতান্ত নগণ্য দ্রব্যটিও বাদ না যায়। ধান, দূর্বা, তিল, সর্ষপ, হরতুকি, পান, সুপোরি, আতপচাল, যব, কলাই, ফল, ফুল, অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, দুধ, দই, ঘৃত, খই, গোময়, গোমূত্র, কাষ্ঠ, চন্দন, মদ্য, মাংস, ভাং, সিদ্ধি, মাটি, বালি, জল ইত্যাদি সবই এই পূজায় সমাদরে আহৃত ও ব্যবহৃত হয়।

সকল বৃত্তিভোগী মানুষের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সমন্বয়ের দ্যোতক ঃ দুর্গাপূজাকে কলির অশ্বমেধযজ্ঞ বলা হয়। এই পূজায় সকল শ্রেণীর একেবারে আক্ষরিকভাবেই সকল বৃত্তিভোগী মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হয়। প্রথমেই প্রয়োজন সম্পন্ন গৃহস্থের, যিনি এই পূজার মূল আয়োজক। এতে প্রয়োজন বিদ্বান শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের যিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণে মন্ত্রপাঠ করে শাস্ত্রবিধান মেনে সুচারুরূপে সমগ্র পূজাটি সম্পন্ন করবেন। পূজার পূর্বে ব্রাহ্মণকে মস্তকমুণ্ডন করতে হয়। এ কাজে প্রয়োজন হয় ক্ষৌরকারের। পূজায় মৃৎপাত্রের ব্যবহার ব্যাপক। অতএব মৃন্ময়ী মূর্তি ও মৃৎপাত্র নির্মাণে মৃৎশিল্পীর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। মায়ের হাতে শোভিত হয় প্রচুর আয়ুধ বা সমরাস্ত্র, বলিকর্মের জন্য প্রয়োজন হয় হাঁড়িকাঠের। এ কাজে কর্মকারের সাহায্য অপরিহার্য। দেবী নানা অলংকারে সুসজ্জিতা। অলংকার নির্মাণে স্বর্ণকারাদি অলংকারনির্মাতাদের রয়েছে এক অনন্য ভূমিকা। দেবদেবী তথা পূজায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই এই সময় নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। তাই তন্তুবায় ও দরজিগণ এ কাজে সাহায্য না করলে সমগ্র পূজার আনন্দই নষ্ট হয়ে যায়। এই পূজার পূজাস্থলে প্রতিমা স্থাপন ও অগণিত দর্শনার্থীদের স্থান সংকুলানের জন্য এবং পূজাসহযোগীদের রাত্রিবাসের জন্য সুবিশাল মণ্ডপ ও আবাসস্থল নির্মাণের প্রয়োজন হয়। একাজে ঘরামি বা আধুনিকযুগের ডেকোরেটরদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র পূজামণ্ডপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে আলোকোজ্জ্বল করার জন্য প্রয়োজন আলোকশিল্পীর। ঢাকি ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রীরা না থাকলে এই পূজার গাম্ভীর্যই নষ্ট হয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রীরা নিতান্তই অপরিহার্য। ঢাক তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় চর্মকারদের সাহায্য। এই পূজায় প্রচুর ফুল ও মালার প্রয়োজন হয়। একাজে মালাকারদের সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। দুধ, দই ও ঘৃতের জন্য গোয়ালাশ্রেণীর মানুষের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। পর্যাপ্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য ময়রা ও হালুইকরদের সাহায্য না হলেই নয়। বিপুল ভোগ রান্নার জন্য রাঁধুনি ঠাকুরের প্রয়োজন। ভোগরান্নার জন্য প্রয়োজন প্রচুর খাদ্যশস্য ও শাকসবজির। এ কাজে কৃষকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। আধুনিক শিল্পসভ্যতার যুগে শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদিত শিল্পসামগ্রী ভিন্ন কোনো কাজই করা কঠিন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা, বিনোদন, সাজসজ্জার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন শিল্পীর। সংগীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে শ্রুতিগোচর করে তোলার জন্য প্রয়োজন মাইকম্যানের। মেলা প্রাঙ্গণকে জমজমাট করে তোলার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন পসরাধারী ব্যবসায়ীদের। এসব দিক বিবেচনা করে দেখলে এই পূজার সমন্বয়কারী ভূমিকার ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমরা সহজেই ধারণা লাভ করতে পারি। অতএব শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা নিছক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান মাত্র নয়। এর এক সর্বগ্রাহী ও সর্বানস্যূত ভাবব্যাপকতা রয়েছে যা লোকলোচনের অন্তরালে নিঃশব্দ পদচারণে সমগ্র সমাজব্যবস্থার উপর আমোঘ প্রভাব বিস্তার করে স্মরণাতীত কাল থেকে স্বমহিমায় বিরাজ করছে ও এগিয়ে চলেছে। তাই কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব না নিয়ে, সম্পূর্ণ সংশয়াতীতরূপেই আমরা বলতে পারি দুর্গাপূজা শক্তির সাধনা, দুর্গাপূজা সমন্বয়ের সাধনা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ, শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু॥

(লেখক রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক)

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

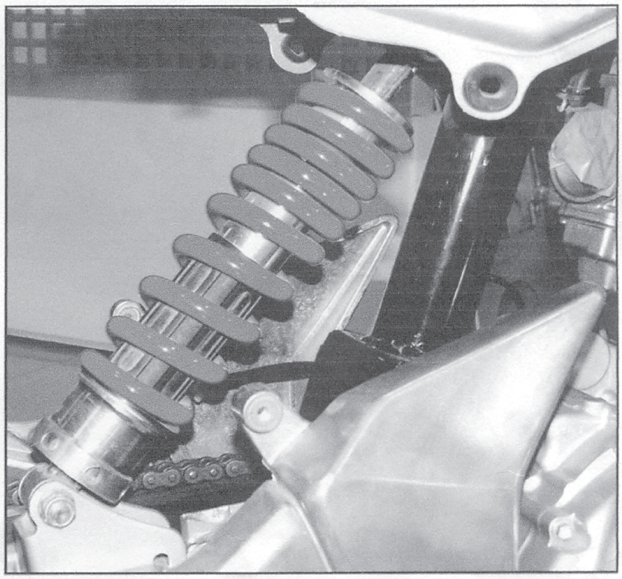

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- **Struts/Gas Struts**
- **Shock Absorbers**
- **Front Forks; and**
- **Gas Springs**

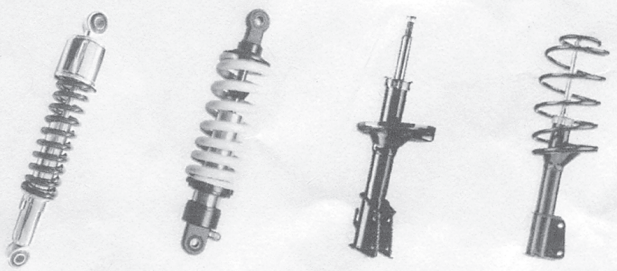

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100

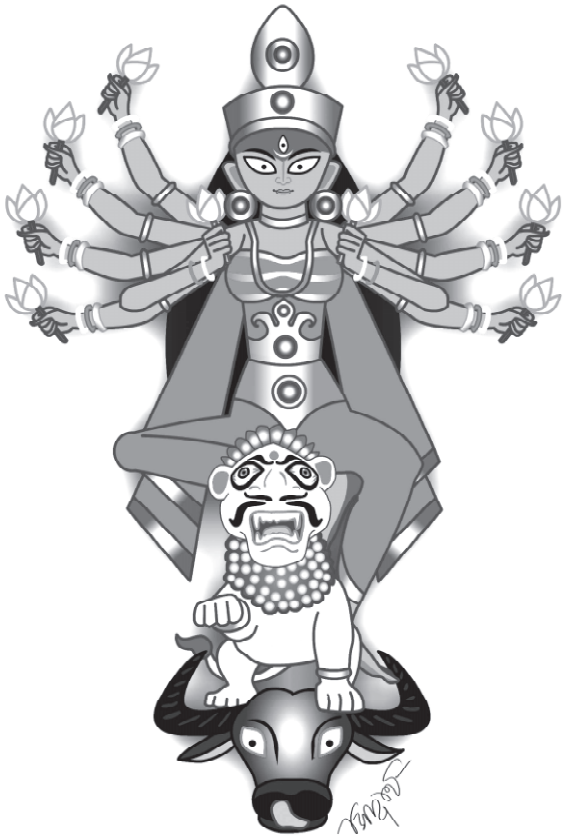

মাতৃশক্তি মাতৃসাধনা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'মা' একাক্ষরী ছোট্টো একটি শব্দ। কিন্তু ব্যঞ্জনায় যেন আকাশছোঁয়া। ভাষার ভিন্নতায় আছে এর নানা রূপান্তর। সম্বোধনের আছে নানা রূপ। তা সত্ত্বেও অনুভবে সেই একই অনুরণন, অন্তর-চেতনার এক জ্যোতির্ময় উদ্ভাস। অন্তরাম্বরে ঘটে ইন্দ্রধনুর সাতরঙা আলোর বিচ্ছুরণ। সেই আলোকিত বিত্তই সবকিছু ভুলে আঁকড়ে ধরে মা-কে। উদ্বভের ভাগীরথীতেই লীন হতে চায়।

মা—পরমাণুর মতোই প্রচণ্ড এক শক্তির আধার এই শব্দটি। আর তাই তো এ বিশ্বের সব সন্তানেরই পরমাগতি মা। তাই তো দিনের বিহঙ্গের নীড়ে ফেরার মতোই মা-ই হয় সন্তানের নির্ভয় আশ্রয়। মায়ের জন্য আকুলতা, মায়ের প্রতি নির্ভরতা—শর্তহীন, স্বার্থশূন্য ভালোবাসার কুসুম নিগড়ে বাঁধা এই সম্পর্কই প্রতি মুহূর্তে নিয়ন্ত্রিত করে মানব ইতিহাসের গতিপথকে। তারই ফলে পার্থিব সব কিছুর বাইরে নিত্য নির্মিত এমন একটি অনুভব রূপদর্শনের প্রতিভাসের অন্তরীক্ষে এক বিমূর্ত ভাব দ্যোতনায় অপার শান্তিবারি হয়ে ঝরে পড়ে মাথার উপরে। তাই তো অবিমুগ্ধ চেতনার জ্যোতির্ময় প্রভাবে মা-কে নিয়ে কথার শেষ নেই সাহিত্যে অথবা ধর্মে। সর্বদেশেই এই ভাববোধেই মর্ত্য মানবীতে ঘটেছে দেবীত্বের উদ্বোধন—এমন কথাই বলেন পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, ধর্মবেত্তারা। তাঁদের এসব সিদ্ধান্ত অবিতর্কিত নয় কোনো সময়ই। এসব নিয়ে আছে অজস্র প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন। আছে ভাব ও ভাবনার নানা প্রকাশ। স্বভাবতই সেই সময়ের আলোতে মাতৃধর্ম-সাধনার উদ্ভব, বিস্তার এবং প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ।

মাতৃপূজা অথবা দেবীতত্ত্ব নিয়ে বিশদে যাওয়ার আগে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে-শাস্ত্রে মা এবং দেশজননী সম্পর্কে যেসব ভাবনা ও মন্ত্র উদ্‌গীত হয়েছে সেগুলি নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করা যেতেই পারে।

দেশ ও জননী ঃ ভারতীয় মনীষায় মা এবং দেশজননী প্রায় সমার্থক। 'বন্দেমাতরম্' দেশবন্দনার সাম্প্রতিকের নিদর্শন হলেও এর বহু হাজার বছর আগে রচিত বাল্মীকির রামায়ণে স্পষ্টতই বলা হয়েছে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'। এই শ্লোকটির বক্তা হিসেবে রামায়ণে দুজনের নাম পাওয়া যায়। একজন হলেন ঋষি ভরদ্বাজ। তিনি কথাটি বলেছিলেন রামকে। অন্যদিকে রাবণ বধের পর স্বয়ং রাম এই কথাটির উল্লেখ করেছিলেন একটু ভিন্নরূপে অনুজ লক্ষ্মণকে, এমন উল্লেখও পাওয়া যায়। বাল্মীকি রামায়ণের সব সংস্করণে অবশ্য শ্লোক দুটি পাওয়া যায় না। একটি সংস্করণে আছে, ভরদ্বাজ আশ্রমে যখন রামচন্দ্র আসেন তখন কথা প্রসঙ্গেই ঋষি বলেন,

'মিত্রাণি ধন ধান্যানি প্রজানাং সম্মতানিব।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।।

শ্লোকার্থ, এ বিশ্বে বন্ধু-বান্ধব, ধনরত্ন, শস্য ইত্যাদির যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয়। কিন্তু রাম, জেনে রাখো, মা এবং জন্মভূমি হলো স্বর্গের থেকেও মহিয়সী। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে টি. আর কৃষ্ণচারীয়ার সম্পাদনায় বাল্মীকি রামায়ণের যে সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে এই শ্লোকটি আছে।

একই ভাবে রাবণ সংহারের পর বিভীষণের সঙ্গে লঙ্কায় প্রবেশের মুখে রাম এই কথাটি বলেন লক্ষ্মণকে। বলেন—

'অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে লক্ষ্মণ রোচতে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।।

অর্থাৎ লক্ষ্মণ, এই স্বর্ণলংকারের প্রতি আমার সামান্য লোভও নেই। কারণ আমি জানি মা ও মাতৃভূমির চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই।

প্রসঙ্গত, জননী জন্মভূমিশ্চ শ্লোকাংশটি নেপালের জাতীয় আদর্শ বাণী।

কী হবে বিচারের ধারা—প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগুলি অনুধাবন করলে দেখা যাবে প্রায় সর্বত্রই মাকে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। সেখানে পিতার কথা থাকলেও মা সম্পর্কে সবিশেষ উল্লেখ অবশ্যই মনে করিয়ে দেয়, ভারতীয় সমাজে নারী উপেক্ষিত

ছিল বলে যেসব অভিযোগ করা হয় তার বেশিরভাগ- টারই তেমন কোনো ভিত্তি নেই। বহুক্ষেত্রে পূর্ব অনুমিত সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই নারী নিপীড়নের কথা বলা হয়। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের অভিমত, প্রাচীন সব কিছুকেই যদি বর্তমানের পটে বিচার করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে তা সবসময় নিরপেক্ষ হয় না। প্রাচীন যে কোনো বিষয়ের মূল্যায়নের সময় তৎকালীন মানসিকতা বা চিন্তাধারার কথা মাথায় না রাখলে তা একদেশদর্শী হতে বাধ্য।

তাঁর অভিমত, শুধু প্রাচীন ভারতীয় সমাজ নয়, যে কোনো দেশ বা জাতির ইতিহাস রচনার সময়ে তৎকালীন সামাজিক- অর্থনৈতিক পরিবেশের দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া দরকার। না হলে একটা ভুল ধারণা গড়ে ওঠার আশঙ্কা থাকতে পারে। বিশ্ব-ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে কখনও সচেতন ভাবে আবার কখনও অজ্ঞানতাবশত সব কিছুর বিশ্লেষণ করার কারণেই বহুসময় সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবনা বা চিন্তাধারার নিরিখে দেশ বা জাতির ইতিহাস রচনা করার ফলে সেগুলি মানুষকে শুধুই বিভ্রান্ত করে। বিপথগামীও করে। মানুষের স্বার্থেই এটা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়।

মাতৃদেবো ভব—ফেরা যাক মূল প্রসঙ্গে। বৈদিক সাহিত্য নির্মোহভাবে অনুশীলন করলে দেখা যাবে নারী—বিশেষ করে মা-কে সেখানে দেবী হিসেবেই বিশেষিত করা হয়েছে।

বেদে এ বিষয়ে যেসব আলোচনা রয়েছে, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচয় তেমন গভীর না হওয়ার কারণে আমাদের বিশ্লেষণে ভুলত্রুটি থাকার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষ করে উপনিষদ এবং তার পরের সময়ে রচিত পুরাণগুলিতে নারীকে দেবীত্বে বরণ করার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, 'মাতৃদেবো ভব' (১/১১/২)। মাকে দেবী রূপে দেখতে হবে। সেই ভাবেই পূজা করতে হবে তাঁর।

ওই উপনিষদের আরেক জায়গায় বলা হয়েছে—'মাতা পূর্বরূপম্' (১/৩/৫) অর্থাৎ পূর্ব বর্ণে মাতা উত্তরবর্ণে পিতা ও মধ্যস্থলে সন্তান—এই দুই বর্ণের মিলনে প্রজননকে দেখে তার অধিষ্ঠাতা রূপে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে। এর সরলার্থ হলো পিতার সঙ্গে মা-কেও ঈশ্বরের অধিষ্ঠাত্রী বলেই মনে করতে হবে।

এইভাবে পুরাণের যুগেও দেখা যাবে ওই একই বিষয়। স্কন্দপুরাণে (মাহেশ্বর খণ্ড) যথেষ্ট আবেগ দিয়েই বলা হয়েছে—

নাস্তি মাতৃসমা ছায়া নাস্তি মাতৃসমা জাতিঃ।
নাস্তি মাতৃসমংত্রাণং নাস্তি মাতৃসমা প্রপা।। (৬/১০৩)

অর্থাৎ মায়ের মতো ছায়া নেই, নেই মায়ের মতো আশ্রয় অথবা সুরক্ষা। এ বিশ্বে মায়ের মতো জীবনদাতাও নেই কেউ।

এইভাবে বিভিন্ন পুরাণে মায়ের বন্দনা করে তাঁর স্বরূপ উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁকে কখনও সমস্ত তীর্থের সেরা তীর্থ, কখনও পৃথিবীর চেয়ে ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ, কখনও-বা পরম দেবতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পদ্মপুরাণে মা-কে তীর্থোত্তমা রূপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে 'সবতীর্থময়ী মাতা' (সৃষ্টিখণ্ড ৪৭/১৩)। একইভাবে অন্যত্র আছে, ন মাতুঃ পর দৈবতম্—মায়ের চেয়ে আর কোনো বড়ো দেবতা নেই।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত 'ললিতা সহস্রনাম'-এর শুরুটাই করা হয়েছে 'শ্রীমাতরে নমঃ' এই বাক্য দিয়ে। এখানে অবশ্য পঞ্চমাতার কথা রয়েছে। এই পঞ্চমাতা হলেন গর্ভধারিণী জননী, শশ্রূমাতা, বড়ো বউদি, গুরুপত্নী ও রানি। মানবজীবনে তাঁদের ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই এঁদের দেওয়া হয়েছে বিশেষ মর্যাদা।

মহাভারতে তো মাকে বলা হয়েছে পৃথিবীর চেয়েও গুরুভার। 'মাতা গুরুতয়া ভূমেঃ (৩/২৯৭/৪১১)। প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'মাতা গুরুতরা ভূমৈবু' শ্লোকে।

আর অষ্টম শতকের মহাতাপস শঙ্করাচার্য তো আরও এক ধাপ আগিয়ে বললেন 'মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বর/ বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্'—অন্নপূর্ণা স্তোত্রমে। উপলব্ধির একদম চরম প্রান্তে পৌঁছবার পরই বলা যায় এমন কথা।

ভারতীয় মননে, মায়ের ভূমিকার আলোতেই এবার মাতৃশক্তি এবং মাতৃপূজার উৎস সন্ধানে অগ্রসর হওয়া যেতেই পারে।

পুরুষ ও প্রকৃতি—জননী জনয়িত্রী। সন্তানের জন্ম দেন তিনি। তাই-বা কেন, জন্ম দেওয়ার পর থেকে সন্তানের পরিপালন, পরিবর্ধন, পরিরক্ষণেও সতত নিবেদিত তিনি, সদা তৎপর। সে কারণেই সন্তানের সঙ্গে শুধুই একটা কায়িক সম্পর্কে বাঁধা নন মা—তিনি তাদের কাছে দেবী স্বরূপা। বস্তুত মর্ত্যজননীই পরমা প্রকৃতির অংশ। তিনিই সাংখ্যের প্রকৃতি।

প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুই সত্যের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে জগৎ—এমনই মনে করেন সাংখ্যকার ঋষি কপিল। কপিলের রচিত সাংখ্যদর্শনের মতে সৃষ্টির আদি পদার্থ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে শরীর ও জগৎ সংসার। আর পুরুষ সাক্ষ-চৈতন্য আত্মা ও পরমাত্মার অঙ্গ। এই দুয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অবস্থারই নাম 'জীব'। যখন খসে যায় এই বাঁধন তখনই লাভ হয় মোক্ষ। মোক্ষ লাভের পর জীবের সঙ্গে পরম পুরুষের থাকে না কোনো পার্থক্য। অর্থাৎ জীব লীন হয় পরমাত্মায়। বলা হয় প্রকৃতি বিকাশশীল বিকারী আর পুরুষ অবিনাশী, নির্বিকার ও অক্রিয়।

পঁচিশটি তত্ত্বের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সাংখ্যদর্শনের শেষ বা পঁচিশতম তত্ত্বটিতে পুরুষ বা আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মোক্ষদাতা হিসেবে।

পাশ্চাত্য দার্শনিক রুসার মতে, সাংখ্য দর্শনের উৎপত্তি অবৈজ্ঞানিক উৎস থেকে। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যের সার হলঃ 'শিব-শক্তি/আকাশ পৃথিবীর গ্রাম্য ধর্মতত্ত্ব এবং যোগ (ধ্যান) ঐতিহ্যের উৎস সম্ভবত বেদে নেই। ধ্রুপদী সাংখ্য যে বেদসহ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সাংখ্য বেদ সম্পর্কে নীরব। প্রাচীন বৈদিক ধর্মে যে পশুবলি প্রথা প্রচলিত তার বিরুদ্ধেও সাংখ্য যৎসামান্য সরব। কিন্তু সাংখ্য দর্শনের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে আমরা যে প্রথম তথ্যগুলি পাই সে সবই বৈদিক সংস্কৃতির অঙ্গ।

রুসারের বিশ্লেষণ পরস্পর বিরোধী। সাংখ্য দর্শনের উৎস কথা

গিয়ে কিছুটা সচেতন ভাবেই তিনি বলেছেন, এই দর্শনের উৎস 'সম্ভবত' বেদে নেই। তাঁর এই বক্তব্যের সূত্রে বলতে হয়, বেদ সম্পর্কে তিনি নিজে হয়তো তেমন পড়াশোনা করেননি। হয়তো অন্যের মুখে শুনেই এই দর্শনের ভিত্তি 'বেদে সম্ভবত নেই' বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

অথচ, বিভিন্ন বিষয়ে বেদের নীরবতার উল্লেখ করেও শেষ পর্যন্ত তিনিই আবার বলেছেন, 'সাংখ্য দর্শনের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে আমরা যে প্রথম তথ্যগুলি পাই সে সবই বৈদিক সংস্কৃতির অঙ্গ।' তাই যদি হয়, তাহলে সংখ্য দর্শনের উৎস বেদে নেই বলে যে মন্তব্য তিনি করেছেন, তা যুক্তিযুক্ত নয় বলেই মনে করা যায়। আসলে হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যে বিশেষজ্ঞদের হয়তো ইচ্ছাকৃত বিকৃত ধারণা তৈরির ঐতিহ্য থেকেই এ জাতীয় মন্তব্য করা হয়েছে।

সাংখ্য দর্শনের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে বেদ ও উপনিষদের বিভিন্ন বক্তব্য নিয়েই গড়ে উঠেছে সাংখ্যদর্শন। কঠ উপনিষদের মতে, অঙ্গুষ্ঠমাত্র অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র 'আত্মা'-ই হলো পুরুষ। একইভাবে শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে অথবা গীতাতেও উল্লেখ রয়েছে সাংখ্য ও যোগ শব্দ দুটি।

সাংখ্য দ্বৈতবাদী দর্শন। সেই দ্বৈতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে ইন্দ্র-বৃত্র উপাখ্যানে। ঋগ্বেদেরই নাসদীয় সূক্তেও রয়েছে এই দ্বৈতবাদের কথা।

প্রকৃতি পূজা—সাংখ্যের এই প্রকৃতি ও পুরুষের কথাতেই আসে আরেক প্রকৃতির কথা। এই প্রকৃতি উপাসনা বা প্রকৃতিবাদকে আদিম ধর্ম সাধনার উৎস বলে উল্লেখ করেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, প্রকৃতির নানা রূপ, বিভিন্ন ঘটনা আদিম মানুষকে কখনও সূক্ষ্ম কখনও ভীত আবার কখনও বিস্মিত -কৌতূহলী করে তুলত। রোজ পূর্ব আকাশে ওঠে যে সূর্য, অস্তমিত পশ্চিমাকাশে, রাতে আকাশ ভরা নক্ষত্র ও তার মাঝে চাঁদ—আদিম মনে বিস্ময়ের সঙ্গে সৃষ্টি করে এক ধরনের মুগ্ধতা। সেই মুগ্ধতাই সূর্য, তারা, চাঁদের মতো মহাকাশের দৃশ্যমান পদার্থগুলির ওপর দেবত্ব আরোপ করে, তাদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে থাকে এক ধরনের ধর্মীয়বোধ এবং সেই বোধেই শুরু হয় তাদের পূজা।

একইভাবে এই জগতে অরণ্যানি, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র তাদের রূপবৈচিত্যের কারণেও আরোপ করা হয় দেবত্ব। আবার বৃষ্টির সময় বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনায় ভীত হয়ে তাদেরও দেবতা হিসেবে অর্চনা শুরু করে আদিম মানুষ। তাদের সেই ধর্মসাধনা ও বোধ থেকে আধুনিক ধর্মগুলির জন্ম, এমনটাই বলে থাকেন বিশেষজ্ঞরা।

দৃশ্যমান এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঘটনার পেছনেই ক্রিয়াশীল একটি শক্তি—সেই শক্তিকেই নানা রূপে কল্পনা করে আদিম মানব সমাজে শুরু হয় ধর্মসাধনা যা পরবর্তীকালে জ্ঞানের আধারে পরিণত হয় আধ্যাত্মিকতায়। এমনই অভিমত বিশেষজ্ঞদের। তাঁদের মতে, প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনার পেছনে এক এক শক্তি বা দেবতা ক্রিয়াশীল বলে ধারণা দানা বাঁধতে থাকে আদিম মানুষের মনে। কালক্রমে সেগুলিই আরও পরিশীলিত ভাবে স্থান পায় নানা ধর্মমতে ও সম্প্রদায়ে। বিশ্বের সর্বত্র আদিম সম্প্রদায়ের এই প্রকৃতি পূজার মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু সাদৃশ্য। প্রাথমিক ভাবে বিশ্বের সর্বত্রই প্রকৃতি পূজার কেন্দ্রগুলি প্রায় এক। অগ্নির উপাসনা অথবা কোনো জীবজন্তুকেও দেবতা অনুমানে তার পূজা শুরু করা হয়। এমনই ভাবে কোনো পাহাড় বা তার পুজা, কোনো বিশেষ শিলা বা ওই ধরনের কোনো বস্তু হয়ে ওঠে আদিম মানুষের কাছে পূজনীয়। শুরু হয় নানাভাবে তাদের অর্চনাও।

ভারতীয় জীবনে প্রকৃতির প্রভাব সুপ্রাচীন কাল থেকে অতি গভীর। ভারতীয় ধর্মসাধনায় প্রকৃতির স্থান আদিমকাল থেকে সকলের উপরে। ভারতীয় বিশ্বাস, প্রকৃতিই সবকিছুর স্রষ্টা। প্রকৃতি শুধু জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণই করে না, এই মানবজীবন গড়ে উঠেছে প্রকৃতির নানা উপাদানে।

ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলির সুস্পষ্ট ঘোষণা, জীবদেহ হয় পাঞ্চভৌতিক। অর্থাৎ পাঁচটি উপাদান—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অর্থাৎ মাটি, জল, আলো বা অগ্নি, বায়ু, আকাশ দিয়ে গঠিত এ জীবন এবং অন্তিমে এই পঞ্চভূতেই বিলীন হয় তা। ওই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই (যার মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক সত্য) হিন্দুরা নানাভাবে এই পঞ্চভূতের উপাসনা করেন। কৃতজ্ঞতা জানান নিজেদের জীবনের জন্য।

ক্ষিতি বা ভূমি হলো কৃষিক্ষেত্র থেকে বাসভূমি পর্যন্ত সব কিছু। তাই কৃষি জীবনে ভূমি পূজা বা ধরণীর অর্চনা দেখা যায় রজঃ উৎসব (ওড়িশা), অম্বুবাচী (বঙ্গদেশ, অসম প্রভৃতি অঞ্চলে) ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। আবার ওইভাবে শস্যগৃহ তৈরির সময় করা হয় ভূমি বা বাস্তুপূজা। একই ভাবে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানানো হয় জল, তেজ, বায়ু ও আকাশকেও।

হিন্দুর সমস্ত পূজা অর্চনার একটি আবশ্যিক অঙ্গ প্রকৃতি পূজা। পূজার প্রাথমিক পর্বেই তাই প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দান করা হয় পুষ্পার্ঘ্য—'ওঁ প্রকৃতৈ নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে। এইভাবে হিন্দুজীবনে মায়ের স্থান সকলের উপরে—গর্ভধারিণী ও দেবী উভয় রূপেই।

আদি জননী—'আমি জননী/আমি মাতৃশক্তি। আমি বিশ্বপ্রসবিনী। যখন না ছিল আকাশ, না ছিল পৃথিবীর মাটি—যখন সব ছিল ঘন তমসায় আবৃত তখনও ছিলাম আমি। একমাত্র আমি—আদ্যাশক্তি।'

এমনই প্রতিধ্বনি শোনা যায় বেদের নানা সূক্তে, উপনিষদ ও নানা পুরাণের পাতায়। এই ঘোষণাই বলে দেয় ভারতের সনাতন ধর্মে নারীশক্তির মহিমার কথা। এর মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সুদূর অস্তিত্বের সন্ধান। এসবের মধ্যেই রয়েছে ভারতের ধর্ম সাধনার বহমান ধারার। এসবই বলে দেয়, ভারত এবং তার সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি সম্পর্কে বিদেশির নানা অভিযোগ, অনুযোগ অনেকটাই মনগড়া। বলে দেয়, ভারতীয় জীবনে প্রাচীন যুগে নারী মোটেই ছিল না অবহেলিত। অবমাননার নানা শৃঙ্খল নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখেনি পরবর্তীকালের মতো। আজ তাই ভারতীয় ধর্মসাধনার গতিশীল ধারায় সমাজ এগিয়ে গেছে নারীকে স্বীকৃতি দিয়ে মাতৃশক্তির

উদ্বোধন ঘটিয়ে—শাক্ত ধর্মাচরণের পথ ধরে। ভারতে ধর্মের ধারাবাহিকতার দিকে নজর দিলে ধরা পড়বে এই সত্যটি। বোঝা যাবে সেই অতি প্রচীনকাল থেকেই ভারতের চেতনায় নানা দেবতার সঙ্গে সঙ্গে দেবীরাও সমাসীন একই আসনে। তাই-বা কেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছেন বেশি দেবীরাই।

দেবী শব্দের মূলে রয়েছে 'বিদ্' ধাতু। বিদ্ বহু অর্থবোধক। তার একটি অর্থ 'প্রকাশ পাওয়া'। যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর, স্বপ্রকাশ যিনি—তিনি দেবতা অথবা দেবী। তিনি নিজে দীপ্তি পান, স্বয়ংজ্যোতি তিনি অন্যকেও করেন উদ্ভাসিত। দেবতাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মচৈতন্যই তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ। বিভিন্ন নাম ও রূপে ব্যক্ত হলেও দেবতারা সেই একই অব্যক্ত পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। পরমব্রহ্মের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি নানা দেবতার। তাইতো ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি—এক অখণ্ড অব্যাকৃত সৎ ব্রহ্মকেই জ্ঞানীগণ বহু নামে অভিহিত করেন।

দেবতাদের সম্পর্কে প্রযুক্ত এই কথাগুলি দেবীদের সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ঈশ্বরীর প্রতিশব্দ হলো দেবী। সনাতন ধর্মে দেবী বলতে বোঝায় এক স্বর্গীয়, ঐশ্বরিক ও শ্রেষ্ঠ সত্তাকে। মনিয়ের উইলিয়ামস দেবীকে অভিহিত করেছেন পার্থিব শ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত জ্যোতির্ময়ী হিসেবে।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে দেবী হলেন লাতিন dea এবং গ্রিক Thea-র সমগোত্রীয়। প্রয়োগের দিক থেকে হিন্দু সনাতন ধর্মে দেবী হলেন স্বর্গের মা। কখনও কখনও দেবীর পরিবর্তে দেবিকা শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। ডগলাস হার্পার তাঁর 'Etymology Dictionary-তে দেবীকে বলেছেন জ্যোতির্ময়ী। গ্রিক divine এবং লাতিন deus/deivas বলে দেবীর সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

বেদে দেবীর কথা সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। রয়েছে নানা স্তোত্রও। কিন্তু দেবীর আকার অথবা চিত্রের কোনো উল্লেখ নেই কোনোখানে। এমনকী বেদের এই দেবীরা সাকার না নিরাকার তাও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি কোথাও। তবে দেবীকে মহাবিশ্বের বাস্তবতা হিসেবে বর্ণনা করে ঋগ্বেদের দেবী সূক্তে (১০/১২৫) যা বলা হয়েছে তারই বাংলা ভাব রূপান্তর অনেকটা এইরকম—

সরস্বতী নদীতীরে ধ্বনিত হল বাণী
সম্রাজ্ঞী আমি—আমি রাজেন্দ্রাণী।
প্রজ্ঞার দীপ্তিতে জ্বলে যে হোমাগ্নি
আমি তারই অধিশ্বরী।
মিলি দেবগণে আমারে রেখেছে
বহু স্থানে, বহু ভাবে অতি সংগোপনে,
তাই তো প্রবিষ্ট আমি প্রতি প্রাণে প্রাণে।
আমি কর্ত্রী—আমি সর্ব সংঘটক
অন্নপূর্ণা রূপে জোগাই সবার অশন;
প্রতিটি শ্বসন, দর্শন বা শ্রবণের পটে
রণিত বচন—
সকলই আমার সীমার দীপ্ত আলোক বিচ্ছুরণ।
একথা জানে না সবে, তবু সত্য এই
এ বিশ্বের সবখানে আমি শুধু রই।
জেনো সবে, সেই ঋত শাশ্বত সনাতন
আমারই ইঙ্গিতে নিত্য প্রবহন।
শ্রদ্ধা রাখো মনে, শোনো সর্বজন
নিজ মনে সদা করি আমি বিচরণ।
আমারই ইচ্ছার ইঙ্গিতে কেউ হয় বলবান
কেউ হয় স্তোতা ঋষি, সেই ব্রহ্মজ্ঞান।
মহাতেজা রুদ্রশিব করে যবে মহাজন
আমি জোগাই তারে দিব্য শরাসন।
সর্বহিতে যোদ্ধা আমি—স্রষ্টা রূপে
করি দ্যুঃ এবং ভুলোক সৃজন।
আমিই জনক আবার জননীও আমি।
মহার্ণবে স্থিতি মোর ব্যাপী ত্রিভুবনে
বাষ্পরূপে, বারিবহ হয়ে করি ধারা বরিষণ
আমি স্রষ্টা, বিশ্বকর্মা—
ব্রহ্মাণ্ড সৃজনকালে বায়ুরূপে ভ্রমি ত্রিভুবন।
অনন্ত অসীম আমি আপন মহিমায়
স্পর্শি অন্তরীক্ষে, তা আছে
ভূলোক দ্যুলোকের পরে।

বেদে দেবতাদের মতো দেবীর সংখ্যাও বড়ো একটা কম নয়। দেবী হিসেবে বেদে এমন কিছু নাম রয়েছে পরবর্তীকালে তাঁদের আর কোনো অস্তিত্বই নেই। প্রসঙ্গত, বৈদিক যুগে এইসব শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য চিত্রিত হলেও সর্বশক্তিময়ী একমাত্র দেবীর প্রতিভাস দেখা যায় মধ্যযুগে এসে।

সমস্ত সৃজনের আদিমাতা হলেন অদিতি। ঋগ্বেদে কম করে আড়াইশো বার অদিতির উল্লেখ করা হয়েছে। অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি। অদিতিকে বলা হয়, সমস্ত দেবতার জনয়িত্রী। একারণেই যাস্ক তাঁকে 'আদিমতা দেবমাতা' বলে উল্লেখ করেছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৮৯ তম সূক্তে বলা হয়েছে, 'অদিতির্দ্যৌরিদিতিরন্তরিক্ষসদিতি' অর্থাৎ অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, তিনিই পিতা, তিনিই পুত্র। অদিতি সকল দেব, অদিতি পঞ্চলোক। অদিতিই জন্ম এবং জন্মের কারণ।

ম্যাক্সমুলারের মতে, অদিতি হলেন আদি দেবী। অদিতি 'is in reality the earliest name invented to express the infinite' তিনি অসীম, অনন্ত, অচ্ছেদ্য। অগ্নি বা সূর্যের মতোই তিনি বিশ্বব্যাপিনী। তাঁর এই রূপের পরিচয় পেয়েই রথ মন্তব্য করেছেন 'Aditi eternity or the eternal'. তিনিই মহাজাগতিক আলোক রশ্মি।

অদিতির সন্তানরাই আদিত্য। ঋগ্বেদেরই বিভিন্ন জায়গায় আদিত্যদের সংখ্যা ছয়, সাত বা আট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য এই সংখ্যা বেড়ে হয় বারো—দ্বাদশ আদিত্য নামেই পরিচিত তাঁরা। পুরাণে অদিতি হলেন দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপের স্ত্রী। সন্তান সংখ্যা ৩৩। এর মধ্যে বারো জন আদিতি। এগারো জন রুদ্র এবং আটজন বসু। রামায়ণেও তাঁর সন্তান সংখ্যা

৩৩ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। অদিতিকে বেদের গুরুত্বপূর্ণ দেবী উষার প্রতিস্পর্ধী হিসেবে দেখানো হয়। যজুর্বেদে অদিতিকে বিষ্ণুর পত্নীরূপেও দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে পুরাণে তিনি বিষ্ণুর অবতার বামনের জননী।

বেদে দেবী—বেদে অদিতি ছাড়া আর যেসব দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন, অপ্সরা, অরণ্যানী, ইলা, রোদসী, উষা, দনু, দিতি, ভূমি, সরণ্যু, সরস্বতী, শচী, সূর্যা, পৃথিবী, বাক্, রাত্রি, শ্রীদেবী, সীতা, সিনিবালী, রাকা ইত্যাদি এইসব দেবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবী হলেন উষা। ঋগ্বেদে গোটা কুড়ি সূক্তে উষা দেবীর স্তুতি করা হয়েছে। রাত্রি উষা বোন। উষার পেছন পেছন আছেন সূর্য। অর্থাৎ উষার পরই প্রকৃতি দীপ্ত হয় সূর্যের আলোতে।

বেদের দেবী পৃথিবী অন্নদাত্রী। মর্ত্যবাসীর মা তিনি। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (৫/৮৪) সুজলা সুফলা পৃথিবীর স্তব করা হয়েছে। আধুনিক যুগে পৃথিবীই হলেন ভূদেবী।

বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সমান গুরুত্বপূর্ণ দেবী হলেন জ্ঞান, সংগীত, শিল্পকলা, প্রজ্ঞা ও শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী। ঋগ্বেদের প্রথম পর্বে তাকে নদী হিসেবে বন্দনা করা হয়েছে। সরস্বতীকে বলা হয় ব্রহ্মার পত্নী।

'বেদমাতা' রূপে অভিহিত বৈদিক দেবী বাক্ হলেন কথার অধিশ্বরী। বলা হয় তিনি হলেন প্রজাপতির স্ত্রী বা শক্তি। ঐতরেয় আরণ্যকে তাঁকে ইন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পদ্মপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁকে কশ্যপের স্ত্রী, আবেগের উৎস বা মাতা এবং গন্ধর্ব বা সংগীতজ্ঞদের বান্ধব হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিই সরস্বতীর আদিরূপ বলে মনে করেন অনেকে।

ধনসম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী লক্ষ্মীর বৈদিক রূপ হলো শ্রীদেবী। শুক্ল যজুর্বেদের শ্রীসূক্তের প্রথম মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করে সায়নাচার্য বলেছেন, জাতবেদা অগ্নিই শ্রী। তিনি হরিণী রূপ নিয়ে বনে বিরাজ করতেন। ঋষির প্রার্থনা, দেববন্দিতা পদ্মবিভূষিতা যশোময়ী আনন্দদায়িনী শ্রী দেবী অশুভ অলক্ষ্মীকে নিশানা করে আমার শুভ করুন। বেদের এই শ্রীদেবীই লক্ষ্মী। দু'টি গুণের অধিকারিণী লক্ষ্মী বিষ্ণুর শক্তি এবং তাঁর স্ত্রী। তিনি ত্রিদেবীরও অন্যতমা।

দেব-দেবীর সংখ্যা কত—বেদে দেবীদের নাম ও শক্তির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের বিভিন্ন নাম ও ঘটনাবলীর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার থেকে পুরো বিষয়টি সম্পর্কেই কিছু প্রশ্ন ওঠে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিত বিশেষজ্ঞরা হিন্দুধর্ম নিয়ে নানা গবেষণা এবং আলোচনার মধ্যে দিয়ে এমন বেশ কিছু সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন যা পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিতদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের অনেকেই এক্ষেত্রে ঐতিহ্য এবং স্বাধীন চিন্তাধারায় আস্থা না রেখে কিছুটা গড্ডল প্রবাহে গা ভাসিয়েছেন এবং তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু বিরূপ ও ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই হিন্দু দেব-দেবীর সংখ্যা নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার।

বহু (অপ) প্রচারের ফলে সাধারণভাবে বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা, হিন্দুদের দেব-দেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। কিন্তু এই সংখ্যাটা কোথা থেকে পাওয়া গেছে তার উৎস সম্পর্কে সকলেই নীরব। তাই এ প্রসঙ্গে খুব সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা সেরে নেওয়া যেতেই পারে।

প্রথমত, বেদে কোথাও দেব-দেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটি বলে উল্লেখ করা নেই। পরবর্তী মহাকাব্য বা পুরাণেও কোথাও এমন কোনো সংখ্যার সন্ধান দেওয়া নেই। বেদে দেবতার সংখ্যা প্রথমে তিন, পরে তেত্রিশ এবং দু জায়গায় সর্বাধিক ৩৩৩৯ দেবতার কথা রয়েছে। তাহলে দেব-দেবীর সংখ্যা তিনকোটি করার কারণ কী?

এক্ষেত্রে দুটি সম্ভাব্য কারণের কথা বলা যেতে পারে। সংস্কৃত 'কোটি' শব্দটির দুটি অর্থ ঃ এক—একশো লক্ষ, দুই—স্তর। বেদ বিশেষজ্ঞদের মতে, বেদের দেবতারা তিনটি স্তর বা থাকের—পৃথিবী স্থান, অন্তরীক্ষ স্থান এবং দ্যুলোক স্থান। এই তিন 'কোটি' বা থাকের দেবতাকেই সংখ্যার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে তিনকোটি বলে প্রথম উল্লেখ করেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ধর্মে বহু দেবতার অস্তিত্ব দেখে পাশ্চাত্যের পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত উভয় সম্প্রদায়ই ব্যঙ্গ করে থাকেন। তেত্রিশ কোটি ভারতীয়ের (ভারতের তৎকালীন জনসংখ্যা) প্রত্যেকেরই একজন দেবতার রটনা চালু হয় বলে ধারণা করা হয়। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনকালে বা আজ থেকে মাত্র আড়াইশো-তিনশো বছর আগে হিন্দুর দেব-দেবীর সংখ্যাটা হঠাৎই তেত্রিশ কোটিতে দাঁড়িয়ে যায়। সোজা কথায়, কোনো তথ্য নয়, ভারতীয়দের হেয় করার মানসিকতা থেকেই দেবতাদের সংখ্যা সম্পর্কে এই ধারণাটি চালু করে ইংরেজরা, এ ব্যাপারে প্রকৃত অনুসন্ধান ছাড়াই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বেশ কিছু ভারতীয়ও তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছে।

সংখ্যাতত্ত্বের এই আলোচনার পরই দেখা যায়, বেদে এ ব্যাপারে কী বলা হয়েছে। বেদের একাধিক জায়গায় আছে, এক পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের নানা অভিব্যক্তি থেকে একাধিক দেবতার উদ্ভব অথবা বহু দেবতাবাদের শুরু। 'নিরুক্তে' যাস্ক দেবতাদের স্বরূপ বিচারের সময় বলেছেন, 'দেবতয়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে' (নিরুক্ত ৭-৬)। অর্থাৎ দেবতাদের এক আত্মাই বহু দেবতারূপে কীর্তিত। ঋগ্বেদেবেও বলা হয়েছে—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (১/১৬৪/৪৬)। অন্যত্র, 'একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি' (১০/১১৪/৫)—সেই ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫তম সূক্তের প্রতিটি ঋকের শেষে আছে 'সহদ্দেবানাম সুরস্তমেকম্' অর্থাৎ ঋগ্বেদরই আরেকটি মন্ত্র 'একং বৈ ইদং বি বভূব সর্বম্' (৮/৫৮/২)—একই পরমাত্মা সকল রূপ ধারণ করেছেন।

শুক্ল যজুর্বেদেও একই উক্তি, 'এতশ্যৈব সা বিঘুস্টিরেরউ হ্যেষ সর্বে দেবা' এই এক পরমাত্মাই সকল পদার্থ সৃষ্টি করেছেন। সকল দেবতার রূপ নিয়েছেন।

লীলাচঞ্চল পৃথিবীর এক একটি কাজের জন্য এক একটি দেবতার স্তুতি করলেও বেদের ঋষিরা কিন্তু অনুভব করেছিলেন দেবতা বিভিন্ন হলেও তাঁদের কাজের পিছনে সর্বক্ষণ রয়েছে একমাত্র একটিই শক্তি, সে শক্তির নাম ঈশ্বর। দেবতা নন প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরই যে সব কিছুর স্রষ্টা অথবা তাঁর ইচ্ছাতেই যে সব কিছু হয়ে থাকে এবং দেবতারা যা কিছু করেন তাও সেই পরমেশ্বরেরই হাত, এই উপলব্ধি থেকেই

ঋগ্বেদের ঋষি প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে প্রশ্নের দ্বারাই স্বীকার করে নিয়েছেন, 'প্রথম জাত' জন্মরহিত' এমনই জগতের সৃষ্টিকর্তা। তাই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ সূক্তে স্পষ্ট ঘোষণা, 'সুধীর পিতাই জন্মকৃতি পরস্পর সন্নিহিত দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পরে পৃথিবী ও আকাশেরও সৃষ্টি হলো।' ওই সূক্তেই আরও আছে, 'যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অন্যসব ভুবনের লোক তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হয়।'

এসব বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে, দেবতা বহু হলেও ঈশ্বর এক। এবং সেই ঈশ্বরই কখনও কর্তা। ব্রহ্মাণ্ডের সৃজক। আর সে কারণেই, দেবতাদের সংখ্যা সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক উক্তি করার আগে বেদে যে একেশ্বরের কথা রয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। সেটা করলেই হিন্দুদের দেব-দেবীর সংখ্যা অসংখ্য এই ভ্রান্তি অবশ্যই দূর হবে।

কীভাবে উদ্ভব—হিন্দুর দেব-দেবীর সংখ্যার মতোই তাদের দেবতা বিশেষ করে দেবীদের উদ্ভব নিয়েও রয়েছে কিছু বিতর্কিত মত বা ধারণা। তাদের ধারণা হচ্ছে বহিরাগত আর্যরা ভারতে এসে স্থানীয়দের শুধু পরাজিতই করেনি, তাদের অনেক কিছু ভাবনা এবং ঐতিহ্য আত্মসাৎ করেছে। এই মতবাদীরা বলছেন, হিন্দুর দেবী ভাবনা অথবা মাতৃশক্তির ধারণাটা এসেছে সিন্ধু সভ্যতার ধর্মাচরণ থেকে। উদাহরণ হিসেবে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার খননকার্যের সময় আবিষ্কৃত মাটির কিছু মাতৃমূর্তির উল্লেখ করা হয়।

ভারততত্ত্ববিদ ডেভিড কিনসলে (David Kinslay) এবং লিন ফাউলস্টোন (Lynn Foulstone)-এর মতো অনেকের অভিমত, সিন্ধু সভ্যতার (৩৩০০—১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) দেবীতন্ত্র বা পূজার সঙ্গে বর্তমানের শাক্তবাদ ও শাক্ত দেবীদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। একইভাবে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, 'শক্তিপূজা বা শক্তি সম্পর্কিত ধারণা দ্রাবিড় ধর্মের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। দ্রাবিড় ধর্মের শক্তি দেবতারাই পৌরাণিক যুগে হিন্দুদের শক্তি দেবী পার্বতী, দুর্গা, কালী-তে পরিণত হয়েছেন। এমন কী শাক্তদের সপ্ত মাতৃকার বিষয়টি দ্রাবিড়দের কাছ থেকেই নেওয়া।

সাম্প্রতিককালের মেহেরগড়ে কৃষিভিত্তিক উন্নত গ্রামীণ সভ্যতার (খ্রিস্টপূর্ব পাঁচহাজার বছর আগের) আবিষ্কারের পর এই পণ্ডিত বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতবাদ কিছুটা বদল করেছেন। সিন্ধু সভ্যতার চরম উৎকর্ষের সময় বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষক ও অন্য মানুষরাও আসতে থাকেন উন্নত সিন্ধু অঞ্চলে বসবাসের জন্য। সেই সময় তাঁরা সঙ্গে করে এনেছিলেন তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ধর্ম বিশ্বাস। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার মানুষজন সেইসব বিশ্বাস ও ধর্মাচরণকে কিছু সংস্কৃত করে অঙ্গীভূত করেছিলেন।

এ বিষয়গুলি বেশ বিশদে আলোচনা করেছেন এন. এন. ভট্টাচার্য তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মাদার গডেস' এবং 'হিস্টরি অব শাক্ত রিলিজিয়ন' বই দুটিতে। কিন্তু তিনি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা সম্ভবত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক এবং ভারততত্ত্ববিদ্‌দের কথা —আর্যরা বহিরাগত—এই তত্ত্বকে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিয়েই গোটা বিষয়টা বিচার করেছেন। সেখানেই উঠেছে কিছু প্রশ্ন।

প্রথমত, অনাদি অতীত থেকেই ভারতের বাইরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে নানা ভাষা ও ধর্মের মানুষ এসে এদেশে বসবাস শুরু করে পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গেছেন। এই জন্যই 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' তত্ত্বটি মান্যতা পেয়েছে। সেই তত্ত্ব অনুসারেই তাই কারা বহিরাগত আর কারা নয় তা নিশ্চিতভাবে করা যায় না। যে সিন্ধু সভ্যতা, মেহেরগড় সভ্যতা বা দ্রাবিড় সভ্যতার কথা বলা হচ্ছে, সেই সব সভ্যতার মানুষ কি ভারতের অধিবাসী? তাঁরাও কি বহিরাগত নন? যদি না হন, তাহলে ওই যুক্তিতেই আর্যদের বহিরাগত বলে চিহ্নিত করে একটি বিভাজনের নীতি নেওয়া হচ্ছে কেন? এর কিন্তু কোনো সদুত্তর পাওয়া সম্ভব হয়নি এখনও পর্যন্ত। ইংরেজরা সুদূর ইংল্যান্ড থেকে ভারত শাসন ও তাকে কবজায় রাখার জন্যই সুপরিকল্পিতভাবে এইসব তত্ত্ব বানিয়ে নিয়েছেন। দেশভক্ত বহু এবং স্বাজাত্যবোধে গর্বিত ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের দিয়ে এমন অভিযোগকে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য পদার্থ বিজ্ঞানীরাই শক্তির (Energy) গতি নিয়ে আলোচনার সময় প্রমাণ করেছেন, শক্তির গতি দুরকম—কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) এবং কেন্দ্রাভিগ (centripetal)। বিজ্ঞানে যাকে শক্তির কেন্দ্র বলা হয়েছে বা মানবসভ্যতার প্রসারণ ও বিবর্তনের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। তাই যে বিষয়ে যাদের বহিরাগত বলা হয়েছে তারা তো সেখানকার অধিবাসী নাও হতে পারে। অর্থাৎ যে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের সঙ্গে তুলনা করে আর্যদের বহিরাগত বলা হচ্ছে, সেগুলি ভারত থেকে নানা দেশে যাওয়া ভারতীয়দের কাছ থেকে জেনেই সেই স্থানের মানুষ গ্রহণ করে থাকতে পারে?

এসবই প্রশ্ন। এনিয়ে বিতর্ক হতেই পারে এবং হচ্ছেও, তাই সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই হিন্দুধর্মে মাতৃশক্তির উদ্বোধন নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

বেদে দেবীতত্ত্ব—বেদ বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ। একথা মেনে নিয়েছেন সকলেই। স্বভাবতই বেদের তথ্যগুলি ঐতিহাসিক দিক থেকে নির্ভরশীল একথা মানতেই হবে। তাই বেদে দেবীদের সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তারই আলোয় দেবীতত্ত্ব আলোচনার পথে এগোতে হবে।

একথা সত্য, বেদের ভাষা বা বৈদিক ভাষা কালক্রমে অবলুপ্ত হয়েছে। ফলে বেদের বিভিন্ন শব্দের অর্থ সম্পর্কেও রয়েছে নানা প্রশ্ন। বহুক্ষেত্রে অনুমানের ভিত্তিতেও বেদের কোনো কোনো মন্ত্র বা সূক্তের ব্যাখ্যা করা হয়। তাই মতান্তরের অবকাশ প্রচুর। তারই মধ্যে যাস্ক'র নির্ঘন্টু এবং সায়ণের ভাষ্যকেই প্রামাণিক বলে মনে করা হয়। তাঁদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ভাষ্যর ভিত্তিতেই বেদের দেবতাদের সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু একথা সত্য, কালকে উপেক্ষা করে বেদের অনেক দেব-দেবীই বর্তমানের ভূমিতে অবস্থান করছেন। আবার বেদের কোনও কোনও দেবতা এখন অপ্রচলিত। অনেকে বিবর্তনে অন্যরূপ নিয়ে বর্তমানে আমাদের কাছে পূজিত হচ্ছেন। তুলনামূলকভাবে বেশ কিছু দেবী প্রায় অ-রূপান্তরিত

ভাবেই পৌরাণিক যুগ পার হয়ে বর্তমানেও পূজিত হচ্ছেন। তবে তাঁদের গুণের ক্ষেত্রে বিয়োজন নয়, সংযোজন হয়েছে বেশি।

বিষ্ণুকে বাদ দিলে বেদের দেবতাদের একটা বড়ো অংশেরই একক পূজা কার্যত বিলুপ্ত হয়েছে। সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থায় বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের ঈশ্বরভাবনাও বিবর্তিত হয়েছে। একেশ্বরবাদ থেকে বহুত্বের দিকে এগিয়েছে হিন্দু সমাজ। বেদে দেব-দেবীদের প্রতিভার উল্লেখ না থাকলেও পৌরাণিক যুগ থেকেই মানবদেহকে মন্দির এবং সেই মন্দিরের মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠান এই বোধ থেকেই সম্ভবত প্রায় মানবীয় অবয়বে দেব দেবীর প্রতিমা নির্মাণ ও পূজার প্রবর্তন হয়েছে। বৈদিক যুগে যজ্ঞের চেয়ে মূর্তি পূজাই প্রাধান্য পেয়েছে। আর তারই মধ্য দিয়ে হিন্দুর আধ্যাত্মিক চেতনা এবং নান্দনিক সৃজনের ধারাটিও পরিপুষ্ট হয়েছে।

পৌরাণিক যুগ থেকেই হিন্দুদের মধ্যে দেবতাদের চেয়েও সংখ্যায় দেবী পূজার আধিক্যই দেখা যাচ্ছে বেশি। কিন্তু সেই সঙ্গে সর্বশক্তিময়ী দেবীরাও যুক্ত হয়েছেন। এক একজন দেবতার সঙ্গে। যেমন হিন্দু ধর্মের ত্রিদেব---স্রষ্টা ব্রহ্মা, পালক বিষ্ণু এবং সংহারক মহেশ্বর—এদের শক্তি বা ছায়া হিসেবে যুক্ত হয়েছেন ত্রিদেবী সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং পার্বতী বা মহামায়া। শাক্তধর্ম অনুযায়ী এই ত্রিদেবীই হলেন সর্বোচ্চ দেবী। এদের ত্রিমূর্তির পত্নীত্রয়ও বলা হয়।

এই ত্রিদেব এবং ত্রিদেবীর অস্তিত্ব বেদেও ছিল। কিন্তু পৌরাণিক যুগে এঁদের উত্তরণ ঘটেছে একটু ভিন্নভাবে। সৃষ্টির দেবতা প্রজ্ঞার পূজা প্রায় বিরল। গুণরাজির কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পালক বিষ্ণু প্রায় অপরিবর্তিত ভাবেই পূজিত। আর সংহারের দেবতা মহেশ্বর বেদের রুদ্রেরই নামান্তর বলে মনে করা হয়।

দেবী শক্তি—শাক্ত ধর্ম অনুযায়ী প্রকৃতি রূপা শক্তির তিনটি রূপ সৃষ্টির দেবী সরস্বতী, পালয়িত্রী লক্ষ্মী এবং বিনাশিনী মহাকালী।

ব্রহ্মাণী সরস্বতী শুধু বিদ্যা-শিল্প-সংস্কৃতি নয়, তিনি জ্ঞান-বুদ্ধি-চেতনারও আধার। পুরাণমতে জন্ম তাঁর শ্রীকৃষ্ণের জিবের ডগা থেকে।

পালনকর্তা বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী পার্থিব সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রী, উৎকর্ষ, সৌভাগ্য, সুখ ও মহত্ত্বের দেবী। পুরাণ-কথা ঃ তিনি মহর্ষি ভৃগু এবং খ্যাতির কন্যা। তিনিই বিষ্ণুর বক্ষস্থিতা মহালক্ষ্মী। সত্যযুগে তিনি নারায়ণ জায়া। ত্রেতায় রাঘবঘরণী সীতা আর দ্বাপরে তিনিই রাধা এবং রুক্মিণী। কলিযুগে তিনিই হবেন কল্কির স্ত্রী পদ্মা।

বিনাশক শিবপত্নী পার্বতী শক্তি, প্রেম, অসুর-বিনাশ, প্রলয় ও অধ্যাত্মের দেবী। রুদ্রমূর্তি তিনি—কালী, তারা, চণ্ডী, দুর্গা। বিভিন্ন পুরাণ থেকে জানা যায়, তিনি পর্বতরাজ হিমবান ও সুমেরদুহিতা মেনা বা মেনকার কন্যা। তিনিই উমা, অপর্ণা, দক্ষকন্যা সতী। তিনি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। জগৎ সৃষ্টির মূলকারণ তিনিই ত্রিদেব ও লক্ষ্মী-সরস্বতীকে সৃষ্টি করেন। সগুণরূপে শক্তি ছাড়া শিবের অথবা শিবছাড়া শক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই। নির্গুণ রূপে তিনি শক্তি-একক। তাঁকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না।

আধ্যাত্মিক চেতনায় শিব হলেন স্থানু, স্থির ও মহৎ আধার। শক্তি সেই চেতনারই গতিময় রূপ। হিন্দুধর্মে শিব ও শক্তি অভিন্ন—অভেদ। পরেমশ্বর শিবের ঐশ্বরিক রূপ দান করেছেন শক্তিই।

শক্তি পরম চেতনায় সমাহিত। সৃষ্টি ও ধ্বংস সবই করেন তিনি। তাঁকে ছাড়া পরম চেতনায় উন্নীত হওয়া যায় না। শক্তি অবিনাশী। তাঁর রূপান্তর হয় মাত্র। একইভাবে পরাশক্তিও বিভিন্ন কাজের জন্য তিনি নিজেই নিজের রূপ পরিবর্তন করেন মাত্র। তিনিই নারী, আবার তিনিই পুরুষ। প্রকৃতি বা শক্তির প্রকাশ ত্রিদেবী মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী এবং মহাকালীর রূপে। নিরাকার ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম এই ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ঘটান সৃষ্টিশক্তি মহা সরস্বতীর মাধ্যমে। সেই সৃষ্ট জগৎকে তিনি পালন ও সংরক্ষণ করেন স্থিতি শক্তি মহালক্ষ্মীর সাহায্যে। আর সেই সৃষ্ট জগতেরই বিনাশ ঘটান সংহার শক্তি মহাকালীর ধ্বংসলীলায়।

স্বভাবতই শক্তি এই মহাজগৎ সৃজনের প্রধান সহায়িকা। এই শক্তির উপাসকরাই শাক্ত। কবে থেকে হিন্দুদের মধ্যে এই দেবী সাধনার শুরু তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল। শুধু এইটুকু বলা যায়, হিন্দুধর্মের পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায় শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য এবং সৌরের মধ্যে একমাত্র শাক্তদের আরাধ্যাই দেবী শক্তি। শৈব ও বৈষ্ণবরাও অবশ্য প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। সে কারণে শৈব সাধনা সহায়িকা শিবজায়া শিবানী দুর্গা বা মহাদেবী। একইভাবে বৈষ্ণবদের দুটি ধারা কৃষ্ণায়েত ও রামায়েত-দের সাধনাতেও দেবী শক্তি হিসেবে পূজিতা হন যথাক্রমে রাধা ও সীতা। পঞ্চউপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে গাণপত্যদের সংখ্যা তুলনায় কম আর সৌর সম্প্রদায় তো প্রায় অবলুপ্ত।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শাক্ত সাধনার বীজ কিন্তু রয়ে গিয়েছে বেদের মধ্যেই। দেবতাদের জন্ম প্রসঙ্গে ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে, অবিদ্যমান থেকে বিদ্যমানতার সৃষ্টি। পরে উত্তানপদ থেকে সৃষ্টপৃথিবী এবং তার থেকে বিভিন্ন দিক পৃথিবী থেকে উদ্ভব হলো অদিতির। (১০/৭২)। এই অদিতিই হলেন দেবমাতা।

ঋগ্বেদেরই অন্যত্র বলা হয়েছে, অদিতিই আকাশ, অদিতিই অন্তরিক্ষ, অদিতিই মাতা ও পিতা, তিনিই পুত্র। তিনিই সকল দেবতা ও পঞ্চলোক। তিনিই জন্ম এবং তার কারণ (১/৮৯)।

এর থেকে বলা হয়, অদিতিই পরমশক্তি—তিনিই আদিমাতা। তাঁরই রূপান্তর আদ্যাশক্তি মহামায়া বা 'মহীমাতা' (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৩৩) এবং এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে মাতৃ বা শক্তি সাধনার বীজ।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, অদিতিই প্রাচীনতমা বা আদি দেবমাতা। তবে এই মাতৃমূর্তি যা সাধনার ধারণাটি নাকি এসেছে হরপ্পার দেবী মূর্তি থেকে। অর্থাৎ বৈদিক নয়, হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকেই এই দেবী সাধনার ধারণা পরিবর্ধিত হচ্ছিল। (এন এন ভট্টাচার্য; হিস্টরি অফ দি শাক্ত রিলিজিয়ান। (পৃঃ ৩৭ ও ৫৩)।

এই মতবাদেই বিশ্বাসী ভারততত্ত্ববিদ আর্থার বাসামের অভিমত, ভারতে আর্য আগমনের (১৫০০ খ্রিঃ পূঃ) আগে ভারতে যে প্রতিষ্ঠিত মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে আর্যদের সংগ্রাম ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্ভবত ভারতে শক্তি সাধনার সূচনা। 'ভূদেবী' ভারতে পূজা পেয়ে আসছেন অনাদিকাল থেকেই। ভূদেবীই জীবন ও আহার দেন বলে

করা হয় তাঁর পূজা। বস্তুত, নারী-বিহনে জীবন অসম্পূর্ণ। নারীই তো জোগায় সব কিছু.....ইত্যাদি (দ্রঃ আর্থার এল বাসাম ঃ ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া)।

বেদ এবং অন্যত্র দেবী তথা শক্তিসাধনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পরও এজাতীয় বিশ্লেষণ ব্রিটিশ রাজত্বে ইংরেজদের বিভাজন সৃষ্টির সুপরিকল্পিত প্রয়াস। এমন কথাই বলেছেন বিভিন্ন পণ্ডিত ও ইতিহাসিক বিশেষজ্ঞরা। তাই ওই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মাতৃপূজা যা শাক্তসাধনা সম্পর্কে বেদ পরবর্তী সাহিত্যে কী বলা হয়েছে সেটাই বরং দেখা যাক।

উপনিষদের মধ্যে 'কেন উপনিষদে (৭৫০—৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বলা হয়েছে। ইন্দ্রের জিজ্ঞাসা মেটাতে আকাশে আবির্ভূতা হলেন বহু শোভায় শোভিতা হৈমবতী উমা। তিনিই মেটালেন ইন্দ্রের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা (৩/১২—৪/১)।

এইভাবে পরবর্তীকালে রচিত 'শাক্ত উপনিষদ'-এ রয়েছে শ্রীবিদ্যা অর্চনার কথা। মহাকাব্যের যুগে রামায়ণে দেবী পূজার বা শক্তি সাধনার কথা না বলা হলেও মহাভারতে কিন্তু বেশ বিশদেই শাক্ত সাধনার কথা বলা হয়েছে। মহাভারতের বিরাট পর্বে বিরাটপুরে প্রবেশের আগে যুধিষ্ঠির দুর্গাস্তব করেন। ওই স্তবে তিনি দুর্গাকে যশোদানন্দিনী, নারায়ণ প্রণয়িনী, কুলবিবধনি কংস ধ্বংসকারিণী ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেন। দেবীকে তিনি ভুবনেশ্বরি, ত্রৈলোক্যতারিনি, বালক সদৃশ চতুর্ভুজা, নানা আয়ুধ ধারিণি ইত্যাদি বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত করেন। (৪/৬)।

অন্যদিকে মহাভারতের ভীষ্মপর্বে যুদ্ধ শুরুর আগে কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন দুর্গার যে স্তব করেন, তাতে তিনি দেবীকে সিদ্ধসেনানি, মন্দরবাসিনি, কুমারী, কালী, কৃপালিনি কপিলে ইত্যাদি সম্বোধন করে যুদ্ধ জয়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। (৬/২৩)। মহাভারতের মতে দেবী বিন্ধ্যাচলবাসিনী।

মহাকাব্য পরবর্তী পৌরাণিক যুগে দেবী বর্ণিত হয়েছেন দুর্গা, কালী ইত্যাদি নামে। দেবীপুরাণ এবং কালিকাপুরাণে দেবী-ই প্রকৃতি। পুরাণগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয়, ব্রহ্মাণ্ড এবং দেবী ভাগবতে দেবী সম্পর্কে করা হয়েছে বিশদ আলোচনা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য এবং দেবী ভাগবতের 'দেবী গীতা'য় শাক্ত সাধনার মূল তত্ত্বগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে অতি বিশদে। শক্তি বা প্রকৃতি সাধনার এবং শক্তিদর্শনের যথাযথ রূপটি তুলে ধরা হয়েছে এবং দুই পুরাণে।

দেবী মাহাত্ম্যই সাধাণভাবে 'চণ্ডী' নামেই সকলের কাছে পরিচিত। দেবী বা শক্তিতত্ত্বের স্বরূপটি ধরা পড়ে দেবী ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ১২—১৫ শ্লোকে। যেখানে দেবী স্বয়ং বলেছেন ঃ ময়ি সর্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরণীধর। ঈশ্বরোহহ সূতোত্মা বিবড়াত্মাহমস্মি?''---এই সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মময়ী আমাতেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমিই ঈশ্বর, আমিই সূতাত্মা আবার আমিই বিবাড়াত্মা। আমিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আবার আমিই ব্রাহ্মণী-বৈষ্ণবী-মহেশ্বরী। আকাশের সূর্য-চন্দ্র-তারা সবই আমি। বলেন যে সব পশুপাখি সে সবই আমিই। আমিই চণ্ডাকে। আবার আমিই তস্কর। আমিই ক্রূর ব্যাধ আবার সৎকর্মশীল সাধু। আমিই সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ ন পুত্তসক। সর্বসি নিয়ে অন্তরে-বাহিরে যা কিছু

With Best Compliments from -

Janta Paints Pvt. Ltd.

MFRS. OF : ALL KINDS OF INDUSTRIAL & DECORATIVE PAINTS & CHEMICALS

C-170, Phase -V, Focal Point, Ludhiana - 141 010 (Pb.)

Ph. - 0161-5036550, Mob. : 98140-92555, 98141-62555

E-mail : info@jantapaints.com

দেখা বা শোনা যায় সবই আমি।

দেবী গীতা—'গীতা' যেমন মহাভারতের অন্তর্গত, 'দেবী গীতা'-ও একই ভাবে দেবী ভগবত পুরাণের একটি অংশ। দেবী এখানে নিজের স্বরূপ বোঝাতে যেসব কথা বলেছেন, তা যেন গীতার একাদশ অধ্যায়ে উক্ত শ্রীকৃষ্ণর কথারই প্রতিধ্বনি। দেবী বলেছেন, 'অহমেবাস পূর্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিল' (দেশি ভাগবত ৩৭/৩২/২)—হে নাগাধিশ, সৃষ্টির আগে যেমন আমিই ছিলাম, অন্য কিছুই ছিল না। আমার সেই আত্মরূপই চিৎসমন্বিত পরব্রহ্ম ইত্যাদি নামে বেদান্ত শান্তে নির্দিষ্ট আছে।

এই সব উক্তির মধ্য দিয়ে দেবীই যে মনোজগতের কারণ স্বরূপা আদ্যাশক্তি একথাই অনুরণিত হয়েছে। তবে পণ্ডিতমণ্ডলীর ধারণা, এইসব সত্ত্বেও আদ্যাশক্তি কখনই পুরাণকে অস্বীকার করেনি। কিন্তু দর্শনে আছে আত্মার কোনো লিঙ্গভেদ নেই। অভিন্ন আত্মাই সব কিছুতে বিরাজমান। তাই-বা কেন, সৃজনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান গুরুত্বের কথা প্রকাশেরই অভিব্যক্তি দেখা গেছে অর্ধনারীশ্বর-এর মূর্তির রূপ কল্পনায়।

এইরকম বিশ্লেষণের ধারায় বলা হয়, শাক্ত দর্শনে রয়েছে সাংখ্য এবং অদ্বৈত দর্শনের ছায়া। একই সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের মতোই শাক্ত উপাসকরাও বেশ কিছু উপনিষদ রচনা করেছেন। তানিমা 'মুক্তিকা'-র মতে শাক্ত উপনিষদের সংখ্যা আট। এই আটটির মধ্যে অথর্ব বেদের সঙ্গে যুক্ত চারটি উপনিষদ হলো গীতা, উপনিষদ, ত্রিপুরতারিণী, দেবী উপনিষদ এবং জাবল উপনিষদ। ঋগ্বেদের সঙ্গে যুক্ত উপনিষদের সংখ্যা তিন, যথা ত্রিপুর উপনিষদ, সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদ এবং বহভৃচ উপনিষদ। তার সরস্বতী রহস্য উপনিষদটি কৃষ্ণযজুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত।

শাক্ত সাধনার প্রয়োগগত শাস্ত্র হলো তন্ত্র। গুরুনির্ভর শাক্ততন্ত্রে কুলকুণ্ডলিনী যোগের মন্ত্র, যন্ত্র, ন্যাস ও মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে। শাক্ত সাধনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বৈদিক না বৈদিক তা নিয়ে রয়েছে দীর্ঘ বিতর্ক। তাই সে বিষয়ে না গিয়ে বরং তান্ত্রিক গ্রন্থের কথা স্মরণ করা যাক। তন্ত্রশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে আছে সারদাতিলক তন্ত্র (১১ শতক), কালী তন্ত্র (১৫শ শতক), যোগিনী তন্ত্র, সর্বানন্দর, সর্বোল্লাসতন্ত্র, ব্রহ্মানন্দ গিরির শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী ও তারারহস্য এবং পূর্ণানন্দ গিরির শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও শ্যামারহস্য (১৬শ শতক), কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার, রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যের আগমতত্ত্ব বিলাস (১৭শত শতক) এবং ভাস্করার্যের বিভিন্ন গ্রন্থ (অষ্টাদশ শতক)।

শাক্ত সাধকরা একই পরমাশক্তিকে বিভিন্ন রূপে পূজা করে থাকেন। এঁদের মধ্যে প্রথম সহস্রাব্দের দেবীরা হলেন, পাবর্তী, দুর্গা, কালী, যোগমায়া, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গায়ত্রী, সীতা ও রাধা।

তান্ত্রিক সাধকদের ত্রিপুরসুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা। এছাড়া বিভিন্ন দেবতার শক্তি রূপে কথিত সপ্তমাতৃকা। অসুরদের সঙ্গে সংগ্রামের সময় এঁরা দেবীকে সাহায্য করেছিলেন। সপ্তমাতৃকা ছাড়া আছেন ৬৪ গোপিনী। লক্ষ্মীর আছে আটটি মূর্তি—তাই তাঁর অন্য নাম অষ্ট লক্ষ্মী এবং দুর্গার নটি রূপ নিয়ে নবদুর্গাও পূজিত হন নবরাত্রির সময়।

তান্ত্রিক সাধনার আবার দুটি ধারা—বামাচার ও দক্ষিণাচার। উপাসিতা কালীরও নানা রূপ—ভদ্রকালী, কুজ্জিকা, কুলেশ্বরী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, শ্মশান কালী, দক্ষিণাকালী, সিদ্ধেশ্বরী ইত্যাদি। তাছাড়া আছেন দশ মহাবিদ্যার দশ দেবী। দেবীর সঙ্গে আঞ্চলিক দেবী শীতলা,উমার নামও যুক্ত হয়েছে।

শাক্তগীতির প্রভাব—আদিতে শাক্তসাধনা গূহ্য সাধনা হিসেবে বিবেচিত হতো। তাই সাধারণ মানুষ শাক্ত ও তান্ত্রিকদের কিছুটা ভয়ের চোখে দেখতেন। কিন্তু অষ্টাদশকশতক থেকে বাঙ্গলার শাক্ত কবিরা তাঁদের ভক্তি সংগীতের মধ্য দিয়ে সাধারণের ভয়কে ভক্তিতে পরিণত করেন। এইসব কার্যের মধ্যে আছেন ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২--১৭৬০), রামপ্রসাদ সেন (১৭১৮/২০—১৭৮১), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৬৯ --১৮২১), দাশরথি রায় (১৮০৬—১৮৫৭) প্রমুখ কবি ও গায়করা শ্যামা বিষয়ক গান বা শাক্তপদাবলীর ভক্তিরসে বহুদেশকে মাতিয়ে তোলেন। একইসঙ্গে উমা বা পার্বতীকে নিয়ে আগমনী বিষয়ক গানগুলিও শক্তির দেবীর প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে আপামর বাঙ্গালির।

এই শাক্তসাধনার প্রতি মানুষের প্রভাব সময়কে বদলে দেয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬–১৮৮৬)। শক্তিদর্শনকে সর্বধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে 'যত মত তত পথ' বলে যে সাধনরীতির প্রবর্তন করেন এবং বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁর মানসপুত্ররা যেভাবে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মযোগকে মিশিয়ে সাধনার পথে এগিয়ে যান সেটা আধুনিক শিক্ষিতদেরও শাক্তধর্ম সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছে।

ভারতমাতা—মাতৃশক্তির জাগরণে মাতৃপূজা নতুন ধারায় প্রবর্তনে বিপ্লবী দেশসেবকরাও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বিংশ শতকের গোড়া থেকে তাঁরা ভারতমাতার পূজার প্রচলন করেন দেশের নানা জায়গায়। দেবী দুর্গাকে সামনে রেখে তাঁরা ভারতমাতার রূপ কল্পনা করেন।

প্রসঙ্গত, বঙ্গভঙ্গের সময়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বঙ্গমাতা'র যে ছবি আঁকেন সেটিই পরবর্তীকালে 'ভারতমাতার' ছবি হিসেবে শুধু ভারত নয়, অন্যত্রও এক নতুন চিন্তার আলোড়ন তোলে।

নারীই দেবী, পথও—বঙ্গভূমি তথা ভারতের মাতৃশক্তির উদ্বোধক ও মাতৃপূজার ইতিহাসের পথে এইভাবে অগ্রসর হতে দেখা যায়। নির্দিষ্ট কোনো দেবী নন, ভারতের কাছে নারী মাত্রই দেবী এবং মা।

ভারতীয়রা বিশ্বাস করে যে নারীশক্তির যথাযথ জাগরণ ঘটিয়ে মাতৃশক্তির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই দেশের যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব। শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বকে তখন শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখানো সম্ভব হবে। স্মরণ হবে সেটাই সত্য—সেটাই পথ—যে পথের কথা বলে গেছেন উপনিষদের ঋষি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে —নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। □





উপন্যাস

স্বপ্ন ধরার জন্য

সুমিত্রা ঘোষ

খাবার টেবিল মোছার শেষ কাজটুকু সেরে খবরের কাগজ হাতে শোবার ঘরে এসে জানালার গরাদ ধরে গলিটার দিকে তাকালেন তনিমা। এমনিতেই নিরিবিলি গলিটা এই গরমের দুপুরে যেন আরও নির্জন হয়ে পড়েছে। আগে আগে তাও ফেরিওয়ালাদের হাঁক ডাক শোনা যেত—'টাটকা ছাঁছ, খাটি দুধের মাঠা!' —'কুলপি মালাই বরফ!' —'শিল-নোড়া কাটাবে গো? শিল-নোড়া!' —'বেগমপুরের নরম তাঁতের শাড়ি-ই-ই!' —'স্টিলের বাসন রাখবে গো? চারটে পুরনো কাপড়ে বড়ো গামলা আর দুটো বাটি-ই-ই!' —আরও কত কী যে নিয়ে আসত ওরা। আর, শীতকালে নভেম্বরের শুরু থেকেই এসে পড়ত কাশ্মীরি কার্পেট আর শালওয়ালারা। ফেরিওয়ালারা জানে দুপুরে বাড়িতে মা-দিদি-বউদিদের স্বাধীন রাজত্ব। মঙ্গলাহাটের ত্রিশ টাকার তাঁতের কাপড় খানা ষাট টাকায় অনায়াসেই গছানো যায় এদের। —কিন্তু করোনা অতিমারি এদেশে এসে ঢুকে পড়ায় সেই যে লক্-ডাউন হলো সে তালা আর খোলা যাচ্ছে না। খুলতে যাবে যাবে করছে তো আবার রোগ বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণ বাঁচাতে যে যার গর্তে ঢুকে হয়তো-বা অনাহারেই কাটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এভাবে কি বাঁচা যায় সরকারি সাহায্য না পেলে?

জানালা দিয়ে গরম হাওয়া আসছিল। তনিমা জানালা বন্ধ করে বিছানায় এসে শুলেন। তিনি জানেন এই গা এলিয়ে দেওয়াটুকুই সার। না কাগজ পড়তে পারবেন না ঘুমোতে পারবেন। অনেক পেছনে ফেলে আসা অতীতের এক যন্ত্রণাময় অধ্যায় তাকে একা পেলেই তিমি মাছের মতো হাঁ করে গিলতে আসবে এক্ষুনি। এতোগুলো বছর ধরে এই হয়ে আসছে। কাকে বলবেন এই জ্বালার কথা? যাকে বলতে পারেন সেই বিকাশও কি একই জ্বালায় জ্বলে পুড়ে রোজ রোজ ছাই হয়ে যাচ্ছে না? ওর চাপা স্বভাব বলে বহিঃপ্রকাশ নেই। কিন্তু ক্ষতটা তো

দুজনেরই এক! রাত্রে একা বিছানায় শুয়ে তিনি কি টের পান না যে বিকাশ ভালো করে ঘুমোতে পারে না? দু-তিন বার উঠে জল খায়, বাথরুমে যায় কিন্তু মুখে রা কাড়ে না। যতক্ষণ দিনের বেলায় জেগে থাকে ততক্ষণ কিছু না কিছু ফাইলপত্র নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখে। লক্‌ডাউনে কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস তো বন্ধ হয়নি তাই রক্ষে হয়েছে। ও সবরকম সাবধানতা মেনে ভিড়ের মধ্যেই মেট্রোয় চেপে অফিসে যাচ্ছে। আগে আগে শাশুড়ির আমলের কাজের লোক বাসন্তীদি ওদের বস্তি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথটুকু পেরিয়ে দুপুরে চলে আসত ফ্যানের নীচে ঘুমোবে বলে। এখন ওরও আসা বারণ। তাই তনিমা এতো একা হয়ে পড়েছেন এই দুপুরবেলার সময়টাতে। কথা বলতে পারলে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো ফেলে আসা সেই দিনগুলোর স্মৃতি তাকে এতো যন্ত্রণা দিতে পারত না যখন তখন। যদি সামান্য একটা ক্লু পেতেন তাহলে সে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন। কিন্তু একেবারে ক্লুলেস একটা ঘটনা মন কী করে মেনে নেবে? এ কি ম্যাজিক নাকি যে সকলের চোখের সামনে ফুস্ বলতেই চোখের পলকে একটা মানুষ বাতাসের মধ্যে ভ্যানিশ হয়ে যাবে? অসম্ভব! .....তাহলে কী হয়েছিল?

এই কী হয়েছিল প্রশ্নটাতেই আটকে গেছে সবাই। কিছুই তো হয়নি! কিছু হবার মতো কোনও কারণ তো কেউ দেখেনি কখনো। বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপড়শী, আত্মীয়-স্বজন কেউই তো কোনো বেচাল দেখেনি কখনো! তাহলে কেন গেল? কোথায় গেল যে পুলিশ পর্যন্ত হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে কোনো হদিশ দিতে পারল না? দু-বছর ধরে ক্যালকাটা পুলিশ এই রহস্যময় অন্তর্ধানের কেস নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল সমস্ত সম্ভাব্য অ্যাঙ্গল মাথায় রেখে। কিডন্যাপিং, ইলোপ, সুইসাইড, মেয়ে পাচার—কিছুই বাকি রাখেনি। মুম্বাই, হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি—মানে দেশের সবকটা মেট্রো সিটির পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তদন্ত করেছে কিন্তু ফলাফল শূন্যে এসে ঠেকেছে। এই বয়সি, ওই চেহারার মেয়েটির ওইসব কোনো অ্যাঙ্গলের সঙ্গে সংযোগ ঘটেনি। অবশেষে লালবাজারের পুলিশ অফিসার ওদের দুজনকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন—'এই কেসটা সমাধান করতে না পারার জন্য আমরা দুঃখিত মিস্টার বাগচী। দুটো বছর ধরে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখিনি আমরা। শেষমেশ লাস্ট ট্রাই হিসাবে দেশের যেসব মঠে, আশ্রমে সন্ন্যাসিনীরা থাকেন সেসব যায়গাতেও তল্লাশি করেছি। কারণ অনেক সময় হঠাৎ কোনো ভাবাবেগের কারণে অনেক পুরুষ-মহিলা কাউকে না জানিয়ে নিজেকে একেবারে পরিবার থেকে উৎপাটিত করে গোপনে সন্ন্যাস নিতে চলে যায় এরকম কেসও দেখেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের এই প্রচেষ্টাও বিফল হলো। .....দেখুন, ওর ডেড্ বডি যখন পাওয়া যায়নি তখন আমরা ওকে মৃত বলে মনে করতে পারি না, তাই কেসটা আমরা ক্লোজ করব না। ওটা খোলাই থাকবে। যদি হঠাৎ করে কোনো সূত্র হাতে এসে পড়ে তাহলে আবার উঠে পড়ে লাগবে ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের আর কিছু করার নেই।.....

সেই দিনের পরে অনেক বছর এসেছে, চলেও গেছে। এখন আর নতুন কোনো সূত্র পাওয়ার আশা করেন না বিকাশ-তনিমা। একবার, শুধু একটি বার যদি ল্যান্ডলাইন ফোনে কল করে বলত—'আমি বেঁচে আছি। ভালো আছি। চিন্তা করো না।'—তাহলেও বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হতো। দিবারাত্রি অগ্নিদহন থেকে মুক্ত হতে পারতেন ওরা। সেদিন লালবাজার থেকে ফিরে কঠিন গলায় বিকাশ বলেছিলেন—'আর নয় তনু। ও আমাদের সন্তান নয়, ও শত্রু! কাল থেকে তুমি আর আমি দুজন দুজনের জন্য বাঁচব। যে স্বেচ্ছায় চলে গেছে তার জন্য আর দুশ্চিন্তা করব না, তুমিও কাঁদবে না। যা কিছু করেছ শুধু ওর জন্যই করেছ এতকাল। এখন নিজের জন্য ভাব, নিজের জন্য কর তনু।'

তনিমা বলেছিলেন—'আমি একা করেছি? তুমি করনি ওর জন্য?'

—'হ্যাঁ করেছি। বড্ডো বেশি বিশ্বাস করেছিলাম। আশকরা দিয়ে মাথায় তুলেছিলাম। তার প্রতিদানে ও আমাদের প্রতারিত করেছে। ও কিন্তু হারিয়ে যায়নি তনু! ও ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করে কারও সঙ্গে পালিয়েছেন বুঝতে পারছ না তুমি? পুলিশ অফিসার মুখে না বললেও ইঙ্গিতে বলেছেন। তা না হলে আকাশ-পাতাল খুঁজে দু-বছরে একটা ক্লু পাওয়া গেল না?'

তনিমা মাথা নেড়ে বলেছিলেন—'এটা কী করে সম্ভব? তাহলে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানত না? পাড়ার ছেলেরা ঠিক ধরে ফেলতো। কিন্তু ওরা তো ক্লিন চিট দিয়েছে!'

—'তুমি আবার ভুল করছ তনু। ও যার সঙ্গে পালিয়েছে তাকে যে এই অঞ্চলের ছেলেই হতে হবে তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। মফস্‌সলের ছেলে হতে পারে কিংবা বাইরে থেকে আসা কেউ হতে পারে। পুলিশ কিন্তু এদিকটাকেও যাচাই করেছিল শুরুতেই। কিন্তু সে সময় ওই বয়সি কোনো ছেলের মিসিং ডাইরি কোনো পুলিশ থানায় করা হয়নি। সেই সময়ে পাঁচটা নাবালক ছেলে-মেয়ের মিসিং ডাইরি ছিল, যাদের মুম্বাই পুলিশ উদ্ধার করেছিল। ওরা সিনেমায় নামবে বলে মুম্বাই পালিয়ে গিয়েছিল। ও সিনেমায় নামবে বলে পালায়নি, হারিয়েও যায়নি। ও কাউকে ভালবেসে আঁটঘাট বেঁধে স্বেচ্ছায় পালিয়ে গেছে বুঝেছ? আমার স্থির বিশ্বাস ও এমন কারও সঙ্গে গেছে যাকে আমরা কখনও মেনে নিতে পারব না। আর সেই কারণেই ও আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতে চায়নি। কারণ ফোন করলে পুলিশ লোকেশন ট্র্যাক করত, চিঠি দিলে তো আরও বিপদ! পোস্ট অফিসের ছাপ থেকেই সম্ভাব্য স্থানের

সূত্র পেয়ে যেত পুলিশ।'

তনিমা মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন—'টু-টু-টুম্পার পেটে পেটে এতো বদবুদ্ধি কোথা থেকে এলো গো? আমরা তো ওকে এই শিক্ষা দিইনি! এতো নরম স্বভাবের মেয়েটা কখন তলায় তলায় এমন ক্ষুরধার বুদ্ধি মাথায় নিয়ে কুচক্রী হয়ে উঠল? আমি যে আর ভাবতে পারছি না!'

বিকাশ বলেন—'তুমি-আমি ভাবতে পারব না তনু। মাত্র আঙুলে গোনা কিছু বছরের মধ্যেই আমরা পুরনো মডেল হয়ে গেছি। অচল পয়সা। আসলে কী জানো পৃথিবীটা আর আগের মতো বিশাল গ্রহ হয়ে নেই এখন। টি. ভি. ইন্টারনেট, হাতে হাতে মোবাইল পৃথিবীটাকে ঘরে ঘরে পড়ার টেবিলে রাখা ছোট্ট একটা কাগুজে গ্লোব বানিয়ে ছেড়েছে। আমাদের যুগ শেষ এটা হাসিমুখে মেনে নিতে পারলে শান্তি পাবে। নতুন প্রজন্মে আমাদের সন্তানরা মায়ের গর্ভ থেকেই শানিত বুদ্ধি নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। আমার মেয়েও তার ব্যাতিক্রম নয়!'

তনিমা অসহায় আকুলতা নিয়ে বলেন—'ও তাহলে কোথায় গেছে গো?'

নির্বিকার গলায় বিকাশ বলেন—'দুবাইও হতে পারে, বাংলা দেশও হতে পারে। .....কাল থেকে আমরা কিন্তু নতুন জীবন শুরু করব। নতুন করে দুজনে দুজনের জন্য বাঁচব। আর কাউকে চাই না আমাদের। টুম্পা যেখানে গেছে সেখানে ভালো থাকুক। কিন্তু আমি চাই আমরাও ভালো থাকি। তাই lets start a new! কেমন? .....দাও এক কাপ চা দাও। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরে মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে গো।

—'একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা আমাদের মেয়ে কোনো ছেলের সঙ্গেই পালিয়েছে এটা কেন ভাবছ তুমি? একা একাও তো পালাতে পারে?'

—'না পারে না। পঞ্চাশোর্ধ্ব কোনো মহিলা সংসারের যাতনায় একা ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারেন কিন্তু অল্পবয়সি মেয়েরা একা যেতে ভয় পায়। ওরা পুরুষের প্রোটেকশনে থাকতে পছন্দ করে। এটা আমাদের দেশের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার মনস্তত্ত্ব। কম বয়সি মেয়ের পালানোর পেছনে একজন পুরুষ প্রেমিকের ভূমিকা থাকবেই ৯৯% ক্ষেত্রে। টুম্পারও তাই ছিল বই কী! না হলে এতো সাহস হতো না। .....যাও চা বানাও। এসব কথা চটকিয়ে আর নিজেকে কষ্ট দিও না লক্ষ্মীটি।'

টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে তনিমা বলেন—'তুমি ঠিকই বলেছ। ঈশ্বরের সৃষ্টি এই শরীরটাই মেয়েদের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। এটা একটা পবিত্র মন্দির। এই মন্দিরে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর একটা মানুষ আসবে পৃথিবীতে। বড়ো হয়ে সে মানুষ হবে কী অমানুষ হবে তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তোমার কাজ কর। শরীররূপী এই মন্দিরকে যথাসাধ্য পবিত্র করে রাখো। প্রথম জীবন পিতার প্রোটেকশনে থেকে নিজেকে রক্ষা কর তারপর স্বামীর প্রোটেকশনে থেকে সন্তানের জন্ম দাও। ব্যাস! জেনে রাখো, যা কিছু তোমার শরীর নিয়ে স্বাধীনচেতা করার কোনো অধিকার মেয়েদের নেই। করলেই কিন্তু সমাজ তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে পতিত করে দেবে। যদি প্রেম করে পালাতে চাও তাহলেও খেয়াল রেখো প্রেমিক যেন বিশ্বস্ত হয়, যেন বিয়ে করে সংসার সৃষ্টি করে। প্রেমিক বিশ্বস্ত না হলে কিন্তু আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই হবে তোমার! —ভয়-ভয়-আর ভয়! আমাদের জীবনে ভয় ছাড়া আর কি কিছু থাকে বল? টুম্পা কি বিশ্বস্ত প্রেমিক পেয়েছিল গো? ও কি একটা সুখের সংসার বানাতে পেরেছিল? না কি.....মেয়েটা ..... আস্তাকুঁড়ে.....' —তনিমা ফুঁফিয়ে কেঁদে ওঠে ছুটে রান্নাঘরে চলে যান। বিকাশ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

তনিমা শোকে দুঃখে পাগল হয়ে যে তিক্ত শ্লেষাত্মক কথাগুলো বলে গেল সেগুলো মিথ্যে নয়! দু-বছর ধরে মেয়ের সন্ধান পাবার যে ক্ষীণ আশা ছিল মনে আজ লালবাজার থেকে আশাহত হয়ে ফিরে এসে আর সামলাতে পারেনি। কিন্তু এটা তো বাড়তে দেওয়া যাবে না, নাহলে ও ডিপ্রেশনে চলে যাবে। তনিমাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য, ওর মনটাকে সুস্থ রাখার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে তাকে। অফিস আওয়ার্সের বাইরের সময়টুকু কেবলমাত্র তনুর জন্য রাখতে হবে। ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে বেড়ানোর জন্য।



পাড়ার নাম জমির মালিক হরিপদ সামন্তই রেখেছিলেন—'শান্তি পাড়া'। নরেন্দ্রপুর থেকে কাজিপাড়া অব্দি ওদের অনেক খালি জমি পড়েছিল। তখনও ফ্ল্যাট কালচার চাগিয়ে ওঠেনি। লোকে জমি কিনে নিজের পছন্দমতো বাড়ি তৈরি করে বাস করতে ভালোবাসত। বড়ো রাস্তা থেকে অল্প ভেতরে ঢুকে ১৫ ফিট চওড়া পিচ্‌ঢালা রাস্তাকে গলি বলা যায় না বোধহয়। তবুও এটা গলিই। হরিপদ সামন্ত প্লট করে বিক্রি করেছিল দেখেশুনে শিক্ষিত ভদ্র মানুষদের কাছে। গলিতে ঢোকার মুখেই ডান দিকের বড়ো তিনতলা বাড়িটা সামন্তদের বসতবাড়ি। হরিপদ মানুষটি পয়সাওলা, জমিওলা এবং বেশ প্রভাবশালী। কিন্তু লোকটি কুটিল নয় বরং পরোপকারী শান্তিপ্রিয় ব্যাবসায়ী বললে ভালো হয়। সুরমা দেবী মনে মনে এই হরিপদ সামন্তের ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে আছেন সারাজীবন। এতো কম দামে না দিলে তার সরকারি চাকুরে স্বামী কোনোদিনও এই আড়াই কাঠার প্লটটা কিনতে পারতেন না। আর তার স্বপ্নের বাড়িও তৈরি হতো না।

তার কৃতজ্ঞ থাকার লিস্টে আর একজন হলেন স্বামীর বাল্যবন্ধু হরিহর আত্মা নির্মলদা, মানে নির্মল ভট্টাচার্য। নির্মলদা বাড়ি তৈরির সময় টাকা দিয়েও সাহায্য করেছেন। এমন কী তাদের ছেলের জন্য তনিমার মতো একটি সুন্দরী লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে জোগাড় করে তার সুখের সংসারকে আরও সুখ আরও শান্তিতে ভরপুর পূর্ণতা এনে দিয়েছে। হাসি, অল্পে খুশি এই তনিমা তাদের জীবনে এক মূল্যবান সম্পদ। জোর করে ঠেলে না পাঠালে যে বউ বাপের বাড়িও যেতে চায় না বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে ফেলে সে তো বউ নয়! সে মেয়ের চেয়েও বেশি আপন। —আর আছে নাতনি টুম্পা ওরফে অনন্যা বাগচী। রূপে-গুণে মেয়েটা মার মতোই হয়েছে। লেখাপড়ায় ভালো, স্বভাব মিষ্টি এই নাতনি বাপের মতো লম্বা, মার মতো মাথা ভরা একরাশ চুল নিয়ে ছটফটে একটা পাখির মতো আট বছরেরটি হলো এবার। সুরমার মনে হয় তার মতো সুখী মানুষ খুব কমই দেখা যায় যাদের ওপর ভগবানের আশীর্বাদ অবিরাম বর্ষিত হয়। 'ধন্য প্রভু, ধন্য আমি।'

—'মা! ও মা! —সুরমার সুখ চিন্তায় বাধা পড়ে তনিমার ডাকে। নিশ্চয় কোনো ফেরিওয়ালা এসেছে। এটাই ওদের আসার টাইম। তনু এসে বলেন—মা, নাড়ুদা এসেছে ছাপা শাড়ি নিয়ে। সামনে পয়লা বৈশাখ তার সাথে গরমও বাড়বে। এই গরমে ছাপা শাড়ি পরলে অনেক আরাম পাবে। নিয়ে নেবো বাসন্তীদি, তোমার আর আমার জন্য?'

সুরমা জানেন এই ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে সস্তার জিনিস কিনেই তার আদরের বউমা খুব খুশি থাকে বরাবরই। পূজোর সময় ছাড়া গড়িয়াহাট-নিউ মার্কেটে যেতে চায় না বিশেষ। অতি অল্পেই ওর চাহিদা পূর্ণ হয়। তাই তিনি কখনও বারণ করেন না। আজও করলেন না। —'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ। নিয়ে নাও। তুমি যাও, আমিও আসছি।'—খুশি হয়ে চলে যায় তনু। তিনি আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসেন। —এই তনু ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে কত জিনিস কিনে ঘর সাজিয়েছে। তার আমলে এতো শৌখিন সজ্জা ছিল না ঘরগুলোর। তিনি পুরনো দিনের মানুষ, শৌখিনতা বিশেষ ছিল না তার। রান্নাবান্না ঘরকন্না নিয়ে মগ্ন থেকেছেন। পাঁচিল ঘেঁষে কিছু ফুলের গাছ লাগিয়ে ছিলেন। ব্যাস্ ওই পর্যন্ত! তনু কাশ্মীরি ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে কার্পেট কিনেছে, ওয়াল হ্যাংগিং, আরও কত কী যে কিনেছে! কাশ্মীরি শাল আর টুম্পার জন্য পোশাকের কাপড় তো প্রত্যেক বছর কেনে। একজন বয়স্ক কাশ্মীরি ভদ্রলোক মুটের মাথায় কার্পেট আর কাঁধে বড়ো বড়ো ব্যাগ ঝুলিয়ে নিয়ে আসেন তার পশরা। তনু তার পারমানেন্ট কাস্টমার। তনু তাকে আংকল বলে ডাকে। তিনি অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। দেখলেই বোঝা যায় এরা ভদ্র শিক্ষিত মানুষ। ব্যাবসার কারণে অতো দূর দেশ থেকে শীতকালে এদেশে এসে ফেরিওয়ালা হয়ে যান। তিনি হিন্দি ভাষায় তনুর সঙ্গে কথা বললেও সুরমা বোঝেন কিছু কিছু। ওদের সঙ্গে এখানকার ফেরিওয়ালাদের তুলনাই চলে না। এতোই মার্জিত ব্যবহার ওদের। প্রতি বছর আসেন, এবারও এসেছিলেন। তনু সারা বছর ধরে টাকা জমায় এদের জিনিস কিনবে বলে। সত্যিই তো! কী অপূর্ব কারুকার্য! কী অসাধারণ সূচিশিল্প! নেশা ধরে যাবার মতোই জিনিস ওদের। তনুরও নেশা ধরে গেছে। তার নিজেরও কি ওসবের উপর নেশা ধরে যায়নি? তার তো শালই এখন চারখানা হয়ে গেছে। —উঠে বাইরের বারান্দায় এলেন সুরমা।

ছাপা শাড়িগুলো কোহিনুর কোম্পানির। পরতে আরাম, রংও ছিঁড়ে যাওয়া অব্দি নষ্ট হয় না। এই নাড়ুও অনেক বছর ধরে তাদের কাছে কাপড় বিক্রি করছে। ঠকায়নি কখনো। একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। তনু ওকে জল-বাতাসা খাওয়ায় এলেই। নাড়ু ওর জীবনযুদ্ধের গল্প করে। ভালো কাপড়খানা অনেক সময় বউদিকে আগে দেখাবে বলে আলাদা করে রাখে। তনু বউ হয়ে আসার পর সুরমাকে আর প্লাস্টিক বালতি, গামলা, স্টিলের বাসনের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়নি। পুরনো কাপড়ের বদলেই ওগুলো হয়ে যাচ্ছে। তাদের গলির দক্ষিণ দিকের শেষপ্রান্তে অনেক পুরনো আর বিরাট সরকারি উদ্বাস্তু কলোনির লোকেরা মাঝখানের গোল মাঠটাতে বাজার বসায় সকাল বেলায়। এই কলোনি বাজার থেকেই পাড়ার ঘরে ঘরে মাছ মাংস সবজি—মানে প্রয়োজনীয় সবই হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। আর আসে কাজের মাসিরা। শহরের কোলাহল থেকে, ধুলো থেকে সামান্য দূরে সর্বসুবিধা যুক্ত, সমমনস্ক প্রতিবেশী যুক্ত এই 'শান্তি পাড়া' যদি স্বর্গরাজ্য না হয় তাহলে আর কোথাও স্বর্গরাজ্য থাকতে পারে না বলে মনে হয় সুরমার। শুধু একটা ভয়ে আজকাল কিঞ্চিৎ কাতর হয়ে পড়েন তিনি। অবসর নেবার পর থেকে কর্তার শরীরটা আগের মতো ভালো থাকছে না। অল্পে হাঁফিয়ে পড়েন। প্রতিবেশী ডাক্তার সন্দীপ সবরকম টেস্ট করে হার্টের বড়ো ডাক্তারকে রেফার করেছিল। তিনি দেখে কী বলেছেন অতশত বোঝেননি সুরমা, তবে বেগতিক যে আছে কিছু সেটা বুঝেছেন। তনু নিয়ম করে বাবাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে, নিয়ম করে বাবা-মাকে গলিটাতেই রোজ সকাল-সন্ধ্যায় তিন চক্কর মারার জন্য ঠেলে পাঠাচ্ছে, বাবার সকালবেলা বাজার করতে যাওয়া বন্ধ করে নিজেই বাজার করছে, প্রেশার মাপার যন্ত্র কিনে ঘরেই প্রেশার দেখে খাতায় লিখে রাখছে—এতো আয়োজনের পেছনে কারণ তো থাকবেই। তবে সুরমা জন্ম-মৃত্যুকে নিয়তির বিধান বলে মানেন। যতদিন 'তিনি' রাখবেন ততদিনই থাকতে পারবে এই সুন্দর পৃথিবীতে! একদিন তো তাকেও যেতে দিতে হবে ওদের, বাবাকেও যেতে দিতে হবে! বিধির বিধান বদলাবে না। সুখের

পেছনেই দুঃখ ওত পেতে থাকে যে!

অবিনাশ বাগচীর বাইপাস সার্জারির ডেট ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অপারেশন টেবিলে আর উঠতে হলো না। সকালে টয়লেট থেকে বেরিয়ে বুক চেপে বসে পড়েছিলেন ইজি চেয়ারে। আর ওঠেননি। সুরমার কর্তা সাতচল্লিশ বছরের খেলাঘর ত্যাগ করে চিরন্তন ধামে চলে গেলেন এক পলকের ঝটকায়। সুরমার ভেতরে কী হচ্ছিল কেউ জানে না। কিন্তু বাহ্যত তাকে শান্ত সংযত দেখাচ্ছিল। ভেঙে পড়া ছেলে-বউকে, বিশেষ করে দাদুর নয়নমণি নাতনি টুম্পাকে তিনিই সামলাচ্ছিলেন। মেয়েটা ছোটবেলা থেকেই ভয়ানক চাপা স্বভাবের। বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না। তনিমার একেবারে বিপরীত চরিত্র ওর মেয়ের। বাচ্চা বেলাতে পড়ে গিয়ে চোট পেলে, কেটে-ছড়ে গেলে কাঁদত না, মুখেও বলত না কিছু। লুকিয়ে রাখতে চাইত। ধরা পড়ে গেলেই বলত—'বললে তো তোমরা বকবে। বিশ্বাস করবে না যে আমি দুষ্টুমি করিনি।' —দাদু ছাড়া ওর আর কোনো বন্ধু ছিল না। এমনিতেই কম কথা বলা মেয়ের কীসে খুশি কীসে অসন্তুষ্টি কেউ বুঝতে পারত না, দাদু ছাড়া। সেই মুখ বোজা মেয়ে টুম্পা এখন দুহাতে ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মতো বলে চলেছে—'ও বাপি তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমার দাদুকে আগুনে পুড়িও না প্লিজ! দাদুর যে গায়ে বড়ো বড়ো ফোসকা পড়বে! ভীষণ কষ্ট পাবে পুড়ে পুড়ে। ও বাপি তোমরা দাদুকে কফিনে করে মাটির তলায় শুইয়ে দাও না! তাহলে তো দাদু পোড়ার যন্ত্রণা পাবে না। আমিও তাহলে কফিনটা দেখতে পাবো। দাদু তো ওটার ভেতরেই থাকবে বাপি। প্লিজ! —সুরমার এখন শোক করলে চলবে না। সেভেনে পড়া এই মেয়ের ঠাম্মি ছিলেন, এখন দাদুও হতে হবে তাকে।

সময়ের প্রলেপ সব ক্ষতই শুকিয়ে দেয়, শুধু দাগটা থেকে যায়। ধীরে ধীরে বাড়ির পরিবেশ স্বাভাবিক হয়েছে। সদা ছটফটে প্রগলভ বউ তনিমার যেন হঠাৎ বয়স বেড়ে গেছে। সংসারের সব দায়িত্ব মাথায় নিয়ে শাশুড়িমাকে অবসর দিয়ে নিরলস সেবিকা হয়ে পড়েছে তনু। উচ্ছ্বাসের তীব্র স্রোতস্বিনী যেন পলি পড়ে শীর্ণ নদী হয়ে বইছে এখন। অবিরাম কল কল ধ্বনিতে নেচে চলা নদী কেমন শান্ত, গম্ভীর হয়ে চরিত্র বদল করে ফেলেছে সংসারের চাপে পড়ে। ওকে দেখে সুরমার কষ্ট হয়। তার নিজের স্বাস্থ্য কর্তা যাবার পর থেকেই ভাঙতে আরম্ভ করেছিল, এখন তো আর কোনো সাহায্যই করতে পারেন না সংসারে। তনু করতে দেবেও না। টুম্পা স্কুলে যাবার সময় ওর ঘন চুল ম্যানেজ করে দুটো বিনুনি বেঁধে দেওয়া আর ঠাকুরঘর দেখা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তার। টুম্পার দাদুর অভাব পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু টুম্পা সেই দরজায় চাবি দিয়ে রেখেছে। ঠাম্মিকে ভালবাসে কিন্তু দাদুর মতো বন্ধু করতে চায় না। ক্লাস নাইনে পড়ছে এখন। এই বয়সে মেয়েদের মনের কত পরিবর্তন হতে থাকে, কত স্বপ্ন দেখে মেয়েরা। বন্ধুদের গল্প শোনাবার জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু টুম্পার যেন বয়ঃসন্ধির পরিবর্তন বলেও কিছু নেই। স্কুলে যাওয়া, কোচিঙে যাওয়া আর নিজের ঘরে বসে পড়াশুনো করার বাইরে আর কোনো জীবন নেই ওর। আর যদি থাকেও তাহলে সে সব গল্প ওর মনের বন্ধ সিন্দুকে চাবি দিয়ে রাখা আছে। মা-বাপি-ঠাম্মির সঙ্গে স্কুলের বন্ধুদের গল্পও শেয়ার করবে না এই মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন, এক ডালা ফুলের মতো যার রূপ, ষোলো বছর যার বয়স—তার কোনোও গল্প থাকবে না এটা ভাবা যায় না। সুরমা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন ওর মন জানার—'হ্যাঁরে, তোর এই ফিগার, এতো রূপ দেখে তোকে হ্যাংলা ছেলেগুলো বিরক্ত করে না?'

ও উত্তর দিয়েছে—'আমাকে পাবে কোথায় ঠাম্মি? আমি স্কুল বাসে যাই–আসি। কোচিং ক্লাসে মা দিয়ে আসে, বাপি অফিস থেকে আসার সময় নিয়ে আসে। একথা কেন জিজ্ঞেস করলে? সুরমা বলেন—'জিজ্ঞেস করলাম কারণ এখন বড়ো হচ্ছিস তো! তার উপরে এতো রূপ দিয়েছেন ভগবান! ছেলেরা তো আকৃষ্ট হতেই পারে।' মুখ গম্ভীর করে টুম্পা বলে—'না। আমার সঙ্গে সে সব ঘটেনি ঠাম্মি। আমি তো এখনও ছোটোই আছি—তোমরাই বলো। বড়ো হয়ে এসব নিয়ে ভাববো। ঠিক আছে?' —বলেই টুম্পা উঠে চলে গেল।

ব্যাস্। হয়ে গেল। চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনিয়ে চলে গেল। সুরমা বুঝে যান এই মেয়ে কখনো ঠাকুমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে না। ও বাপ-মার কাছেও কখনও মন খুলবে না। ওকে বোঝা বড়ো কঠিন। কর্তা বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো ওর মনের হদিশ পেতেন। আর কেউ পাবে না। ভগবান করুন ওর এই চাপা স্বভাবের কারণে ভুল করেও যেন ভুল পথে চলে না যায়। বিকাশ আর তনিমা তো খালি মেয়ের ভালো রেজাল্ট করা নিয়েই ব্যস্ত। শুধু পড়্ পড়্ আর পড়্। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের খোরাকও দরকার বই কী! বন্ধু-বান্ধব থাকবে, মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে একটু বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, নিদেন সিনেমা-থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাওয়া— এগুলোর দরকার ছিল। তবেই মেয়েটা বাবা-মাকে ভরসা করে মনের ইচ্ছেগুলো বলতে পারতো। শুধু পড়ার বইয়ে মুখ গুঁজে থেকে বাবা-মাকে ভালো রেজাল্ট করে দেখাতে দেখাতে মেয়েটা যে সঙ্গীসাথীহীন ক্লান্ত একটা জীবনযাপন করছে সেটা তার ছেলে-বউমা ভেবে দেখে না। তিনি বোঝাতে গেলেই বলে—'এখন ওকে পড়তেই হবে গো মা। এটা কম্পিটিশনের যুগ। বড়ো কিছু হতে গেলে ক্যারিয়ার নিজেকেই বানাতে হয় মাধ্যমিক- উচ্চমাধ্যমিক আর জয়েন্ট এনট্রেন্স পরীক্ষা দিয়ে। এই কটা বছর জান-প্রাণ দিয়ে ওকে পড়তে হবে। আনন্দ-ফুর্তি বেড়ানোর জন্য সারা জীবন

পড়ে আছে।' —ওদের মেয়ে ওরা যা ভালো মনে করছে করুক। তিনি আর কদিন? সারা জীবনের কাজের লোক বাসন্তী আছে তার সহচরী হয়ে। ওর সাথেই মনের কথা বলে নিজেকে হালকা করেন সুরমা। বয়স ওরও হয়েছে, ঘরে ছেলে-বউ, নাতি-নাতনি আছে তবুও কলোনির ঘর থেকে এই বাড়িতেই ওর মন পড়ে থাকে। তনিমাকে খুবই ভালবাসে বাসন্তী। নিজে বেশি খাটুনি খেটে বউদিকে একটু আরাম দিতে পারলে যেন বর্তে যায়। আর মাসিমা সুরমা যে ওর দুর্দিনের অন্নদাত্রী সে কথা বাসন্তী কখনও ভোলে না। কৃতজ্ঞতার বন্ধনে বাগচী পরিবারের সাথে দীর্ঘকাল ধরে জড়িয়ে থেকে পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে। ওর সাথে সব কথা শেয়ার করতে দ্বিধা হয় না সুরমার। —আর বউমা তনিমা তো সুরমার চিরকালের বাধ্য মেয়ে। মা'র কথার উপরে কোনোদিন একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি, শুধু এবার টুম্পার পড়াশোনা নিয়ে বেশি কড়াকড়ি করতে বারণ করেছেন যখন তখন মৃদু প্রতিবাদ করেছে। হতে পারে ওরাই ঠিক বলছে! যুগ যে বদলে গেছে সেটা তো তিনি চোখেই দেখেন। পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই এখন সব বিষয়ে এগিয়ে আছে। তাদের যৌবনে এসব কি ভাবা যেতো? আঠারো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল দশ বছরের বড়ো পাত্রর সঙ্গে। এখন এসব কল্পনার অতীত।

যাক্ গে, ওরা যে সুখে আছে, মা বলে তাকে যে ভক্তি শ্রদ্ধা করে এতেই তিনি সন্তুষ্ট। তনুর ফেরিওয়ালারা এখনও আসে, শাড়িওয়ালা নাড়ুগোপাল আসে, শীতে সেই কাশ্মীরি ভদ্রলোক তনুর মেয়ের জন্য আগের বছর অর্ডার দিয়ে রাখা সুতির কাপড়ের উপর কাশ্মীরি কাজ করা চুরিদার-কুর্তার ড্রেস মেটেরিয়েল গুলোর সঙ্গে আরও নতুন কিছু নিয়ে আসেন। স্টিলের বাসন, ফুলঝাড়ু, আচারওলা—সবাই আসে। আজও তনু ফেরিওয়ালা এলে মাকে ডেকে নিয়ে যায়। বিকাশ অফিস থেকে ফিরে মার ঘরে এসে বসে চা-জলখাবার খায় মাকে সঙ্গ দেবার জন্য। তিনমাস পরপর মায়ের ডাক্তারি চেক আপ করায়। তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন বরাবর, এখনও তাই আছেন। শুধু কর্তা চলে গেছেন ওইটুকুই ফাঁক। টুম্পা যদি তাকে দিয়ে দাদুর অভাব মেটানোর চেষ্টাটুকু করত তাহলে ওই ফাঁক টুকুও ভরাট হয়ে যেতো।

কদিন ধরে সুরমার পিঠে ব্যথা। একটুতেই খুব হাঁফিয়ে পড়ছেন। বাসন্তী রসুন তেল গরম করে মালিশ করছে, হটওয়াটার ব্যাগের সেঁক দিচ্ছেন কিন্তু কমছে না। ব্যথা আর হাঁফ ধরা ছাড়া অন্য উপসর্গ ছিল না। হঠাৎই জ্বর এলো তার, গা পুড়ে যাওয়া ১০৪ ডিগ্রি জ্বর। পাড়ার ডাক্তার সন্দীপ এসে মুখ গম্ভীর করে বলেন—'নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে। মনে হচ্ছে নিউমোনিয়া। সেই যে নার্সিং হোমে গেলেন সশরীরে আর বাড়ি ফিরলেন না। দেহটি এলো। সব অর্গান ফেল হয়ে গিয়েছিল তার। দুদিকের ফুসফুসেই বরফের মতো জমাট বেঁধেছিল কফ। আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেই কফ গলানো গেল না। বয়সটা বড়ো ফ্যাক্টার ছিল তার। চলে গেলেন সুরমা বাগচী।



—'হ্যালো!'

—'উঁম! বল।'

—'আমি এখানে এসেছি।'

—'কই কিছু জানাওনি তো? কখন এলে?'

—'কাল রাত্রে। ট্রেন লেট ছিল ছ' ঘণ্টা। জানালে তো সারপ্রাইজ হতো না!'

—'কোথায় উঠেছ? দেখা কখন হবে?'

—'যেখানে গতবার উঠেছিলাম সেখানেই উঠেছি। তোমার যখন সুবিধা হবে তখনই দেখা হবে। আমি তো ফ্রি।'

—'তাহলে কাল দেখা করার প্ল্যান কর। কাল বেলা তিনটে পর্যন্ত ক্লাস আছে। তারপর সাতটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি।'

—'ও. কে। আচ্ছা যে নোটস্‌গুলো পাঠিয়ে ছিলাম সেগুলো কেমন ছিল? কাজে লেগেছে তোমার'?

—'খুব কাজে লেগেছে। অসাধারণ নোটস্! এমন নোটস্ পেলে ফার্স্ট ক্লাস আটকায় কে? .....উফ্! আর সাতটা মাস প্রচুর খাটতে হবে ফাইনাল সেমিস্টারের জন্য। ওদের স্বপ্ন পূরণ করে আমার ছুটি।'

—'না না, ওরকম করে বলো না। ওদের স্বপ্ন পূরণ করা ছেলে- মেয়েদের কর্তব্য। ওদের নিঃস্বার্থ ত্যাগের জন্যই কিন্তু আমরা বড়ো হই, উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয় আমাদেরও। ....আচ্ছা, তোমার এতো রাগ কেন বলত? তুমি জয়েন্ট বসতে চাওনি, মেডিক্যাল- ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাওনি—ওরা তো মেনে নিয়েছিলেন। তোমার ইচ্ছে মতোই তো ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে পড়ছ, তারপরেও খুশি নও কেন? আমি মাঝে মাঝে তোমাকে বুঝি না।'

ওপাশ থেকে উত্তর এলো—'ওসব কথা থাকা এখন। কালকের প্ল্যানটা জানিয়ে দিও। আমার এখন ক্লাস আছে, এখন তাহলে রাখি?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ। রাখো।'

সেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। বাগচী বাড়ির



সামনে পাড়ার লোকের ভিড়। এ বাড়ির মেয়ে অনন্যা বাগচী এ পাড়ার গর্ব। সে সেকেন্ডারি বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান র‍্যাংক নিয়ে পাশ করেছে ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন, অঙ্ক-এ তিনটি 'লেটার' শুদ্ধু। এই গর্ব শুধু বিকাশ-তনিমারই নয়, এই ছোট্ট পাড়ার প্রত্যেক প্রতিবেশীরও গর্ব। তাই সবাই শুভেচ্ছা-আশীর্বাদ জানাতে এসেছে। বাড়ি ফাঁকা হওয়ার পর উল্লসিত বিকাশ মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল— 'ভালো রেজাল্ট করার জন্য তোকে উৎসাহ দিতাম আমরা কিন্তু তুই যে এ...তো ভালো করে ফেলবি সেটা কল্পনাতেও আসেনি। আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে ধন্য করে দিলি টুম্পা। দাদু-ঠাম্মি শুধু দেখে যেতে পারল না রে মা! তোর এই বিজয় যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে এখন। এইচ.এস.-এর সাথে সাথে জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। আমি জানি তুই পারবি।'

টুম্পা বিকাশের বুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। মাথা নেড়ে নেড়ে গম্ভীর মুখে বলল—'না বাপি তুমি জানো না। কারণ তুমি কখনও জানতে চাওনি যে তোমার মেয়ে কী পড়তে চায়, কী হতে চায়। তুমি তোমার ইচ্ছেগুলো জোর করে আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাও। ....আমি জয়েন্ট এনট্রেন্স পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তার- ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই না। ফিজিক্স নিয়ে পড়তে চাই আর তাই জয়েন্টের প্রিপারেশন করতে গিয়ে এইচ. এস. এর রেজাল্ট খারাপ করতে একেবারেই চাই না। এইচ. এস.-এও আমি ভালো রেজাল্ট করব এবং ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি.এস.সি.-তে ভর্তি হব। তারপর মাস্টার্স করব, রিসার্চ করব। ....এটা আমার স্বপ্ন বাপি, প্লিজ তুমি বাধা দিও না।'

বিকাশ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। টুম্পা এতো কথা কখনও বলেনি একসাথে। ও বাধ্য শান্ত গম্ভীর চাপা স্বভাবের মেয়ে শুধু নয়, ওর চালচলন পোশাকআশাকও এখনকার মেয়েদের মতো নয়। চুরিদার পাজামা-কুর্তির উপরে দোপাট্টায় গা ঢেকে রাখা পোশাকই একমাত্র পছন্দ। এতকাল মা-বাপি যা বলেছে নীরবে তাই করেছে মেয়েটা। কখনও প্রশ্ন তোলেনি। আজ প্রথম প্রতিবাদ করল তীব্র আক্রমণে। সত্যিই তো! ওরা তো কোনদিন টুম্পার ইচ্ছেগুলো জানতে চায়নি! ....না? ওকে জোর করবে না আর, শেষে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। বিকাশ ধাতস্ত হয়ে শান্ত গলায় বলল—'তোর কথা আমি মেনে নিচ্ছিরে পাগলি। তোর যখন ফিজিক্স নিয়ে পড়ার এতো ইচ্ছে তুই তাই পড়বি। আমি জানি তুই যা-ই পড়িস না কেন তোর স্বপ্ন সফল হবেই। —কি খুশি তো?'

টুম্পার মুখ খানাও খুশির ছটা। বলল—'হ্যাঁ বাপি, আমি খুব খুশি গো। তোমাকে ওরকম করে বলেছি বলে খারাপ লাগছে। আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ!'

এতক্ষণের নীরব শ্রোতা তনিমা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তবে বিকাশ যদি ওর মতামত জানতে চাইত তাহলে এবার ও

টুম্পাকেই সাপোর্ট করত। আজ আনন্দের দিনে বিকাশ যে নিজেকে সামলে নিয়ে টুম্পার বাপের কাছে চাওয়া জীবনের প্রথম দাবি মেনে নিয়েছে তাতেই তনিমা কৃতজ্ঞ। মা বেঁচে থাকতে কতবার ওদের বোঝার চেষ্টা করেছেন—'ওরে তোরা মেয়েটার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা কর, ওর সঙ্গে দিনরাত শুধু পড়াশুনোর কথা না বলে গল্প কর। সিনেমা দেখাতে নিয়ে যা। এদিক ওদিক বেড়াতে যা তোরা কয়েক দিনের জন্য। ওর মনের কপাট খুলে স্বাভাবিক হাওয়া বাতাস বইতে দে ওর মনে। জন্মদিনে ওর বন্ধুদের নেমন্তন্ন কর। ওকে তো তোরা ছোটবেলা থেকে শুধু এটা করো না—সেটা করোনাই বল্লি। লোকে নাকি বাচ্চা মেয়ে দুষ্টুমি করলেও নিন্দে করবে! তোদের ভয়ে মেয়েটা ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে ফেলল নিজেকে। পড়ে গিয়ে চোট পেয়েও কাঁদত না, বলত না। দ্যাখ এখন সময় আছে ওকে বদলাবার। কাছে টান ওকে নাহলে মানসিক রুগি হয়ে যাবে শেষে।

ওরা মা'র কথাগুলোকে ঠাকুমার অপত্যস্নেহের চিন্তা ভেবে পাত্তা দেয়নি। আজ টুম্পার অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ দেখে বোঝা গেল মেয়েটা কত ক্ষোভ কত জ্বালা পুষে রেখেছিল মনের মধ্যে। না, আর খোঁটায় বেঁধে রাখব না ওকে। বরং ইচ্ছেমতো চলাফেরার উৎসাহ বাড়াবো।

টুম্পা ওর কথা রেখেছিল। এইচ. এস.-এর পরীক্ষায় অষ্টম র‍্যাংক নিয়ে দ্বিতীয়বার বাবা-মার মুখ উজ্জ্বল করে মেয়ে ওর কাঙ্ক্ষিত ফিজিক্স অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে কলেজ অনেক দূর। কয়েক বছর আগে হলে যাতায়াতের সমস্যা হতো। এখন লোকাল ট্রেন তো আছেই, সঙ্গে মেট্রো রেলের সংযোগ হয়ে দূরত্ব আর নেই কলকাতায়। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সবকিছু নিকট হয়ে গেছে। মা আর ওকে কড়া শাসনের বেড়ি পরিয়ে রাখে না, টুম্পাও তাই মার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করতে চায় এখন। লাইব্রেরি কিংবা অন্য কোনো কারণে দেরি করে বাড়ি ফিরলে মা আর রাগ করে না। অবশ্য দেরী হবার কারণ থাকলে টুম্পা ফোনে জানিয়ে দেয় মাকে। মা তাতেই খুশি থাকে। মা'র নিজের জীবনেও তো কোনো নতুনত্ব নেই। সংসার সংসার করে দাদু-ঠাম্মির মন জুগিয়ে ভালো বউ হবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কী ছিল মা'র? এমনকী মধ্যমগ্রমে বাপের বাড়িতেও যেতে চাইত না এবাড়িতে অসুবিধা হবে বলে। ঠাম্মি বিজয়াদশমীর পর ঠেলেঠুলে জোর করে একসপ্তাহের জন্য পাঠালে পরদিনই ফেরত চলে আসত মুখে একগাল হাসি নিয়ে—'চলে এলাম মা।' ঠাম্মি খুব রেগে গিয়ে বলত—'চলে এলে? তুমি যে আমাদের বদনাম করে দিচ্ছ তনু! ওরা তো ভাববেন আমরা তোমাকে যেতে দিই না?'

মা বলত—'ওরা তোমাকে চেনে মা। তোমার বদনাম করে না, আমাকে দোষ দেয়। ....আসলে আমিই তো তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি না গো! তা, সেটা ওরা এতকালে ভালো করেই বুঝে গেছে'—বলে হাসত মা। টুম্পার মনে হয় মা যেন নিজের কামনা-বাসনা ইচ্ছাগুলোকে কোনো দামই দিত না। ঠাম্মি-বাপি হাজার বললেও জামা কাপড় বাজার করার জন্য দক্ষিণাপন গড়িয়াহাট মার্কেটে যেত না সবসময়। বছরে দুবার মাত্র যেত—চৈত্র সেল আর পূজোর বাজার করতে। সারা বছরের নিত্য প্রয়োজন মিটিয়ে নিত ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে কিনে। ওই এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল ওর মার। সেই আকর্ষন আজও বজায় আছে এবং থাকবেও চিরকাল জানে টুম্পা। তবে বিশেষ আকর্ষণ ছিল কাশ্মীরি জিনিসের প্রতি। উলেন কার্পেট থেকে পেপার ম্যাশ ডিবে-কৌটোর অভাব নেই ওদের বাড়িতে। এই একটা ব্যাপারে মাকে কখনও কার্পণ্য করতে দেখেনি ও। সেই পাকা দাড়ি সুদর্শন বয়স্ক ফেরিওয়ালাকে মা মুর্তজা আংকল বলে সম্বোধন করত, খুব সম্মান করত ওনাকে। শীতকাল এলেই ছটফট করত কবে মুরতাজা চাচা ভাতিজি তনিমার দরজার কড়া নাড়বেন বলে। কাশ্মীরির জিনিস কেনার জন্যে মার একটা আলাদা ফান্ড ছিল। সবাই জানত এটা। তাই দাদু, ঠাম্মি, বাপি—সকলেই এই ফান্ডে টাকা ডোনেট করত স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে। হয়তো ভাবত বউটা আর তো কিছু চায় না কখনও। টুম্পার ভাবতে হাসি পায় এখন—মা প্রত্যেক শীতে নানাবিধ জিনিস কিনে আগামী বছরের জন্য আগাম অর্ডার সঙ্গে কিছু অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে রাখত মুরতাজা বাট্টু মশাইকে। অবশ্য বেশিরভাগ জিনিসই মেয়ের শীত ও গরমকালীন পোশাকের কাপড়ের অর্ডার হতো। টুম্পার আলমারিতে এতো কাশ্মীরি সূচিশিল্পের কারুকার্য করা পোশাক জমেছে যে অনায়াসে একটা সুন্দর প্রদর্শনী করা যেতে পারে। অবশ্য এই চুরিদার স্যুটগুলো ওর নিজেরও অত্যন্ত প্রিয়।

কলেজে ড্রেসকোড নেই তাই টুম্পা রোজ নতুন নতুন ডিজাইনের কাশ্মীরি স্যুট-দোপাট্টা পড়ে কলেজে যায়। ব্যাস্, বন্ধুরা ধরেছে ওকে—'এই তোদের কেউ কাশ্মীরে থাকে বুঝি?'

—'নারে। আমার মার একজন পুরনো শালওয়ালা আছেন, প্রত্যেক শীতে কলকাতায় আসেন কাশ্মীর থেকে। মা ওনার কাছ থেকে কাপড়গুলো কিনে টেলারকে দিয়ে বানিয়ে দেয়। তোরা শালওয়ালাদের ডাকবি। পেয়ে যাবি ওদের কাছে।'

ওরা বলে—'ধুর! ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে শালওয়ালাকে পাওয়া যায়? সাততলার বারান্দা থেকে ওদের নাগাল পাওয়া দুস্কর। কাশ্মীর সরকারি অ্যাম্পোরিয়ামে একবার গিয়ে দেখব তাহলে।'

—টুম্পার এখন বন্ধুও হয়েছে। একটা নতুন স্বপ্ন দেখছে এখন ও। দিল্লিতে জে.এন.ইউ. ইউনিভার্সিটিতে এম.এস.সি করতে যাওয়ার স্বপ্ন। বিশ্বজুড়ে এতো নাম, কত শত বিখ্যাত মানুষরা

পড়েছেন ওখানে। ওরও ভীষণ ইচ্ছে জে.এন.ইউ. তে পড়ার। কিন্তু মা-বাপি কি অতদূরে ছাড়বে ওকে? উলটে বলবে—'কেন রে? ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে বিশ্ববন্দিত মানুষরা বেরোননি নাকি? ঘরের মুর্গা ডাল বরাবর? দিল্লিতে মোটেই যেতে হবে না তোমাকে। এখানেই এম.এস.সি. পড়বে তুমি। জে.এন.ইউ. তে সারক্ষণ ঝামেলা লেগে থাকে, পড়িস না কাগজে? টি.ভি.তে দেখিস না? যতই নামি হোক, ওটা একটা রাজনীতির আখড়া। ওখানে যেতে হবে না।' টুম্পা এসব জানে। আবার এটাও জানে যারা সত্যিই পড়াশোনাকে ভালোবেসে ওখানে পড়তে যায় তারা ওই রাজনীতির আখড়া থেকে অনেক দূরে রাখে নিজেদের। তারা শিক্ষাটা গ্রহণ করে। কুশিক্ষা তাদের স্পর্শ করতে পারে না। ওকেও পারবে না।—কী জানি কী হবে? এই স্বপ্নটাকে ও ধরতে পারবে কি না! তবুও চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা না করে বসে থাকবে না ও। মা'র মতো নিজের সব ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবে না ও। সেই কারণে কেউ যদি ওকে স্বার্থপর বলে তো বলবে। ও তো খারাপ কিছু চাইছে না, নিজের পছন্দের ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাইবে মাত্র। সে জন্য দূরদেশে থাকতে হলে থাকবে! লোকে তো বিদেশে যাচ্ছে পড়তে, তাহলে দেশের রাজধানীতে ওর পড়তে যাওয়াতে আপত্তি কেন হবে?—যাক্ গে। এখন এসব নিয়ে মাথা খারাপ করা বাতুলতা হবে। সময় এলে দেখবে ও।

নভেম্বরেও সেবার বেশ গরম ছিল। টুম্পার একটু জ্বর জ্বর ভাব, তাই কলেজে যায়নি সেদিন। দুপুরবেলা মা ছাদে গেছে শুকনো কাপড় তুলতে, তখন বেল বাজল। দরজা খুলতেই দেখে মুর্তজা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আর তার পেছনে ক্লিন শেভড্ এক লম্বা ছিপছিপে সুন্দর তরুণ যার গালদুটো রোদের তাপে গোলাপি হয়ে গেছে।

—'ক্যায়সি হো বেটা? মাম্মি হ্যায়?'

—'জী, ঠিক হুঁ। মা ছাদ পর গয়ী। ....আপ আইয়ে অন্দর। নমস্তে।'

ওরা এসে সোফায় বসতে টুম্পা ফ্যান চালিয়ে দিয়ে দু-গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দিল। তার মধ্যেই তনিমা শুকনো কাপড় হাতে এসে পড়েছে। মুর্তজাকে দেখেই খুশি হয়ে বলেন—'এসেছেন আংকল? নমস্কার।' শরীর ভালো আছে তো? এখানে এখনও যা গরম আপনাদের খুব কষ্ট হবে। ....একে তো চিনলাম না.....

মুর্তজা বললেন—'ও আমার নাতি আছে বহুজী। নাম আন্‌মোল বাট্টু। জেএনইউ-মেঁ ফিজিক্স নিয়ে কী সব রিসার্চ করছে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে একটা আলোচনা চক্রে এসেছে, তো ভাবলাম সঙ্গে নিয়ে আসি। পুরানো কাস্টমার তো রিস্তেদার জ্যায়সা হয়ে যায়। সব পুরানো কাস্টমারদের সাথে মুলাকাত করিয়ে দেব।'

—'একদম ঠিক কথা বলেছেন আংকল। আর ওকে সঙ্গে এনেছেন তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। ....আনমল তোমার গরমে খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না বাবা? দাঁড়াও এ.সি. চালিয়ে দিচ্ছি।'

মুর্তজা তর্জমা করে নাতিকে বুঝিয়ে দিলেন তনিমার কথাগুলো। তখন ও বলল—'নহী আন্টি, তকলিফ নহী হো রহা। দিল্লি মে গর্মি অউর জ্যাদা হ্যায়।'

এই ছেলেটা জে.এন.ইউ.-তে রিসার্চ করছে শুনেই টুম্পা চমৎকৃত হয়েছে তার উপরে কিনা ফিজিক্সেই। বাঃ বাঃ! ওর কাছ থেকেই সব খবর জেনে নেবো। বলল—'হাই! আমি অনন্যা বাগচী। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বিএসসি পড়ছি ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সি কলেজে। জে.এন.ইউ. সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে আমার অনেক কিছু জানার কৌতূহল হচ্ছে।'

মা তখন বলল—'আমার মেয়েও কিন্তু অনেক কৃতী ছাত্রী। সেকেন্ডারি থেকে এইচ.এস. পর্যন্ত প্রথম দশ জনের মধ্যে র‍্যাঙ্ক করেছে। ওর পড়াশোনা নিয়ে কথা বলতে পারলে আর কিছু লাগে না ওর।....আচ্ছা টুম্পা তুই ওকে তোর রুমে নিয়ে গিয়ে কথা বল। এখানে আমাকে এগুলো দেখতে দে। মা আনমোলের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—'যাও বাবা, উসকা ঘর মে যাকে কথা বল।'

না বুঝে আনমোল আবার দাদুর দিকে তাকায়। উনি নিজেদের ভাষায় তর্জমা করে দেন। ছেলেটা কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছিল। টুম্পাই হিন্দিতে বলেছিল—'আমার কামরায় গিয়ে কথা বলতে বলছে মা, কারণ আমরা এখানে ফিজিক্স নিয়ে কথা বল্লে চাচা-ভাতিজীর কেনা-কাটার খুব অসুবিধা হবে। আসুন প্লিজ!—বলে হেসেছিল।

ওরা সেদিন এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে কথা বলেছিল। জে. এন. ইউ.-র নাড়ী নক্ষত্র খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিল টুম্পা। ওর এতো আগ্রহ দেখে আনমোল বলেছিল—'আপনি জে.এন.ইউ. তে পড়তে চাইলে আমি সাহায্য করতে পারব।' ও বলেছিল— 'ধন্যবাদ। তবে সেটা তো বিএসসি পাশ করার পরে হবে। আপনারও তো ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট! ফার্স্ট ক্লাস এমএসসি এখন ফিজিক্সে রিসার্চ স্কলার। আমাকে নোটস্ দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন? আমাদের বিএসসি-র সিলেবাস দিয়ে দেব।'

—'অবশ্যই করব। আমার ফোন নম্বর রাখুন। আপনার ফিউচার এইম কী? আমি তো নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হতে চাই। মিসাইল বানাবো টুম্পা বলল—''আমি স্পেস সাইনটিস্ট হতে চাই। আপনি মিসাইল, অ্যাটম বম্ব বানাবেন, আমি স্যাটেলাইট পাঠাবো মহাকাশে।

চমৎকার নোটস্ আসতে থাকল, সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠল। প্রথম প্রেমের স্পন্দন অনুভব উপলব্ধি করল টুম্পা। আনমোল একজন জিনিয়াস ছাত্র। ভবিষ্যতে ও হয়তো মস্তবড়ো স্কলার

হবে ওর প্রতিভার জোরে। আজ অবধি কোনো দিন ও মুখে বলেনি আই লাভ ইউ। বললে হয়তো টুম্পার ভালো লাগত না। আর পাঁচটা ছেলের মতো সস্তা বলে মনে হতো ওর। আনমোল ভালবাসা বুঝিয়েছে ওর সহযোগিতা দিয়ে। ফার্স্ট সেমিস্টারের ঠিক আগে দিল্লি থেকে চারদিনের জন্য এসে চমকে দিয়েছিল। বলেছিল—'চার দিনের জন্য চলে এলাম প্রথম পরীক্ষায় বেশি নম্বর তোলার জন্য কিছু টিপস্ বুঝিয়ে দিয়ে যাবো বলে। যেখানে উঠি সেখানেই উঠেছি। তুমি কলেজের পর বই-খাতা নিয়ে রাস্তা চিনে একা একা সেখানে আসতে পারবে তো? বেশি সময় লাগবে না, ধর ঘণ্টা দুয়েক। ভয় পাবে না তো একা একা আসতে?'

—'না-না, ভয় পাবো কেন? ওই অঞ্চলে আমাকে কেউ চেনে না তাই একা যাওয়াই ভালো। আমি চলে আসব।'

এক বছর হতে চলল ওদের সম্পর্ক, তার মধ্যে মাত্র দুবার ওরা ফেস্ টু ফেস্ দেখা করেছে অতি সংগোপনে। আনমোল কখনও হাত বাড়ায়নি ওকে ছোঁবার জন্য। এতোই ডিসেন্ট পুরুষ ও। ওর কথায় বার্তায় প্রেমপ্রেম ভাব একেবারেই নেই উলটে যেন শিক্ষক শিক্ষক ভাব বেশি। আন-রোমান্টিক হতে পারে। তবে যাই হোক, ওর ব্যাবহার টুম্পার মন ছুঁয়ে থাকে। টিপস্গুলো যে কী কাজেই লেগেছিল ওর! টুম্পার ভালো লাগে যে ওর পড়াশোনায় এখন ডাবল ইঞ্জিনের শক্তি। এক দিকে প্রফেসর ব্যানর্জির কোচিং, অন্য দিকে আনমোলের কোচিং। রেজাল্ট আশানুরূপ হতেই হবে।

আনমোল যে মুসমলমান এই কথাটা প্রথম দেখার মুগ্ধতায় ওর মনে আসেইনি। এখন আসে, কারণ ও নিজেও জানে যে এই সম্পর্ক মা-বাপি কেন সমাজের কেউ মেনে নেবে না। একটা ভয়ংকর ঝড় উঠবেই। কেউ মানতে চাইবে না যে সব মুসলমান যেমন দাঙ্গাবাজ হয় না তেমনি সব হিন্দুও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয় না। দুদিকেই ভালো মন্দ আছে। তফাত শুধু এই যে মন্দ মুসলমানরা অসম্ভব কট্টর আর অনুদার। কথায় কথায় দা-তরোয়াল বের করে খুনোখুনি করে ফেলে। কিন্তু মন্দ হিন্দুরা ঝগড়া ঝাটিতেই থেমে যায়, দা-কাটারি দিয়ে হত্যা করতে পারে না কথায় কথায়। এদের সহিষ্ণুতা অনেক বেশি। এরা অনেক উদার। মুশকিল হলো এসব কথাও কাউকে বোঝাতেই পারবে না। মুসলমান ছেলে ভালো চরিত্রের হলেও সে তো মুসলমানই! বিধর্মী! যাদের সাথে আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক কখনোই সম্ভব নয়। টুম্পার অনুরোধেই আনমোল যে দুবার ওর সাথে দেখা করেছে দুইবারই খুব সাবধানে করেছে। এমন জায়গায় দেখা করেছে যেখানে টুম্পার পরিচিত মানুষ থাকবে না। ওকে আর টুম্পাকে কেউ একসঙ্গে দেখবে না তেমন ব্যবস্থা করেই দেখা করেছে। তারমানে, আনমোল মুখে কিচ্ছুটি না বলালেও সব সময় ওর রিকোয়েস্ট মেনে চলেছে।

With Best Compliments from-

Laghu Udyog Bharati

All India Organisation in the Service of small scale industries

ADVOCATE ARVIND DHUMAL

All India Vice President
Co-ordinator Punjab, Chandigarh, J/K & Laddakh

With Best Compliments from-

AMBAY TOOLS CO.

Manufacturers & Exporters of :
MACHINE VICES,
WORKSHOP TOOLS,
CARPENTRY TOOLS,
GARAGE TOOLS &
PLUMBING TOOLS

Industrial Enclave, Gali No. 9
Near Krishna Rubber Industry
Randhawa Masanda,
Jalandhar- 144 004 (Punjab)
Ph. +91-98148-22860



মুসলমান বলে ওর মনে একটা ভয় কাজ করত। করাই স্বাভাবিক। পরস্পর বৈরী দুটো সম্প্রদায়ই যে ভালবাসাকেও ধর্ম-মজহব দিয়ে বিচার করে! —ধুর! এসব নিয়ে চিন্তা কেন করছে ও? ভাবে টুম্পা। আনমোল তো ওকে পড়াশুনোর ব্যাপারে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছিল মাত্র? সেটাই করছে বন্ধুর মতো। ও নিজেই যে একা একা রামধনু রং মনে নিয়ে ছবি এঁকে চলেছে! আনমোল তো একটি আশ্বাসও দেয়নি ওকে! তবে কেন বোকার মতো বিয়ে অব্দি ভেবে নিচ্ছে ও? ছিঃ। আর ভাবব না। আর ভাবব না ভেবেও টুম্পা কি আনমোলকে ওর চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল? কত বুঝিয়েছে মনকে—আগের মতো আদানুন খেয়ে একনিষ্ঠ হয়ে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকো মন! তা নাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। স্বপ্ন পূর্ণ হবে না অবিন্যস্ত মনযোগ দিয়ে। আনমোল কেন মুখ ফুটে কিছু বলছে না এই চিন্তাই কি ওর মানসিক অস্থিরতার জন্য দায়ী নয়? —হ্যাঁ, দায়ী তো বটেই। টুম্পা যে ডেফিনিট কিছু জানতেই পারল না! ওর মনে সংশয় আছে, তাই চঞ্চল হচ্ছে মন। আনমোল কি দ্বিধাগ্রস্ত ও হিন্দু মেয়ে বলে? তাহলে তো প্রথম থেকেই সম্পর্ক না রাখলে ভালো করত। সেই প্রথম দেখা হওয়ার দিনে টুম্পা পড়াশুনোর ব্যাপারে হেল্প করার অনুরোধ জানিয়েছিল। আনমোল কি তাহলে ওর কাশ্মীরিয়ত ইনসানিয়ত দেখাবার জন্য টুম্পাকে ওনলি সাহায্যই কতে চাইছে, আর কিছু নয়? টুম্পার জন্য ওর হৃদয়ে কোনো স্থান নেই, ওর কখনও টুম্পার জন্য মন কেমন করে না? তার মানে ও হেরে গেছে? আনমোল হাতছাড়া হয়ে গেলে ওর স্বপ্ন পুরণ হওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে নিশ্চিত। আপমান, লজ্জা একসাথে মিলে চোখে জল এনে দেয় টুম্পার। দোপাট্টায় চোখ মুছে বই-খাতা ব্যাগে ভরে উঠে পড়ে ও। লাইব্রেরিতে এসে একটা লাইন পড়েনি, একটা লাইনও লেখেনি। এভাবে চললে হবে না, ওকে শক্ত হতেই হবে। আনমোলকে শিকেয় তুলে এবার ওকে ফিরে যেতে হবে আগের জায়গায়।

বাইরে বেরিয়ে এসে মোবাইলের সুইচ অন করেই দেখে পাঁচটা মিসড কল। সব কটাই আনমোলের। কল ব্যাক করবে কী করবে না ভাবতে ভাবতেই আবার কল এলো।

—'হ্যালো! কী হয়েছে?'—জিজ্ঞেস করে টুম্পা।

—'তুমি কোথায় ছিলে? সুইচড্ অফ ছিল তোমার ফোন।'

—'এতো উদ্বিগ্ন কেন আনমোল!—আমি তো লাইব্রেরিতে ছিলাম তাই। কিন্তু তোমাকে কেমন উদ্বিগ্ন, অস্থির, চঞ্চল মনে হচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?'

—'না। শরীর ঠিক আছে।....আসলে মনটা খারাপ লাগছিল। ম...মানে তোমার কথা মনে পড়ছিল।.....কতদিন দেখিনি তো! তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য তড়পাচ্ছিলাম।'

টুম্পার বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। একেই বোধহয় টেলিপ্যাথি বলে। ঠিক যে সময়ে ও কষ্ট পাচ্ছিল, চোখে জল এসেছিল ঠিক সেই সময় অনেক দূরে আনমোলও কষ্ট পাচ্ছিল ওর কথা ভেবে ভেবে। আর ও কিনা সেই মানুষটাকে ভুল বুঝে কত কথাই কল্পনা করেছে। ও বলল—'এখন পেয়েছ আমাকে! এবার না তুতলিয়ে অনেক কথা বলে ফেলো।'

আনমোল হাসল। বলল—'অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে জানো? মনে মনে অনেক কথা বলি কিন্তু মুখে বলতে পারি না। বিশেষ করে সামনে বসে কিছু বলতেই পারি না। সব কথা তখন গলায় আটকে যায়। তোমাকে পড়াবার সময়ে কিন্তু এটা হয় না....অন্য কিছু বলতে গেলে হয়। টুম্পা, তুমিও তো তখনও

অন্য কোনো কথা বলনি আমাকে! তোমার কি আমাকে বলার মতো অন্য কোনো কথা নেই? আমার মতো তোমারও বলতে গেলে গলায় আটকে যায়?'

টুম্পার চোখ জলে ভরে এলো। হাত দিয়ে চোখ মুছে বলল— 'আমারাও হয়। আমরা দুজন যে একরকম। আমাদের দুজনকে মুখে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই আনমোল! আমাদের মন দুটো তো বইয়ের পাতার মতো খোলা। আমরা মন পড়ে নেবো। তুমি বড়ো সৎ, বড়ো বেশি ভাল আনমোল।

—'ওয়েল সেইড টুম্পা! কনগ্রেচুলেশনস্ টু আওয়ার হার্টস! তুমিও ভালো টুম্পা।'



টুম্পার বি.এস.সি. পরীক্ষা শেষ হতেই বিকাশ তনিমাকে বললেন এক দিন—'বুঝলে তনু, মেয়েকে গ্র্যাজুয়েট করে দিয়ে আমরা এবার নিশ্চিন্ত। ওদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য এই ডিগ্রিটাই গেট পাস। এটা হয়ে গেলে যাহোক কিছু করার যোগ্যতা অন্তত হাতে থাকে। যাদের এলেম আছে তারা আরও এডুকেশন বাড়ায়, যাদের নেই তারা এই গেটপাস দিয়ে এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখায়। ...আমার কন্যা অবশ্য এম.এস.সি. তারপর পি.এচ.ডি. —সবই করবে আমি জানি। ও থামবে না। ওগুলোর জন্যে বাবা-মাকে আর মাথা ঘামাতে হয় না। ওগুলো ওরা প্রপার চ্যানেল ধরে নিজেরাই করে নেয়। আমাদের চিন্তা শেষ। কী বল?'

—'না। চিন্তা শেষ নয়, চিন্তা বৃদ্ধি! তোমার কি চোখ নেই না আক্কেল নেই গো? তুমি শুধু পড়ার কথা, ক্যারিয়ারের কথাই ভাববে? একবারও মেয়ের বয়স বাড়ার কথা, ওর বিয়ের কথা মাথায় আসে না তোমার? টুম্পা সারাজীবন ধরে শুধু গলায় মেডেল ঝুলিয়ে হাততালি পেতে থাকবে? ওর বিয়ে হবে না? সংসার হবে না?'

বিকাশ হেসে বলেন—'সবই হবে তনু, তবে বিয়ের সম্বন্ধ করে পাত্র-পাত্রী দেখাশুনো করে আজকাল কমই হয়। ওরা নিজেরাই নিজেদের পছন্দের পাত্র-পাত্রী খুঁজে নেয়। তোমার মেয়েও কোনো উপযুক্ত পাত্র পেয়ে যাবে দেখো। তাছাড়া আজকাল ছাব্বিশ-সাতাশের আগে ছেলে-মেয়েরা বিয়ে করতে চায়ও না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ের কথা ভাবে। আর আমাদের টুম্পা তো না ভেবে-চিন্তে, না বিচার করে এক পা এগোয় না। ওর ফিজিক্স নিয়ে পড়ার আগ্রহটাও অনেক ভেবেই নিয়েছিল। তুমিও সেটা জানো। দেখ অনু, যে মেয়ে স্কুল জীবনেই নিজের লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে পড়াশুনো করে যে তাকে মহাকাশ ফিজিসিস্ট হতে হবে সেই মেয়ে বড়ো হয়ে তার জীবনসঙ্গী খোঁজার সময়েও কিন্তু সামনে একটা লক্ষ্য স্থির করেই এগোবে। দেখে নিও টুম্পা ভুল করবে না। আর একটা ভবিষ্যৎ বাণীও করে দিচ্ছি। টুম্পা বিএসসি-এতেও আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে গলায় মেডেল পরবে।'

—'সবই জানি সবই বুঝি তবুও মায়ের মন তো! একটামাত্র সন্তান, তাই বড়ো ভয় হয়। ওর যা উঁচু নাক, যাকে-তাকে ও পাত্তাই দেবে না জানি আমি কিন্তু....ভুল তো মানুষেই করে গো!.....

বিকাশের ফোরকাস্ট সত্য করে অনন্যা বাগচী বিএসসি-তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিল। তৃতীয়বার বাবা-মার মুখ উজ্জ্বল করে। ধন্য ধন্য করেছিল মিডিয়াও। দিল্লি গিয়ে জে.এন.ইউ. তে এম.এস.সি. পড়ার বায়নাও করেছিল। কিন্তু মার কান্না কাটিতেই কিনা কে জানে শেষে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে রাজি হয়ে গিয়েছিল। ভর্তি হবার জন্য সমস্ত জরুরি কাগজ সার্টিফিকেট তনিমাই গুছিয়ে দিয়েছেন, টাকাও তনিমাই ব্যাগে গুছিয়ে দিয়েছেন। বিকাশ তখন অফিসে চলে গেছেন। রওনা হবার আগে টুম্পা ঠাকুর ঘরে প্রণাম করে মাকেও প্রণাম করে বের হয়েছিল অ্যাডমিশন নিতে।—সেই যে গেল আর ফিরে এলো না।

বিকাশ বারবার একই কথা বলেছেন, আজও বলেন—'ও হারিয়ে যায়নি। নিজের ইচ্ছায় প্ল্যান করে চলে গেছে কোথাও। যে ইচ্ছে করে লুকিয়ে থাকতে চায় তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ওকে কেউ খুঁজে পাবে না তনু।'

তনিমা শোনেন কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে এখনও কষ্ট হয় তার। মা-বাপিকে কী করে ভুলে যাবে টুম্পা? নিজের ইচ্ছায় কারও সঙ্গে চলে গেলে এতো বছরের মধ্যে একবার ফোন করার সুযোগও কি পায়নি ও? এটা হতেই পারে না। ওতো জানে ও ছাড়া মা-বাপির আর কোনো অবলম্বন নেই। না না, তাদের মেয়ে এতো নিষ্ঠুর কী করে হবে। সন্তান থাকতে মা-বাপিকে নিঃসন্তান কেন করে দেবে ও? তনিমার মনে হয় ওকে বন্দি করে রাখা হয়েছে কোথাও যেখান থেকে আর বের হওয়া যায় না। পুলিশ দুবছর খুঁজে খোঁজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তনিমা যে এখনও মেয়েকে মনে মনে খুঁজে চলেছেন রাস্তায় ঘাটে ওই বয়সি মেয়েদের মুখ দেখে দেখে। মা কি কখনও নিরুদ্দেশের কেস ক্লোজ করে দিতে পারে বল? সেই যেদিন লালবাজার থেকে শেষ বারের মতো হতাশ হয়ে ওরা ফিরে এসেছিলেন, বিকাশ বলেছিল—আমাদের আর কেউ রইল না তনু। আমরা দুজনে দুজনের জন্য বাঁচব এখন থেকে। নিজেদের

জন্য ভাবিনি আগে। শুধু মেয়ের হায়ার এডুকেশন, মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভেবে ভেবে টাকা জমিয়েছি নিজেদের বঞ্চিত করে। ....যাক্ গে! সেসব পাট চুকে গেছে। আর ভেবো না তনু, এবার নিজেদের জন্য ভাবো। চলো বেরিয়ে পড়ি। এদিক ওদিক পরিব্রাজন করে আসি। মেয়ের পড়া পড়া করে কিছুই তো দেখা হলো না। তাছাড়া, পরিবেশ বদল হলে হয়তো একটু শান্তি পাবো।

গিয়েছিলেন ওরা শান্তির আশায় বারাণসীতে বাবা বিশ্বনাথের দরবারে। সকালে মন্দিরে গেছেন রোজ, সারাদিন নৌকোয় করে ঘাটে ঘাটে ঘুরেছেন, সন্ধ্যেবেলায় গঙ্গা আরতি দেখে লজে ফিরেছেন। সংকটমোচন, দুর্গাবাড়ি, বি.এইচ.ইউ, সরু সরু গলির ভেতর চমক লাগানো কাঁচের চুড়ির দোকান দেখেছেন, নাকে সুবাসিত আতর মেশানো জর্দার গন্ধ পেয়েছেন। কিন্তু যার জন্য যাওয়া সেই শান্তি তো পেলেন না কোথাও! ভ্রমণ-তীর্থ দর্শনের মাঝেও মেয়ের মুখখানা যে তাদের সঙ্গেই গিয়েছিল! ওরা কী করে শান্তি খুঁজে পাবে যাদের যুবতী মেয়েকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না? বিশেষ করে তনিমার কি বেড়ানো, পুণ্য অর্জন, দেব দর্শন —এসবে আকর্ষণ ছিল একটুও? না। ও তো যাত্রাটা কাটিয়েছে পথ চলতি, পাশে বসা, ঘাটে স্নানরত মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে টুম্পাকে খুঁজে!

পরের বছরও লক্ষ্মীপুজোর পরে ওরা হরিদ্বার দর্শন করতে গেলেন। সেখানেও বারাণসীর মতোই ভিড়। সকাল থেকে গঙ্গাস্নান, মন্দিরে মন্দিরে সকাল থেকে ঘণ্টাধ্বনি,স্তোত্রপাঠ, সন্ধ্যায় অপূর্ব গঙ্গাআরতি, তারপর কখন যেন ঝুপ করে রাতের নীরবতা নেমে আসে। ঋষিকেশ হয়ে দেরাদুন–মুসৌরি পাহাড় ঘুরে এলেন। হাজার কয়েক রূপসি কন্যা দেখলেন এই যাত্রায় পথে-ঘাটে-পাহাড়ে। শুধু তাদের টুম্পাকে দেখতে পেলেন না তনিমা। মনের শান্তি অধরাই থেকে গেল। ঠাকুর তার ডাক শুনলেন না। শুনবেন কেন? না চাইতেই তো ভগবান সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু আগাম দিয়ে রেখেছিলেন ওকে! প্রতিদানে উনি কি সামান্য একটা ধন্যবাদও দিয়েছেন ভগবানকে? বিপদে না পড়লে কি স্মরণ করেছেন? অগাধ ভক্তি আর বিশ্বাস কি ছিল তার? সকাল-সন্ধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে দায় মুক্ত হয়েছেন। আজকাল টুম্পাকে ফিরে পাবার জন্য মাথা ঠুকে ঠুকে কেঁদে কেঁদে যে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, বিনা স্বার্থে আগে কখনও এমন আকুল হয়ে তাঁকে ডেকেছেন? না, কিছু করেননি তিনি। শুধু আরও দাও বলে দাবি করেছেন আর পেয়ে গেলেই ভুলে গেছেন তাঁর কৃপা।—তার মতো মানুষের শান্তি পাবার অধিকারই তো নেই!

আজ আমি এক পূর্ণ বয়স্কা নারী। পনেরো বছর আগে স্বপ্নকে ধরার জন্য পাগলের মতো দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলা বিধ্বংসী ঝড়ের মতো একুশ বছরের মেয়েটাকে আমি অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। আমার স্বপ্ন ছিল স্পেস রিসার্চ সাইন্টিস্ট হবো। একের পর এক গবেষণা করব স্পেস নিয়ে, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে। স্কুলজীবন থেকেই মহাকাশের বিস্ময় আমাকে মুগ্ধ করেছে। সন্ধ্যের পর অনেকটা সময় আমি প্রায়ই ছাদে কাটাতাম। মা ভাবত আমি বাইরে যাই না তাই ছাদে পায়চারি করি। তখন থেকেই আমার মনে ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে জেগেছিল। দেশ-বিদেশের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের জীবনী পড়ে পড়ে ইচ্ছেটা স্বপ্ন হয়ে গেল। জানতাম এই স্বপ্নটাকে ধরতে হলে কঠোর তপস্যা করতে হবে, দিন-রাত পরিশ্রম করে পড়াশুনো করে আমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে তাহলেই হয়তো একদিন স্বপ্ন আমার কাছে ধরা দেবে। তপস্যা করার মতোই কঠোর অনুশাসনে নিজেকে বেঁধে রেখে যোগ্য করে তুলেছিলাম। তারপর আর কোনও দিকে তাকাইনি, কারও কথা ভাবিনি। চোখের সামনে লক্ষ্য স্থির রেখে যেখানে যে সুযোগ পেয়েছি, ছোট-বড়—সব সুযোগ নিয়েছি আমি।

স্বপ্নটাকে ধরার জন্য ভয়ানক স্বার্থপর হতে তখন আমার বিবেকে বাধেনি। কোন অন্যায়ই অন্যায় বলে মনে হয়নি। কোনো অপরাধই অপরাধ ছিল না আমার কাছে। হ্যাঁ, স্বপ্নটা ধরে ফেলেছিলাম আমি কিন্তু মূল্য দিতে হয়েছিল আমার প্রাণাধিক প্রিয় নিষ্পাপ দুজন মানুষকে। সেই বয়সে বুঝিনি। আত্ম অহংকারে আচ্ছন্ন থেকে ভেবেছি—জীবনটা তো আমার! আমি আমার জীবন কীভাবে গড়ব, কোথায় থাকব, কাকে বিয়ে করব—সব কিছুতে আমার সাংবিধানিক অধিকার আছে। একুশ-বাইশ বছরের ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিক অধিকার। তবে কেন লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সেই অধিকার ব্যবহার করব না? আমি কোনো খারাপ কাজ করছি না বরং এমন কাজ করতে চাইছি যা আমার দেশকেই হয়তো একদিন সমৃদ্ধ করবে। তবে কেন আমি আমার অতি নিকটজনদের ইচ্ছের কাছে নত হতে গিয়ে নিজের ইচ্ছেগুলোকে গলা টিপে মেরে ফেলব? আমাদের সমাজ, পরিবার, প্রিয়জনরা যদি আমাদের মানতে না পারে তাহলে তো তাদের সুবিধার জন্য আমার দূরে থাকাই মঙ্গলজনক। কেন শুধু শুধু যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের বিব্রত করব? এতে ওদের কষ্ট বাড়বে বই কমবে না তো! —হ্যাঁ তখন আমি আমার স্বপ্ন, লক্ষ্য আর বিশ্বস্ত প্রিয় পুরুষটি ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গেই কম্প্রোমাইজ করতে রাজি ছিলাম না। না জাতপাত, না ধর্ম, না পরিবার, না কর্তব্য—কিছুই গুরুত্ব পায় নি। হায়দরাবাদে ISRO আমার লক্ষ্য, স্পেস রিসার্চ আমার স্বপ্ন, বিধর্মী পুরুষটি আমার শিক্ষক, আমার ভালোবাসা আর অর্ধেক সত্তা।

আজ আমি জীবনে সফল সাঁইত্রিশ বছরের পরিণত এক

স্যাটেলাইট স্পেশিয়েলিস্ট। যা হতে চেয়েছিলাম তার চেয়েও বেশিই কিছু হয়ে স্পেস সায়েন্স কার্যক্রমে দেশে-বিদেশে অংশগ্রহণ করে মান-যশ-প্রশংসা কুড়িয়ে আমার স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। আমি আর আমার জুনিয়র টিমকে নিয়ে তৈরি কয়েকটা স্যাটেলাইট মহাকাশে ঘুরছে এখন। আর কোনো আক্ষেপ নেই, কারণ আমি এখন সম্পূর্ণা। এই তৃপ্তি, এই সম্পূর্ণতা আমার হাত ধরে টেনে টেনে অতীতের দিকে, অনন্যা বাগচী টুম্পার দিকে নিয়ে যায়। বলে—'ওই তুমি কে দেখ।'

আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি। না—না! আমার স্মৃতি ধূসর নয়, প্রখর। ফেলে আসা প্রতিটি দিনের কথা মনে আছে আমার। ফ্ল্যাশব্যাকে আর দেখতে চাই না। আমাকে ছাড়া বাপি-মার আকাশে আর কোনো নক্ষত্র ছিল না। আমি ছিলাম তাদের বার্ধক্যের একমাত্র লাঠি। যারা আমার জীবন গড়ে তোলার জন্য নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হাসিমুখে বিসর্জন দিয়েছিল সেই দেবতুল্য মানুষ দুজনের সঙ্গে আমি কী ভয়ানক প্রতারণা করেছি, বলতে গেলে ওদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছি, সে কথা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে? কলকাতার চেনা পরিচিত জগৎ হয়তো আমাকে ধিক্কার দেয় 'ছিঃ ছিঃ।' বলে। তা বলুক। ছিঃ ছিঃ বলার মতো কাণ্ড করেছি, বলবে না কেন? কিন্তু কাণ্ডটা কেন করেছিলাম সেটা তো কেউ জানে না একমাত্র আমি আর আনমোল ছাড়া! রীতিমত প্ল্যান করে ঠান্ডা মাথায় কান্ডটা করতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি। আনমোল আমাকে অনেক করে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। বলেছে— 'না-না। আমি তোমার সঙ্গে এই প্ল্যানে সহমত নই। এটা অন্যায়, মহা পাপ। এভাবে তুমি নিজের বাবা-মাকে ধোকা দিতে পারো না। ওঁদের প্রতি রেসপনসিবিলিটি আছে তোমার। তুমি ওনাদের বুঝিয়ে বল তোমার কথা। ওঁরা না মানলে তুমি জানিয়ে শুনিয়ে আমার কাছে এসো। এভাবে চোরের মতো গোপনে পালিয়ে আসতে আমার মত নেই। লুকিয়ে থাকবে কেন তুমি? আমি এসবের মানে বুঝতে পারছি না। খেলো ড্রামাটিক ফিল্মি কাহানি মনে হচ্ছে। —শোন টুম্পা, তুমি স্পষ্ট উচ্চারণে ওঁদের বল যে তুমি আমাকে ভালোবাসো তাই অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। দরকার পড়লে দাদাজীকে নিয়ে আমি যাবো ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে। আমি জানি ওঁরা মানবেন না। কোনো মধ্যবিত্ত হিন্দু কখনওই মুসলমান ছেলেকে জামাই বলে মেনে নিতে পারে না। কারণ তাদের একটা সমাজের অনুশাসন মেনে চলতে হয়। একেবারে উচ্চবিত্ত আর একেবারে নিম্নবিত্তদের এই সমস্যা নেই। কারণ এরা সামাজিক নিন্দে-কুৎসার ছোটো বৃত্তের বাইরে বসবাস করে, ওদের জগৎ আলাদা।' —'দেখ টুম্পা, আমরা দুজনেই অ্যাডাল্ট। বিনা ঝামেলায় যখন ইচ্ছা স্পেশিয়াল ম্যারেজ এ্যাক্ট আমাদের বিয়ে করিয়ে দিতে পারে। এতে তোমাকে পরিচয় গোপন করে লুকিয়ে থাকতে হবে না। তবুও আমি বলব একবার ওঁদের সাথে মন খুলে কথা বল তুমি। ওঁদের জানতে দাও কার হাত ধরে চলে যেতে চাইছ, কোথায় যাচ্ছো। তাতে যোগাযোগ টিকে থাকবে, দেখাসাক্ষাৎ করার সুযোগ থাকবে। তুমি-আমি দুজনেই আত্মগ্লানি হাত থেকে বাঁচব। প্লিজ, ভুলেও দুই তরফের লিংকটা কেটে দিও না। যদি দাও তাহলে আমার দিকে কোনো ক্ষতি হবে না। আমার পরিবার খুশিই হবে। কিন্তু তোমার বাবা-মা সবকিছু হারিয়ে ফেলবেন। একবার চোখের দেখা দেখতেও পারবেন না। তুমি কি তা চাও? —ভেবে দেখ। পরে অনুশোচনা করো না।'

আনমোল সৎ। ও মিথ্যার আশ্রয় নিতে রাজি নয়। কিন্তু আমি যে এখন কিছুতেই ওর পরিচয় দিতে পারব না বাপি-মার কাছে। মুসলমান শালওয়ালার নাতি যত বিদ্বানই হোক, ও যে জাতে মুসলমান। আমার সত্যবাদিতা ওদের খানখান করে ভেঙ্গে ফেলবে কাঁচের বাসনের মতো। ভয়ে আতঙ্কে আমাকে বাড়িতে বন্ধ করে দিতে পারে। নিজেরাও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। না-না, এমন বোকামি আমি করবো না যাতে ওদের মাথা নত হয় সমাজের কাছে। আর আমার স্বপ্নটাও অধরা থেকে যায়। অন্য উপায় নিতেই হবে।



বিএসসি পরীক্ষার পর একেবারে ফাঁকা হয়ে পড়েছিলাম। পড়াশুনো নেই, কোনো কাজকর্ম নেই। আনমোল নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের রিসার্চ পেপার নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। যখন তখন ছোট্ট মুঠো ফোন কানে লাগিয়ে ওকে ডিসটার্ব করা যায় না। তখন ঘরে ঘরে কম্পিউটার ঢুকে পড়তে শুরু করেছে বটে কিন্তু আমার নেই। আমি সাইবার কাফেতে গিয়ে ওকে ই-মেল করতাম। আর রাত ন' টার পর নেটওয়ার্ক পেলে ফোনে কথা বলতাম ছাদে গিয়ে। সেই সময় দুটো টিউশনি পেলাম। পাড়ার দুজন ক্লাস নাইনের ছাত্র পিওর সায়েন্স পড়তে আসত সন্ধ্যেবেলা। ওদের পড়িয়ে ফাঁকা জায়গাটা ভরাট হতো আর আমার চর্চাও বজায় থাকত। এই সময়েই একদিন কথায় কথায় বাপিকে বলেছিলাম—'বাপি, এমএসসি আমি এখানে পড়তে চাই না, জে.এন.ইউ.-তে গিয়ে পড়তে চাই। যেতে দেবে আমায়?'

বাপি অবাক হয়ে গিয়েছিল—'কলকাতা ছেড়ে

জে.এন.ইউ.-তে? কেন রে? এখানকার স্ট্যান্ডার্ড খারাপ?'

তারপর যুক্তি-তর্কের লড়াই, মান-অভিমান, মা'র কান্নাকাটি—সব মিলিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম আমি যুক্তির কাছে হেরে যাচ্ছি, এই আশাটা পূর্ণ হবে না আমার। অগত্যা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কলকাতাতেই করতে হবে আমাকে। এছাড়া আর উপায় নেই। মনকে স্বান্তনা দিয়েছিলাম—'তোমার সব অহেতুক জেদ ওরা মেনে নেবে কেন? ঘরে থেকে ওদের কাছে থেকে যা করা যায় সেই কাজটা তুমি অযথা দূরে গিয়ে করতে চাইছ কেন? মা-বাবার উপর চাপ সৃষ্টি করে তুমি কি অন্যায় করছ না? জেএনইউ-তে গেলে কি বেশি দিগ্‌গজ হয়ে যাবে?' কলকাতাতেই মেনে নিলাম। আনমোলের সঙ্গ লোভ, ওর গাইডেন্সের লোভ দমন করে বাপির ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম। মুঠো ফোন আর সাইবার কাফের মাধ্যমে আনমোলের সঙ্গলাভ চলবে, ওর গাইডেন্সও পাবো ই-মেলে। থিসিস জমা দেবার সময়ও এসে গেছে ওর। ফ্রি হয়ে নিজেই চলে আসবে। হঠাৎ একদিন ফোন করে বলবে—'চলে এলাম'। আমি জানি ও আসবেই কারণ অনেক দিন আমাদের দেখা হয়নি।

বিএসসি-র রেজাল্ট বেরিয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বিজয় যাত্রা অটুট রাখতে পেরেছি। আবার আনন্দধারা বইছে বাড়িতে। মা-বাপি যেন আমার কাছে এই গৌরবের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে আছে এমন ভাব করছে। আমাকে বুকে রাখবে না মাথায় রাখবে ভেবে কূল পাচ্ছে না। কিন্তু আমি যে খুশি হয়েও খুশি ধরে রাখতে পারছি না, কারণ আনমোল এই খুশিতে যোগ দিতে আসতে পারবে না বলেছে। ও বিশেষ কাজে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে। বিশেষ কাজ কী সেটা আমি জানি, তাই রাগ করিনি। দেশের একজন ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানী, যে কিনা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে থিসিস জমা দিয়েছে তাকে বার বার BARC-এ যেতে হবে যখন তখন। ও ফোনে আমাকে শুভেচ্ছা দিয়েছে। অনেকক্ষণ কথা বলেছে। সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে আমি কলকাতায় মাস্টার্স করতে রাজি হয়েছি শুনে।

এই অব্দি সব কিছু ভালই চলছি। পাগল হয়ে




LIBERTY
Wide collection of products for
Your Whole Family
leap7
HEALERS
SENORITA
GLIDERS
FORCE 10
FORTUNE
COOLERS
Prefect
LucyLuke
LIBERTY SHOES LIMITED
HEAD OFFICE- CENTRAL HOUSE, RAILWAY ROAD, KARNAL-132001, HARYANA
T. +91-0184-2252533, 2252510, 2255620, F: +91-184-2256400
E-mail. office_knl@libertyshoes.com

যাওয়ার মতো কোনো সমস্যার কথা কল্পনাতেও আসেনি তখন। আমি খবরের শিরোনাম। পরিচিত জগতে তৃতীয় বার আলোচনার বিষয়বস্তু। পাগল পাগল হবার অবস্থা সেদিন থেকে ফেলেছিলাম। ছাদ থেকে নীচে নামছিলাম। বাপি অফিস থেকে কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে। সিঁড়ির ঠিক নীচে খাবার টেবিলে বসে ছিল মা আর বাপি। আমি মাঝের ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছেই শুনলাম—'একটা খুব ভালো খবর আছে তনু। তার আগে বল টুম্পা কোথায়?

মা বল্লো—'ও ছাদে গেছে।'

বাপি বলল—যাক্ বাঁচা গেছে। ওর কানে কথাটা যেন না পৌঁছায়। আজ সুকোমল এসেছিল অফিসে একটা আর্জি নিয়ে। প্রথমে তো টুম্পার জন্য অনেক শুভেচ্ছা আশীর্বাদ জানালো। বলল আমাদের গর্বে ওরাও গর্বিত। একথা সেকথার পরে বলল—বিকাশ, আমরা কলেজ লাইফ থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনে দুজনের হাঁড়ির খবর জানি। আমার ছেলের আগা পাশতলা তুই ছোটোবেলা থেকে দেখেছিস, তুই জানিস সৌরভ তোর মেয়ের পাত্র হিসেবে মন্দ নয়। খড়্গপুর আইআইটি থেকে সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। এতোদিন ব্যাঙ্গালোরে ছিল, এবার সুদূর আমেরিকায় চলে যাবে মাস কয়েকের মধ্যে। আমার খুব ইচ্ছে টুম্পাকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনি। টুম্পা আমাদের কাছে এসেও পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারবে রে। যদি তোরা রাজি হোস, যদি বিয়েটা হয় তাহলে তোর-আমার সম্পর্কটা আত্মীয়তা হয়ে যাবে। .....বুঝলে তনু? এক্কেবারে পার্ফেক্ট ম্যাচিং রাজযোটক যাকে বলে। আমি তো সুকোমলকে কথা দিয়েই দিয়েছি—বলেছি যেমন তোর ছেলে, তেমনি আমার মেয়ে। পালটি ঘর আমরা। ধরে নে আমরা দুজন এখন থেকেই বেয়াই হয়েই গেছি। বাপি আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল।

মা বল্লো—'দুর্গা দুর্গা! কথা দিয়ে এসে খুব ভালো করেছ। এমন পাত্র উপযাচক হয়ে এসেছে তাকে কেউ হাতছাড়া করে? এরপর তো ওর উপযুক্ত পাত্র পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। আমরা ছাপোষা মানুষ, কোথায় পাবো ওর যোগ্য পাত্র? শেষে চিরকুমারীই হয়ে থেকে যাবে। কথা দিয়ে এসে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ গো। হাতে কয়েক মাস সময় আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন অ্যাডমিশন নিয়ে ক্লাস করতে থাকুক, সময় মতো বুঝিয়ে বলব আমরা। ....তাছাড়া টুম্পা তো ওদের চেনে, সৌরভের কথাও জানে। আমার মনে হয় না ও আপত্তি করবে, বিশেষ করে পড়াশুনোর সুযোগ খোলা আছে যখন। তবে, এখন ওকে এসব না জানানোই উচিত। শুধুশুধু মুখ গোমড়া করে বসে থাকবে যেন আমরা ওর সঙ্গে শত্রুতা করছি।'

মা-বাপি উঠে চলে যাবার পর নিজের রুমে এসে আনমোলকে ফোন করে সব জানিয়ে বলল—আমার তোমার কাছে পালিয়ে আসা ছাড়া আর গতি নেই। তারই প্রেক্ষিতে ও আমাকে লম্বা ভাষণ দিয়ে বলেছিল—মা-বাপির সঙ্গে কথা বলতে। দরকার হলে ও নিজেও আসবে কথা বলতে, কিন্তু গোপনে চোরের মতো পালিয়ে যাওয়া ও সমর্থন করে না। সেই কথা শুনে খুব কষ্ট হয়েছিল মনে, অসহায় মনে হচ্ছিল। ও যদি সাপোর্ট না করে তাহলে কী হবে আমার?

সব মানুষের ভেতরে একটা পাগল থাকে। আমার ভেতরের পাগলটা তখন জেগে উঠেছে—আমি সব অসম্ভব কাজ করতে প্রস্তুত। রিস্ক আমাকে নিতেই হবে।

আমার লুকিয়ে পালানোর প্ল্যানটা যে বাপি-মা আর আনমোলের সামাজিক সম্মান রক্ষার জন্যই জরুরি দরকার সেটা আনমোলকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল আমার। আমি বাড়ি না ফিরলে খোঁজা খুঁজি হবে, পুলিশ ডাইরি হবে—শেষে কোঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়লে কী হতে পারে দুই বিরোধী সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েকে নিয়ে, সেটা ওর মগজে ঢুকে ছিল পরে। ওর-আমার বা সাধারণ মানুষের মনে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে পরোয়া না থাকলেও পলিটিশিয়ানরা কাশ্মীরি ছিলের বাঙ্গালি হিন্দু মেয়েকে নিয়ে পলায়নকে একটা ইস্যু বানিয়ে ঝামেলা করতেই পারে। এতে বাপির ইজ্জত বাড়বে না। আর আনমোলও অযথা ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে। ওকে বুঝিয়ে বলেছিলাম—'তোমাকে আমি প্রকাশ্যে আনতে চাই না। যখন সময় হবে তখন আমি একাই দিল্লিতে আসতে পারব। দিল্লি স্টেশন থেকেই তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তো? আমি যে কিছু চিনি না। খুবই রিস্ক নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমি, তুমি বুঝতে পারছ তো?'

—'পারছি, তাই আমি আসব নিজে। তুমি শুধু অপরিচিতের মতো ফলো করবে আমাকে হাওড়া স্টেশনে। শোন, তোমার অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। হোএস্টেল পাবে। এখানে থাকা-খাওয়া, পড়াশুনোর খরচ নেই, স্কলারশিপের টাকাতেই সব হয়। ব্যাকওয়ার্ড মেধাবী ছাত্রদের জন্য তৈরি হয়েছিল জে.এন.ইউ.। ফরোয়ার্ড মেধাবী ছাত্ররাও পড়তে পারে এখানে পুরোপুরি সরকারি অনুদানে। তাই তোমাকে টাকার চিন্তা করতে হবে না। তাছাড়া আমি তো আছি। .....আমি আমার বাড়িতে সব কথা খুলে বলেছি। ওঁদের কোনো আপত্তি নেই আগেও বলেছিলাম তোমাকে। দাদাজী বলেছেন দিল্লিতে এসে তুমি আমার ছোটো চাচার বাড়িতে উঠবে। তারপর হোস্টেল ঠিক হয়ে গেলে হোস্টেলে চলে যাবে। এবার মাথা ঠান্ডা রেখে শান্ত হয়ে থাকো। তোমার ইচ্ছারই জয় হলো তো।'

কৃতজ্ঞ গলায় বলেছিলাম—'তুমি আছো বলে ইচ্ছেগুলো পূর্ণ হচ্ছে। সারা জীবনেও তোমার ঋণ মেটাতে পারব না। তুমি না থাকলে চুনকালি মেখে ফিরে যেতে হতো।'

কোথা দিয়ে পনেরোটা বছর চলে গেল। আমি আজও

আনমোলের ঋণ মেটাতে চেষ্টা করিনি। আমার তৈরি স্যাটেলাইট মহাকাশে ঘুরছে। আর দুবছর পর আমার তৈরি স্পেস শিপ অন্য গ্যালাক্সিতে চিরকালের জন্য চলে গিয়ে বহুবছর ধরে সিগন্যাল পাঠাতে থাকবে আগামী প্রজন্মের জন্য। আর ফিরে আসবে না কোনোদিন। এতো সফলতা যার জন্য সম্ভব হয়েছে তার একটা সামান্য মিনতি আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। সে নিজে আমার থেকেও বড়ো সায়েন্টিস্ট। পৃথিবীর যেসব দেশগুলো নিউক্লিয়ার পাওয়ার হতে চায় তাদের কাছে আনমোলের অসাধারণ কদর। আমাদের গবেষণা সাধারণত গোপন থাকে, পাবলিকের নজরে আনা হয় না। টপ গ্রেড সায়েন্স জার্নালে কখনও কিছু প্রকাশিত হয়। সাধারণ মানুষ ওইসব জার্নাল পড়ে না তাই আমাদের বিষয়ে কেউ কিছু জানতে পারে না। শান্তি পাড়ার মানুষ আমার বাবা তার মেয়ের কৃতিত্বের কথা কোনোদিন জানতে পারবে না। আমি তাদের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে হয়েই থাকব। তবুও ওরা আমার আশায়, আশায় প্রাণে বেঁচে তো থাকবে? আমি যে ওদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যই পনেরো বছর নিজেকে লুকিয়ে রেখেছি। গোড়া ব্রাহ্মণ মানুষ দুটোকে কী করে বলব প্লিজ তোমরা রাজি হয়ে যাও। মুসলমান শুনলেই বাপির হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় যদি? এদিকে আনমোল ওর আত্মপরিচয় গোপন রেখে বিয়ে করাকে মহাপাপ বলে মনে করে। বিয়ে না করে একসাথে থাকাটাও ওর কাছে গুনাহ। আমাদের মধ্যে এই পাঁচিল আজও অটুট। দুজনে দুজনের জন্য আছি সব প্রয়োজনে এই টুকুই সান্ত্বনা। বিয়ে আমাদের আর হবে না। আমারই অসুবিধার কারণে। ওর কাঁধে ভর দিয়ে আমার বিজয়যাত্রা অব্যাহত রাখলেও আনমোলের কঠোর ব্যক্তিত্বের কাছে আমার পরাজয় হয়েছে। ওর প্রেজটিজ আর সেল্ফ রেসপেক্ট আমি ভাঙতে পারিনি। অনেক বার অনুরোধ করেছি, কখনও রাগ করেও বলেছি—'তাহলে তুমি এবার বিয়ে কর প্লিজ। আমার জন্য নিজেকে বঞ্চিত করে রেখো না। তোমার স্বাভাবিক জীবন নষ্ট করার জন্য তো আমিই দায়ী হয়ে থাকব! নিকৃষ্ট সুযোগসন্ধানীর মতো তোমার কাছ থেকে শুধু নিয়েই গেলাম, কিছুই তো দিলাম না তোমাকে।'

—'শাট্ আপ! এই অসহ্য ন্যাকামিগুলো এবার বন্ধ কর। পনেরো বছর ধরে অনেক ন্যাকামি করেছ অনেক মিথ্যে বলেছ! আর নয়। তুমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কখনও ভালবাসোনি। তোমার মা-বাবাকেও নয়, আমাকেও নয়। পরজীবী উদ্ভিদের মতো উপরে ওঠার নিমিত্তে একটা অবলম্বন খুব দরকার হতো তোমার। প্রথম অবলম্বনের রস নিঃশেষ হয়ে গেলে আর একটা তাজা রসালো গাছ খুঁজেছ। এই ভাবেই নিজের বাবা-মার কাছ থেকে যতটুকু পাবার ছিল ততটুকু শুষে নিয়েই তাদের ত্যাগ করে আমার পঁচিশ বছরের তরতাজা গাছটাকে জড়িয়ে ধরে উপরে ওঠার রাস্তা তৈরি করেছ ভালোবাসার নাটক করে। মিথ্যে বলায় তোমার জুড়ি নেই। কলকাতায় নাকি আমাদের কথা জানতে পারলে দাঙ্গা লেগে যাবে তাই লুকিয়ে দেখা করা। লুকিয়ে দিল্লিতে আসা—আরও কত রকমের গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছ। তোমার অসুস্থ বিকৃত মানসিকতায় তুমি বোধহয় তা বুঝতে পারো না। প্রথমে আমিও পারিনি। যা বলেছ সব বিশ্বাস করেছি সরল মনে। কিন্তু এখন আর পঁচিশ বছরের গবেষণারত ছাত্র নই আমি, চল্লিশ বছরের এক সায়েন্টিস্ট। এখন বুঝেছি হাইলি কালচার্ড ক্যালকাটা সিটিতে রায়টের ভয় দেখিয়ে, বাবা-মার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার দোহাই দিয়ে তুমি আমাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছ আমি মুসলমান বলে। এখন তুমি একজন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক, আমার গাছের প্রয়োজন শেষ তোমার কাছে, তাই আমাকে অন্য কাউকে বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতার চাল চেলেছ। আমার ভালোবাসা অভিনয় ছিল না তোমার মতো। তুমি নিজে ধর্মান্ধ ছিলে টুম্পা, অসম্ভব স্বার্থপর তুমি। তোমার স্বপ্ন ধরার নেট হিসেবে তুমি আমাকে ব্যবহার করেছ মাত্র। প্রেম ছিল না মনে। প্রেম থাকলে অনেক দিন আগেই আমাদের ঘর-সংসার হতো। তোমার অপেক্ষা করতে করতে চুল-দাড়িতে পাক ধরত না আমার। কিন্তু আর আমাকে এক্সপ্লোয়েট করতে পারবে না তুমি। নেকেডলি এক্সপোজড্ হয়ে গেছ তুমি। গুডবাই ইউ ফ্রড!'—বলে আমার ফ্ল্যাট থেকে আমার জীবন থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল আনমোল।

ও যা বলেছে সব ঠিক একটা দুটো ছাড়া। নিজের পক্ষে সাফাই দিয়ে আর তো কোনো লাভ নেই, কারণ আমার কথা তো আদালতের জুরিরা শুনছেন না, আমি একাই শুনছি আমার ঘরে বসে। ওকে আমি ভালোবাসিনি কখনও একথা ঠিক নয়। বাইশ বছর বয়সের প্রথম ভালোবাসা এখন সাঁইত্রিশ বছর বয়সেও অম্লান আছে। আমার স্বপ্ন ধরার জন্য ওকে আমি নেটের মতো ব্যবহার করেছি ঠিকই কিন্তু সেটা করার অধিকার তো ও নিজে আমাকে দিয়েছিল। ও সাহায্য না করলে আমি কি আজকের আমি হতে পারতাম? কক্ষনো না। ও আমাকে হাত ধরে জে.এন.ইউ. থেকে ISRO অবধি নিয়ে এসেছে, একথা যে সূর্যের প্রকাশের মতো সত্যি। লক্ষ বার স্বীকার করি আনমোল না থাকলে আমি একা কোনো কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারতাম না এই জীবনে। আজ আমার যে স্বীকৃতি, যে সম্মান সব কিছুই ওর অবদানে আর আমার পরিশ্রমে সম্ভব হয়েছে। একমাত্র ভালোবাসা ছাড়া ওকে দেবার মতো আমার কাছে যে আর কিচ্ছু ছিল না। একেবারে খাঁটি সত্যি কথা আজ রাগের মাথায় আমাকে বলে গেছে আনমোল। আমি যে পরজীবী উদ্ভিদ হয়ে ওকে আঁকড়ে ধরে মেরুদণ্ডহীন লতার মতো আকাশের দিকে উঠেছি এ কথা মিথ্যে নয়, চরম সত্য। প্রতিদান কখনো চায়নি ও। গবেষণা চলাকালীন বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়নি আমাকে বরং



স্কলারশিপের টাকায় টান পড়লে নিজে থেকেই টাকা দিয়ে সমস্যা মিটিয়েছে। আমি ISRO তে প্রবেশাধিকার পাওয়া অবধি সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হতে দেখিনি ওকে, নীরবে অপেক্ষা করেছে সঠিক সময়ের জন্য। তারপর সময় যখন এলো, যখন বিনম্রভাবে বিয়ের জন্য আমার অনুমতি চাইল, একবার আমার বাবার কাছে ওর পরিচয় জানাবার অনুরোধ করল ঠিক তখন থেকেই আমার বুকের ভেতরে দারুণ ভয়ের গুড়গুড় শুরু হয়েছিল। কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। নানা দোহাই দিয়ে টালবাহানা করে করে সময়কে পিছিয়ে দিচ্ছিলাম। ওর দিক থেকে চাপ বাড়ছিল। শেষে একদিন বলে ফেললাম—'আচ্ছা আজকাল তো লিভ-টুগেদারের যুগ। বিয়ে না করে একসাথে থাকছে লোকে। আমরা কি একসাথে থাকতে পারি না?'

—'ছিঃ! তুমি একথা মুখে বলতে পারলে টুম্পা? তাহলে এতোগুলো বছর আমরা অপেক্ষা করে বয়স বাড়ালাম কেন? সম্পর্কের পবিত্রতার মূল্য নেই তোমার কাছে?' সেদিন ক্ষমা চেয়ে কোনোরকমে শান্ত করেছিলাম ওকে। আজ আর পারিনি। ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে বলে দোষ দেবার অধিকার নেই আমার। ও আজ আমাকে ধর্মান্ধ বলে কোনো অন্যায় করেনি। আমি ধর্মান্ধ ছিলাম। ধর্মান্ধ আছি আর হিন্দু হয়েই থাকতে চাই। অপরিণত বয়সে ওর রূপ, গুণ, সৌহার্দ্য দেখে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। সেই সময়েও ধর্মের কারণেই ওকে সকলের চোখের আড়ালে রাখতে চেয়েছি কিন্তু ভালবাসার দুর্দম নদীটাকে বাঁধ দিয়ে আটকাতে পারিনি। অবশ্য আটকানোর চেষ্টাই করিনি। আনমোল বলেছে আমি ওর সঙ্গে ভালোবাসার নাটক করেছি। এটা সত্য নয়। ও মুসলমান বলে ওকে বিয়ে করে মুসলমান পরিবারে বউ হয়ে যেতে পারছি না—এটা সত্য। হিন্দু রক্ত-মাংসে আমার শরীর, হিন্দু সংস্কারে মোড়া আমার আত্মা। আইনি বিয়ের কাগজে যতই লেখা থাক—''যে যার ধর্ম পালন করিতে পারিবে''। কার্যক্ষেত্রে কি এই লেখার কোনো মূল্য থাকে? না, থাকে না। হিন্দু পাত্র-পাত্রীকে ইসলামে কনভার্ট হতেই হয়। এই দুনিয়াতে স্ত্রীকে স্বামীর পরিচয় নিতে হয়, সন্তানরা পিতার পরিচয়ে সমাজে পরিচিত থাকে। ঠিক এই জায়গাটাতেই আমার মন

বিরোধী হয়ে যায়। শুধু আমি নই আমার সন্তানরাও যে মুসলমান পরিচয় পাবে? আকাশের মতো উদার তোমার মন। সমুদ্রের মতো নিখাদ গভীর তোমার ভালোবাসা। তুমি বলতে—রাইটার্স, আর্টিস্টম, সায়েন্টিস্টদের সৃজনশীলতাই ধর্ম। ওরা অন্য কোনো ধর্মের পরোয়া করে না। তাহলে, যে হিন্দু মেয়েটাকে ভালোবেসে এতো ত্যাগ স্বীকার করে ওর জীবন গড়ে দিলে, আর এক পা এগিয়ে আর একটু ত্যাগ কেন স্বীকার করতে পারলে না আনমোল? যখন বুঝেই ফেলেছিলে আমি হিন্দু ধর্ম ত্যাগের ভয়েই বিয়েতে রাজি হচ্ছিলাম না তখন বলতে পারতে—'টুম্পা, যুগযুগ ধরে হিন্দু মেয়েরা মুসলমান পুরুষকে ভালবেসে নিজের ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে কলমা পড়েছে নিকাহ করার জন্য। তোমাকে তা করতে হবে না। এবার আমি হিন্দু ধর্মে কনভার্ট হয়ে তোমাকে হিন্দু নিয়মে বিয়ে করে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করব।'

তোমার ধর্ম পরোয়া না করা নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট মন থেকে এই কটা কথা বের হয়নি একবারও। বরং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি আমার বাপির কাছে তোমা সত্য পরিচয় জানাবার জন্য চাপ দিয়েছ। সেজন্য আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। কারণ আমাদের দুজনের কাছেই যার যার রিলিজিয়াস ফেথ প্রাধান্য পেয়েছে সবসময়। জন্মসূত্রে লাভ করা ধর্মীয় আস্থা ভাঙতে দুজনেই অক্ষম ছিলাম বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক হয়েও। জীবনের এতোটা পথ একসাথে হেঁটে এসেও আমাদের মিলন হলো না তাই।

স্বপ্ন ধরার তাগিদে গোপনে মা-বাপিকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলাম একদিন আনমোলের ভরসায়। ও আমাকে ডোবায়নি। সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছে পনেরো বছর ধরে। ওর সহায়তায় স্বপ্ন আমার হাতে ধরা দিতে বাধ্য হয়েছে। বাপি-মা'র পরে আমার আপন বলতে আনমোল ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওকে কি কখনও ভোলা যায়? মা-বাপিকে কি ভুলতে পেরেছি? জেদি ছিলাম। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে, অনেক মূল্য দিতে হবে জানতাম। মূল্য দিতে দিতে এখন আমি নিঃস্ব। কষ্টলব্ধ স্বপ্নটাকে শক্ত করে হাতের মুঠোয় ধরে অসীম মহাকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছি আমি একা এক অবোধ্য নারী। স্বপ্ন আমাকে বোঝে, হয়তো তাই ভাঙ্গনের সম্মুখে এসেও ও ছেড়ে চলে যায়নি আমায়। মহাকাশের রহস্য নিয়ে কত গবেষণা বাকি রয়েছে এখনও। সেগুলো সম্পূর্ণ করার জন্য আগামী দিনে স্বপ্নের প্রেরণা আমার শক্তি হয়ে থাকবে সাথে।

আমি এতো সহজে ভাঙবো না। কাজ শেষ না করে থামবো না। আমার দুর্দম অগ্রগতি। আমি চাই বিশ্বব্যাপী আমার নাম ইতিহাসের পাতায় চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকুক। বিজ্ঞান জগতের আকাশে 'একটি নতুন নক্ষত্র' বলে পরিচিত হোক। এটাই আমার শেষ ইচ্ছে।..... আর এই ইচ্ছেকে সফল করার জন্য আবার যদি আমাকে 'ভানুমতীর খেল' খেলতে হয় তাহলে বার বার খেলব। স্বপ্ন ধরা এবং স্বপ্ন সার্থক করার কৌশল আর তো অজানা নেই! □

With Best Compliments from-

KOHINOOR INDIA (P) LIMITED

Basti Bawa Khel, Kapurthala Road,
Jalandhar - 21 (Pb.) India
Phone : (O) 3050052, 3050057, 3050066
Fax : +91-181-3050014
E-mail : nipun@kohinooronline.com
Web : www.kohinooronline.com



নীল মেঘের চিঠি

নিখিল চিত্রকর

এই একলা ঘর আমার দেশ—গানটা যতবার শোনে অদ্ভুত এক মন খারাপ পেয়ে বসে মেঘাদিত্যকে। পৃথিবী জুড়ে মানুষের ছায়াসঙ্গী একাকিত্ব। লক্ষ জনের বিলম্বিত স্রোতের মাঝেও কী ভীষণ একা মানুষ। কেন? সে উত্তর অধরা থেকে গেছে। চিরকাল একাকিত্ব থেকে পালাতে চেয়েছে সে। কিন্তু আজও পারেনি। সুযোগ পেলেই জেগে ওঠে অতীতের আলোআঁধারি ক্যানভাস।

নিজেকে বাস্তবের আলোয় ফিরিয়ে আনলো মেঘাদিত্য। এমনিতেই আজ সারাদিন প্রচুর দৌড়ঝাঁপ গেছে। বকুলতলা মার্ডার কেসটা গোটাতে গিয়ে যথেষ্ট নাকানিচোবানি খেতে হয়েছে। ভরদুপুরে একই পরিবারের চারজন খুন। শুধুমাত্র বছর দুয়েকের এক শিশুকন্যা বেঁচে গেছে। বকুলতলার মতো ব্যস্ত এলাকায় দিনেরবেলায় এরকম ক্রাইম ভাবাই যায় না! উপরতলায় জবাব দিতে দিতে নাজেহাল। একমাস পর ধরা পড়ল অপরাধী। আজ একটু হালকা লাগছে মেঘাদিত্যর। রাত দুটো বাজতে চলল। পরমা আইল্যান্ড হয়ে মেঘাদিত্যর স্করপিয়ো ছুটে চলেছে চিংড়িঘাটার দিকে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে ভরা বর্ষার মেঘ। মাথার উপরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে ঝুলন্ত রেললাইন। কিছুদিন পর তার উপর দিয়ে দাপিয়ে বেড়াবে মেট্রো রেল। একধারে রেলিং ঘেরা মাছের ভেড়ি। রেলিঙের ওপারে সাজানো গার্ডেন বেঞ্চ। এত রাতেও বেঞ্চে বসা কয়েকজনের ছায়া পড়েছে পাশের ফুটপাথে। সন্ধেবেলা হেডকোয়ার্টারে ফিরে দুটো সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল ইন্সপেক্টর মেঘাদিত্য ব্যানার্জির জন্য। সিনিয়র অফিসারের ঘরে গিয়েই সুখবরটা পেল। আগামী মাসেই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদে প্রোমোশন হচ্ছে মেঘাদিত্যর। কমিশনার দিগ্বিজয় সাহা নিজে ফুলের বোকে পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

(২)

অ্যাপ ক্যাবের এসি বন্ধ করে উইন্ডো গ্লাস খুলে দিতে বলল নীলাক্ষী। বৃষ্টিটা বেশ জোরেই হচ্ছে। চারদিক সাদা হয়ে গেছে। এখন সকাল ১১ টা। অথচ মনে হচ্ছে পড়ন্ত বিকেল। কাল রাত থেকেই একটানা ঝরছে আকাশ। সাত বছর পর এই শহরে ফিরল নীলাক্ষী। তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠার প্রতি মুহূর্তের সাক্ষী এই শহর। আরো অনেক স্মৃতির ভালো-মন্দ ছড়িয়ে আছে এই কলকাতার আনাচে কানাচে। অথচ এই শহর ছেড়ে একদিন চলে যেতে হয়েছিল। উচ্চ মাধ্যমিকের পর বাবা মা একরকম জোর করেই ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দিল। সবকিছুর মূলে ছিল উঠতি বয়সের একটা সম্পর্ক। বাবা অসিতাভ মজুমদার ছিলেন কড়া ধাতের মানুষ। পড়াশোনা শিকেয় তুলে এই বয়সে মেয়েকে আশকারা দিতে নারাজ তিনি। নীলাক্ষীর মা অরুণিমার ভূমিকাও কম ছিল না। বাবা মাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিল নীলাক্ষী, কিন্তু লাভ হয়নি। ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময় সাতবছরে একদিনের জন্যও কলকাতায় আসেনি। অভিমান আর জেদ করে। এর মাঝে ঘটে গেছে অনেক কিছু। গত বছর বাবার ফোরথ স্টেজ লিভার কারসিনোমা ধরা পড়ল। ট্রিটমেন্ট হলো ব্যাঙ্গালোরেই। সেখানেই না-ফেরার দেশে চলে গেলেন অসিতাভ। পারলৌকিক ক্রিয়া ওখানেই হয়েছিল। মা কলকাতায় ফেরার সময় নীলাক্ষীকে ফিরতে অনুরোধ করেছিল। ও ফেরেনি। নীলাক্ষীর মা লেকগার্ডেন্সে ওর দিদার বাড়িতেই থাকেন। নীলাক্ষী জানিয়েছিল, আপাতত কলকাতায় ফেরার কথা ভাবছে না। কোনোদিন ফিরবে কিনা তাও জানে না। তাই একরকম অভিমান করেই অরুণিমা সাদার্ন অ্যাভিনিউর বাড়িটা বিক্রি করে দেন। হঠাৎ আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জব অফারটা এল। গোড়ায় নীলাক্ষী অতটা গা করেনি। এইচ আর ও সান্যাল স্যারের কথায় শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে। নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়ার রিজিওনাল প্রোজেক্ট হেড-এর পোস্ট। কলকাতায় অফিস। এতদিন যেকোনো ভাবেই কলকাতাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। এবার পারলো না। সবচেয়ে খুশি হয়েছে মা আর দিদা। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরেছে। দিদা তো বলেই রেখেছে, 'এবার বিয়ে করে সংসার কর'। ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্সে নামলো নীলাক্ষী। এই ক'দিনে একটা জিনিস খেয়াল করেছে নীলাক্ষী। শহরটার চালচলন হয়তো বদলেছে, কিন্তু মানুষগুলোর চাওয়া-পাওয়া, ওজর আপত্তি, জোরাজুরি একই রকম থেকে গেছে।

(৩)

সকালেই ডিসিপি স্যার ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন, পুরো দায়িত্বটা তাকেই নিতে হবে। ভিভিআইপি-রা থাকবেন। সি এম আসবেন। সেখানে কোনো গড়বড় তিনি চান না। এরকম গুরুদায়িত্বে মেঘাদিত্য ছাড়া অন্যা কাউকে ভাবতে পারেন না ডিসিপি অমিত রায়। তাই ও টিম নিয়ে চলে এসেছে কালীঘাটে শশ্মানে। গত রাতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন চিত্রতারকা প্রমীলা সেন। শেষকৃত্য হবে কালীঘাটে। মুম্বই থেকেও তারকারা আসছেন শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। সেই অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পেয়েছে সে।

ক্ষীণস্রোতা আদিগঙ্গার পাড়ে বাগানের রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়েছিল মেঘাদিত্য। এদিকে হুড়োহুড়ি। চরম ব্যস্ততা। দূরে টিভি চ্যানেলের ওবি ভ্যানগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। ইতিউতি সাংবাদিকদের ভিড়। ক্যামেরা, ট্রাইপড, বুমের আনাগোনা। দূর থেকে একটা খঞ্জনির বাজনা আর হরিবোলের সুর শুনতে পেল সে। এই হরিবোলের সুর তার ভীষণ চেনা। লোচন দাসের গলা। এর আগে কলেজে পড়ার সময় মাঝেমাঝেই উদভ্রান্তের মতো এই শশ্মানে ছুটে আসতো মেঘাদিত্য। দাহকাজ হয়ে গেলে মৃতের আত্মীয়রা যখন নাভিটা নিয়ে আদি গঙ্গার দিকে আসতো, তাদের পিছু পিছু খঞ্জনি বাজিয়ে হাজির হতো লোচন দাস। বড়ো অদ্ভুত মানুষ। দিন নেই, রাত নেই, এই শশ্মানেই পড়ে থাকে। বলতো এ আকাশ, মাটি, নদী সবই যে তার দেওয়া

ঠাঁই। এর চেয়ে বড়ো ঘর আর কোথায় গো গৌর! এই পঞ্চভূতের পোশাক এভাবেই একদিন পঞ্চভূতে মিশে যাবে। তার আড়ালে থাকা জ্যোতি মুক্ত হয়ে মিলবে পরমাত্মার সঙ্গে। জ্যোতির কোনোও ঠাঁই নেই। সে-ই সবার ঠাঁই গো। লোচনের কথা সদ্য যৌবনে পা রাখা মেঘদিত্যর বুঝতে আরও কিছু সময় লেগেছিল। সেই হরিবোলের সুর আবার বাজছে। ফিরে আসছে ফিকে হয়ে আসা অতীতের সংঘাত। কিন্তু আজকের মেঘাদিত্য অনেক বদলে গেছে। আনমনা হয়ে পড়েছিল মেঘাদিত্য। সংবিৎ ফিরল পামেলার ডাকে।

(৪)

নিজের কেবিনে বসে ফাইল দেখছিল নীলাক্ষী। অফিস কোঅর্ডিনেটর তিয়াসা অরফ্যান স্কুল প্রোজেক্টের ডেমন্সট্রেশন দিচ্ছে। নীলাক্ষীর মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। স্বল্প কথায় ফোন রাখল। ক্লান্তিভরা চোখে তিয়াসার দিকে চেয়ে বলল, চলো একটু কফি খেয়ে আসি।

নীচে নেমে রাস্তাটা ক্রস করেই একটা ক্যাফেতে ঢুকল নীলাক্ষীরা। দুটো কফির অর্ডার দিয়ে বসল। নীলাক্ষী জিজ্ঞেস করল—

—তিয়াসা তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

—আমি গড়িয়ায় একটা পিজিতে থাকি ম্যাম। এক জ্যেঠিমা ছাড়া এ পৃথিবীতে তেমন কেউ নেই আমার। খুব ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছি। উনিই আমায় মানুষ করেছেন। আমি, জ্যেঠিমা আর ভাই। এই আমার পরিবার। আমরা কাশীপুরে ভাড়াবাড়িতে থাকি।

'অনাথ' শব্দটা শুনলেই কেমন মন খারাপ হয়ে যায় নীলাক্ষীর। যে সময়টা বাবা-মায়ের হাত ধরে জীবনে চলার পথ শুরু হওয়ার কথা সেই সময়েই একটা শিশু বাবা-মাকে হারিয়ে ফেলে। আত্মীয় পরিজন থাকলেও সেই যত্ন, সেই ভালোবাসা কি শিশু পায়? সব পরিজন তো আর ভালো হয় না। একজন অনাথ তার জীবনেও এসেছিল। গড়ে উঠেছিল সম্পর্ক। বাবা-মা হারানো সেই ছেলের ভুবন ভোলানো দৃষ্টিতে সব কিছু শিকেয় উঠেছিল তার। তার বয়ঃসন্ধির অকাল সময়ের মেঘ। সেই মেঘ ভাঙেনি। ঝরে পড়েনি। ঝোড়ো হাওয়ায় তার অভিমানী চোখের জল প্রখর তাপের পথ ধরে ফিরে গেছে।

সামনে রাখা কফির কাপে ধোঁয়া উঠছে। কফিতে দুটো সুগার কিউব ফেলে গুলতে গুলতে নীলাক্ষীর দিকে তাকালো তিয়াসা। ম্যামের মুখটা বিষণ্ণ। কাচের দেওয়ালের ওপারে ছুটে বেড়াচ্ছে একটা অস্থির শহর। এখানে বসে বেশ আন্দাজ করা যায় তার ক্যাকাফোনি। ক্যাফের আশেপাশের চেয়ারে কিছু যুগল নীচু স্বরে কথা বলছে। মৃদুলয়ে বেজে চলেছে শিবকুমারের সরোদ।

—আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরবো ম্যাম। রাস্তায় প্রচুর ট্র্যাফিক হবে। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তিয়াসা বলল।

—কেন বলতো? কোনো মিছিল টিছিল বেরোবে নাকি?

—প্রমীলা সেন মারা গেছেন তো! কালীঘাটেই ওনার শেষকৃত্য হবে বিকেলের দিকে। অনেক সেলিব্রিটিও আসছেন। ওদিকের রাস্তা পুরো বন্ধ থাকবে। তাই বলছিলাম।

—হ্যাঁ নিউজে দেখলাম। একটা যুগ শেষ হলো। পুরনো বাংলা ছবিতে গৌরব কুমার আর প্রমীলা সেনের জুটি জনপ্রিয় ছিল।

—হ্যাঁ। কী অদ্ভুত তাই না! গৌরব কুমার মারা যাওয়ার পর থেকে উনি নিজেকে একেবারে আড়াল করে নিয়েছিলেন। এতবড়ো একজন সেলিব্রিটি জীবনের শেষ বছরগুলো নির্জনে কাটিয়ে দিলেন!

কথাটা সত্যি। তিয়াসার মতো অনেকেই ভাবতে পারে না। কিন্তু ভালোবাসা যদি অপার্থিব হয়, তাহলে নির্জনতাই আপন সঙ্গী হয়ে ওঠে। তার হারিয়ে যাওয়া 'মেঘ' একদিন প্রিন্সেপ ঘাটের কনেদেখা সন্ধ্যেবেলায় তাকে বলেছিল, গৌরব কুমার আর প্রমীলা সেনের ভালোবাসা ছিল অপার্থিব। তাই এ জগতের কেউ তা অনুভব করতে পারে না। মেকি সংসারের সং সাজা মানুষগুলো তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলে। মিডিয়া গসিপ বানায়। কিন্তু কেউ তাদের মনের গভীরতা অনুধাবন করতে পারে কি? কথাগুলো মনে ধরেছিল নীলাক্ষীর। তার মেঘকে নিয়ে এমনই অপার্থিব গাঁটছড়া বাঁধার স্বপ্নও দেখেছিল সে। কিন্তু দূর নৌকার গলুইয়ে জোনাকির মতো জ্বলতে থাকা সেসব আলো আবছায়া হয়ে গেছে।

(৫)

পামেলাকে দেখে অবাক হলো মেঘাদিত্য। কয়েকবছর হলো ও একটা ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলে দিল্লির ব্যুরো হিসেবে জয়েন করেছিল। দিল্লিতেই থাকতো। পামেলা শর্মা। বেশ ডাইনামিক সাংবাদিক। নিজের কাজ আর কেরিয়ারে পুরোপুরি ডুবে থাকে। বছর দুয়েক আগে মুম্বাইয়ে সাইবার ক্রাইমের একটা সেমিনারে আলাপ হয়েছিল।

—হ্যালো মিস্টার এসিপি। হাউ আর ইউ? অ্যান্ড কনগ্র্যাচুলেশনস!

—ফাইন। কিন্তু কনগ্র্যাচুলেশনস ফর হোয়াট?

—বাঃ মেঘাদিত্য ব্যানার্জি এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ। এত বড়ো প্রোমোশন! তাছাড়া বকুলতলার মার্ডার কেসটাও খুব ভালোভাবে সামলেছো।

—সব খবরই রাখো দেখছি। কিন্তু তুমি এখানে কী করছো? তুমি তো...

—চলে এলাম। আমাদের হাউজ বাংলা নিউজ চ্যানেল লঞ্চ করেছে। তারই দায়িত্ব পেয়ে গেলাম। সোজা চলে

এলাম তিলোত্তমার ছায়ায়। আসার সময় ভাবছিলাম, এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। হয়েও গেল। যাক ওসব বলে কথা ঘোরালে হবে না। প্রোমোশনের ট্রিট কবে দিচ্ছো?

—যেদিন বলবে। তার জন্য দিনক্ষণ দেখতে হবে না কি? তবে পদোন্নতি তো তোমারও হয়েছে দেখছি। তাহলে ট্রিট তোমাকেও দিতে হবে.....বলে দুজনেই হেসে উঠলো।

দূর থেকে কতকগুলো লালবাতি-নীলবাতির গাড়ি ঢুকতে দেখা গেল। একে একে রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুলিশ কমিশনার, ডিসিপি এসে হাজির। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছাবে প্রমিলা সেনের মরদেহ। ছোটবড়ো সেলিব্রিটিদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ মিডিয়ার সামনে বাইট দিচ্ছেন।

সব কিছু শেষ হতে হতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল। মেঘাদিত্য ফ্ল্যাটে ফিরল অনেক রাতে। ডিনার সেরে শুতে যাবার আগে মোবাইল ফোনের নোটিফিকেশনে দেখল পামেলার দুটো ম্যাসেজ। 'আগামীকাল ফ্রি থাকলে দেখা করো'। 'ওকে, জানাবো' লিখে সেন্টার টেবিলে মোবইলটা রেখে শুতে গেল মেঘাদিত্য।

(৬)

চারদিন হলো কাঁকুড়গাছির নীলদিগন্ত আবাসনের ফ্ল্যাটে শিফট করেছে নীলাক্ষী। ফার্নিশড ফ্ল্যাট। প্রথম দুদিন ঘরদোর গোছাতেই কেটে গেছে। একা হাতে যতটা করা যায়। গতকাল রবিবার ছিল। তিয়াসা এসে অনেকটা হাতে হাতে করে দিয়েছে। বেশ ভালো মেয়েটা। মা কে ফোন করে বলেছিল আসতে। তার নতুন ফ্ল্যাটে কয়েকদিন থেকে গেলে মা'র ভালো লাগত। দিদার প্রেশারটা গতকাল থেকে একটু বেড়েছে। তাই মা আজ আসতে পারল না। কয়েকদিন পর আসবে। নীলাক্ষীর তেরো তলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে রাতের কলকাতা যেন একটা স্বপ্নপুরীর মতো মনে হচ্ছে। বহুদূরে কুহেলির মতো পাকদণ্ডি। কত রঙের নিয়ন বাতির দ্যুতি। বিশাল বিশাল কংক্রিটের বিল্ডিঙের ভেতর ছোটছোট ঘর।

হাসি-কান্না-অভিমান, চাওয়া-পাওয়ায় মেশা রঙিন বিভাবের ছবি। সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার বিজ্ঞাপনে ঢাকা ক্যানভাসে স্বপ্নপূরণের তুলির টান।..... সত্যিই আজ খুব একা লাগছে। বসার ঘরে ব্লুটুথ স্পিকারে রবীন্দ্র সংগীত চালিয়েছে। এটা তার নিত্যদিনের অভ্যাস। এই সময়ে সে ডায়েরির পাতায় চিঠি লিখতে বসে। কিন্তু সে চিঠি কখনো পোস্ট হয় না। ঠিকানা হারিয়ে গেছে। তার মনে পড়লো, তিয়াসা বলছিল, বকুলতলায় একটা দুর্ঘটনায় বাড়ির সব সদস্য মারা গেলেও প্রাণে বেঁচেছে একটা ছোট্ট শিশু। তখন থেকে অবচেতন মনে বাচ্চাটাকে নিয়ে ভাবনার জাল বুনে চলেছে নীলাক্ষী। ওইটুকু একটা বাচ্চা! জ্ঞান হওয়ার আগেই অনাথ হলো। গোটা পৃথিবীতে কেউ নেই তার। এই সময়ে স্বজনছাড়া কতটা একা অনুভব করছে শিশুটা? জানা নেই। আচ্ছা, যদি তার খোঁজ করে এই ফ্ল্যাটে এনে তাকে মানুষ করা যেত কেমন হতো? একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ পাওয়ার অধিকার বাচ্চাটার কি নেই? কত জনই তো আজকাল বিয়ে না করেও বাচ্চা দত্তক নেয়। সিঙ্গল মাদার হয়ে বাচ্চা মানুষ করে। মা, দিদাকে যদি এই ইচ্ছেটা জানায় ওরা কি বাধা দেবে? নীলাক্ষী স্থির করলো অনাথ শিশুটার সম্বন্ধে কাল থেকেই খোঁজ নেবে সে।

(৭)

তিয়াসা বলল, বছর দুয়েকের অনাথ শিশুটিকে মধ্যমগ্রামের একটা সরকারি হোমে রাখা হয়েছে। আজ সকাল সকাল মধ্যমগ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়েছে নীলাক্ষী। একবার শিশুটাকে চোখের দেখা দেখবে সে। তারপর তাকে দত্তক নিতে যা যা করণীয়, করবে। হোমের পরিবেশ বেশ নিরিবিলি। সুপার মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তর ঘরে নিজের পরিচয় দিয়ে এখানে আসার কারণ জানালো নীলাক্ষী। সুপার বললেন, ''খুব ভালো কথা। তবে বাচ্চাটিকে অ্যাডপ্ট করতে হলে আপনাকে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করতে হবে। আমাদের কাছে তেমনই নির্দেশ আছে। এখানে আসার পর বেশ কয়েকদিন সারাক্ষণই কেঁদেছে। চেনা মুখ, পরিবেশ, চেনা স্পর্শ পাচ্ছিল না। হোমের ফিজিসিয়ান বলেছেন মেন্টাল শক থেকে বেরোতে ওর আরও সময় লাগবে।

'মিসেস দাশগুপ্ত, আমি কি একবার ওকে দেখতে পারি?' নীলাক্ষী জিজ্ঞাসা করল। সুপারের ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোর ধরে সোজা হেঁটে গেলে একটা ছোট ঘর সেখানে বেবি কটে শুয়ে আছে একটা কন্যাসন্তান। তার ছোট ছোট মুঠো হাত চাদরের একটা অংশ আঁকড়ে ধরেছে। ঘুমের মধ্যেও হয়তো সে তার আশ্রয় হারানোর ভয়ে শঙ্কিত। নীলাক্ষীর চোখ ভিজে গেল। ওর নাম জানতে চাইল। সুপার বললেন, 'তেমন কোনও নাম তো ভাবা হয়নি। তবে হোমের মেয়েরা ওকে 'পরি' বলে ডাকে। নীলাক্ষীর ঠোঁটের কোণে আলতো হাসি ফুটলো। মনে মনে বলল 'পরিই বটে'।

আজ আর ঘুম আসছে না নীলাক্ষীর। ডিনার করে ব্যালকনিতে অনেকক্ষণ পায়চারি করেছে। আজ চিঠি লিখতেও মন করল না। বিছানায় শুয়ে মোবাইলে ফেসবুক দেখতে লাগলো। পামেলা অনলাইন আছে। ম্যাসেঞ্জারে পামেলাকে একটা পিং করল নীলাক্ষী। পামেলা রিপ্লাই দিল। দু'জনে ম্যাসেজ চালাচালি হলো কিছুক্ষণ। সবশেষে নীলাক্ষী লিখল,

—আগামীকাল ফ্রি আছিস? একটু দেখা করতাম। ইটস আর্জেন্ট।

—হ্যাঁ, তবে সন্ধ্যে ৬টার পর আমার



অফিসেই চলে আয় তাহলে। পার্কস্ট্রিটে।

—ওকে। দেখা হচ্ছে।

অনেকদিন পর দেখা হচ্ছে দুজনের। ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময় একই প্রতিষ্ঠান থেকে দুজনে গ্র্যাজুয়েশন করেছে। স্ট্রিম আলাদা হলেও দুজনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে অসুবিধা হয়নি। নীলাক্ষীর কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ, প্রেমের সম্পর্ক, পরিবারের আপত্তি, সবটাই জানে পামেলা। ওকে কথাগুলো বলে অনেকটা হালকা হয়েছিল নীলাক্ষীও।

পামেলা নীলাক্ষীর জন্যই অপেক্ষা করছিল। নীলাক্ষীকে দেখে পামেলা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল।

—তাহলে অবশেষে কলকাতায় ফিরলি?

—হুম, ফিরতে হলো। আর অ্যাভয়েড করতে পারলাম না রে!

—ভালোই করেছিস। কাকিমারও বয়স হচ্ছে। এই সময় একটা সঙ্গ দরকার।

—মা দিদার কাছেই থাকে। মায়েরও নিজের একটা পৃথিবী আছে। নিজস্ব কমফোর্ট জোন আছে। আমি অন্য ফ্ল্যাটে থাকছি। আমার মতো।

—তা বেশ। এই ক'দিনে তোর সেই অভিমানী নায়কের খোঁজ পেয়েছিস কি?

—না। তবে দেখা হওয়াটা যদি কপালে থাকে অবশ্যই হবে। আমি ডেস্টিনিতে বিশ্বাস রাখি পামেলা। অবশ্য তুই এসব বুঝবি না।

—তা ভুল কিছু বলিসনি। কেরিয়ারের পেছনে দৌড়ে ওসব অনুভূতি আমি দূরে ফেলে এসেছি।

কাকিমা, বা তোর দিদা বিয়ের কথা বলে না? আচ্ছা যার প্রেমে পড়েছিলি তার নামটা কী যেন?

—ওসব ছাড়। আমি এসেছি তোর একটা সাহায্য নিতে—পামেলাকে বকুলতলা মার্ডার কেসে উদ্ধার হওয়া 'পরি'র কথা বলল নীলাক্ষী।

—আমি বাচ্চাটাকে অ্যাডপ্ট করতে চাই পামেলা। একটু হেল্প কর প্লিজ।

—এ তো খুব ভালো কথা নীল।

With Best Compliments from-

VISHAL GUPTA

Railway Road, Taraori, Karnal

Haryana - 132116, India

E-mail : vishal@jyotigroup.net gupta16.vishal@gmail.com

Website : www.jyotigroup.net

With Best Compliments from-

A

WELL WISHER

আমি সবরকম সাহায্য করব। কলকাতা পুলিশে আমার এক বন্ধু আছে। বকুলতলা মার্ডার কেসটা ওইই হ্যান্ডল করছিল। আগামীকাল ওর হেডকোয়ার্টারে চল। ও আমাদের সাহায্য করতে পারে।

(৮)

পরের দিন পুলিশ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গেল নীলাক্ষী আর পামেলা। সিকিউরিটি চেকিঙের পর রিসেপশনে মোবাইল ফোন জমা দিয়ে চার নম্বর ব্লকের দিকে এগিয়ে গেল। নীচে গেটের সামনে দাঁড়ানো একজন পুলিশকে পামেলা জিজ্ঞাসা করল, 'এসিপি মেঘাদিত্য ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করব। উনি কোথায় বসেন?' 'তিনতলায় উঠে বাঁদিকে পাঁচ নম্বর ঘরে।' মেঘাদিত্য ব্যানার্জি নামটা শোনামাত্র শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল নীলাক্ষীর। কার সাথে এখানে দেখা করতে এসেছে ওরা! পামেলা তো একবারও বলেনি এই নামটা। আচ্ছা, এখানে আসার আগে মেঘাদিত্য নামটা শুনলে কী করত নীলাক্ষী? ও কি আসত না? এত কথা ভাবতে ভালো লাগছে না ওর। তাছাড়া এত চিন্তাই বা করছে কেন? একই নামের কত মানুষ তো থাকে। নাম, পদবি একরকম হলে কি মানুষও একই হতে হবে? নানারকম চিন্তা করতে করতে ধীরে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল সে। পাশ থেকে পামেলা অনেক কথাই বলে চলেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেসব শুনতে ভালো লাগছে না নীলাক্ষীর। পুরনো সুগন্ধের মতো স্মৃতিরা এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথার মধ্যে। ওরা তিন তলার করিডোর ধরে পাঁচ নম্বর ঘরের দিকে এগোচ্ছে। যেখানে এসিপি মেঘাদিত্য ব্যানার্জি বসেন। নীলাক্ষী ভাবছে এই ব্যক্তিই যদি তার প্রথম যৌবনের 'মেঘ' হয়? কী করবে সে? কী করে তার চোখে চোখ রাখবে। একদিন যাকে সে ফিরিয়ে দিয়েছিল, ভালোবাসার সব সম্পর্ক ছিন্ন করে পাড়ি দিয়েছিল অনেক দূরে।

মেঘাদিত্য বাইরে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। জানাল পামেলা। একটু স্বস্তি পেল নীলাক্ষী। কেন জানে না তার মনে হচ্ছে আজ এই মিটিংটা না হলেই ভালো হয়। বাইরের চেয়ারে বসে পড়লো নীলাক্ষী। পামেলাকে জিজ্ঞাসা করল,

—আচ্ছা, তুই আমায় আগে তো এই ভদ্রলোকের নাম বলিসনি।

—ওঃ বলিনি না। আসলে কথায় কথায় তোকে মেঘাদিত্যর নামটা বলা হয়নি, সরি। রিয়্যাল জেন্টলম্যান। আর ভীষণ হেল্পফুল।

—তোর সাথে আলাপ হলো কীভাবে?

—একটা কনফারেন্সে ইন্টাভিউ নিতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। সেই থেকেই বন্ধুত্ব। খুব ভালো মনের মানুষ। সাধারণত কাজের বাইরে আমি কারও সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখতে পছন্দ করি না। কিন্তু এই মানুষটা একদম অন্যরকম। আলাপ কর। তোরও ভালো লাগবে।

—বুঝলাম। তবে দেখিস। কথায় বলে পুলিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কোনওটাই ভালো না—

মুখের কথা শেষ করতে পারল না নীলাক্ষী। করিডোরের ও প্রান্ত থেকে হেঁটে আসা মানুষটার দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। এই হাঁটার ছন্দ তার বহুদিনের চেনা। এ তো সেই 'মেঘ'! তার ভালোবাসা মেঘাদিত্য ব্যানার্জি। ক্রমশ এগিয়ে আসছে মানুষটা। গায়ে পুলিশের উর্দি। ঘরে ঢুকতেই মেঘাদিত্যর সঙ্গে চোখাচোখি হলো। মেঘাদিত্য দেখলো পামেলার সঙ্গে যে দাঁড়িয়ে আচে সে তার 'নীল'। এত বছর পর এভাবে এখানে দেখা হবে তা কোনওদিন ভাবেনি মেঘাদিত্য। এইমুহূর্তে দুজনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই চেয়ারটাই বসে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কোনো বাহুল্য দেখালো না মেঘাদিত্য। দুজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। এভাবে দুজনকে দেখে অবাক হচ্ছে পামেলা। ওদের এখানে আসার উদ্দেশ্য শুনল মেঘাদিত্য। বকুলতলার পরিবার হারানো শিশুটির দায়িত্ব তাড়াতাড়ি যাতে নীলাক্ষী পায়, তার জন্য সবরকম সহযোগিতা করার কথা দিল।

সারাদিন কাজে তেমন মন বসাতে পারেনি মেঘাদিত্য। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে। বসার ঘরের বুকসেলফ থেকে একটা নীল ডায়েরি বের করল সে। বহুদিন তার পাতা ওলটানো হয়নি। লালচে হয়ে যাওয়া পাতার লেখাগুলো বিবর্ণ হয়ে এসেছে। ঝাপসা হয়ে যাওয়া ছবিগুলো স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ.....।

কবেকার কথা। মাধ্যমিক পাশ করে সবে হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। কো-এড স্কুল। ছোট থেকেই ছেলেদের স্কুলে পড়াশোনা করেছে মেঘাদিত্য। এখানে একই ক্লাসে মেয়েদের সঙ্গে ক্লাস করতে, কথা বলতে জড়তা বোধ করত সে। পড়াশোনায় আগাগোড়া ভালো। মেয়েদের মধ্যে কেউ যেচে কথা বলতে এলে কেমন যেন গুটিয়ে যেত। সেই সময় নীলাক্ষীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। নীলাক্ষীকে তার অন্য সবার চেয়ে আলাদা মনে হতো। স্কুলের পর কোচিং ক্লাসেও একসঙ্গে যেত ওরা। যেদিন স্কুল থাকত না, নোটস নেওয়ার নাম করে মেঘাদিত্যর বাড়িতে চলে আসত নীলাক্ষী। চিঠি দেওয়া-নেওয়া চলত দু'জনের মধ্যে। স্কুলে নীল-মেঘের জুটি ছিল বিখ্যাত। বন্ধুত্বের মেলামেশা একদিন প্রেম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। পৃথিবীর সব চেয়ে সুগন্ধী বস্তু যে প্রেম! যতই চাপা দেওয়া হোক না কেন সে তার সৌরভ ছড়াবেই। একদিন তাদের অল্প বয়সের ভালোবাসার কথা নীলাক্ষীর বাবার কানে গেল। মেঘাদিত্য ছোট থেকেই অনাথ। দূর সম্পর্কের মাসির

বাড়িই ছিল তার ঠাঁই। চালচুলোহীন ছেলের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক নীলের বাবা-মা মেনে নিলেন না। একদিন নীলের মা, মেঘাদিত্যর মাসিকে সতর্ক করে গেলেন। মাসির বাড়িতে আর থাকা হলো না মেঘাদিত্যর। উচ্চমাধ্যমিকের ফল বেরোতেই নীল চলে গেল ব্যাঙ্গালোর। মেঘের রেজাল্ট আশানুরূপ হলো না। এর মাঝে সে বহুবার নীলের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছে। দেখা হয়নি। নীল তেমন তাগিদ দেখায়নি। মেঘের জীবনে এর পরের ধাপগুলো নিরন্তর সংগ্রামের। সেখানে থামা নেই। পেছন ফিরে তাকানো নেই। দুজনের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর বহুবছর কেটে গেছে। সময়ের ফেরে আবার দেখা হলো দুজনের। মেঘাদিত্য ভাবছে, নীল নিশ্চয়ই বিয়ে করে সংসার পেতেছে। তাই হয়তো ওই বাচ্চাটাকে অ্যাডপ্ট করতে চাইছে। মেঘাদিত্য অনেক কিছু জানতে চেয়েছিল। কিন্তু বেশি উচ্ছ্বাস দেখালে পাছে পামেলা সব জেনে যায়, তাই নিরস্ত করেছে নিজেকে। একটা অস্বস্তি কুরে খাচ্ছে মেঘাদিত্যর মন। পামেলাকে ফোন করে মেঘ—

—হ্যাঁ, মেঘাদিত্য বলো, কোনও আপডেট পেলে।

—আসলে তোমার বন্ধুর কিছু ডিটেল লাগবে। ওর কনট্যাক্ট নাম্বারটা দিতে পারো?

—হ্যাঁ সিওর। আমি ইনবক্স করছি।

নীলাক্ষীর নাম্বার তো পেল। কিন্তু কী করবে, মেঘাদিত্য বুঝতে পারল না। ফোন করাটা কি ঠিক হবে? সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে নীলাক্ষীর নাম্বারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে।

(৯)

সন্ধ্যের দিকে মা ফোন করে জানালো দিদার খুব বাড়াবাড়ি। ডাক্তার এসে দেখেছেন। খবর পেয়েই সাদার্ন অ্যাভিনিউ চলে এসেছে নীলাক্ষী। বাড়িতেই স্যালাইন চলছে। একজন নার্স মনিটর করছেন। অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। মা খুব কান্নাকাটি করছে। সান্ত্বনা দিচ্ছে নীলাক্ষী। তার মোবাইল ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। কলার আইডি অ্যাপে জ্বলজ্বল করছে মেঘাদিত্য ব্যানার্জির নাম। ফোন ধরল নীলাক্ষী। ওপারে সেই ভালো লাগা কণ্ঠ!

—নীল, ডিস্টার্ব করলাম না তো। এতো রাতে কল করছি বলে তোমার হাজব্যান্ড কিছু মনে করবেন না তো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেজা গলায় বলল,

—আমার দিদা খুব অসুস্থ মেঘ। বাড়িতে চিকিৎসা চলছে। আমার বাবা নেই। আমি আর মা-ই দিদার কাছে রয়েছি। আরেকটা কথা, আমি অবিবাহিত। কাজেই.....

নীলাক্ষীর কথা শুনে কী বলবে ভেবে পেল না মেঘাদিত্য। শুধু ফোন রাখার আগে দিদার বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিল।

পরের দিন লেক গার্ডেন্সে বাড়ির গেটে বৃষ্টি মাথায় মেঘাদিত্যকে দাঁড়াতে দেখে ভূত দেখার মতো অবস্থা হলো নীলাক্ষীর। দৌড়ে এল নীচে। কী করবে বুঝতে পারছে না। মেঘাদিত্যই বলল, ভিতরে আসতে পারি?

দিদা আগের থেকে একটু সুস্থ। মেঘাদিত্যকে ইশারায় খেয়ে যেতে বলেছেন। এখন ড্রইংরুমে মুখোমুখি সোফায় বসে আছে মেঘাদিত্য আর নীলাক্ষীর মা। নীলাক্ষী মায়ের পাশে।

সেদিনের অনাথ ছেলেটা, যার পাল্লায় পড়লে নীলাক্ষীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে, এমন আশঙ্কায় মেয়েকে এই শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে আজ পুলিশের মস্ত বড়ো অফিসার। নীলাক্ষীর মতো সেও বিয়ে করেনি! ভেতরে ভেতরে কুণ্ঠিত হলো অরুণিমা। সেদিনের কঠিন সিদ্ধান্তের জন্যই আজও কষ্ট পাচ্ছে নীল-মেঘ। দু'হাত জোড় করে মেঘাদিত্যর সামনে দাঁড়ালো মা। চোখে জল। বলল, 'পারলে ক্ষমা করে দিও। আসলে সব বাবা-মায়েরাই সন্তানের ভালো চায়। ওর বাবা আর আমিও ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ওকে কলকাতা থেকে দূরে পাঠিয়েছিলাম। এত বছর পর ফিরে এসেছে। হয়তো তোমার টানেই। একটা বাচ্চা দত্তক নেবে বলছে। তুমি ওর পাশে থাকলে ও সারাজীবন খুশি থাকবে। মা হয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করছি তোমরা ভালো থেকো। নীলাক্ষী আর মেঘ মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। আকাশ কাঁদলো করে আরও জোরে নামল বৃষ্টি। □





রণচণ্ডী দেবীর মন্দির

উত্তর-পূর্ব ভারতে মা দুর্গার বিভিন্ন রূপ : একটি ঐতিহাসিক অন্বেষণ

সুজিত কুমার ঘোষ

ডীমাসা-কাছাড়ির ইতিহাস অন্বেষণে আঞ্চলিক ঐতিহাসিক প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে তাদের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজ যে যথেষ্ট নয়, এ কথাও তেমনি ঠিক। এর মূল কারণ বোধহয় পদ্ধতি; অর্থাৎ যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা মূলত তাদের অনুসন্ধান চালিয়েছেন তা যথেষ্ট নয় বলেই মনে হয়। এরফলে ডীমাসা ইতিহাসের একটি বড়ো অংশই তাদের গবেষণা থেকে বাদ থেকে গেছে। প্রবীণ পণ্ডিতদের মতে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ছিল মূলত উপজাতিদের বাসভূমি, যাদের তাঁরা

তিব্বতি, বর্মন মঙ্গোলয়েড রূপে চিহ্নিত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং পরবর্তীকালে সিনো-তিব্বতিয় ভাষাভাষী মানুষদের বিস্তার এখান থেকেই হয় মনে করেন। কাকতালীয়ভাবে, ডীমাসারাও উত্তর-পূর্ব ভারতের এই অঞ্চলে উপজাতি হিসেবেই বসবাসরত। এদের সাধারণ জীবনযাপন পদ্ধতি, অন্যান্য উপজাতিদের মতো সাধারণ বাড়িঘর স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে ডীমাসারাও মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যদিও এই বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত এবং সেগুলি সঠিকভাবে পর্যালোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন।

ডীমাসাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে আদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তার থেকে জানা যায় যে এর পথ চলা শুরু হয়েছিল দিমাবং হালালি থেকে এবং তাদের নতুন রাজধানী অসমের সডিয়ায় কৌণ্ডিল্য নগর নামে পরিচিত। দিখও ও ডেবং নদীর তীরে রাজা কৌণ্ডিল্য নারায়ণ এই রাজ্যের পত্তন করেন। তামাশ্রী মা বা তাম্রমন্দিরকে F.H. Buchanan (An Account of Assam, London, 1820) 'পূর্ব কামাখ্যা' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কথিত আছে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দর্শন পাওয়া যায় একমাত্র দেবীর সন্তুষ্টি বিধানে। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত যোনি এখানে নিত্য উপাসিত, যা মূলত শিবলিঙ্গেরই একটি অংশ। তাই বলা যেতে পারে, এখানে উপাসনা করা বেশিরভাগ মানুষই হিন্দু রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা নিষ্ঠার সঙ্গে মা দুর্গারও উপাসনা করতেন। কৌণ্ডিল্য নগরে প্রাপ্ত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইটের তৈরি কাঠামোর অবশেষের আধিক্য সেই কথায় প্রমাণ করে। হেড়ম্ব বংশের রাজারা ধানসিঁড়ি উপত্যকার প্রভু বলে পরিগণিত হতেন, তারা ডিমাপুরে তাদের রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শাদিয়া রাজবংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে ডীমাসা-কাছাড়িরা বৃহত্তর শাদিয়া সুবনসিরি অঞ্চলে নিজেদের শক্তিশালী হিসেবে প্রমাণ করেছিল, যার প্রমাণ হিসেবে মন্দির, দুর্গ, র‍্যাম্পার্ট, ট্যাংক ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ এতকিছু নির্মাণের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রভূত শক্তি ও সংস্থানের। অহম-বুরঞ্জীরা দিখও থেকে ধানসিঁড়ি অববাহিকা এবং তার বাইরেও ডীমাসা-কাছাড়ির আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে দিয়েছিল। উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ তাঁর 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত'-এ বলেছেন যে, ডীমাসা রাজারা ১১৫০ থেকে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ডিমাপুরে তাদের রাজত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তারা তাদের সভ্যতাকে একটি উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, যা অহোমদের চেয়ে অনেক উন্নত সভ্যতা ছিল। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এটি সম্ভবত উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম হিন্দু সভ্যতা ছিল। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভারতবিশারদ রাজমোহন নাথ বলেছিলেন যে ডিমাপুর শহরটি লক্ষীন্দ্রপুর নামে পরিচিত ছিল, যা মূলত এসেছিল ডীমাসা রাজাদের প্রতিষ্ঠিত এক বিষ্ণু দেবতার নামানুসারে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, সেখানে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বস্তু হলো মেগালিথের উপস্থিতি। ডীমাসা লোককথার ভিত্তিতে প্রয়াত পণ্ডিত সোনারাম থাওসেন ধারণা করেছিলেন যে ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ডীমাপুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রায় ৪৫০ বছর ধরে সেখানে তাদের অধিকার কায়েম ছিল, কারণ এরপর তারা মাহুর নদীর তীরে মাইবঙে তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করে। সমকালীন ডীমাসা সমাজ গঠনে থাওসেন ও নলিনীন্দ্র কুমার বর্মনের অবদান অনস্বীকার্য। ডীমাসাদের মতে ডীমাপুরের বিষ্ণুমূর্তি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, তারা শিবকেও পরম শক্তি হিসেবে পূজা করত। সতী, উমা, দুর্গা, কালী, রণচণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত ভগবান শিবের বিভিন্ন অনুষঙ্গকেও ডীমাসা সম্প্রদায় শক্তির প্রতীক হিসেবে পূজা করত। ডীমাসাদের মধ্যে শিব পূজিত হতেন 'শিবরায়' রূপে, ঠিক একইভাবে বোরো সমাজে 'বাথবরায়' এবং নাগাদের মধ্যে 'হারক' রূপে শিব পূজিত হতেন।

কথিত আছে মাইবঙে প্রতিষ্ঠিত রাজধানী লম্বায় ছিল প্রায় ৪ কিলোমিটার এবং চওড়ায় ৩ কিলোমিটার। সিংহদুয়ারটি সম্ভবত নির্মিত হয়েছিল ১৫৭৬ সালে রাজা মেঘনারায়ণের সময়। Edward Gait মাইবঙে রণচণ্ডী মন্দির সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন মন্দিরটি ১৬৩৪ শকে প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য মহাশয় এই মতের খণ্ডন করেন। তাঁর মতে ১৬৪৩ নয়, ১৬৮৩ শক এই মন্দিরের নির্মাণকাল। মন্দিরের প্রাচীরে উৎকীর্ণ লিপি সেই কথাই প্রমাণ করে। জনশ্রুতিতে জানা যায় যে রণচণ্ডী বা যুদ্ধের দেবী মাইবঙের রাজা নির্ভয় নারায়ণের স্বপ্নে আসেন এবং পরের দিন সকালে তাঁকে নদীর ধারে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আসার জন্য আদেশ করেন। সময়টা ছিল মোটামুটি ১৫৫০ সাল নাগাদ। সেই আদেশমতো রাজা নদীর ধারে উপস্থিত হলে তিনি দেখতে পান একটি সাপ নদীতে সাঁতার দিচ্ছে। তিনি ধরে নেন যে সাপের আকারে দেবী তার সামনে প্রকট হয়েছেন, তখন তিনি লেজটি ধরেন, যা হঠাৎই একটি তলোয়ারে (অসি) পরিণত হয়। তিনি তলোয়ারটি প্রাসাদে নিয়ে চলে আসেন। এরপর একই রাতে দেবী আবার তার স্বপ্নে দেখা দেন এবং বলেন যে তিনি সাপের ঘাড়ে না ধরে ভুল করেছেন। তবে দেবী আশ্বস্ত করেন যে তলোয়ার যতদিন নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করা হবে ততদিন তা রাজ্যে সৌভাগ্য বয়ে আনবে। কথিত আছে যে, যখন ডীমাসা রাজ্য একের পর এক অহোম, জয়ন্তিয়া, কোচ ও মুঘলদের দ্বারা আক্রান্ত তখন শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ডীমাসারা রণচণ্ডীর ওপরই বিশ্বাস রাখে এবং শ্রদ্ধার সাথে দেবীর উপাসনা অব্যাহত রাখে। মহাভারতের হেড়ম্বের মতো ডীমাসাদের ঐতিহ্য ছিল বহু প্রাচীন। রাজা হরিশ্চন্দ্রনারায়ণ পাহাড় কেটে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে উৎকীর্ণ ছিল ১৬৮৩ শকতে ২২শে অগ্রহায়ণ দেবী রণচণ্ডীর পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালের পর থেকে সংস্কারসাধন শুরু হলে তারা কাছাড়ের বর্মণ নামে পরিচিত হতে থাকে, যারা শাক্ত ধর্মের সমস্ত দেব-দেবীর উপাসনা করতেন এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের তাদের ধর্মীয় কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। ডীমাসারা কম বেশি একটি মিশ্র জাতি বলা চলে, যাদের মধ্যে ছিল তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের মিশ্রণ। আসলে শিবরায় এবং রণচণ্ডী যথাক্রমে শিব এবং পার্বতীরই রূপ কল্পনা। জলের প্রতি ডীমাসাদের শ্রদ্ধাও লক্ষ্য করার মতো। 'দিগথর' বা খাঁটি জল স্পর্শ করে নিজেদের শুদ্ধ করার রীতি ডীমাসাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যা এক পাত্র জলে সোনা ও তামা ফেলে তৈরি করা হতো। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রণচণ্ডীকে স্মরণ করে বেশ কয়েকটি শ্যামাসংগীত রচনা করেছিলেন। রণচণ্ডী দেবীর এক প্রাচীন মূর্তি বর্তমানে রাজধানীর উত্তর সিংহদ্বারের নিকটে বেশ ভালো অবস্থাতেই দণ্ডায়মান। এখানে দেবীর কোনও বিগ্রহ নেই, তবে একটি তলোয়ার (অসি) দেবীর প্রতীক হিসেবে পূজিত। প্রথম ব্রিটিশ সুপার Thomas Fisher এই বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে রণচণ্ডী অর্থাৎ 'কাছাড়ের ঠাকুরায়েন' ছিল একটি তলোয়ারের প্রতীক; যেটি রাজবাড়িতে সংরক্ষিত ছিল এবং তার ধর্মীয় গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এছাড়া খাসপুরেও রাজধানী সংলগ্ন এলাকায় শিব, শ্যামা, বিষ্ণু, নরসিংহ-সহ বিভিন্ন মন্দিরের অবস্থান লক্ষ্যনীয়। উধরবন্দের রাজা তাম্রধ্বজনারায়ণ ১৭০২ সালে দেবী কাচাকান্তির মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এর পূজারি ছিলেন রাজকীয় পূজারিদেরই বংশধর। এই কাচাকান্তি দেবী মা দুর্গার অবতার বলেই বিবেচিত হন। বলা হয়ে থাকে এই দেবী আসলে দুটি শক্তিশালী হিন্দু দেবীর একত্রীকরণ। দুর্গা ও কালী।



তামাশ্রী মাই

রাজা গোবিন্দনারায়ণ ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। তাঁর সাহিত্য রচনার মধ্যে 'গোবিন্দকীর্তন' এবং 'মহারাষটশোভা লীলামৃত' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও রাজা তাম্রধ্বজ বড়খলায় দুটি মন্দির নির্মাণ করেন যার একটি হল নির্মাতা মন্দির এবং অন্যটি বিষ্ণু মন্দির। রাজা লক্ষ্মীচন্দ্রনারায়ণ আলমবাগের লকলকীতে একটি মন্দির নির্মাণ করেন সেখানে শিব ও পার্বতীকে প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন।

তাই বলা যেতে পারে যে, ডীমাসা শাসকবর্গ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠাকল্পে হিন্দু সমাজের প্রচারে বিশাল অবদান রেখেছিলেন। উপরিউক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতেই পারি যে এই ডীমাসা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনান্য হিন্দু জাতির ন্যায় অনেক উন্নত ছিল, যা তৎকালীন সমাজগঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং বর্তমানেও তা যে একইভাবে প্রযোজ্য এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। □

With Best Compliments from -

SPORTSLINE

Certified Substantial Sports Protection
Made in India
H-29, Udyog Nagar Industrial Area, Near Peeragarhi
New Delhi - 110041, India
+91-11-25470502, +91-11-49052142
sportslineindia@gmail.com
www.sportshelmet.com



কাবুলিওয়ালা

রাকেশ দাস

আমার আট বছরের কন্যা মিনি সারাদিন অজস্র কথা বলে। একেকবার মনে হয়, মুঠোফোনের মতো মিনির যদি মিউট করার বোতাম থাকত তাহলে শান্তি পেতাম। ওর মা ওর সাথে বেশি কথা বলে না। সেজন্যই বোধহয় আমার সঙ্গে তার কথাবার্তার কোনো সীমা নেই। একেকবার প্রচণ্ড বকাঝকা করি তাকে, কিন্তু তার দীর্ঘকালিক কোনো পরিণাম দেখা যায় না। দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকেই উলটে প্রচণ্ড বকে দিয়ে তার কথার ফুলঝুরি সমধিক বেগে ছুটতে থাকে। আমি কখনও শুনি, কখনও তার দুয়েকটা কথার উত্তর দিই। সে কিন্তু নিঃসঙ্কোচে তার হৃদয়ের সমস্ত কাহিনি আমাকে শোনাতে থাকে। আমি কলেজের ক্লাসে ব্যস্ত থাকলে সে পুতুলদের সঙ্গে গল্প করে, কখনও বা তার লেখাপড়ার জন্য তাকে যে মুঠোফোন দেওয়া হয়েছে সেটাতে কিছু দেখে, কিংবা খেলা করে সময় কাটায়। সেই সময়েও যদি তার কিছু জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ তার লেখাপড়ার খাতায় লিখে আমাকে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করে। আমিও লিখে তাকে উত্তর দিই। এটাও তার একটা মজার খেলা বলেই আমার মনে হয়।

দেখুন তো.... কথায় কথায় আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি। আমি কলকাতার নিকটবর্তী জেলার একটি কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক। কিছু কিছু পত্রিকাতে আমার প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়ে থাকে। আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, আমি মনুষ্যত্বের উপাসক। ঈশ্বর, অদৃষ্ট প্রভৃতি বিষয়ে আমার কোনো বিশ্বাস নেই। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই। আমার বিশ্বাসে সম্প্রদায়, ধর্ম, ঈশ্বর এই সব হলো দুর্বলদের শোষণের জন্য শক্তিশালীদের দ্বারা রচিত ষড়যন্ত্র। আমার মতে জগতের ইতিহাসই হলো শক্তিশালীর বিরুদ্ধে দুর্বলের সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু প্রবাদ আছে—সিংহদের নিজস্ব ঐতিহাসিক না জন্মানো পর্যন্ত শিকারের কাহিনিতে শিকারির প্রশংসাই লেখা হবে। সেজন্য বাস্তবে লিপিবদ্ধ ইতিহাস হলো আক্রমণকারীদের, শোষকদের প্রশংসার ইতিহাস। সাহিত্যের দ্বারা মনুষ্যত্বের প্রচার হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। প্রাচীন সাহিত্যে যেখানে যেখানে দুর্বলদের সংগ্রামের বর্ণনা আছে ততটুকুই প্রাচীন সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করা প্রয়োজন বলে আমার ধারণা। প্রাচীন সাহিত্য থেকে শক্তিমানদের অত্যাচারের কাহিনি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করলেই প্রাচীন সাহিত্যের সার্থকতা। সাহিত্যে সৌন্দর্য, লাবণ্য, রস, নান্দনিকতার বর্ণনা আসলে সক্ষমদের লীলাবিলাস। প্রেয়সীর মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা ভরাপেটে সক্ষম শোষকরাই করতে পারে। কারণ, তাদের পেট ভরে দুর্বলের শোষণের মাধ্যমে, বিনা পরিশ্রমে। ক্ষুধিত শ্রমিক চন্দ্রকলায় ছেঁড়া রুটির টুকরোই খোঁজে।

যাই হোক, আমার বিপ্লবী সত্তার পরিচয় দিতে এই কাহিনি শুরু করিনি। কথা হচ্ছিল মিনিকে নিয়ে। বলা ভালো এই গল্পে তার নাম নিয়ে। তার নামের একটি রহস্য আছে। তার মায়ের যখন প্রসববেদনা উঠল তখন তাকে নিয়ে আমি নার্সিংহোমে পৌঁছালাম। চিকিৎসক জানালেন প্রসবের খানিকটা দেরি আছে। আমি চট করে বাড়ি ফিরে এলাম। নার্সিংহোমে কয়েকদিন থাকার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র একটি ব্যাগে ভরে যখন বাড়ি থেকে বেরোব তখনই কলিংবেল বাজল। দরজা খুলে দেখলাম এক কাবুলিওয়ালা। ঝোলায় করে শাড়ি, শুকনো ফলের পসরা নিয়ে সে আমার দরজায় উপস্থিত। আমি আমার অবস্থার কথা তাকে জানালাম। শুনে সে বলল, ''আপনার মেয়ে হবে।'' আমি মৃদু হেসে তাকে বিদায় জানিয়ে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চিকিৎসালয়ের উদ্দেশে। দুপুরে সত্য সত্যই আমার কন্যাসন্তান জন্মাল। সন্ধ্যায় স্ত্রীকে জানালাম কাবুলিওয়ালার কথা। সে শুনে হেসে বলল, ''রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছে? সেই যে রহমতের মিনির প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের কাহিনি?'' সহসা সিদ্ধান্ত নিলাম, মেয়েকে আমরা 'মিনি' বলেই ডাকব।

২

দুই মাস পরে কাবুলিওয়ালা আমার বাড়ি হাজির। সেইদিন আমি বাড়িতেই ছিলাম। কপাট খুলে দরজায় দাঁড়িয়েই কিছু একটা করছিলাম। রাস্তায় সেই কাবুলিওয়ালাকে

দেখতে পেয়ে তাকে নিজে থেকেই ডেকে মেয়ের জন্মসংবাদ দিলাম। আমার স্ত্রীও মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এল। কথায় কথায় কখন যে কাবুলিওয়ালা ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীকে তার খরিদ্দার বানিয়ে ফেলেছে সেটা বুঝতে পারলাম না। ভালো ভালো শাড়ি, চাদর কম দামে বিক্রি করে সে। ঝোলার মধ্যে কাপড় ছাড়াও থাকে আখরোট, কাঠবাদাম, কাজু, কিসমিস। কাবুলিওয়ালার কথামতো ''পুরা আফগানিস্তান থেকে লিয়ে আসি বাবু। খাঁটি জিনিস। বাজারে পাবেন নাই...'' কিন্তু আমার মনে হয়েছে এই সমস্ত ফল কলকাতার মেছুয়া পট্টিতেও পাওয়া যায় এবং এগুলি সেখান থেকেই সংগ্রহ করা। একবার তাকে বলেছিলামও। কিন্তু সে আল্লাহের নামে কসম খেয়ে বলল যে, এই সমস্ত ফল সে আফগানিস্তান থেকেই নিয়ে আসে। ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু কাবুলিওয়ালার আল্লাহের প্রতি আস্থায় আমার অগাধ আস্থা। কোনো মুসলমান আল্লাহের নামে মিথ্যা কসম খেতে পারে না বলেই আমার বদ্ধমূল ধারণা। আমি তার কথাকেই সত্য বলে মেনে নিলাম।

মাসে দুই-তিনবার সে আমার বাড়িতে আসে। জিনিসপত্র বিক্রি করে। আমার মেয়ের সাথে তার বড়ো ভাব। তার নাম আমি কখনও জানতে চাইনি। কিন্তু, আমার স্ত্রী তাকে রহমত নামে ডাকে। এই ডাকের মধ্যে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের প্রভাব আমি স্পষ্টই অনুভব করতাম। একটি গল্প একটি জাতির মনে কীভাবে দীর্ঘকালীন প্রভাব ফেলে সেটা ভেবেই মনে মনে অপার সন্তোষ অনুভব করতাম।

হঠাৎ করে তার আসা বন্ধ হলো। প্রায় এক বছর পর হঠাৎ কাবুলিওয়ালার আবির্ভাব ঘটল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, সে নিজের দেশ আফগানিস্তানে গিয়েছিল। সেখান থেকে আমাদের জন্য আখরোট, বাদাম প্রভৃতি নিয়ে এসেছে। নিজের দেশের অনেক গল্প শোনাল সে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে সে অত্যন্ত চিন্তিত এবং দুঃখিত বলে বোঝা গেল। দেশটা আমেরিকার দখলে চলে গেছে। সর্বত্র মার্কিন সৈনিকদের অবাধ বিচরণ। দেশের গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকার মার্কিন দেশের হাতের পুতুল বই কিছুই নয়। মার্কিন জবরদখল থেকে দেশের মুক্তির সংগ্রাম চালাচ্ছে তালিবান। তালিব মানে ছাত্র। যারা ইসলামের ছত্র ধারণ করে ইসলামের প্রসারের জন্য নিবেদিতপ্রাণ তারাই হলো তালিবান। অন্য দেশের লোকে, পশ্চিমের দেশের লোকে বৃথাই তালিবানদের নিন্দা করে। এই দেশের লোকে তালিবানদের খারাপ বললে তার শুনতে বড়ই খারাপ লাগে। বামিয়ানের বুদ্ধবিগ্রহ ভেঙে ফেলার জন্য আমার মনে তালিবানদের সম্পর্কে একটা ঘৃণা ছিল। আমি স্পষ্টই সেই কথা রহমতকে জানালাম। রহমত বোঝাল যে, তাদের সম্প্রদায়ে মূর্তি হলো শয়তানের আগার। এমনিতেও যে দেশে বৌদ্ধদের চিহ্ন নেই সেখানে বুদ্ধমূর্তি থাকারও কোনো মানে হয় না। তালিবানরা ঠিকই করেছে। তাছাড়া, এই একটি কাজ বাদ দিলে স্বাধীনতাকামী, মনুষ্যত্বের উপাসক তালিবানদের সংগ্রামকে কোনোভাবে খাটো করা যায় কি? রহমতের দৃঢ় মনোভাবে আমার বিশ্বাস জন্মাল যে, তালিবানরা আসলেই দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। আমেরিকা নামক দেশটির বিষয়ে আমার সহজাত ঘৃণা। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যই তালিবানদের শ্রদ্ধা করা যেতে পারে।

যাওয়ার আগে রহমত জানাল যে, ''আপনাদের দেশের সরকারও তালিবানদের সন্ত্রাসবাদী মনে করে। এটা ঠিক নয়। আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আপনাদের সরকারের মত প্রকাশের কোনো প্রয়োজন বা অধিকার কোনোটাই নেই।'' রহমত ঠিকই বলেছে। সরকারের ব্যাপারে আমার প্রচণ্ড অনাস্থা। ধনাঢ্যদের তোষণ এবং শ্রমিকদের শোষণই সরকারের একমাত্র কাজ।

কালক্রমে তিনবছর বয়সি মিনিকে আমি বিদ্যালয়ে ভর্তি করালাম। বিদ্যালয়ের বিষয়ে আমি ও আমার স্ত্রী অনেক আলাপ আলোচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটি ইংরেজি মাধ্যম কনভেন্ট স্কুলে তাকে ভর্তি করানো হলো। সেখানে প্রতিদিন তাকে ইংরেজি ভাষায় খ্রিস্টসঙ্গীত শেখানো হয়, বাইবেলের কাহিনি শেখানো হয়। বাড়ি এসে সেই সমস্ত জিনিস সে আমাদেরকে শোনায়। ধর্ম, সম্প্রদায়, পাপ, পুণ্য—এই সমস্ত বিষয়ে আমার ঘোর অশ্রদ্ধা। কিন্তু মেয়ের মুখে ইংরাজি ভাষায় বাইবেল আর খ্রিষ্ট সঙ্গীত শুনতে আমার মন্দ লাগে না।

রহমত আসলে মিনি তাকেও এই সমস্ত গান শোনায়। একদিন যাতে আমি হঠাৎ খেয়াল করলাম যে, আমার ছোট্ট মেয়েটি মাথায় একটি কাপড় বেঁধে বজ্রাসনে বসে রয়েছে। তার নতুন খেলা ভেবে আমি যখন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি তখন স্ত্রী হঠাৎ বলে উঠল, ''কী করছে বল তো?'' আমার উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিজেই উত্তর দিল, ''রহমত ওকে এই সব শিখিয়েছে। নামাজ পড়ার কায়দা। রহমত এলেই ওকে এই সব শেখায়। আমি কয়েকবার বারণ করেছি। তোমার এই সমস্ত কিছুতেই বিশ্বাস নেই। এই সমস্ত দেখলে তুমি রাগ করতে পার বলেও তাকে বলেছি।'' আমি মাঝপথে স্ত্রীকে থামিয়ে বললাম, ''না না, তা কেন! বাচ্চা মেয়ে। রহমত ওকে বড্ডো ভালবাসে। নিজের মেয়ের মতো ভালবাসে। মিনিকে রহমত কুশিক্ষা দেবে না। বারণ কর না।''

৩

প্রায় একটি বছর কেটে গেছে রহমত আর আসে না। হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মতো তার আবির্ভাব। এসেই প্রথম প্রশ্ন, ''মিনি কোথায়?'' আমি উত্তর দিলাম, ''মিনি আছে। তুমি কোথায় ছিলে এতদিন?''

—''আমার এই দেশে থাকার ভিসা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই দেশে ফিরে গিয়েছিলাম।''

—''ওখানকার খবর কী?''

—''ভালোই। আমেরিকা জবরদখল করে রেখেছে। স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে তালিবানরা।''

—''তোমার মেয়ে কেমন আছে?''

রহমত জানাল যে তার মেয়ে ভালই আছে। একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়ে তার মেয়ে। কিন্তু দেশে ফিরে গিয়েই সে মেয়েকে স্থানীয় মাদ্রাসাতেও ভর্তি করেছে। দিনে স্কুলে যায়, রাতে যায় মাদ্রাসায়। এই সমস্ত কথার মধ্যেই ঝোলা থেকে একগাদা ফল বের আমার হাতে দিল সে।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, ''আরে এত সব কেন? এত দামি জিনিস কেনার মতো টাকা আমার নেই।''

—''আরে টাকা দেবেন কেন? আমার উপহার।''

—''কী উপলক্ষ্যে উপহার?''

—''আরে আমার দুই বিবিই অন্তঃসত্ত্বা।''

পাশ থেকে আমার স্ত্রী বলে উঠল, ''তোমার দুইজন স্ত্রী নাকি?''

রহমত উত্তর দিল, ''আজ্ঞে। আমার দ্বিতীয় পত্নী আবার বাঙ্গালী। এই কলকাতারই মেয়ে। এবারে দেশে যাওয়ার আগে তার সঙ্গে নিকাহ্ করেছি আমি।''

—''বয়স কত তার?''

—''আঠরো। তার বাড়ি থেকে আমাদের এই সম্পর্ক মেনে নিচ্ছিল না। কিন্তু আমাকে সে প্রচণ্ড ভালবাসে।''

—''কিন্তু তোমার বয়স তো পঁয়ত্রিশের বেশি! সেই মেয়ে কি তোমার আগের পক্ষের বিয়ের কথা জানে?''

হা হা করে হেসে উঠে রহমত বলল, ''সেই কথা জানলে কী আর বিয়ে করে? আমার গ্রামে গিয়ে সে প্রথম জানতে পারে আমার পূর্বপক্ষের কথা।''

এবারে স্ত্রীকে চুপ করিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, ''সে এই বেইমানি, তঞ্চকতা মেনে নিল?''

—''বেইমানি কোথায়? আমি তাকে ভালোবাসি। এর মধ্যে তঞ্চকতা কোথায়? সেখানে গিয়ে সে তিন দিন কান্নাকাটি করেছে। তার পরে সব স্বাভাবিক। কাছেই একটি বিদ্যালয়ে আমি তাকে শিক্ষিকার কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এই তো, আর ছয় মাস পরেই বাচ্চা হবে তার।''

সত্যই তো, যুদ্ধ আর প্রেমে তঞ্চকতা বলে কিছু হয় নাকি! সেই দিক থেকে রহমতের কোনো দোষ আমি খুঁজে পেলাম না। রহমত মিনির খোঁজ করল। মিনি ঘরের ভিতরে খেলা করছিল। তার মা তাকে কোলে করে নিয়ে এল। রহমত তাকে কোলে নিতে গেলে আমার স্ত্রী বলে উঠল, ''থাক রহমত। ওকে কোলে নিও না। বাইরে থেকে এসেছ। কত রকমের রোগ জীবাণু থাকতে পারে। দূর থেকেই কথা বল।'' আমি কিছু বলতে গিয়েও স্ত্রীর মুখের কাঠিন্য দেখে চুপ করে গেলাম। রহমতের মুখে কালো ছায় পড়ল। এটা ওটা কিছু কথা বলে সে সেইদিনের মতো বিদায় নিল।

আবার অনেক মাস কেটে গেল। করোনার প্রাদুর্ভাব ঘটল। বহুদিন রহমতের দেখা নেই। এই বছর অর্থাৎ ২০২১-এর আগস্ট মাসের শেষে সে আবার এসে উপস্থিত। তার মুখে বড়ো আনন্দ। তাকে দেকেই আমার স্ত্রী বলে উঠল, ''তোমার তো ভারী আনন্দ। তালিবানরা শেষ পর্যন্ত তোমাদের দেশকে স্বাধীন করল তাহলো!'' তার গলায় স্পষ্ট ব্যাঙ্গ ধরা পড়ছিল। তার মুখ থেকে এরকম কথা আমি করিনি। এর আগে যেবার রহমত এসেছিল তার পর থেকে আমার স্ত্রী আর কখনও রহমতকে নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। তাছাড়াও একদিন মিনি যখন রহমতের শেখানো নামাজ পড়ার কৌশল দেখাচ্ছিল সেই দিন মিনিকে প্রচণ্ড বকাবকি করেছিল সে। আমি কিছু বলতে গিয়েও সাহস পাইনি। স্ত্রীকে আমি একটু ভয় পাই বটে। তার বিরোধিতা করার মতো সাহস আমি জুটিয়ে উঠতে পারি না। কিন্তু আজ সে রহমতকে যেভাবে বলল সেটা আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। রহমতের প্রতি তার ব্যবহারে প্রচণ্ড রেগে উঠেছিলাম আমি। তালিবানদের অনেক কাজই আমার পছন্দ নয়। কিন্তু রহমতের মুখ থেকে তাদের সম্বন্ধে আমি যেটুকু জেনেছি তাতে আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, তারা আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামী। এমনকী সত্য সেই দেশ থেকে ফেরত আসা এক শিক্ষকের মুখেও তাদের বেশ প্রশংসা শুনেছি আমি। তিনি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে স্পষ্টই জানিয়েছেন কীভাবে কাবুলি-পোলাও খাইয়ে তালিবানরা তাদের আপ্যায়ন করেছিল। সব মিলিয়ে তালিবানদের ব্যাপারে আমার মনে একটি নরম কোণ তৈরি হয়েছে বটে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সেখান থেকে লোকের পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখাচ্ছিল বটে। কিন্তু আমি সেই পলায়নপর লোকগুলির মূর্খতায় হাসছিলাম। তালিবান নেতৃত্ব তো স্পষ্টই সকলকে অভয় প্রদান করেছে। তারা স্পষ্টই জানিয়েছে যে, সকলেই নিরাপদ থাকবে। সবচেয় বড়ো কথা রহমত তার দেশের সম্বন্ধে যা জানে আমরা কি তার থেকে বেশি জানব! এই সব কথা বলতে গিয়েও আমি স্ত্রীর ক্রোধারক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারলাম না।

৪

দুই মাস পরে আজ আবার রহমত এসেছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে বিধ্বস্ত। সামনেই দুর্গাপূজা। নতুন জামাকাপড় কেনার জন্য আমরা বেরোব বলে প্রস্তুত। সেই সময়ে রহমতের আগমন। ব্যস্ততা সত্ত্বেও তার মুখ দেখে তার কুশল প্রশ্ন করলাম। রহমত বলল, ''আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। স্থানীয় তালিবান নেতা এসে আমার দুই পত্নীকেই তুলে নিয়ে গেছে...''

''কী বলছ?'' আমার স্ত্রী চিৎকার করে উঠল।

''ঠিকই বলছি। আফগানিস্তানে এখন এই ঘটনা নিত্যই ঘটছে। এখন আমার আরও বড়ো ভয়ের কারণ অন্য। আমার ছোটো ছোটো দুটো মেয়েকেও না ওরা তুলে নিয়ে যায়। বাঙ্গালি বউ একটা মেয়ের জন্ম দিয়েছে। বড়ো বউ এবারে ছেলের জন্ম দিয়েছে। জানি না কী হবে ওদের। আমারও এখান থেকে যাওয়ার মতো সুযোগ নেই। কী যে করি...'' এই বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে রহমত।

হঠাৎ আমার স্ত্রী তার দিকে এক গেলাস জল এগিয়ে দিয়ে বলল, ''রহমত, তুমি চলে যাও। আঠারো বছর বয়সি যে মেয়েটিকে তুমি তার পরিবারের অমতে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিলে সেই মেয়েটির পরিবারের সদস্যদের মানসিক অবস্থা বোঝার মতো চেতনা তোমার নেই। সেই অবুঝ মেয়েটির আজকের দুর্দশার কারণ একমাত্র তুমি। তুমি বেইমান। তুমি তাকে ঠকিয়েছ। তুমিও তালিবান দানবদের থেকে কোনো অংশে কম নও। তোমাদের মতো পাপিষ্ঠরা ওদের শয়তানির দোসর। আর কখনও আমাদের বাড়িতে এস না। তোমার মতো দুর্বৃত্তের ছায়া আমার মেয়ের উপর পড়ুক তা আমি চাই না। কে জানে, কোনদিন হয়তো তাকেও তুমি তোমার কামুকতার শিকার বানিয়ে ফেলবে।''

এর পরে আগুনঝরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে স্ত্রী বলে উঠল, ''আজ থেকে মেয়েকে আর মিনি বলে ডাকবে না...''

মিনির দিকে তাকালাম। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে রহমতকে দেখছে। সেই দৃষ্টিতে বরফের শীতলতা.... □

With Best Compliments from -

ARIES ENGINEERS

JALANDHAR

PUNJAB

M: 9815479543

With Best Compliments from -

SANT VALVES PVT. LTD.

G.T. Road, By-pass,
Jalandhar
Pin - 144012 (PB.) India

Mfrs. of **SANT**
IBR CERTIFIED : BRONZE, CAST IRON, CAST STEEL, FORGED STEEL, BOILER MOUNTINGS
IST MARKED : GM VALVES, CI BALL VALVES, SLUICE VALVES, BUTTERFLY VALVES, **'SBM'** BRONZE INDUSTRIAL VALVES
Ph. +91 181-5084693-94-95, 2603308
FAX : +91-181-5062270
E-mail : info@santvalves.com
Website : www.santvalves.com

With Best Compliments from -

S. S. FORGINGS

Manufacturer & Exporters of

'SANT' Brand Froged Steel Pipe Fitting & Hand Tools

G.T. Road, By-Pass,
Jalandhar- 144012 (PB.) India
Phone : 0181-2601976, 2601719
E-mail : ssforgings.jal@gmail.com

With Best
Compliments from :-

AURO MECHANICALS

An ISO 9001 : 2000 Certified Firm

Mfrs. & Expoters of Hardware Nuts & Bolts, Hi-Tensile Fasteners

Auto Parts, Sheet Metal Components

B-20, Bhagwan Mahavir Industrial Complex, Backside Focal Point Sheds

Ludhiana - 141010
Tel. 0161-4610141
M.: 9814000141





উপন্যাস

একটি কাল্পনিক কাহিনি

এষা দে

‘কেয়াদি না?’ তাকিয়ে দেখি মোটাসোটা ফর্সা সুমুখশ্রী এক বয়স্কা মহিলা, পুজোর নতুন শাড়িতে ঝলমলে।—‘চিনতে পারছো না? আমি চন্দ্রিমা, আমার দিদি শর্বরী।’

‘ও তুমি চন্দ্রিমা! চেনা চেনা লাগছিল ঠিক মনে করতে পারছিলাম না। একটু মোটা হয়ে গেছ কি না।’

'একটু নয় অনেক। তুমি কিন্তু বিশেষ পালটাওনি চুলটা শুধু একটু পেকেছে। চিনতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি তো সেই অঞ্জলি দেওয়ার সময় থেকে লক্ষ্য করছি আর ভাবছি ঠিক কেয়াদির মতো দেখতে। শেষে ডেকেই ফেল্লাম।

'তুমি কি 'ভাসি'তে থাকো? আগের পুজোতে দেখিনি তো?'

'না, না, আমি থাকি দিল্লিতে। এখানে বড়ো মেয়ের কাছে বেড়াতে এসেছি। সাধারণত এ সময়ে আসি না, দিল্লিতে অনেক পুজো হয়, আমাদের চিত্তরঞ্জন পার্কে তো বিরাট আয়োজন। ওরা এবারে অনেক করে ধরল। আগে বহু বছর 'থানে'তে ভাড়ায় ছিল, পরে ভাসিতে ফ্ল্যাট কিনেছে।'

'কী নাম তোমার জামাইয়ের? শুভজিৎ ঘোষ? ও মা শুভর বউ লিপি তোমার মেয়ে! চিনি তো। তুমি নিশ্চয় কিছুদিন থাকবে। এসো না সবাইকে নিয়ে আমার বাড়ি। তুমি আর দিদি তো একেবারে হরিহর আত্মা ছিলে। তোমাদের মতো বন্ধুত্ব আজকাল আর হয় না। আমার মোবাইল নম্বরটা নিয়ে নাও, ফোন করো। এসো কিন্তু।'

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ভাসির বাঙ্গালি অ্যাসোসিয়েশানের ধুমধামের দুর্গোৎসব। মহাষ্টমীর অঞ্জলি দিতে এসেছি। মেয়ে জামাই নাতির সঙ্গে। চারিদিকে সুসজ্জিত নারী-পুরুষ। ছোটো বড়ো সকলের সানন্দ গুঞ্জন। কেমন যেন আর মন লাগল না। ধীমানকে বলি, 'চল ফিরি।'

'সে কী। এখন তো ফেরার কথা নয়। সবাই এখানে। পুজো দেখবে খাওয়া দাওয়া করবে, লম্বা প্রোগ্রাম।'

'খেয়াল ছিল না। তুমি ওদের সঙ্গে থাকো, আমি একাই ফিরে যাই। এই ভিড় আর এত আওয়াজ কেমন ভালো লাগছে না। সঙ্গে যাবার দরকার নেই। হাঁটা পথ, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না।'

মেয়ের কাছ থেকে ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে আর এক প্রস্থ কৈফিয়ত দিয়ে বাইরে আসি। অক্টোবর মাসে ও শহরে যথেষ্ট গরম। এতটুকু হেঁটে ওদের ফ্ল্যাটে ফিরতেই ঘেমে নেয়ে একশা। হাত-মুখ ধুয়ে মেয়ের দেওয়া নতুন শাড়ি ছেড়ে বাড়ির পোশাক পরি। অঞ্জলি দেব বলে সকালে কিছু খাইনি। এক কাপ চা করে দুটো বিস্কুট নিয়ে লিভিং রুমে আসি। সামনে খোলা বড়ো জানলার পর্দা সরিয়ে দিই। বাইরে পরিষ্কার আকাশ। এখন আর অত খারাপ লাগছে না। সোফায় বসে পা মেলে দিই। চায়ে চুমুক দিয়ে রিল্যাক্স।

কী অদ্ভুত, বলতে গেলে একেবারে কাকতালীয় যোগাযোগ। এতকাল পর শর্বরীর সঙ্গে। তার বোনের মাধ্যমে। এবং তাও নবি মুম্বাইয়ে। কত স্মৃতি শর্বরীকে ঘিরে। রিওয়াইন্ড রিওয়াইন্ড। সাদা ব্লাউজ নীল স্কার্ট ইউনিফর্ম পরে দুটো বেণী ঝুলিয়ে দুজনে পাশাপাশি ক্লাসে বসে। অ্যনুয়েল ডে-তে ফার্স্ট গার্ল শর্বরী রায়চৌধুরী প্রাইজ নিচ্ছে, ফোর্থ ফিফথ্ হওয়া আমি কেয়া মিত্তির হাততালি দিচ্ছি সকলের সঙ্গে। একটু বেশি জোরে। শুধু আমারই জানা তার প্রাণপণে পড়া আর ফার্স্ট হওয়ার তাগিদের পিছনে কী গভীর বেদনা। ওর মা দিনরাত পিছনে লেগে থাকেন, 'পড় পড়। ভালো রেজাল্ট কর, তোমাকে চাকরি করে খেতে হবে। এই চেহারায় বিয়েটিয়ে তো হবে না।'

একবার মুখের ওপর শর্বরী বলে ফেলেছিল, 'কেন অসুন্দর মেয়ের বিয়ে হয় না নাকি।'

'হ্যাঁ গরিবগুর্বোদের মধ্যে হয়। সেখানে সংসারে, ক্ষেতেখামারে বউদের খাটাবার জন্য বিয়ে করে। আমাদের ক্লাসে হয় না।' শক্ত মুখে রূপসি উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরনি মায়ের জবাব।

বেচারি শর্বরী, বেশ ময়লা রং, কপালটা গড়ের মাঠ, মোটা কাচের চশমার ভিতর গর্তে বসা ছোটোছোটো চোখ, বড়ির মতো নাক, পুরু ঠোঁট। মুখে যেন ছিরিছাঁদা নেই, তার ওপর বরাবরই ভারী শরীর। কে বলবে ওরই ছোটো বোন চন্দ্রিমা একেবারে পাত্রপাত্রী বিজ্ঞাপনের ভাষায় গৌরবর্ণা সুন্দরী তন্বী। নিখুঁত তার নাক-মুখ-চোখ। মায়ের রূপ পেয়ে তাঁর নয়নমণি। যার সুবাদে ক্লাসে এক আধটা সাবজেক্টে গাড্ডা খেলে আয়নার সামনে বসে সযত্নে কালার লাগিয়ে মেমসাহেবি ঢঙে থোকা থোকা করা চুল আলতো করে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে, 'আমার তোর মতো ফার্স্ট হওয়ার দরকার কী । আমি তো আর রোজগারে বেরব না।'

বা, কাজ না করা হাতে সযত্নে বাড়ানো লম্বালম্বা নখে ঘন লাল নেইল পালিশ লাগাতে লাগাতে বলে, 'বাব্বা, কেয়াদি কী করে যে তোমরা অত বই মুখে করে থাকো! আমার তো আধ ঘণ্টা ওরকম থাকলেই মাথা কেমন করে।' মাসিমা হাসিমুখে মন্তব্য করেন, 'দিদির মতো ফার্স্ট হতে হবে না। তবে একটু পড়াশোনা তো লাগবে। আজকাল বিয়ের বাজারে গ্র্যাজুয়েট না হলে, একটু গান-টান না জানলে ভালো পাত্র মেলে না।' আমরা অনেকেই শখ থাকা বা না থাক, কোনো না কোনো গানের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। যেমন আমি যেতাম দক্ষিণীতে। তবে চন্দ্রিমার জন্য স্পেশাল বন্দোবস্ত। তার সপ্তাহে দুদিন গানের মাস্টার আসে। সে সময়ে গড়পরতা মেয়েদের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ লিখনং বিবাহের কারণম্ গণ্য হতো। তেমনই প্যাঁ প্যাঁ হারমোনিয়ম বাজিয়ে পাত্রপক্ষের সামনে ক'লাইন 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' বা 'মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর' গাওয়া প্রত্যাশিত। শর্বরীর যেহেতু বিয়ের সম্ভাবনা নেই অতএব তার গানবাজনায় উৎসাহ আছে কিনা কেউ খোঁজও নেয়নি। ধরেই নেওয়া হয়েছে পড়াশোনা আর ভালো রেজাল্টই তার একমাত্র

কর্ম, তাতেই তার জীবনের সিদ্ধিলাভ।

শর্বরীর দুঃখে আমি সমান দুঃখী, ছিঃ নিজের মা এমন নিষ্ঠুর। সবসময় চেষ্টা করি ওকে উৎসাহ দিতে। তবে ক্লাসের অন্য বন্ধুদের কাছে এসব বলি না। আমার আর শর্বরীর মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গতার ভিত্তিটা গোপনই থাকে। যেমন শুধু আমিই জানি ও ঠাকুমার বিশেষ আদরের নাতনি, তাঁর দৈনন্দিন লক্ষ্মী জনার্দনের সেবায় হাতে হাতে জোগাড় দেয়, বাড়ির মধ্যে ওরই একমাত্র দেবদেবীতে ভক্তি। মায়ের অকারণ ঠেস দেওয়া কথায় চোখে জল এসে গেলে ঠাকুমা মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, 'তোর মা তো অন্ধ। যে মেয়ের স্বভাব এত লক্ষ্মী, যার মাথায় এত বুদ্ধি, তাকে কিনা হেলাফেলা করে।'

স্কুল ফাইনালে প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে হলো শর্বরী। ঠাকুমা তখন মৃত্যুশয্যায়। সবাইকে দিয়েথুয়ে তাঁর গহনার ভাণ্ডারে অবশিষ্ট, ঠাকুরদার উপহার মুক্তোর টাবজোড়া কৃতী নাতনিকে আশীর্বাদ করে চোখ বুজলেন। পুজোপাঠে উদাসীন মায়ের ঘাড় থেকে ঠাকুরঘরের দায়িত্ব সেই আগ বাড়িয়ে ঘাড়ে তুলে নিল।

বয়সের নিয়মে এবং কলেজ জীবনে প্রবেশের উত্তেজনায় ঠাকুমাকে হারানোর শোক সামলাতে শর্বরীর মতো সিরিয়াস স্বভাবের মেয়েরও বেশি দেরি হলো না। ছোটোবেলায় বিনোদন ছিল বড়োদের সযত্ন তত্ত্বাবধানে। ছুটির দিনে মাঝেসাঝে কাকা মামারা টারজান ও কিং কং-এর অ্যাডভেঞ্চার আর লরেলহার্ডির হাসির ফিল্ম দেখাতে নিয়ে যেতেন। এই ভাবে আমাদের হলিউডের সঙ্গে পরিচয়। সবই অ্যাকশন ফিল্ম, বাংলা মিডিয়ামে পড়া ছেলে-মেয়েদেরও অনায়াসে মাতিয়ে দিত। কলেজে ভর্তি হয়ে স্বাধীন ভাবে চলাফেরার অনুমতি পেয়ে আমাদের পাখা গজালো। শুরু হলো বন্ধুদের সঙ্গে চৌরঙ্গিতে ইংরেজি সিনেমা দেখা। অর্ধেক ডায়ালগ বুঝতেই পারতাম না। তবু কী দুর্নিবার আকর্ষণ সাহেব মেমদের প্রেম-বিরহ, রাগ-অনুরাগ, ঘৃণা-বিদ্বেষের সব কাহিনির। তাদের আবেগের তীব্রতা, প্যাশানে আমরা অভিভূত। বাংলা ফিল্ম তার ধারেকাছে লাগে না। তার ওপর দেখার আরাম। দিশি পাড়ার হলগুলোর চেয়ে কত ভালো, যেমন গদি আঁটা সিট, এয়ারকন্ডিশানড্, তকতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারিদিক, তেমনি সাজসজ্জা। মেট্রোর সেই সিলিং থেকে ঝোলানো রংবেরঙের বিখ্যাত আলোকগুচ্ছ, আস্তে আস্তে ধীর লয়ে ব্যাকগ্রউন্ড মিউজিকের সঙ্গে নিভে আসছে, অন্ধকার পর্দায় ভেসে উঠবে 'মেট্রোগোল্ডউইন মেয়ার' লেখার মধ্যে সিংহের মাথা নেড়ে গর্জন। কলাম্বিয়া, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স, ওয়ার্নার ব্রাদার্স, সব বড়ো বড়ো ফিল্ম কোম্পানির লোগো আমাদের চেনা হয়ে গেল। এলিটের নিজস্ব টিউন শুনলেই যেন অন্য দুনিয়ায় চলে যাই।

হলে ঢুকতেই যেন একটা অন্য জগতের ছোঁওয়া, যে জগৎ আমাদের চারিপাশের পাঁচাপাচি বাস্তবের চেয়ে অনেক সুন্দর মোহময়, কারণ অজানা। আমাদের তিন জনের মতো কলকাতায় আরো অনেকেই সে সময়ে ইংরিজি ফিল্মের ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে কোনো কোনো সিনেমা হল ম্যাটিনি শোতে টিকিটের কম দাম নিত বলে কলেজে ক্লাসের শেষে বা লাস্ট ক্লাস কেটে আসা ছাত্র-ছাত্রীতে ভরতি হয়ে যেত।

শর্বরীর মতো গম্ভীর পড়াশোনাঅন্ত প্রাণ মেয়েও হলিউডের জাদুতে মুগ্ধ। আমার কাছে একাধিক দিন বলেছে, 'জানিস মেট্রো লাইটহাউসে সিনেমা দেখতে দেখতে আমি সব ভুলে যাই, মা, চন্দ্রিমা, পরীক্ষা, কেরিয়ার।' 'চল্ আরো ফিল্ম দেখি।' আমি ওর হাতে হাত রেখে বলি। হই হই করে দু বছর কেটে গেল।

এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি সত্ত্বেও প্রত্যেকের পরীক্ষার রেজল্ট ভালোই হলো। শর্বরী প্রথম দশজনের মধ্যে। স্কলারশিপ পাবে, যেমন প্রত্যাশিত। একই কলেজে অনার্স নিয়ে পড়া, আমার পল সায়ান্স, শর্বরীর হিস্ট্রি, হেনার ফিলজফি। উর্দু অনার্সে নাদিরা নামে একটি নতুন মেয়ে ভর্তি হলো। এ কলেজে নতুন। লম্বা স্লিম, মাজা মাজা রং, সরু সরু চোখ, চওড়া হাঁমুখ, লম্বা নাক, ধারালো চিবুক, সব মিলিয়ে কিন্তু বেশ একটা চটক আছে। পরনে প্রতিদিন ম্যাচকরা শাড়িব্লাউজ। আর মুখে সর্বদা হাসি। দারুণ মিশুকে মেয়ে, ক'দিনেই একেবারে প্রচুর বন্ধু জুটিয়ে ফেলেছে। যাদের মধ্যে ছিলাম আমরাও। পাড়ার সুবাদে কলেজে কিছু মুসলমান ছাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে নাদিরা ব্যতিক্রম, অন্যদের মতো শান্ত শিষ্ট লাজুক লাজুক নয়। ক্রমে আমাদের তিনজনেরই জিগরি দোস্ত্। স্টাফেদের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে টিফিন টাইমে কলেজ গেটের বাইরে ফেরিওয়ালার ফুচকা আইসক্রিম খাই, হাহা হিহি করি চারজন। একদিন নাদিরা চকোবার চাটতে চাটতে বলল, 'কাল আমাদের সকলের তিনটেয় ছুটি, চল আমাদের বাড়ি, এইতো পার্কসার্কাস মোড় থেকে ডানদিকে রাস্তা, ক' মিনিটের ডিস্ট্যান্স। ভাইজান একটা এস্প্রেসো কফির মেশিন কিনে এনেছে। কফি বানাবো।'

রেস্তোরাঁয় এসপ্রেসো কফি উঠতি ফ্যাশন। তখন মধ্যবিত্ত সংসারযাত্রা মেশিনবর্জিত। রেডিয়ো ও বড়োজোর হিটারে সীমাবদ্ধ। কাজেই এসপ্রেসো মেশিন কেনার খবরে আমাদের কৌতূহল ও বিস্ময় জাগল। এর মধ্যে ওর ভাইজানের প্রচুর প্রশস্তি শোনা হয়ে গেছে, মৌলানা আজাদের দারুণ স্টুডেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে টপ পজিশান হোল্ডার। আমাদের কারো দাদাই নেই। শর্বরী আর আমার একটি করে বোন, হেনার ভাই ওর চেয়ে ছোটো। কাজেই আমরা ইম্প্রেসড্।

শীতকাল। বিকেলের নরম রোদে নাদিরার সঙ্গে আমরা

তিনজন হাঁটতে হাঁটতে মহানন্দে চলে গেলাম। বেশ বড়ো দোতলা বাড়ি, ইয়া উঁচু সিলিং, তিনতলার সমান তো কম হবে না। অনেকটা জায়গা নিয়ে, ভেতরে বাধানো চৌকোণা উঠোনের তিনধারে কিছু বড়ো বড়ো গাছ, একদিকে গ্যারেজ ও কাজের লোকেদের থাকার আউটহাউস। স্পষ্টত পুরুষানুক্রমিক সচ্ছলতা। প্রতিষ্ঠিত পরিবার। ক্লাসগেজেট হেনার চুপিচুপি ফিসফিস, নাদিরার বাপঠাকুর্দা কনস্ট্রাকশান বিজনেসে হেভি মালকড়ি কামিয়েছিল, সেন্ট্রাল ক্যালকাটায় তাদের বানানো অনেক মস্ত মস্ত ম্যানশান রয়েছে।

আমাদের বসানো হলো একতলায় ছোটো একটা ঘরে। সলিড কাঠের শক্ত শক্ত কটা টেবিলচেয়ার পাতা, যেন জমিদার গৃহের দর্শনার্থী কী উমেদারদের অপেক্ষার জায়গা। অন্দরমহল থেকে বিচ্ছিন্ন। আমাদের বসিয়েই নাদিরা ভিতরে ঢুকে গেল। আমরা তিন জন এর ওর মুখের দিকে চাই। মিনিট পনেরো পরে তার প্রত্যাবর্তন, হাতে মস্ত ট্রে। তাতে সাজানো চার কাপ প্রতিশ্রুত এস্‌প্রেসো কফি এবং বড়ো প্লেটে বেশ ক'টা শামি কাবাব। তখন চারটেও বাজেনি। এই অবেলায় এত আয়োজন। হেঁসেলে সর্বদাই অতিথি সৎকারের এমন মোগলাই ব্যবস্থা থাকে, নাকি এটাই এ বাড়ির স্বাভাবিক জলখাবার। আমরা মোহিত।

সেই শুরু। ক্রমে ঘন ঘন যাতায়াত। কফি ও কাবাবের লোভ আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি কি সামলাতে পারে! গ্রীষ্ম-বর্ষা থোরাই কেয়ার। আশ্চর্য ব্যাপার কখনো নাদিরার মায়ের দেখা পাই না। তবে অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের আসরে উপস্থিত নাদিরার ভাইজান আফতাব হোসেন। শনিবার আমাদের লম্বা আড্ডা চলে, তার মফস্‌লের কর্মক্ষেত্র থেকে উইক এন্ডে বাড়ি আগমন উপলক্ষ্যে।

'ইশ্‌ কী কালো ভুতো ভুতো বিশাল চেহারা, দেখ্‌। ক্রুড, নারে?' আমি ও হেনা নিজেদের মধ্যে মুখ টেপাটেপি করি। 'মোটেই বোনের মতো ছিপছিপে পাতলা, ধারালো মুখ, ফ্যাশন দুরস্ত সাজপোশাকে অ্যাট্রাক্টিভ নয়।'

শর্বরী চুপ করে শোনে। তারপর বলে, 'আড়ালে তোরা নিশ্চয় আমার সম্বন্ধেও এরকম কমেন্ট করিস।'

অপ্রস্তুত আমরা তাড়াতাড়ি বলি, 'দূর, তুই তো আমাদের বন্ধু।'

'আর নাদিরার ভাইজান কি আমাদের শত্রু?'

'উফ্‌, অত হিসেব করে কথা বলা যায় নাকি', হেনা মন্তব্য করে, 'তুই সবসময়েই অতিরিক্ত সিরিয়াস।'

তবে আমরা দুজন সাবধান হয়ে যাই। নো বেফাঁস মন্তব্য শর্বরীর সামনে।

চেহারা যাই হোক স্বভাবে আফতাব অবশ্য বোনের মতোই মিশুকে। তার সাবজেক্ট ছিল হিস্ট্রি। সগর্বে ঘোষণা, সে মডার্ন ইউরোপিয়ান হিস্ট্রির ছাত্র, অন্য পাঁচটা মুসলিমের মতো মিডিয়েভেল পিরিয়ড অর্থাৎ মুসলমান শাসনের যুগে নিজেকে বন্দি রাখে না। শর্বরীরও মডার্ন হিস্ট্রি। দেখা গেল, দুজনেরই কমন ইন্ট্রেস্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিমে সামন্ততন্ত্রের পতন। একসঙ্গে হলেই এ নিয়ে আলোচনায় লাগে। আমরা বলতে বাধ্য হই, 'তোরা যে একেবারে টিউটোরিয়েল ক্লাস শুরু করলি।'

'চল শর্বরী আমরা বাইরে বাগানে যাই'। আফতাবের প্রস্তাব। ঘরে ফ্যানের হাওয়ার আরাম ত্যাগ করে ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমেও প্রায়ই তাদের কুর্চি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপে মগ্ন দেখা যেতে থাকে। 'কী আলোচনা হচ্ছে রে? কোন বিপ্লব? রুশ না জার্মান?' আমরা হাসাহাসি করি। দেখতে দেখতে শর্বরীর পড়াশোনা নিয়ে উপদেশ দেওয়া, তাকে নিজের সংগ্রহের রেফারেন্স বইটই দেখানো শুরু হয়ে গেল। একদিন আমাকে আর হেনাকে নাদিরা ফিসফিস করে জানাল, 'বুঝলি, ভাইজান একটু শর্বরীতে ইন্ট্রেস্টেড।'

হেনা ইচ্ছে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'শুধু একটু!'

আমি ফোড়ন কাটি 'ধীরে রজনী ধীরে। সবুরে মেওয়া ফলে।'

দেখতে দেখতে হেমন্ত কাল। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে আসে। আফতাব বাড়ির গাড়ি বের করে আমাদের এগিয়ে দেয়। আমার ড্রপ গড়িয়াহাটে, সেখান থেকে হেঁটেই তেকোণ পার্কের কাছে বাড়ি যেতে পারি, হেনার গোলপার্ক, বালিগঞ্জ গার্ডেন্সের গলিতে আর গাড়ি ঢোকায় না। সব চেয়ে দূর শর্বরীর, নতুন পাড়া যোধপুর পার্ক। অর্থাৎ অনেকটা বেশি সময় একসঙ্গে কাটাবার সুযোগ মেলে দুজনের। এর মধ্যে মাঝে মাঝে আফতাবের সঙ্গে আসা তার দু একজন কলিগ, সুব্রত দত্ত, ওঙ্কার রক্ষিত। রীতিমতো নরক গুলজার। ওঙ্কারদা দারুণ জমাটি। কে বলবে আমলা। নিজেই বলে এ বাড়িতে আসে হাঁপ ছাড়তে, চাকরি আর বাইরের জগতের সিরিয়াস আবহ থেকে ছুটি ছুটি ছুটি। অনেক দমফাটানো রসিকতা কথাবার্তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে ওস্তাদ। আমরা সকলে খুব এনজয় করি। বিশেষ করে নাদিরা। তার সঙ্গেই যেন বেশি মিলমিশ। কিছুদিনের মধ্যে ওঙ্কারদার পদার্পণ মাত্রেই নাদিরা প্রবল উচ্ছ্বাসে তাকে কবজা করে গল্প জুড়ে দেয়। আমাদের মতো তারও যাতায়াত ঘন ঘন হতে থাকে। এখন হলিউডের ফিল্মের জায়গা নিল নাদিরার বাড়ি। ছবি যতই সবাক এবং সচল হোক, সে শুধু ছবি। চোখের সামনে রক্তমাংসের মানুষের নাটকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।

আমি ও হেনা বলাবলি করি, 'ওরে, আমরা কাবাব্‌মে হাড্ডি হয়ে যাচ্ছি। আমাদের কেটে পড়া দরকার।' কায়দা করে নানা বাহানায় কাটবার চেষ্টাও করি। কিন্তু ওদের কাছে আমাদের



উপস্থিতি ভীষণ দরকার, একটা যেন ধোঁয়াশার আড়াল।

এদিকে ফাইনাল পরীক্ষা আগতপ্রায়। আফতাবের আমাদের পড়াশোনায় দারুণ আগ্রহ। 'ক'মাস নো আড্ডা। শর্বরী মাস্ট গেট আ ফার্স্ট।'

আমি ও হেনা ডুয়েট গাই, 'আর আমরা তো ফেল্ করলেও ক্ষতি নেই, কেই-বা আমাদের নিয়ে মাথা ঘামায়।'

লাগসই জবাব, 'আরে তোমাদের কলেজের যা ম্যাসিভ রেপুটেশান, সক্কলে ভালো করবে।'

করি। জাস্ট পাঁচ নম্বরের জন্য ফার্স্ট ক্লাসটা মিস করে মেরিট লিস্টে সেকেন্ড হলো শর্বরী। সে সময়ে তো গণ্ডায় গণ্ডায় ফার্স্ট ক্লাস পেত না। অনার্সে ফিফটি পারসেন্ট তুলতেই কালঘাম ছুটত। এবার এমএ। তখন যাদবপুর সদ্য খুলেছে। ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের এমএটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতেই পড়ার কথা। শর্বরী বলল, 'যাদবপুরে নম্বর তোলা সহজ হবে, চল্ ওখানে ভর্তি হই।' আমরা জানি আসল কারণ যাদবপুর থেকে সুবিধাজনক দূরত্বে পার্কসার্কাস, কলেজ স্ট্রিটের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়। আমি ও হেনা সঙ্গে জুটি। দলছুট হয়ে নাদিরা গেল সি ইউতে।

ততদিনে আফতাব শর্বরী রিলেশান একেবারে কোয়ালিটির আইসক্রিমের মতো জমতে শুরু করেছে। আমাদের প্রবল উৎসাহ। একটা সামাজিক বিপ্লবে আমরা শামিল। বাঙ্গালি হচ্ছে জনজাতির মতো শুধু বর্তমানে বাসিন্দা একটি জাতি। দিনরাত রিফিউজিদের দুর্দশার পাঁচালি শুনতাম যার কারণ বলা হতো ব্রিটিশের বজ্জাতি, আমরা হিন্দু-মুসলমান ভারতে বরাবরই ভাইভাই, ওদেরই ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির জন্য পার্টিশান। আর বাঙ্গালি রিফিউজিদের দুর্দশার মূলে কেন্দ্র সরকারের বাঙ্গালি বিদ্বেষ। আমাদের শেখানো হতো সেই কবে তুর্কি আফগানরা আক্রমণকারী হিসেবে দেশে ঢুকেছিল বটে, কিন্তু তারা মোটেই ইংরেজদের মতো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ছিল না। কিছুকাল শাসনশোষণ করে বিদায় নেয়নি, এ মাটিতেই স্থায়ী বসবাস করেছে, অতএব এ দেশের মানুষ হয়ে গেছে। হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক বলেই দুটি গোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্ক, বিয়েথা হয় না।

এখন যে সব ক্ষেত্রে 'সেকুলার' শব্দটা ব্যবহৃত তখন সেখানে প্রচলিত ছিল 'উদার'। শিখেছিলাম আকবর বাদশা ভারী উদার মহৎ, রাজপুত রাজকন্যা বিয়ে করেছিলেন। এমন

উদার আমাদের গণ্ডির মধ্যে শুধু নজরুল আর হুমায়ুন কবির। মুসলমানদের মহত্বে উদারতায় আমরা মুগ্ধ। তুলনায় হিন্দুদের সংকীর্ণতায় লজ্জিত। অতএব শর্বরী আফতাব প্রণয়ে মদত দিতে আমরা কোমর বেঁধে লেগে পড়লাম। মাসিমাকে ফোন করে আমার বা হেনার শর্বরীকে নিয়ে অমুক সিনেমা দেখা কী তমুক জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার বাহানা দিই। অ্যালিবাই। ভাগ্যে শর্বরীর বোন চন্দ্রিমা রেজাল্ট তেমন ভালো না করায় আমাদের কলেজে চান্স পায়নি। একটা পাঁচাপাচি মেয়েদের কলেজে পড়ে। কাজেই দিদির কার্যকলাপ সম্বন্ধে তার কোনো ইনফো নেই। আমাদের ফাইনাল ইয়ারে আফতাব শিলিগুড়িতে পোস্টেড হয়ে চলে গেল। ওঙ্কার আলিপুরদুয়ারে।

'আহা রে' দু দু জোড়া বিরহকাতর প্রেমিক-প্রেমিকা।' ফাজিল হেনাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'কাপ এনে দে, চোখের জল ফেলি।' আফতাবের মতে অবশ্য ভালোই হলো, শর্বরীর, নাদিরার কনসেন্ট্রেশানে ব্যাঘাত হবে না। হল না। যথাবিধি পরীক্ষা সমাপ্ত। শিক্ষাপর্ব শেষ।



ছাত্র জীবনের পরবর্তী পর্যায়, কর্ম ও গার্হস্থ্য। পরিণয় প্রণয়ের স্বাভাবিক সামাজিক উত্তরণ। কে না জানে প্রেমের পূর্ণতার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। দুর্গম বন্ধুর। আমি ও হেনা আলোচনা করি, শহরে বাঙ্গালি মুসলমানের ক্ষুদ্র বৃত্তে শর্বরীর মতো শিক্ষিত পরিবারের মেধাবী পাত্রী বিরল। যেমন দুর্লভ আফতাবের মতো যোগ্য যুবক। হ্যাঁ কন্যার রূপের ঘাটতি আছে। তা ছেলেও তো কার্তিক নয়। বরং বলতে গেলে রঙে আর উচ্চচায় পাত্রপাত্রী মানানসই। আর মেধায় তো বটেই। যাকে বলে রাজযোটক। পরিবারের এক ছেলে, বিধবা মায়ের ভরসা। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে তার সুশীলা গুণবতী মেয়ে পছন্দে মা খুব অমত করবেন না। আর শর্বরীর ভাগ্যে ঘরসংসার নেই রায়চৌধুরী পরিবার ধরেই নিয়েছেন। রিলিজিয়ানের ভূমিকা আমাদের আধুনিক হিন্দু জীবনে কতটুকু।

একেবারে একসঙ্গে না হলেও কলকাতা আর যাদবপুর, দুটো বিশ্ববিদ্যালয়েরই রেজাল্ট বেরল শর্বরী হিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড, আমি ও হেনা যার যার সাবজেক্টে সেকেন্ড ক্লাসে প্রথম তিন জনের মধ্যে, নাদিরা উর্দুতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। পার্কসার্কাসের বাড়িতে আমাদের সেলিব্রেশান। নাদিরা জানাল তার আম্মিজান আমাদের সঙ্গে আলাপ করবেন।

'বুঝলি, উনি গম্ভীর মানুষ, হাহাহিহি করিস না।'

আমরা সেইমতো নিরীহ শান্তশিষ্ট মুখে বসে আছি। আম্মিজান ঢুকলেন। ঠিক যেন কালো জর্জেট শাড়িপড়া আফতাব। শুধু চুলটা মেহেদিতে লালচে বাদামি। সাধারণত বন্ধুর মাকে প্রথম আলাপে আমরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। করতেই যাই, 'এ কী এ কী , ও সব এখানে নেই', উনি যেন সভয়ে দু পা পিছিয়ে যান। অপ্রস্তুত আমরা ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে।

'আমরা খালি আল্লার কাছে সিজদা করি। আমাদের প্রণাম নেই, তোমরা জানবে কী করে। কোনো দরকার নেই। বস, বস।

তিনজন একটা সোফায় ঘেঁসাঘেঁসি করে বসি। উনি উলটো দিকে একটা সিংগল সোফায় বসেন। 'তোমাদের সঙ্গে এত দিন বাতচিত হয়নি। আসলে পায়ে দর্‌দ, সিঁড়ি ভাঙতে তকলিফ হয়। সকালে একবার নামি। এক তলায় রসুই আর খানা, একটা গেস্ট রুম এই ছোট কামরা ছিল ভিজিটর্স রুম। এ মকান আগে গমগম করত। বড়ো লেড়কির শাদি হয়ে চলে গেল পাকিস্তানে, এক লেড়কাও গেল। অন্যজন কারবার করে মালয়েশিয়ায়। এদের আব্বাজানের ইন্তেকাল হলো। এখন শুধু দুজন, নাদিরা আর আফতাব। কী নসিব। তোমরা জানো না এদের আব্বু পাণ্ডুয়ার মাজারের ফকিরের ওয়ারিশ। গাঁয়ে এঁদের কত ইজ্জত। আমার দিকই কী কমতি। সেই কবে বাবরের সঙ্গে যে নকশাবন্দি সুফি এসেছিলেন তার মুরিদ আমার নানার নানার নানা।

'থাক আম্মি, ওদের গুলিয়ে যাবে।' নাদিরা বাধা দেয়।

'না বললে বুঝবে কী করে কেন ফ্যামিলির এত লোক পাকিস্তানে আর আমরা হিন্দুস্তানে পড়ে আছি। আমরা লিগ সাপোর্টার ছিলাম কিন্তু বাঁটোয়ারার পর পাকিস্তানে চলে গেলাম না। আমাদের মুরশিদ মানে তোমরা যাকে গুরু বল, তিনি বললেন, পশ্চিম বাঙ্গালে রয়ে যেতে, এখানে ইসলামের অনেক কাম বাকি।'

'চুপ আম্মি চুপ। ভাইজান মানা করেছে না তোমাকে ও সব বাত তুলতে। বলে দেব কিন্তু।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে। বাব্বা, তোমরা দেখছ লেড়কি কেমন মাকে শাসন করছে।' অতঃপর আমাদের নাম, ধাম, পিতৃ পরিচয়, বাড়িতে শাদির চেষ্টা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিশদ সমাচার তাঁর জানা হলো। পুরোটাই একতরফা আলাপ। আমরা শুধু জবাব দিয়ে যাচ্ছি। নোকরানির দ্বারা পরিবেশিত রকমারি পাকৌরা, কাবাব ও ফিরনি। উনি উঠে গেলে নাদিরা বলে, 'আব্বু মারা যাওয়ার পর থেকে আম্মির ওই রিলিজিয়ন বাই হয়েছে। তোরা কিছু মাইন্ড করিস না।'

'মাইন্ড করবো কেন, এটা তো কমন ব্যাপার। আমাদের সমাজেও বিধবারা ধর্ম নিয়ে থাকে। ঠাকুমাকে দেখেছি। দিনের

অর্ধেক সময় ঠাকুরঘরে।' শর্বরী দিব্যি হাসি মুখে বলে।

আমি আর হেনা চুপ করে থাকি। দুজনেরই মনে খটকা লেগেছে। এতকাল আমরা শুধু নাদিরা আর আফতাবের কথাই শুনেছি। ওদের যে বিশাল পরিবার, এতগুলি ভাই-বোন, তারা যে পাকিস্তানি, সে সব কিছুই জানতাম না। স্পষ্টবক্তা হেনা সরাসরি বলেই ফেলে, 'আচ্ছা, নাদিরা তুই তো কখনো তোর এতসব দিদি দাদাদের কথা বলিসনি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম তুই, তোর ভাইজান আর আম্মিকে নিয়েই তোদের ফ্যামিলি।'

'প্র্যাকটিক্যালি তাই রে। দাদা দিদিরা সব আমাদের দুজনের চেয়ে অনেক বড়ো, সেই কবে দেশ ছেড়েছে। বড়ো দিদির পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের অফিসারের সঙ্গে শাদি হয়েছিল। ক'বছর পর তালাক, হাজব্যান্ডেরই পাঞ্জাবি কলিগকে সেকেন্ড শাদি। সেই সেকেন্ড দুলাভাইয়ের কথাতেই জাফর ভাই পাকিস্তানে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে সিভিল সার্ভিস পেল। তারপর তার বোনকে শাদি করে পুরো পাঞ্জাবি বনে গেছে। বেশিরভাগ সময় থাকে রাওয়ালপিণ্ডিতে, মানে যার কাছে নতুন ক্যাপিটল ইসলামাবাদ হচ্ছে। মেজো দিদি পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের অফিসারের বউ, বদলির চাকরি, বাকি জন ঢাকায় হোটেল মালিকের বিবি, দিনরাত খান আর মিঞাদের খাতির করে চলে। সবচেয়ে বড়ো ইকবাল ভাইজান তারও আগে কায়রো চলে গিয়েছিল আল আজাহার নামে খুব ফেমাস মাদ্রাসায় ইসলামে হায়ার স্টাডিজ করতে। বেশি দূর এগোতে পারেনি। ওখানকার আরবি খুব হাই স্ট্যান্ডার্ডের তো। এখানে মুসলিম লিগের ইসলামি বুলি কপচানো যত সোজা, ওখানে আসল ইসলামের শাস্ত্র নিয়ে পড়া আদৌ তত সহজ নয়। পড়াটড়া শিকেয় তুলে পিঠটান। কী একটা কানেকশান জুটিয়ে সেখান থেকে কুয়ালালামপুরে গিয়ে ব্যবসা। আসলে বাপদাদা তো সব কারবারি ছিল, রক্তে আছে বিজনেস। টিন না রাবার, কিসে জানি দিব্যি সেটল্ করেছে। তার বিবি আবার ইজিপশিয়ান। জানিস আমার ছোটোবেলায় একবার এসেছিল, কী ভয়ংকর নাক উঁচু ভাবতে পারবি না। সবসময় মুখ বেঁকিয়ে বলত 'ইন্ডিয়ানদের ইসলামের কালচার, ট্র্যাডিশান কিছুই নেই। আরবি ঠিকমতো উচ্চারণই করতে পারে না।' যেন মেহেরবানি করে ভাইজানকে শাদি করেছে। পরে দেখা গেল চিঠিফিঠি লেখারও টাইম নেই মিঞাবিবির। আর দিদিরা কলকাতায় আসত শুধু পাগলের মতো নিউ মার্কেটে শপিং করতে আর ইংলিশ হিন্দি সিনেমা দেখতে। আব্বু ভীষণ রাগ করতেন। তাই আস্তে আস্তে তাদের সঙ্গেও কমিউনিকেশান কমে গেল। আব্বু মারা যাবার পর প্রায় নেই।'

'আর তোদের আম্মি কিছু বলতেন না?'

'আসলে ওরা আমাদের নিজের ভাই-বোন নয়, আব্বুর ফার্স্ট ওয়াইফের চিলড্রেন।'

'তিনি মারা গেলে তারপর বুঝি তোর মাকে শাদি করেন বাবা?'

'না না, তালাক দিয়েছিলেন। আম্মিরও আগের শাদির দুটো ছেলে আছে, ঢাকাতে তাদের আব্বার সঙ্গে থাকে।

আম্মিজান আর আব্বু কাজিন, মাসতুতো ভাই-বোন। বরাবরই আশনাই ছিল। কে জানে কেন বাড়ি থেকে দুজনকে অন্য জায়গায় শাদি দিয়েছিল। আম্মির ফার্স্ট হাজব্যান্ডের ইস্টবেঙ্গলে অনেক জমিটমি ছিল, ঢাকার নবাবদের ক্লোজ রিস্তেদার। এদিকে বড়ো আম্মি ছিলেন পাটনার মেয়ে, খুব সুন্দরী। দেখ্ টাকাতে আম্মির আর রূপে আব্বুর মন ভরল না। দুজনেরই তালাক হয়ে গেল। পহেলা মোহব্বত বলে কথা।'

আমি আর হেনা কাষ্ঠহাসি হাসি। হঠাৎ যেন একটা অন্য দুনিয়ায় এসে পড়েছি। রীতিমতো অস্বস্তিকর। বেরিয়ে এসে সে কথা বলতে শর্বরী খুব রাগ করে।

'জানিসই তো মুসলমানাদের মধ্যে তুতো ভাই-বোনে বিয়ে হয়। বরং কেমন জেন্ডার ইকোয়ালিটি দেখ। দুজনেরই একাধিক শাদি, দুজনেরই তালাক, শেষে পছন্দমতো দ্বিতীয় বিয়ে। হিন্দুদের মধ্যে এঁদের জেনারেশানে কেন এখনো ভাবা যায় না। আমার খুব ফ্রি সোসাইটি মনে হলো।'

হেনা টিপ্পনী কাটে, 'তোর বটে সার্থক প্রেম, সেন্সিবিলিটিও বদলে গেছে। তা কবে তোরা অফিসিয়েলি জোড় বাঁধবি?'

আফতাবের প্ল্যান ওদের ঘনিষ্ঠতার খবর শর্বরী তার বাবা মাকে আগে জানাক, তারপর সে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবে। 'কেন, তুমি আগে তোমার ফ্যামিলিতে বল।' শর্বরী নার্ভাস।

'আরে আমার ফ্যামিলিতো অলরেডি জানে।'

'তবু, আম্মির পারমিশান নিতে হবে না?'

'ওটা স্রেফ ফরম্যালিটি। বরং তোমার ফ্যামিলির পক্ষে এটা সারপ্রাইজ হবে, পারহ্যাপস আ শক্।'

শর্বরীর মা কেঁদেই ফেললেন, 'ভগবান, এ কী করলে। ওরে ময়মনসিং আর পাবনায় আমাদের দুজনের পরিবারের জমিদারি ছিল। তোর বাবা খাওয়া পরার জন্য চাকরি নেননি। লেখাপড়া শিখে বড়ো সরকারি চাকরি করে যোগ্যতা দেখাতে। শুধু প্রেস্টিজের জন্য। পার্টিশানের সময় যখন গভর্ণমেন্ট অপশান দিল হিন্দুস্থান না পাকিস্তান কোথায় থাকতে চাই, আমরা চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি জমিজায়গা সব ছেড়ে দিয়ে ইন্ডিয়া অপশান দিলাম। কেন? শুধুমাত্র ধর্ম বাঁচাবার জন্য। যে পাকিস্তান থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে শুধু ধর্মের জন্য পালালাম সেই পাকিস্তান আজ ঘরের মধ্যে। তুই না রোজ লক্ষ্মীনারায়ণকে জলবাতাসা দিস, ঠাকুমার কাছ থেকে পুজো করতে শিখেছিস? কোথায় থাকবে তোর ঠাকুর? এই তোর পরিবার, সমাজ, দেশ সম্বন্ধে বোধবুদ্ধি! এত শিক্ষা পেয়ে...'

প্রথম ধাক্কা সামলানোর পর বাড়তি জ্ঞানদান। জন্ম থেকে

তিনি দেখেছেন গ্রামে মুসলমানদের পাড়া পৃথক, মুসলমান পুরুষদের সামনে উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েদের বেরনো পর্যন্ত নিষেধ। বাড়িতে মুসলমান অতিথি এলে আলাদা রাখা বাসনে আপ্যায়ন ছিল স্বাভাবিক। বিয়েথাতে তাদের বাড়িতে খাবার প্রশ্ন উঠত না। তাঁরা সিধে পাঠাতেন। আজকাল ধর্মের ভেদ মানা হয় না, সব সেকুলার। বলি ক্ষতিটা কাদের হচ্ছে। আরে বাবা দেওয়ালটা ভাঙার আগে একবারই কেউ ভাবল না দেওয়ালটা আদৌ কেন তোলা হয়েছিল।

বাবা কঠোর মুখে প্রশ্ন রাখেন সে কি জানে না যার ভিত্তিতে পাকিস্তান, দেশভাগ, সেই ইসলামের হাজার বছর ধরে কী কীর্তি, সমস্ত জাতির উপাসনালয় ধ্বংস করেছে এরা। শুধু হিন্দু বৌদ্ধ জৈনদের মন্দির নয়, খ্রিস্টানদের গির্জা, পার্শিদের আগিয়ারি, কিছু বাদ যায়নি এদের বর্বরতা থেকে। অস্ত্র আর কোরান হাতে আরব তুর্কিদের দেশে দেশে অভিযানে কত সভ্যতা বিলুপ্তির পথে।

আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের ছাত্রী শর্বরী স্তম্ভিত, 'নাৎসি জার্মানদের ইহুদি বিদ্বেষের মতো তোমাদের মজ্জাগত মুসলমান বিদ্বেষ।'

বাবা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। 'বাহ্ এই তোমার জ্ঞানের নমুনা? জার্মানিতে ইহুদি আর ভারতে মুসলমানদের এক স্টেটাস ভাবতে পারছ কোন ইতিহাসের সুবাদে? কবে ইহুদিরা ইউরোপের কোনো দেশ আক্রমণ করেছে? ইহুদিদের মধ্যে সুলতান মাহমুদ, মহম্মদ ঘোরি, বখতিয়ার খিলজি, তৈমুল লং, বাবর, নাদির শাহ, হয়েছে? খ্রিস্টাদের ক'টা চার্চ ইহুদিরা ভেঙেছে? ক'টা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে, ক'টা লাইব্রেরি পুড়িয়েছে? কতজন খ্রিস্টানকে তারা ধর্মান্তরিত করেছে? কী হল, চুপ করে আছ কেন, জবাব দাও।'

শর্বরীর শান্ত প্রতিক্রিয়া, 'তোমরা হিন্দুরা হচ্ছ ফসিল, অতীতে বন্দি। কবে বেরবে?'

'অতীত বাদ দিয়ে বর্তমান হয়? অতীতের জন্যই তো দেশভাগ হল। পাঁচশো বছর ধরে সুলতানি, বাদশাহি আমলে সংখ্যালঘু মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর অস্তিত্বের ওপর একচ্ছত্র দাপট ছিল। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর শাসন হবে। যারা শতশত বছর ছিল শাসক তারা কেন শাসিত হবে। তাই মুসলিম লিগের ডিমান্ড মুসলমানদের জন্য ভিন্ন হোমল্যান্ড নিজস্ব ভূমি চাই। বাঙলার মুসলমানরা ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে লিগকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে মত দিয়েছিল। যার জন্য ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সালে কলকাতায় লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, পড়নি? নোয়াখালি জেনোসাইড জানো না, যা গান্ধীও বন্ধ করতে পারলেন না? সেখান থেকে বিহার হয়ে সারা ভারতে দাঙ্গা ছড়িয়ে গেল এবং তাই পরের বছর পার্টিশান হলো।

পার্টিশানের দাবিতেই বাঙলা থেকে শুরু দাঙ্গা। চারিদিকের রিফিউজি এই দীর্ঘ ইতিহাসের ফসল। আমাদের অতীত মনে রাখাটা আশ্চর্য নয়। আশ্চর্য তোমাদের এমন ভুলে যাওয়া।'

শর্বরী বলতে চেষ্টা করে স্বাধীন ভারত সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে। আফতব হোসেন নামে কলকাতার এক শিক্ষিত মুসলমান যুবক ইসলাম মতাবলম্বীদের অতীত সব কুকীর্তির জন্য দায়ী নয়। সে ও আফতাব আধুনিক ভারতের নাগরিক, যথেষ্ট শিক্ষিত, যোগ্য দায়িত্বশীল দুটি নারী-পুরুষ, দুটি ব্যক্তি যারা পরস্পরকে চায়। পরস্পরের সান্নিধ্যে তাদের সুখ। মানুষ মাত্রেরই সুখী হওয়ার অধিকার আছে।

'পরিবার সমাজ দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুখ! ব্যক্তি মাত্রেই কোনো সমাজের একজন। কেউ সমুদ্রে একাকী দ্বীপ নয়, নো বডি ইজ অ্যন আইল্যান্ড। চিন্তা করে দেখ।'

অতঃপর কতগুলি সেশান। প্রথমটা শর্বরী স্টার্ট করে। মা, ছোটো মেয়ের জন্য কবে থেকে পাত্র। খোঁজা শুরু করেছেন। আর বড়ো মেয়ের বেলা? চেষ্টার নামও করেন না। তাহলে সে নিজে পাত্র বাছবে না কেন, কোনো যুক্তি আছে। তার কি স্বামীসংসার চাইবার অধিকার নেই।

নিশ্চয় আছে। প্রত্যেক বাবা-মাই চায় মেয়ে তাদের কাছে যে স্ট্যান্ডার্ডে যে কালচারে মানুষ, বিয়ের পর যেন তার সঙ্গে মানানসই সংসার হয়। আমাদের দেশে সম্বন্ধ করা বিয়েতে চেহারাটা বড়ো ফ্যাক্টর। তার ওপর তাঁরা আধুনিক, পণটনের মধ্যে নেই। আবার যার তার হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়াও সম্ভবপর নয়। তাই বিয়ে যেখানে সমস্যা, সে ক্ষেত্রে বরং বিয়ের বাইরে মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সব উপায় আছে তাঁরা সে সবই তার ভবিষ্যতের জন্য ভেবেছেন। বিয়েটা আজকাল মেয়েদের একমাত্র ভবিতব্য হতে পারে না। তাহলে এত পড়াশুনার মূল্য কী! আর্থিক স্বাবলম্বন, পুরুষের মতো কেরিয়ারে সার্থকতা খোঁজা কি যায় না? তার চোখের সামনে কত শিক্ষিকা অধ্যাপিকা লেডি ডাক্তার দেশনেত্রী শুধুমাত্র নিজেদের পরিচয়ে সকলের শ্রদ্ধা সম্মানের আসনে। নিজেদের সাফল্যে তাঁরা কি সুখী নন? বিবাহ, সন্তান, সংসারের বাইরে কি মেয়েদের সুখের ক্ষেত্র নেই, এমন দৃষ্টিভঙ্গি কি সময়োপযোগী?

দ্বিতীয় সেশান আরম্ভ করেন বাবা মা : একটা কথা বুঝতে শর্বরী চেষ্টা করুক। তাঁরা আফতাব হোসেনের শত্রু নন, তার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। বিয়ে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, তার নিজের সমাজে সে নিশ্চয় সুপাত্র। সে সেখানে বিয়ে করুক। শর্বরী তার বন্ধু থাক। কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এ সমাজে তার স্থান নেই। যেমন শর্বরীরও স্থান নেই তার সমাজে।

শেষমেশ : শর্বরী সাবালক, উচ্চ শিক্ষিত, নিজের

ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। তার বিয়েতে বাধা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, তাতে লোকহাসানো ছাড়া আর কোনো ফল নেই। খালি একটা অনুরোধ। ছোটো বোনের বিয়ে পর্যন্ত দয়া করে অপেক্ষা করুক। ওর অনেক সম্বন্ধ আসছে। বেশি দেরি হবে না।

শর্বরী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। 'বেশ তো। আফতাবকে বলছি। ও তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

বাবা গম্ভীর গলায় বলেন, 'কী লাভ। আমাদের পছন্দ অপছন্দের কোনো ভূমিকা এক্ষেত্রে নেই। তার সঙ্গে আলাপ চন্দ্রিমার বিয়ের পর হবে। আই অ্যাম শিওর সে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে রজি হবে।'

'হ্যাঁ, হবে। তোমরা কী ভাবছ জানি না। ওদের সমাজে ও দারুণ সুপাত্র। আমার রূপ তো এই, আমাকে বিয়ে করে পয়সাকড়ি লাভেরও প্রশ্ন নেই। কেন সে আদৌ বিয়ে করতে চায় যদি সত্যি আমার প্রতি আন্তরিক কোনো টান না থাকে?'

বাবা তাঁর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, 'তোমাকে সে বিয়ে করতে চায় একটিই কারণে, তুমি হিন্দু বলে। এ বিয়ের ফলে একজন হিন্দু নারী হিন্দু সন্তানের বদলে মুসলমান সন্তান জন্ম দিয়ে ইসলামের আধিপত্য বৃদ্ধি করবে।'

'এটা তোমাদের একেবারে ভুল ধারণা। ধর্মের কোনো রোল্‌ই নেই আমাদের সম্পর্কে। আমরা পরস্পরকে ব্যক্তি হিসেবে ভালোবাসি, কারো ধর্মকে নয়। আমি কোনোদিন মুসলমান হব না। কোনোদিন লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা ছাড়বো না।'

বাবা মৃদু হাসেন, 'তোমার ওপর রাগ করা বৃথা। তুমি করুণার পাত্রী। তবে একদিন না একদিন ভুল বুঝতে পারবে। তখন তোমার ফেরার পথ থাকবে না। যাক, বাড়িতে আর এ বিষয়ে কোনো আলোচনা চাই না।

সেপ্টেম্বর মাসের প্যাচপেচে গরম/ তবু যাদবপুর ক্যাম্পাসে খোলা জায়গা থাকায় সহনযোগ্য। একটু নির্জনে বসে শর্বরীর বৃত্তান্ত আমি ও হেনা শুনছি। আমাদের প্রতিক্রিয়া, 'সত্যি এডুকেটেড হিন্দুরা পর্যন্ত কী কমিউনাল, ভাবতে লজ্জা করে। একেবারে অন্ধ বিদ্বেষ, ইসলামফোবিয়া, ছিঃ ছিঃ।'

শর্বরীর চোখ ছলছল। 'আফতাবের কাছে মুখ দেখাব কী করে বলতো? ও তো প্রায়ই ফোন করে, জানতে চায় বাড়িতে বলেছি কি না, কী রিঅ্যাকশান। ট্রাংক কল, দুচার কথায় ভাসা ভাসা জবাবে সেরে দিই। এই উইক এন্ডে আসবে। মুখোমুখি কী বলব?'

প্র্যাকটিক্যাল হেনার পরামর্শ, 'শোন ওসব সুলতান মামুদ টামুদ চেপে যা। এডিট কর, হিস্ট্রিফিস্ট্রি গুলি মার। খালি বলবি, সারপ্রাইজ তো, একটু শকড্, তবে আমি সাবালিকা আমার পছন্দে বাধা দেবেন না, শুধু চান চন্দ্রিমা মানে আমার ছোটো বোনের বিয়ে পর্যন্ত যেন আমরা বিয়েটা পিছিয়ে দিই।'

আমি যোগ করি, 'ফ্যামিলিতে একজন বেজাত ফেজাত এদিক ওদিক বিয়ে টিয়ে করতে বসলে আগে অন্যদের তড়িঘড়ি যথাবিধি পার করা খুবই ইন থিং।' মনে করাই নাদিরা ওঙ্কার কেসের অবস্থা আরো খারাপ। নাদিরার সঙ্গে অনেক কাল শুধু টেলিফোনে যোগাযোগ। ওই আগ বাড়িয়ে আমাকে ফোন করে জানাল ওদের ভাবভালোবাসার খবরে ওঙ্কারের বাড়িতে নাকি তুলকালাম, বাবা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন, মা বলেছেন মুসলমান বউ বাড়ি ঢুকলে তিনি গলায় দড়ি দেবেন। 'সত্যি তোরা হিন্দুরা কী ভয়ংকর কমিউন্যাল। সাধে কী আর পার্টিশান হয়েছে।"

লজ্জায় আমাদের তিনজনের মাথা হেঁট। তাই ওর সঙ্গে বেশি যোগাযোগ রাখি না। পাছে হিন্দুদের আরো কী নষ্টামির কাহিনি শুনতে হয়।

মুসলমানদের নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। এইতো শর্বরীর বাবা-মায়ের সিদ্ধান্ত জানা মাত্র আফতাব সানন্দে প্রতীক্ষায় রাজি। 'সাধারণত হিন্দু মুসলমান বিয়ের প্রস্তাব থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। তোমার বাবা-মা খুবই কনসিডারেট বলব। ব্যস। আর চিন্তা নেই। এবার কলেজে কাজের জন্য লেগে পড়।'

সত্যি, এত আধুনিক প্রগতিশীল আফতাবভাই। আমাদের সমাজে কত পুরুষ আজও মানে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে পর্যন্ত স্ত্রীর ঘরের বাইরে চাকরি করা চায়ই না, বিশেষত তেমন টাকার দরকার না থাকলে। আমি ও হেনা মুগ্ধ। 'শর্বরী তুই খুব লাকি।'

অথচ চাকরিক্ষেত্রে লাক্‌টা মোটেই ফেভার করল না। নিজেদের কলেজেই হিস্ট্রিতে ভ্যাকেন্সি ছিল, কিন্তু লেকচাররের পোস্টের জন্য এই মুহূর্তে পি (পাবলিক) এস (সারভিস) সি (কমিশন)-এর কোনো বিজ্ঞাপন নেই। তবে অ্যাড্‌হকে তো অনায়াসে নিতে পারে। ওমা, অফিস থেকে বলে কিনা যাদবপুর ভুঁইফোঁড় ইউনিভার্সিটি, তার ফার্স্ট ক্লাসের চেয়ে কলকাতার হাই সেকেন্ড ক্লাসেরও বাজার দর বেশি। কলেজ নিজেদের ছাত্রী বলে রাইটার্সে বলেকয়ে অ্যাডহকে নিলেও পরে পিএসসি রিজেক্ট করে দেবে। কী পার্শিয়ালিটি। অতএব প্রাইভেট কলেজে অ্যাপ্লাই করা শুরু। ওর সঙ্গে আমিও। হেনা সোজা বি এড পড়তে ঢুকে গেল। যতদিন না বিয়ে হয়, স্কুলে কাজ করতে পারে, কলেজে ফিলজফির কোনো ডিমান্ড নেই। পল সায়ান্স তখন নতুন সাবজেক্ট, পপুলার। আমিই আগে উইমেনস কলেজে কাজটা পেয়ে শর্বরীকে বলি অ্যাপ্লাই করতে। নাদিরা দিব্যি ইউনিভার্সিটিতে কাজ জুটিয়ে ফেলে।

কলেজের স্টাফ রুমে একান্ত পরিসরের অভাব। ছাত্রীদের মতো প্যাসেজে, বাইরে পের্টিকোতে বা গেটের মধ্যে খালি জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা অধ্যাপিকাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। শর্বরী আর আমার আড্ডা আগের মতো জমে না।

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

Phones : Fac : 2222224, 2222225, 2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

এখন আমরাই ক্লাস নিই, আর ক্লাস কেটে হলিউডের ফিল্ম দেখার প্রশ্ন নেই। নাদিরার বাড়িও আর পায়ে হেঁটে পৌঁছানোর দূরত্বে নয়। ছাত্রজীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সবই কেমন বদলে গেল। চারিপাশে বয়সে বড়ো সহকর্মিণী, যারা সংসার ও চাকরি দু নৌকোয় পা দিয়ে জীবনসাগরে ভেসে থাকতে হিমসিম। তাদের প্রধান মাথাব্যথা দুটি ক্ষেত্রকে মেলানোর। আমাদে কাজ যাদের নিয়ে তাদের বেশিরভাগই চন্দ্রিমার মতো বিয়ের বাজারে দর বাড়াতে ডিগ্রির জন্য আসা অগণিত উদাসীন ছাত্রীর দল। তাদের সামনে বকবক করে, দিস্তা দিস্তা নোট ডিকটেট করে সিলেবাস গুলে খাওয়ানো, দিস্তা দিস্তা খাতা দেখা হচ্ছে অধ্যাপনার বাস্তব। কিছুদিনেই তেতো হয়ে যায়।

এরই মধ্যে স্টাফরুম ফাঁকা থাকলে চাপা গলায় বলি, 'ওদিকের কী খবর রে?' শুনি চন্দ্রিমার বিয়ে ঠিক, দারুণ আয়োজন চলছে, পাত্র ও তার পরিবারের গুণগানে মাসিমা পঞ্চমুখ। মেসোমশাইয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'একেবারে আমাদের উপযোগী।' অর্থাৎ শর্বরীর নির্বাচিত পাত্রের অনুপোযোগিতা অনুচ্চারিত থেকেই বাড়ির আবহে পরিব্যাপ্ত। চন্দ্রিমার জন্য বেনারসি কাঞ্জিভরম শাড়ি, সনাতন সোনা থেকে হাল ফ্যাশনের জরোয়া গহনা, কাঁসা ও রুপোর সঙ্গে সদ্য ওঠা স্টিলের বাসন ইত্যাদি কেনাকাটায় মায়ের প্রাণশক্তি অফুরন্ত। বারংবার আবৃত্তি, 'একবারই তো করা। যথাসাধ্য করতেই হয়।' যেন শর্বরী নামে তার আর কোনো কন্যা নেই, যেন তারও বিবাহ আসন্ন নয়, যেন বাবা-মায়ের কাছ থেকে তার কোনো কিছু প্রাপ্য নেই। হ্যাঁ, চন্দ্রিমার বিয়ের অনুষ্ঠানে পরার জন্য একটা ধূসর রঙের সবুজ পাড় সাউথ ইন্ডিয়ান পিওর সিল্ক শর্বরীর প্রাপ্তি হয়েছে, ব্রাইট রঙে তোকে মানায় না। তাছাড়া সোবার গ্রে কালার বেশি বয়সেও পরতে পারবি।' মায়ের পুরনো ঘিয়ে রঙের বেনারসির সঙ্গে অপছন্দের কঙ্কন জোড়া আর আদ্দি কালের মটরমালাটাও পালিশ করানো হয়েছে। বরপক্ষের রিসেপশানে সে পরবে।

শুনতে শুনতে সান্ত্বনা দিই, 'দেখ, এমনিতেই তো তুই শাড়ি গয়নায় ইন্ট্রেস্টেড নস। মনে আছে কী ক্যাবলার মতো ড্রেস করতিস? আমি আর হেনাই তো তাকে শিখিয়ে শিখিয়ে পদের করলাম। তাও আমাদের তুলনায় তুই তো কিছুই সাজিস না। তাহলে মিছিমিছি মন খারাপ করছিস কেন। বি লজিক্যাল। আর আফতাব ভাইও ড্রেসট্রেস সম্বন্ধে বিশেষ কনশাস বলে মনে হয় না। কখনো তোর চেহরা, পোশাকআশাক নিয়ে কোনো কথা বলে না, তাই তো? ও ঠিক তোরই মতো। একেবারে ইন্টেলেকচুয়েল জগতে বিচরণ দুজনের। ইউ টু আর মেইড ফর ইচ আদার।'

চুপ করে থাকে শর্বরী। 'সবই জানি তবু মনটা বড়ো খারাপ রে। জিনিসের জন্য নয়। মায়ের এই যে অনাদর। বাবা পর্যন্ত যেন অন্য লোক হয়ে গেছেন।'

'ধৈর্য ধর। আর কিছু দিনের মধ্যেই তোর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জাস্ট আ ম্যাটার অফ টাইম।'

চন্দ্রিমার বিয়ে হয়ে গেল। হানিমুন শেষে পিতৃগৃহে কিছুকাল কাটিয়ে অবশেষে তার শ্বশুর বাড়ি এবং স্বামীর কর্মক্ষেত্র বম্বেতে সংসার পাতা। বম্বে তখনো মুম্বাই হয়নি। কলেজে আমরা স্থিতু। বাবা-মা আমার বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অবিরাম পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক ইন্টারভিউ এবং কেনো এক পক্ষের অন্যকে বাতিলের প্রক্রিয়া পুরোদমে চালু। শর্বরীর সঙ্গে কথাবার্তার সময়ই পাই না। তবে জেনেছি আফতাবের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা পরের ধাপ অতিক্রান্ত, এখন পার্কসার্কাসের বাড়িতে আমার ও হেনার উপস্থিতিহীন একান্তে দেখাসাক্ষাৎ। একতলায় বন্ধ গেস্ট রুমটি খুলে সাফসুতরো করে রাখা হয়েছে। নির্জন দুপুরে দুটি যুগলের অভিসার। শর্বরী আফতাব বা নাদিরা ওঙ্কারের মিলন।

আমার যে একটু কিন্তুকিন্তু লাগেনি তা নয়। বিয়ের আগেই সব সেরে ফেলল, পরে শুধু আলুপটল ঝি চাকর এবং চ্যাঁভ্যাঁ!

এদিকে দেওয়ালেরও চোখকান আছে। হাওয়ায় গুজব ভাসে। একদিন দুজন সিনিয়র কলিগ আমাকে আলাদা করে ডেকে বললেন, 'কিছু মনে কর না একটা কথা বলব? তোমার বন্ধু হিস্ট্রির শর্বরী রায়চৌধুরী নাকি কে একটা মাইনরিটি ছোকরার সঙ্গে রীতিমতো আফেয়ার করছে?'

'দেখুন, ভদ্রলোক ঠিক 'কে একটা' নন, স্টেট সার্ভিসের উঁচু পদে আছেন, ওদের সম্পর্ক সিরিয়াস, বিয়ে করবে, সব ঠিক হয়ে আছে। দুপক্ষের ফ্যামিলিও জানে।'

'জানলেই ভালো। এ কলেজের গভর্নিং বডির মেম্বাররা সব খুব ট্র্যাডিশানাল, মেয়েদের সামনে একটা আনডিজায়ারেবল্ মডেল ভাবতে পারেন।' একজন বলেন।

অন্যজন যোগ করেন, 'এত ভালো রেজাল্ট করা মেয়ে, পড়ায়ও শুনি যত্ন করে। কী করে যে ফেঁসে গেছে। কষ্ট হয়। বেচারা।'

যেন শর্বরী কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত।

'এবার তোরা বিয়েটা সেরে ফ্যাল। কানাকানি শুরু হয়ে গেছে।' সুযোগমতো শর্বরীকে জানিয়ে বলি।

'আমরাও ভাবছিলাম। আসলে কাছাকাছি, আলিপুরে বা বারাসতে একটা পোস্টিঙের জন্য খুব চেষ্টা করছে। নেক্সট যেদিন মিট্ করব সেদিনই ফাইনালাইজ করে ফেলা হবে।'

ক'দিন বাদে রাতে বাড়িতে শর্বরীর ফোন। আজকাল আমাদের যোগাযোগ অনেক কমে গেছে। কলেজে দেখাসাক্ষাতের অবকাশ এবং পরিসরের অভাব। বাড়িতে ক্লাস লেকচারের প্রিপারেশান, খাতা দেখা ইত্যাদিতে ব্যস্ত। আগের

মতো ফোনে আড্ডারও সময় নেই। ফোন পেয়ে অবাক হই, 'কী ব্যাপার রে?' চাপা গলায় যেন ঊর্ধশ্বাসে বলে, 'তোর সঙ্গে খুব জরুরি দরকার। কাল তোর ক'টায় ক্লাস শেষ? তিনটেয়? আমার তিনটে পঁয়তাল্লিশে। ওয়েট করিস। একসঙ্গে বাড়ি ফিরব তখন কথা হবে। ফোনে বলা যাবে না, কলেজেও না।'

শর্বরীকে দেখে পরদিন অবাক, যেন ঝড় বয়ে গেছে। 'এ কী রে! সারা রাত ঘুমটুম হয়নি নাকি শরীর খারাপ?'

প্রশ্নের জাবাব না দিয়ে বলে, 'আয় একসঙ্গে যাই। রাসবিহারীতে নামবো।'

'আমাদের বাড়ি চল না, ওখানে বসা যাবে।'

'না না, বাড়িটাড়ি নয়।' অতঃপর সারা রাস্তা চুপচাপ। দেশপ্রিয়র স্টপে নামি। পার্কে গিয়ে বসি দুজনে। 'বল, কী ব্যাপার।'

যথারীতি গত শনিবার দুপুরে শর্বরী আফতাব অভিসার। আফতাবকে বিয়ের কথা বলতেই সে সোৎসাহে জানায় তার আম্মির ইচ্ছে ছেলে মেয়ে দুজনের শাদি একসঙ্গে হোক। 'বুড়ি পয়সা বাঁচাতে চায়, লোক খাওয়ানোয়', হাসতে হাসতে বলে আফতাব।

'সেটা দোষের নয়। অযথা ধুমধাম, রোশনাই, আম জনতার জন্য এলাহি ভোজ আমাদের মতো গরিব দেশের মারাত্মক রোগ। কোনো মানে হয়!'

সামনে ডিসেম্বর মাস, অনুষ্ঠানের পক্ষে আইডিয়েল। দিন বাছতে বসে দুজনে। কার কী ছুটি পাওনা, কবে নিলে আফতাবের অফিসে, শর্বরীর কলেজে সুবিধা। কনের বিয়ের পোশাক এঁরা পাঠাবেন, সেটাই মুসলমানি রীতি।

পুঙ্খানুপুঙ্খ প্ল্যানিং চলে। বিদায়ের আগে আফতাব বলে, 'শাদির আগে একটা ছোটো ফরম্যালিটি আছে। তোমার মুসলমান হওয়াটা সেরে নিতে হবে। মৌলবি সাহেব আসবেন। সমাজের দু'চারজন বিশিষ্ট লোক ডাকবো ভাবছি।'

'মুসলমান হবো, কেন? এমন কথা কোনোদিন তো আগে হয়নি।' শর্বরী একেবারে বজ্রাহত।

'হিন্দু-মুসলমান বিয়েতে জানা কথা হিন্দুকে কনভার্টেড হতে হয়। চিরকাল তাই হয়ে এসেছে।'

'চিরকাল মানে?'

'মানে যেদিন থেকে মুসলমানরা হিন্দু বিয়ে করছে, সেতো প্রায় হাজার বছর হতে চলল।' সে কী! এই যে হিন্দি ফিলমে দেখি আকবরের রাজপুত বেগম নিজের মহলে পুজোআর্চা করে ভক্তিভরে বাদশাহকে প্রসাদ খাওয়াচ্ছেন!'

আফতাব হোহো করে হেসে ওঠে।' আরে ওটা তো কূটনীতি। পরাজিত জাতির নারীর দ্বারা বিজেতার সন্তান জন্মদানের অধিকার অফিসিয়ালি প্রতিষ্ঠা করে তুর্কি বিজয়কে স্থায়ী করলেন। এ দেশের মাটিতে তৈমুরের বংশের সাম্রাজ্যে একেবারে গ্রানাইটের ভিত্তিতে স্থাপন। যাকে বলে মাস্টার স্ট্রোক।' 'কিন্তু রাজপুত বেগমরা তো হিন্দুই থাকতেন, তাই না?'

'কী করে একবার ভেবে দেখেছো? বিয়েটা হতো কোন মতে? তখন তো স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ছিল না। হিন্দু বেগমদের হিন্দুত্ব কতদূর? মরলে তাদের মুখাগ্নি করে চিতায় পোড়ানো হতো, শ্রাদ্ধ হতো? সে সব খবর আছে? হ্যাঁ, সুলতান বাদশাহরা ইচ্ছা করলে কী না করতে পারেন। তবে মুসলমানি আইনে হিন্দু আর জোরাস্টিয়ান মানে পার্শিদের সঙ্গে বিয়ে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। জিন্নার পার্শি বউকে মুসলমান হতে হয়েছিল। শোন, তোমার ভালোর জন্যই কনভার্সান দরকার। মুসলমান না হলে তুমি আমার সম্পত্তির ভাগ পাবে না, আমাদের ছেলে-মেয়েরা আমার ওয়ারিশ হতে পারবে না...।'

আমি স্তম্ভিত। এই কি স্বাধীন ভারতের নমুনা! 'সে কী রে, এরকম আইন-ফাইন আছে নাকি। এই না শুনি ইসলাম সাম্যের ধর্ম। আমি ভাবতেও পারছি না আফতাব ভাই এ সব কথা বলল। এত ডাঁট দেখাত সে নাকি মধ্যযুগ আর মুসলিম ইতিহাস নিয়ে মাথাই ঘামায় না, সে হান্ড্রেড পারসেন্ট মডার্ন ইন্ডিয়ান!'

'আরো অনেক কথা বলত, সেকুলারিজম, ইনক্লুসিভ ইন্ডিয়া, পাকিস্তানের মতো নয় এটসেট্রা।'

'একেবারে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে গেছে। এরা পারেও বটে। শুধু মুসলিম আইনের বাহানা না আরো কিছু বক্তব্য আছে?'

'আছে। আম্মির মনোকষ্টের ব্যাখ্যানা, যে বাড়ির কর্তা অমুক মাজারের ওয়ারিশ, গিন্নির ফ্যামিলি অমুক সুফির মুরিদ, সেই বাড়ির বউ কিনা নামাজ পড়বে না! হা আল্লাহ! এ কী মুসিব্বতে তিনি পড়েছেন। এত তকলিফে তাঁর দানাপানি বন্ধ হতে বসেছিল, নাদিরা ধমক দিয়ে দিয়ে খাওয়াচ্ছে।'

'জিজ্ঞাসা করলি না, বোন যে হিন্দু বিয়ে করছে, সে বেলা?'

করেছিল। সে আর একটা বম্ব শেল। ওঙ্কার মুসলমান হয়ে গেছে, ওমর রহমান নাম, নাদিরার চয়েস। আসলে ওঙ্কার রক্ষিতের 'ও' এবং 'আর', ইনিশিয়েল দুটো এক রাখা। বাইরে অবশ্য হিন্দু নামটাই ব্যবহার করবে।

কনভার্সানটা গোপন রাখা আজকাল ফ্যাশন। দুটি মুসলমানের শাদিকে হিন্দু মুসলিম মিশ্র বিবাহ হিসেবে পাবলিককে দেখানো হয়। বেশ লিবারেল ইমেজ তৈরি। সে-ও শর্বরী রায়চৌধুরী নাম কন্টিনিউ করতে পারে। তাতে আফতাবের আপত্তি নেই।

'আরে এমন মুখ করছ কেন? ইটস জাস্ট আ সেরিমনি। অনুষ্ঠান মাত্র। নাথিং উইল চেঞ্জ, সব এক থাকবে। অত আপসেট হয়ো না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। একা একা ধর্মপালন হয় না। বাড়িসুদ্ধ সকলে মুসলমান, খানসামা নোকর-নোকরানি



পর্যন্ত, আমাদের ছেলে-মেয়েরা মুসলমান হবে, তুমি একা হিন্দু থাকবে কী করে? প্র্যাকটিক্যাল প্রবেলমটা ভাবো।'

শর্বরী চুপ। কথা বলতে পারে না অনেকক্ষণ। 'আমাকে একটু ভাবার সময় দাও।'

'কী ভাববে? আমাদের রিলেশান যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে অনারেবল্ নেক্সট স্টেপ ইজ ম্যারেজ, আর ম্যারেজের জন্য ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট। সিম্পল্।'

'কিন্তু আমাদের দেশের আইনে তো যার যার ধর্ম বজায় রেখে দুজন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের নারী-পুরুষ বিয়ে করতে পারে। কারো ধর্ম বদলানোর কোনো প্রয়োজনই নেই। ভেবেছিলাম আমাদের সিভিল ম্যারেজ হবে। তুমি মুসলিম আমি হিন্দু, আমরা পরস্পরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করব, আমাদের ছেলে-মেয়ে দুটো ধর্মই পালন করবে।'

'ওসব খোয়াব। সেমিনারে কনফারেন্সে আঁতেলদের আর মাঠে ময়দানে নেতাদের বাঁধাধরা বাতেল্লা। রিয়েলিটি আলাদা। তাছাড়া ছেলে-মেয়ে সব মুসলমান হবে, যেমন আমাদের নিয়ম। আকবরের হিন্দু বেগমের ছেলে মুসলমান, তানসেনের মুসলমান বিবির ছেলেও মুসলমান, তিনি নিজেও শাদির জন্য হিন্দু থেকে কনভার্টেড। যে দুচারটে রাজপুত মারাঠা রাজা কনভার্টেড না হয়ে মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেছিল, তাদের

ANOOPAM

METAL INDUSTRIES

ISO 9001-2000 Certified

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Manufacters & Exporters of :

CYCLE PARTS & AIMEX BRAND ALLEN BOLTS-NUTS, GRUB SCREW & TURNING PARTS

B-6, Textile Colony, Industrial Area A, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, 4652326
e-mail : anoopam_met@hotmail.com, www.anoopammetal.com

With Best Compliments from -

Mr. Vishal Dada

Gen. Secretary,
Jalandhar
Laghu Udyog Bharati
Punjab
M; 9878569111

With Best Compliments from -

IRAVATI INDUSTRIES

11- Bhagwan Mahavir Industrial Complex
ADJ. Industrial Sheds
Focal Point
Jalandhar
(PB.) India

ছেলে-মেয়ে সবাই মুসলমানই, কেউ হিন্দু নয়। এটাই বরাবর হয়।' যেমন সূর্য বরাবর পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়। অবধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম।

'তারপর?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'সেটাই শেষ কথা। আমাকে গাড়িতে ড্রপ করতে এল, অ্যাজ ইউজুয়েল। রাস্তায় কেউ কোনো কথা বলিনি। আমার খালি মনে হচ্ছিল এ সব কিচ্ছু আসলে ঘটছে না, আমি একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছি, এখুনি ঘুম ভেঙে যাবে আমি আমার আগের পৃথিবীতে ফিরে আসব। বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে বলল, 'দুদিনের মধ্যে জানাবে কোন তারিখে মৌলবি সাহেবকে বলব, সেই অনুযায়ী শাদির দিন ঠিক হবে।' রিয়েলাইজ করলাম আমার আগের দুনিয়া আর কোনোদিন ফিরবে না। জানিস, সারা রাত ঘুম হয়নি। বাবার কথাগুলো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, 'তোমাকে বিয়ে করতে চায় একটিই কারণে, তুমি হিন্দু বলে। একজন হিন্দু মেয়ের ধর্ম যাবে, হিন্দুর বদলে মুসলমান সন্তানের জন্ম দেবে।'

আমরা দুজনে চুপচাপ বসে থাকি। এমন পরিস্থিতি কখনো দুঃস্বপ্নেও ভাবি নি। যেন অবিশ্বাস্য। কী যে পরামর্শ দেব ভেবে পাই না। শেষে বলি, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখ, হুটহাট কোনো ডিসিশান নিস না।'

যে যার বাড়ি ফিরি। ক'দিন আমিও খুব বিচলিত। হেনাকে ফোনে বলি সব। সে তো খেপচুরিয়াস, 'শর্বরীর মাথায় কী, গোবর না আলুভাতে। মুখের ওপর বলতে পারল না, গো টু হেল্। ওর উচিত এক্ষুনি নেড়েটার সঙ্গে রিলেশান কাটঅফ করা। কী স্পর্ধা। ভাবে কী এরা নিজেদের। সব এক একটা মহম্মদ ঘোরি, বখতিয়ার খিলজি।...'

'থাক্ থাক্ তুই মাথা গরম করিস না। তুই কি জানিস না ওদের রিলেশান যে পর্যায়ে গেছে তাতে এখন শর্বরীর পক্ষে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়।'

'যা যা, যত্ত সব আদ্যিকালের ইনহিবিশান। শর্বরী আফতাবের সঙ্গে শুয়েছে সো হোয়াট। তাতে কি আফতাব ওকে একেবারে কিনে ফেলেছে নাকি! এর পরে সতীত্ব ফতিত্বের কথা তুলবি।'

'তুই বুঝতে পারছিস না কলেজে পর্যন্ত চাউড় হয়ে গেছে।'

'তবে আর কী। যাক, কলমা পড়ে বিবি হোক। এর পর বোরখা ধরবে। আমি আর ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না।'

'না না, প্লিজ। উই মাস্ট স্ট্যান্ড বাই হার। দেখ্ আমরাও তো পার্শিয়ালি দায়ী। কখনো মুসলমানদের ইতিহাসটা তলিয়ে দেখি নি। আমাদের সঙ্গে তফাতটা এড়িয়ে গেছি। বাইরে যে সব পোলিটিক্যাল ভাষণ টাসন শুনি সেইমত ভেবে এসেছি। কোনোদিন ওকে আগুপিছু বিবেচনা করতে বলেছি? বরং সমানে উৎসাহ দিয়ে গেছি। ওদের প্রেম করার সুবিধার জন্য মাসের পর মাস, বলতে গেলে ক'বছর ধরে মাসিমার কাছে আমরা সমানে মিথ্যে কথা বলেছি। নাদিরার কথায় নেচে আমরাই তো দিনের পর দিন ওদের বাড়ি গিয়েছি।'

'যেমন আফতাবের ডাকে নেচে নেচে আমাদের মতো যেত তার উদার হিন্দু কলিগরা, ইনক্লুডিং ওই ওঙ্কার রক্ষিত যে এখন ওমর রহমান। ভাই-বোন মিলে হিন্দু পাকড়াও করবার জব্বর ফাঁদটি পেতেছিল। ঠিক হিসেব করেছিল।

আমরা পাতি মিড্ল ক্লাস হিন্দু, মাগনা এসপ্রেসো কফি আর কাবাবের লোভে ফাঁদে পা দেবোই দেবো।' 'দোষারোপের পালা শেষ করে কিংকর্তব্য ভাবা যাকা।'



না, ভাবাভাবির বিশেষ অবকাশ পেলাম না। হঠাৎ জোর কদমে আমার বিবাহের প্রস্তুতি, সব পক্ষেরই পরস্পর পছন্দ। কলেজ শর্বরীর শুকনো মুখ দেখি, দেখি দিন দিন রোগা হয়ে যাওয়া। ব্যস্ততার মধ্যেই ওকে একা পেয়ে প্রশ্ন করি, 'কীরে কিছু ভাবলি?' মৃদু কণ্ঠে বলে সে আফতাবকে জানিয়ে দিয়েছে যে ধর্ম ত্যাগ করবে না।

'গুড্। এই তো চাই। কী বলল?'

'তাহলে ও আমাকে বিয়ে করবে না।'

'না করুক। বিছানা ছাড়া কি মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জায়গা নেই? তুই কোয়ালিফায়েড, ফিনানশিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। কাজে মন দে। রিসার্চ কর, চাকরিতে উন্নতি কর। শক্ত থাক। দেখিস ঠিক সামলে যাবি।'

শুকনো মুখে মাথা হেলায় শর্বরী, হ্যাঁ।

ইচ্ছে সত্ত্বেও ওর এই দুঃসময়ে সঙ্গ দিতে পারি না। নিজের খুব খারাপ লাগে। যেন ওকে একটা অতল গহ্বরের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি দিব্যি নিরাপদ অবস্থানে রয়েছি। কত দূরে সরে যাচ্ছি। স্বার্থপরের মতো মেতে যাই প্রাকবিবাহ হবু স্বামীর সঙ্গে আলাপপরিচয়ের হাল্কা পূর্বরাগে, অবশ্যই পরিবার নিয়ন্ত্রিত। অতঃপর বিয়ের আয়োজন ও শুভদিনে শুভকর্মটি সমাপ্ত। সেই বোনের বিয়ের ধূসর রঙের শাড়িতে শর্বরীর জোর করে হাসিটানা মুখ আমার বিয়ের আনন্দকে খানিকটা ম্লানই করে দিল। কয়েক মাসের মধ্যে হেনারও বিয়ে হয়ে গেল। ও একটা ভালো স্কুলে কাজ পেয়েছিল। বিয়ের পর কন্টিনিউ করবে আগেই বলে নিয়েছে এবং পাত্রপক্ষ সম্মত।

আমার বেলা বলাবলির দরকার হয়নি। ইঞ্জিনিয়ার স্বামী মধ্যপ্রদেশে একটা আগ মার্কা জায়গায় কোম্পানির প্লান্টে

পোস্টেড, ওখানে ফ্যাক্টরির ছোট্ট কলোনিতে, কলকাতায় অভ্যস্ত আমার মানানো শক্ত হবে, তাছাড়া পার্মানেন্ট একটা চাকরি আছে, দুম করে ছেড়ে দিয়ে পরে পস্তানো উচিত নয়। আপাতত বরং ছুটিতে যাব, ওখানকার সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসব। টিচিঙের তো লম্বা লম্বা ছুটি, গরমে দু মাস, পুজোয় এক মাস, বড়ো দিনে প্রায় দু সপ্তাহ। বিরাট সুবিধা। পরে বেটার জায়গায় কাজ পেলে তখন দেখা যাবে। শ্বশুর-শাশুড়ি নিজেরাই অগ্রণী হয়ে পরামর্শ দিলেন।

এখন শর্বরী আমার আর হেনার সৌভাগ্যের তারিফ করে। আমরা যেন একটু অপ্রস্তুতই বোধ করি। ওর নীরব বিমর্ষ মুখ দেখলে নিজেদের ভীষণ অপরাধী লাগে। হেনার সঙ্গে ফোনে বলাবলি করি। হ্যাঁ, আমরা ভাবিনি এমন পরিণতি হবে, কিন্তু কেন ভাবিনি। শর্বরীর বাবা-মায়ের মানসিকতা তো ব্যতিক্রম ছিল না। তার পছন্দের বৃত্তান্ত শুনে আমার আর হেনার বাবা-মায়েরও হুবহু এক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এবং খেদ প্রকাশ, ইস্ ব্রিলিয়্যান্ট মেয়েটা কী ভুলই না করল। নাদিরা ও ওঙ্কার থুরি ওমরের শাদি হয়ে গেল মুসলমানি মতে, 'ওয়ালিমা'র ভোজে আমি ও হেনা দাওয়াত পেয়েছিলাম, দুজনেই ছুতো দেখিয়ে যাইনি। নিজেই ফোন করে সাতখানা করে জানাল সে মোহব্বত করে শাদি করছে বলে নামমাত্র দেনমোহর, মোটে হাজার টাকায় তার শাদি কবুল। সারাক্ষণ তার ভাইজান শুকনো মুখে ঘোরাঘুরি করছিল। শর্বরী এমন দাগা দিয়েছে, বেচারা কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

হেনা পালটা বলে, 'দাগা কে কাকে দিল নাদিরা? এত বছর মডার্ন সেকুলার ভড়ং দেখিয়ে শেষ মুহূর্তে বলে কিনা কনভার্টেড হও নইলে শাদি হবে না।'

নাদিরার জবাব রেডি, 'তাতে অন্যায় কী হলো ভাই? হিন্দু মুসলিম শাদিতে চিরকাল তাই হয়ে এসেছে। পণ্ডিত রামতনু মিশ্র মুসলমানি শাদি করে মিঞা তানসেন হয়েছিলেন। আজও কমল দাশগুপ্তর মতো ট্যালেন্ট ফিরোজা বেগমকে বিয়ের জন্য মুসলমান হন। যেমন আমার জন্য ওঙ্কার হয়েছে। ভালোবাসার জন্য একটু স্যাক্রিফাইস করবে না? আসলে ওঙ্কার আমাকে যতটা ভালোবাসে, শর্বরী ততটা ভাইজানকে ভালোবাসে না।'

'শুধু মুসমানদের কাছে অমুসলমানদের ধর্ম বিসর্জন দেওয়া ভালোবাসার মাপকাঠি। আগা খানের ছেলে আলি খানকে বিয়ে করার জন্য হলিউডের স্টার রিটা হেওয়ার্থকেও মুসলমান হতে হয়েছিল, তাই না?'

'রিয়েলি হেনা তোমরা হিন্দুরা এত প্রেজুডিসড্ যে মুসলমানের মোহব্বতকে পর্যন্ত কদর করতে পারো না। রিটা হেওয়ার্থের বাপের ভাগ্যি যে আগা খানের ওয়ারিও তাকে পেয়ার করেছে।'

'যারা অপরের ধর্মকে খতম করার জন্য বিছানাকে ব্যবহার করে তাদের কাছ থেকে পেয়ার মোহব্বত শিখব না।' দড়াম করে হেনা রিসিভার রেখে দিয়েছিল।

'বেশ করেছিস।' আমি শুনে বলি।

কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে স্থিতু হয়ে কলেজের পুরনো জীবনে ফিরে যাই। না, একেবারে আগের মতো বলা যায় না। বিয়ে একটা আশ্চর্য জাদুকাঠি যার ছোঁওয়াতে মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন, মানসিকতা, আচার আচরণ সব কীরকম বদলে যায়। এখন ক্লাসের লেকচার আর খাতা দেখায় প্রাণমন নিবেদিত থাকে না, কাজের ফাঁকে সর্বদা চিঠির প্রতীক্ষা, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার রোজকার ছোটোখাটো কাঁটা সামলানো, গরমের, পুজোর, বড়োদিনের ছুটির প্রতীক্ষা, আগে থেকে ট্রেনটিকিটের বন্দোবস্ত, মধ্যপ্রদেশের সংসারে কলকাতা থেকে কী কী নিয়ে যাব তার সদা বর্ধমান তালিকা তৈরি।

এত সব মাথায় রেখে শর্বরীর সঙ্গে আদানপ্রদানে ঠিক আগের সুর বাজে না। কেন জানি না ওকে আমার এসব কথা বলি না। শুধু ওর অবস্থাই আলোচ্য। জে ইউতে যে সব প্রফেসর ওকে স্নেহ করতেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করে রিসার্চের টপিক ঠিক করতে বলি, নিজের শরীর স্বাস্থ্যে মনোযোগ দিক। শর্বরী শোনে কিন্তু কিছুই করে না। সমানে পেছনে লেগে থাকি।

'কী রে তুই না বলতি মডার্ন ইউরোপিয়ান হিস্ট্রিতে তোর ইন্ট্রেস্ট, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর দেশে দেশে রাজতন্ত্রের পতন নিয়ে কাজ করব? নে, শুরু করে দে।' বা, 'তোর আবার ব্রণ হচ্ছে, চোখের কোণে কালিটা বাড়ছে, এই কর সেই কর, রাতে ঘুম...'।

কোনো লাভ হয় না। ওর যেন কোনো কিছুতেই আর আগ্রহ নেই। কলেজে আসা, ক্লাসে পড়ানো দিনগত পাপক্ষয়।

একদিন জিজ্ঞাসা করি, 'হ্যাঁরে, মাসিমা মেসোমশাই জানেন তোদের বর্তমান স্টেটাস?'

'না, আমি কিছু বলিনি। বলার মুখ নেই।'

'চন্দ্রিমার বিয়ে প্রায় বছর দেড়েক হতে চলল, তোরা তারপরই বিয়ে করবি বলেছিলি। জিজ্ঞাসা করেন না কিছু?'

'না। কেন করবেন বল্? ওঁরা তো আমাদের বিয়েটা চান না।'

'আফতাবের কোনো খবর নেই?'

'নাদিরা গায়ে পড়ে ফোন করে করে জানায় তার ভাইজানের কত ভালো ভালো রিস্তা আসছে, ওঙ্কারকে দিয়ে ও প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত কেমন নামাজ আদায় করায়, কী রকম নিয়ম মেনে এ বছর রোজা রেখেছে।'

'বটে! নাদিরার নিজের নামাজ পড়ার কথা তো কস্মিনকালে শুনিনি। এত বছর রোজা রাখতেও দেখিনি। হিন্দুর জাত মেরে এখন নিজে নমাজি হয়েছে।'

একদিন শর্বরী বলল, 'বুঝলি এখন আমি রিয়েলাইজ করছি

কেন হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে সোশ্যাল ইন্টারঅ্যাকশান করত না, কেন বিশেষত মেয়েদের মুসলমানদের সামনে বেরনো বা তাদের সঙ্গে কথা বলা বারণ ছিল। ওটা সামাজিক প্রতিরোধ। সামরিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হেরে গিয়ে হিন্দুদের টিকে থাকার একমাত্র উপায়। অন্য জাতিগুলি কেউ এমন অবস্থায় ধর্ম বাঁচাতে পারেনি। বিরাট পারসিক সাম্রাজ্যে জরাথুস্ট্রিরা, তুরস্কে আদি খ্রিস্টানরা প্রায় বিলুপ্ত।'

আজকাল বুঝি মডার্ন ইউরোপিয়ান হিস্ট্রিতে তোর আর আগ্রহ নেই?'

'না। প্রাসঙ্গিক নয়। তার চেয়ে পারস্য কী তুরস্কর ইতিহাস জানা অনেক বেশি জরুরি।'

'বেশ তো, এই ফিল্ডেই কিছু কর।'

'দেখি।'

পরে যখন জিজ্ঞাসা করি, 'কী রে তোর রিসার্চ প্রজেক্ট কতদূর?'

'না রে কিচ্ছু হয়নি। গিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটিতে। কারো কাছ থেকে তেমন উৎসাহ পেলাম না। আমাদের দেশে বিশেষত কলকাতায় এ ধরনের বিষয়ে কাজ করার আদৌ স্কোপ আছে কী না সন্দেহ। প্রফেসারদের মানসিকতা সব ব্রিটিশ বা বলতে পারিস কলোনিয়েল ট্র্যাডিশানের ছাঁচে ঢালাই হয়ে গেছে। পারস্য তুরস্ক কোনো দিন ইউরোপের কারো কলোনি ছিল না, কাজেই তাঁদের বোধবুদ্ধির বাইরে। কলোনিয়েল পাওয়ার সব আফটার অল খ্রিস্টান। প্রফেট, বুক আর কনভার্সানে তাদের বিশ্বাস মুসলমানাদেরই মতো। ইন্ডিয়াতে যে ইংরেজরা কনভার্শানের সে রকম চেষ্টা করেনি তার কারণ এটা তাদের ইন্টারভেনশান কলোনি অর্থাৎ স্বল্পকালীন উপনিবেশ যার প্রধান উদ্দেশ্য কমার্শিয়েল বা বাণিজ্যিক শোষণ। আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় তারা সেট্‌লার, স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সেখানকার সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করেছে। আরব তুর্কিরা সর্বত্র সেট্‌লার বা স্থায়ী বসবাসকারী, তাই প্রাক-ইসলাম সব ধর্ম তাদের শাসনে বিপন্ন, শুধু হিন্দু ধর্ম নয়। পৌত্তলিকতাবর্জিত জাতিভেদহীন ধর্মগুলোও মোটেই রেহাই পায়নি। মুসলমান ও খ্রিস্টানরা বিশেষত ব্রিটিশ জাত আধুনিক, উপনিবেশে আধুনিক জীবনযাত্রার মূল পরিকাঠামো তৈরি করে দিয়ে আমাদের মধ্যযুগ থেকে বেরতে সাহায্য করেছে।'

'সে কী রে! তুই তো একেবারে নতুন কথা বলছিস। আমরা তো বরাবর জানি ইরানি, তুরানি, আরব, পাঠানরা এখানে স্থায়ী বসবাস করে এ মাটির মানুষ হয়ে গেছে। ইংরেজদের মতো তারা এখান থেকে সম্পদ লুটেপুটে নিজের দেশ বোখারা-সমরখন্দে নিয়ে যায়নি।'

'নিয়ে যায়নি কারণ বোখারা সমরখন্দে ফেরার রাস্তা তাদের ছিল না। চেঙ্গিস খানের খাস উত্তরাধিকারী শয়বানি খান তৈমুরের বংশকে দেশ থেকে উৎখাত করার সংকল্প নিয়েছিল এবং পালনও করে গেছে। 'ঘুর' বা গজনিতে প্রচুর গেছে ভারতের সম্পদ। যখন নিয়ে যেতে পারেনি, তখন শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে জমা করেছে। তারা কী চেয়েছে? এ দেশের মানুষের রক্ত চুষে ক্ষমতা আর ভোগবিলাস। সমস্ত মুসলমান দেশ থেকে লাগাতার লোক আমদানি করে এ মাটিতে বসিয়ে জনবিন্যাসের ধাঁচা বদলে দিয়েছে, বিশাল ফৌজ পুষে অবিরাম যুদ্ধ করে গেছে ক্ষমতার লোভে, মস্ত মস্ত হারেমে ভোগ করেছে শতশত নারী, পালন করেছে অগণিত অবৈধ সন্তান। তৈরি করেছে দারুণ দারুণ মসজিদ, মকবারা, কেল্লা, ফটক। যে প্রজাদের শোষণ করে এমন রমরমা তাদের জন্য ক'টা হাসপাতাল করেছে? ক'টা বিশ্ববিদ্যালয়? তাদের নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা? আইনশৃঙ্খলার তো বালাই ছিল না।'

'সবই মানলাম। কিন্তু দেখ প্রচুর দেশীয় মানুষও তো মুসলমান হয়েছে। নিচুজাতের হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করে বামুন কায়েতের দাপট থেকে রেহাই পেয়েছিল। এটা তো ফ্যাক্ট।'

'দেখ্ সবচেয়ে বেশি কনভার্টেড হলো বৌদ্ধরা, যাদের জাতিভেদ ছিল না। আমাদের এই মগজ ধোলাইয়ের জন্যই পারস্য আর তুরস্ক নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম। আমাদের জানা দরকার যাদের জাতিভেদ আদৌ নেই, পৌত্তলিকতা নেই, তাদের দশা মুসলমান শাসনে আমাদের চেয়েও খারাপ।'

'একেবারে নতুন কথা বলছিস। লেগে পড়।'

কিছুদিন বাদে জিজ্ঞাসা করি, 'কী রে তোর প্রজেক্ট কতদূর এগল?'

বোরড্ মুখে শর্বরী বলে, 'দূর! কিছুই হয়নি। দু' একজন প্রফেসরকে বললাম। 'হ্যাঁ ইন্ট্রেস্টিং টপিক। তবে মেটিরিয়েল পাবে কি? গাইড পাওয়াও শক্ত হবে। আর তুমি তো ইসলামিক হিস্ট্রির ছাত্রী নও।' ব্যাস ইতি। ভেবে দেখলাম বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে এ কাজ করা যাবে না। হিন্দুধর্মই আমাদের হীনতার উৎস, যার জন্য কুসংস্কারের নাগপাশ, ঐক্যের অভাব, সামাজিক অসাম্য, অবধারিত শতশত বছর পরাধীনতা, এই কলোনিয়েল শিক্ষাই আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে। হেইট্ হিন্দুইজম্ হচ্ছে বিদ্বজ্জনদের পোলিটিক্যালি কারেক্ট অবস্থান। পরোক্ষ ভাবেও হিন্দুদের বিপন্নতার লেশমাত্র ইঙ্গিত থাকতে পারে এমন কোনো বিষয়ে গবেষণা এখানে আদৌ করতে দেওয়া হবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া যদিও বা করা যায়, কী লাভ হবে। একটা থিসিসে আমাদের বাস্তব বদলাবে না।'

'শোন, কর্মের জন্যই কর্ম, ফলের জন্য নয়। যার যে কাজ করার ইচ্ছা, সেটা করা উচিত। মানুষের জীবন ক'দিনের। কর্মই সব।'

শর্বরী মৃদু হেসে বলে, 'তোর ভাবসাব দেখে তো মনে হয় না। নাকি কর্ম কথাটা বৃহত্তর অর্থে? ঘরে বাইরে দুই?' লজ্জিত

হই। সত্যি আমি তো রিসার্চ টিসার্চের কথা মোটেই ভাবি না। খালি পড়াবার জন্য যেটুকু পড়া আর খবরের কাগজ, ম্যাগাজিনে চোখ বোলানো। এতেই সময় পাই না।

বছর দেড়েক কেটে যায়। মেটার্নিটি লিভে বাড়িতে আছি। শর্বরীর ফোন, 'তোর সঙ্গে কথা ছিল। টেলিফোনে বলা যাবে না।'

'চলে আয় না যেদিন তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ। তিনটে চারটে নাগাদ বাড়ি ফাঁকাই থাকে, আমার ঘরে বসব।'

বসা হলো। উত্তেজনার ছাপ শর্বরীর মুখে। 'কী হলো রে?'

'আফতব লাস্ট উইকে ফোন করেছিল দেখা করতে চাইল। আমি রাজি হলাম...' বাধা দিয়ে বলি, 'সে কী রে! কেন? সব তো চুকেবুকে গেছে। উনোনের আগুনে জল ঢেলে আবার তাকে খুঁচিয়ে জ্বালাতে গেলি।'

একটু চুপ করে থাকে শর্বরী। 'জানিস, ওকে আমি ভুলতে পারিনি। একা থাকলেই আমাদের আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, কত ধরনের কথাবার্তা, নিজেদের সাবজেক্টে কত আলোচনা হত। কী যে ভালো লাগত। ওর সঙ্গটা খুব মিস্ করি।'

'দেখ, আফতাব ভালো ছাত্র, তুই ভালো ছাত্রী। এটা ছাত্রজীবনের বন্ধুত্বের মতো আড্ডার সম্পর্ক। প্রেমের নয়।'

'প্রেম কি বন্ধুত্বের শত্রু? শুধু তাই নয়। উই ওয়ের লাভার্স। ও ছাড়া কোনো পুরুষ আমাকে ছোঁয়নি, কোনোদিন ছোঁবে আমি কল্পানাও করতে পারি না।'

'এটা স্রেফ পরিস্থিতির জন্য তোর মনে হয়। অন্য কোনো পুরুষ জীবনে এলে আপনিই তুই তাকে গ্রহণ করবি। যেমন আফতাবকে করেছিলি।'

করুণ হাসি হাসে শর্বরী। 'মিথ্যে স্বপ্ন দেখাচ্ছিস। অন্য পুরুষ কোথায়? আমাদের সমাজে নারী-পুরুষের ডেটিংয়ের ট্রাডিশান আছে? কলেজ টলেজ চাকরিক্ষেত্র একমাত্র দেখা সাক্ষাতের জায়গা। সম্বন্ধ করে তোর বা হেনার মতো বিয়ে আমার কপালে নেই। তাছাড়া আফতাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটা যথেষ্ট জানাজানিও হয়ে গেছে। এখন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়, 'শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী অধ্যাপিকা পাত্রীর জন্য উদারচেতা যোগ্য পাত্র চাই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর এক্সকিউজ দিতে হবে না। মোটমাট তোদের অমর প্রেম। এখন ঘটনাটা কী বল।'

আবার গ্রীষ্মের সেই নির্জন দুপুর। পার্কসার্কাসের সেই বাড়িতে একতলার শোবার ঘর। শর্বরী পৌঁছানো মাত্র আফতাব ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে, 'অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারলাম না। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। তুমি ছাড়া আমার সুখ নেই।' শর্বরীর সমস্ত শরীর যেন গলে গেল তবু জোর করে নিজেকে সংবরণ করে বলে, 'এই যে শুনি তোমার নাকি কত পাত্রী' কথা শেষ হয় না। ওসব নাদিরার ইয়ার্কি। কাউকে আমার মনে ধরেনি। তোমার মতো কারো সঙ্গে কথাবার্তাই বলা যায় না। দেখ আমার শরীর পর্যন্ত তোমাকে কেমন জানে। এসো।'

বাধা দেয় না শর্বরীর উপোসি দেহ। পরে তৃপ্তির শান্তিতে দুজনে কিছুক্ষণ প্রায় ঘুমিয়েই পড়ে। শর্বরী আগে উঠে খুলে রাখা ব্রা আর ব্লাউজটা টেনে নিয়ে রেডি হয়। আফতাব প্যান্টটা পায়ে গলাতে গলাতে বলে, 'সত্যি আমরা মেইড ফর ইচ আদার। কেউ অন্য রিলেশান করতে পারব না উই আর হ্যাপি উইথ ইচ আদার ওনলি। লেট আস ফেইস দ্য ফ্যাক্ট।'

শর্বরী শাড়ি পড়তে পরতে মাথা হেলায়, হ্যাঁ। 'তবে এভাবে চলা যাবে না। বাইরে জানাজানি হয়ে গেছে।'

আফতাব চুপ করে থাকে। 'তুমি কী ভাবো জানি না। আই রিয়েলি লাভ ইউ। তোমার সঙ্গে আমার যেমন র‍্যাপো তেমন আর কারো সঙ্গে হয় না।'

শর্বরী মৃদু হেসে বলে, 'কেন ভালোবাসো? আমার চেহারা তো এই, সাজপোশাক করতে শিখিনি, পুরুষভোলানো হাবভাব জানি না' আফতাব কাছে এসে শর্বরীর দু কাঁধে হাত রাখে, 'তোমার বুদ্ধি, তোমার স্বভাব আর কারোর দেখিনি।'

শর্বরী চটির স্ট্যাপ লাগাতে লাগাতে বলে, 'যাক, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার যে মোহিনী ক্ষমতাও আছে তা জানলে অনেকে মেয়ের বাপ-মা নিশ্চিন্ত হবে। চলি 'নেক্সট কবে দেখা হবে? আগে থেকে প্ল্যান করে কলকাতায় আসতে হয়, জানই তো।'

'দেখা যাক।'

'তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। এখনো রাগ করে আছো, তাই না?'

'বললাম তো এভাবে আমাদের অনির্দিষ্ট কাল দেখাসাক্ষাৎ সম্ভব নয়।'

'বুকে হাত দিয়ে বল তো, আমার কথা এতদিন মনে পড়েনি?'

'বুকে হাত না দিয়েই বলছি, হ্যাঁ মনে পড়েছে। কিন্তু তাতে কী? কিচ্ছু বদলায়নি। আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান। গল্প শেষ।'

'বাহ্ হেভি ডায়লগ ঝেড়েছিস। তা কী বলল?'

' লেট'স গেট ম্যারেড।'

'বলল? হুর্‌রে। তুই কী জবাব দিলি?'

'সিভিল ম্যারেজ। ও একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি নিজেই দেখছ আমাকে ছাড়া হ্যাপি হতে পার না। তবুও ডিটারমিন্ড যে মুসলমান হবে না?' বললাম, 'আমি তো কখনো তোমাকে ইসলাম ছাড়তে বলি না। তুমি কেন আমার হিন্দু থাকা অসহ্য মনে কর? কেন আমার ধর্ম ত্যাগ করা নিয়ে জেদাজেদি কর?'

‘কতবার বলব ইসলামে হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে লিগ্যাল নয়। তাই মুসলমান মেয়েরাও হিন্দু পুরুষদের কনভার্ট করে বিয়ে করে।’

‘আর হিন্দু ধর্মে বুঝি মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে সিদ্ধ?’

‘আমরা কি আবার তর্ক করব? প্লিজ শর্বরী ফরগেট রিলিজিয়ন।’

‘হোয়াই ডোন্ট ইউ ফরগেট? তুমি রিলিজিয়ানের কথা তুলো না তাহলে আমিও তুলব না। চলি।’

‘সো ফার সো গুড। এখন দেখ। তবে আর বেশি মাখামাখি করিস না।’

‘না, আর বাড়িতে যাবো না ঠিক করেছি। এবার ফোন করলে বাইরে কোথাও চা-টা খেতে বসব।’

‘দ্যাটস রাইট। কী হয় বলিস আমাকে।’

বলে। পার্কস্ট্রিটে বিভিন্ন রেস্তোরায় কয়েক বার শর্বরী আফতাব সাক্ষাৎ। আফতাব সমানে অনুযোগ করে, এ যেন কাহিনির ক্লাইম্যাক্স থেকে প্রথম চ্যাপ্টারে ফিরে আস, শয্যা থেকে চায়ের টেবিলে মুখোমুখি বসা মোটেই সম্পর্কের উন্নতি নয়, বরং চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো, চাইলেই সব পাওয়া যায় না।

আমার সঙ্গে অনেকদিন আর তেমন একান্তে কথা হয়নি। কলেজের কাজ করা, বাচ্চা নিয়ে আমি ব্যস্ত। বছর ঘুরে যায়। গরমের ছুটি পড়তে না পড়তে পরীক্ষার খাতার বান্ডিল নিয়ে বসছি। তাড়াতাড়ি শেষ করে স্বামীর কাছে যাবার প্ল্যান। এক রাতে শর্বরীর ফোন, ‘শোন, তুই কি সামনের রবিবার আমাদের বাড়িতে সকাল এগারোটা নাগাদ আসতে পারবি বাচ্চাকে মাসিমার কাছে রেখে? আফতাব আর আমার রেজিস্ট্রি হবে। বাবা-মার সামনে।’

‘বলিস কী ! কংগ্র্যাটস্। শেষপর্যন্ত জিতলি তাহলে। আই অ্যাম সো প্রাউড অফ ইউ। কী যে ভালো লাগছে। শোন্, তোর বিয়েতে আমি গান গাইবো, আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।’

‘যা তা ফাজলামি করিস না। আসিস।’

যাই। একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি নিস্তরঙ্গ বাড়ির আবহ। উৎসবের কোনো পরিবেশ নেই। বাইরের ঘরে লম্বা সোফায় এক কোণে সেজেগুজে বসে হেনা। অন্য কোণে বসে কনে, তার পরনে একটা যেমন তেমন শাড়ি, সাজসজ্জার বালাই নেই মুখচোখ শুকনো, গালে এক রাশ ব্রণ, অর্থাৎ খুব টেনশান যাচ্ছে। আমি হেনার পাশে বসি। দু ধারে দুটো সেটিতে গম্ভীর মুখ মাসিমা মেসোমশাই। উলটো দিকে সেন্টার টেবিলের সামনে ক'টা চেয়ারের সারি। একটিতে বসা বয়স্ক এক অচেনা ভদ্রলোক, অধৈর্যভাবে খালি ঘড়ি দেখছেন।

‘দেখুন আমরা অফিসেই রেজিস্ট্রেশান করাই। আপনাকে তো বলেইছিলাম। নেহাত আপনারা সমাজের গণ্যমান্য লোক তাই এক্সেপশান করা। নইলে আমি রোববার এজমালি বাড়ি চন্দননগরে যাই, বাবা-মা এখনো জীবিত। টাইম দিয়েছিলেন সাড়ে এগারোটা, আধ ঘণ্টার ওপর বসে আছি...।’

শর্বরী শুকনো মুখে বলে, ‘এসে যাবে। প্লিজ একটু বসুন।’

বলতে বলতে বাইরে গাড়ির আওয়াজ। সে-ই উঠে গিয়ে দরজা খোলে। আফতাব ঢোকে, সঙ্গে ওঙ্কার। দুজনেরই পরনে সাধারণ সার্টপ্যান্ট, যেন অফিসে এসেছে। প্রথমেই আমাকে লক্ষ্য করে বরের বাক্যবর্ষণ, ‘এই যে কেয়া, কতকাল পরে তোমাকে দেখছি, বাহ্ বেশ সুন্দর চেহারা হয়েছে তো। নাথিং লাইক ম্যারেজ অ্যান্ড মাদারহুড। মেয়েদের ডেস্টিনি। হা হা।’

যেন সেই পার্কসার্কাসের বাড়ি, যেন গুরুজনরা কেউ ঘরে নেই এমন ভঙ্গি। আমি মৃদু হাসি, উত্তর দিই না। ওঙ্কার হাত জোড় করে মাসিমা মেসোমশাইকে নমস্কার করে। আফতাব একটু নীচু হয়ে হাত তুলে সালাম না কী করল ভগবান জানে। একেবারে অড্। হাবভাবে কেমন বেখাপ্পা।

রেজিস্ট্রার ভদ্রলোকের মুখের মেঘ আরো ঘন হয়। ‘ইনিই কি পাত্র? তাহলে আর দেরি না করে শুরু করা যাক। দায়সারা গোছের ভঙ্গিতে করণীয় কর্মটি করলেন, আফতাবের ভঙ্গি মানানসই, যেন অফিসের কোনো বিরক্তিকর ফাইলে শেষ পর্যন্ত সই করতে বাধ্য হচ্ছে। পাত্র, পাত্রী, সাক্ষী সকলের যথাযথ ভূমিকা পালন সমাপ্ত। মাসিমার চোখ সজল, মেসোমশাই বিষাদের মূর্তি। প্রায় শোকের আবহ হাল্কা করতে হেনা বলে, ‘ইস্ ভুল হয়ে গেল, দুটো মালা নিয়ে আসা উচিত ছিল। অন্তত মালাবদলটা হতে পারত।’

‘না না ওসব শুভদৃষ্টি মালাবদল টদল আমার বরদাস্ত হয় না বলেই দিয়েছিলাম।’ আফতাবকে হেনা ফট করে যুতসই জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই ‘আশা করি আপনাদের বিবাহিত জীবন সুখ ও শান্তির হবে’, বলে রেজিস্ট্রার ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

‘আমরা সকলের জন্য দুপুরে খাবার ব্যবস্থা করেছি।’ মেসোমশাই জানান।

‘না না আমি তো বললাম আমাকে চন্দনগর...’

‘বেশ তো খেয়েদেয়ে যান, বেলা হয়েছে, পৌঁছতে পৌঁছতে তো বিকেল হয়ে যাবে আপনার। সব রেডি আছে।’ মাসিমা উঠে দাঁড়ান, সঙ্গে শর্বরীও। খাবার টেবিলে মামুলি কথাবার্তা, ওঙ্কার আফতাব কে কোথায় পোস্টেড, রাইটার্সে পলিটিক্সের হালচাল এবং সবেচেয়ে নিরাপদ সাবজেক্ট, দেশের অবস্থা। রাজনীতি বাঙ্গালির সামাজিক আদান প্রদানের শেষ অবলম্বন। যেন বাই চান্স কিছু মানুষ একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া

করছে, কোনো সামাজিক তাৎপর্য নেই, নেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের আলোছায়া। বিদায়ের সময় শর্বরী আর আফতাবকে বলি, 'আমরা অনেক কাল ধরে আজকের দিনটার প্রতীক্ষায় ছিলাম। সব ভালো যার শেষ ভালো।'

হেনা যোগ করে, 'শেষ কোথায় রে, এই তো সবে শুরু। কী বলেন ওঙ্কারবাবু?' ওঙ্কার হাসতে চেষ্টা করে, 'তা যা বলেছেন।'

'প্লিজ কিপ ইন টাচ।' আফতাব হঠাৎ খুব ফরম্যাল।

'আরে ভুলে গেলেন নাকি শর্বরীর আমি কলিগ, রোজ দেখা হয় আমাদের, চলি রে। কলেজে বলেছিস কাউকে, না?

ও এখন তো গরমের ছুটি। ঠিক আছে কলেজ খুললেই তাহলে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো।'

'এক বাক্স সন্দেশ অন্তত নিয়ে যাস ইতরজনের জন্য।' যথারীতি হেনার ফোড়ন কাটা। আমাদের দুজনেরই শর্বরীর দিকে চেয়ে শেষ কথা, 'ফোন করিস কিন্তু। তোর নম্বর পালটালে জানাস।'



কিছুদিন যোগাযোগ নেই আমাদের। কলেজ খোলার আগের দিন কলকাতায় ফিরেছি। রাতে শর্বরীকে ফোন করতে যাচ্ছি এমন সময় ওরই ফোন। 'তোর কথা এক্ষুনি ভাবছিলাম। টেলিপ্যাথি। তা কী খবর সব বল।'

বিয়ের পরদিনই মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হোসেনের সাত দিনের জন্য দার্জিলিং যাত্রা, হোটেল উইন্ডারমেয়ারে অবস্থান, শর্বরীর হিমালয় ও অফতাবের তার সান্নিধ্য উপভোগ।

'জানিস ও হিলস্টেশান একদম পছন্দ করে না, নেহাত আমার খুব শখ ছিল দার্জিলিং বেড়ানো। তাই ব্যবস্থা করল।'

'একেবারে লাভিং হাজব্যান্ড।'

'যা বলেছিস।'

অনেক দিন পর তার গলায় উৎসাহের সুর। না তার বেশি। একেবারে গদগদ। আগেই ঠিক হয়ে গেছে আম্মির সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকা নববধূ বা তার শাশুড়ি, কারো পক্ষেই খুব সুখকর হবে না। তার ওপর সেখানে একতলাটা এখন দখল করে আলাদা সংসার পেতেছে নাদিরা। ওদের বিয়ের কথাতেই ওঙ্কারের মায়ের ননস্টপ কান্না আর বাবার ননস্টপ মেজাজের পরিণতি একজনের হার্ট অ্যাটাক, অন্যজনের স্ট্রোক। ওঙ্কারকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার আইনি পদক্ষেপ নিতে নিতে দুজনে খতম। নাদিরার মন্তব্য 'দেয়ার ইজ জাস্টিস।' কিন্তু সম্পত্তি বলতে তো উত্তর কলকাতার এঁদো গলিতে একটা আড়াইতলা বাড়ি, সাকুল্যে চারখানা শোবার ঘর, একতলায় রান্না খাওয়া এবং কলঘর। তার কাগজকলমে মালিকানা দু ভাইয়ের। সেখানে বাস করবে নাদিরা হোসেন, যার তিন পুরুষ রিয়েল এস্টেটের ব্যাবসায় পার্কসার্কাস রিপন স্ট্রিট ধর্মতলা প্রায় কিনে ফেলেছিল! অসম্ভব। ওঙ্কার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের সরকারি আবাসনে ফ্ল্যাটের জন্য চেষ্টা করতে গিয়েছিল। না, তাও চলবে না। টিপিক্যাল হিন্দু পাতি মিডল ক্লাস ব্যাপার। আসলে স্টেট সিভিল সার্ভিস যে ওই শ্রেণিরই জীবিকা সেটা নাদিরা হোসেন ভাইজানের প্রতি অন্ধ ভক্তিতে এতদিন সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি। আপার মিড্‌ল্ ক্লাস হিন্দুর চয়েস কর্পোরেট সেক্টর, বিদেশ নিদেনপক্ষে অল ইন্ডিয়া সার্ভিস। অতঃপর নাদিরার পিতৃগৃহে পার্মানেন্ট অবস্থান। ওঙ্কার ডিস্ট্রিক্টে আপতত পোস্টেড হয়ে ঘরজামাইয়ের স্টেটাসটা এড়িয়ে রয়েছে।

না, বাড়ির নববধূ শর্বরীর তাতে একেবারে অসুবিধা হয়নি। পরিবারের সেরা মেধাবী ছাত্র কিশোর আফতাবকে তার পিতামহ বেকবাগানে একটি ছোটো বাড়ি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেটার পুরনো ভাড়াটেকে পুলিশের ভয় এবং কিছু থোক টাকা, অর্থাৎ সিলভার ও বুলেটের যৌথ ম্যাজিকে খালি করে নিয়ে আফতাবের দারুণ চটজলদি রেনোভেশান। বাপ ঠাকুর্দার কনস্ট্রাকশান প্রতিভার ছিঁটেফোঁটা তার মধ্যেও তো রয়েছে। মডার্ন বাথরুম, রংটং, পার্কসার্কাসের বাড়ি থেকে আমদানি পুরনো ভালো কাঠের ফার্নিচার এবং নোকর চাকর। শর্বরীকে অভ্যর্থনার জন্য রেডি একটি সাজানো সংসার।

'আমি একেবারে বোল্ড আউট। এত কনসিডারেট হাজব্যান্ড ভাবা যায়, তুই বল।' আমি বলি, 'হ্যাঁ সত্যি অসাধারণ।' মনে মনে ভাবি ক'পুরুষের টাকা যদি না থাকত তাহলে দৃশ্যটা কেমন হতো।

এদিকে শর্বরী শৈশব থেকে পড়াশুনা ছাড়া আর কিছুতে কখনো মন দেয়নি। মাসিমা ধরেই নিয়েছিলেন, ওকে তো পুরুষের মতো চাকরিবাকরি করেই জীবন কাটাতে হবে। কাজেই আমাদের দেশে পুরুষের মতোই ঘরের কাজে আনাড়ি রয়ে গেছে। আফতাব ঠিকই আঁচ করে নিজেই পুরো সংসারটা হাতে তুলে নিয়েছে। শর্বরী যেন গেস্ট। ক'দিন বাদে গিন্নিপনার পাঠ শুরু, মেনু ঠিক করা। সেটাতেই প্রথমে ঠোক্কর। এখন তো আর এসপ্রেসো কফি আর কাবাব হলেই চলে না। ডাল ভাত মাছ সুক্তো চচ্চরি ডালনা রান্নায় পার্কসার্কাসের পাঠানো রাঁধুনে একেবারেই ফেল। আমাকে জিগ্যেস করে করে তারা বাঙ্গালি রান্নায় হাতে খড়ি।

তবে সংসারের খুঁটিনাটিতে রপ্ত হবার আগেই বিয়ের পরবর্তী পর্ব, মাতৃত্ব এসে গেল। বোধহয় তাদের দুজনেরই অতি

আকাঙ্ক্ষিত বলেই মা বা শাশুড়ির তত্ত্বাবধান, যত্নআত্তি ছাড়া দিব্যি পর পর দুটি ছেলের মা হয়ে গেল শর্বরী। বড়োটি আবার চমৎকার ফুটফুটে, একেবারে দিদিমার রূপ পেয়েছে, ছোটোটি অনেকটা মায়ের মতো। যেন আফতাবের কোনো অবদান ছাড়াই এদের জন্ম। যোধপুর পার্কে নাতিদের নিয়ে উল্লাস। শর্বরীর পিতৃগৃহে সাদর পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ক'বছর আমাদের সব দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কাকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে আফতাবের একেবারে আদর্শ স্বামীর আচরণ।

একমাত্র কাঁটা নাদিরা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু থেকে তার টিপিক্যাল পিছনে লাগা ননদিনী রায়বাঘিনিতে রূপান্তর। গায়ে পড়ে বাড়ি এসে অন্তর টিপুনি দিয়ে কথা বলে, ভাইজানকে শাদি করে কী সুখেই আছে শর্বরী, হিন্দু সোসাইটিতে তার তো বিয়েই হতো না, হলেও কোনো পাতি টিচারফিচার বর জুটত। এই স্টাইলে থাকত! ভাইজানের শখ দেখ, সোফাগুলোর নতুন কভার থেকে মানানসই পরদা। তবে হ্যাঁ শাদি হতে না হতে হিন্দুর মেয়ে দুদুটো আল্লার বান্দা পয়দা করে ফেলেছে। 'শর্বরী ইউ হ্যাভ ডান্ ইয়োর ডিউটি।'

'তাও তো ভাই সব মেয়ে পারে না', সন্তানহীন নাদিরাকে কাঁটা ফুটিয়ে শর্বরী বলতে পারত। নাহ্ পারে না। এই সব মেয়েলি তরজায় সে একেবারে অপরাগ। কাজেই নীরবে শোনে, কী খরচাই না ভাইজান করল হাত থেকে। সেরা নার্সিং হোমে ডেলিভারি, কেন পিজিতে থাকলেই তো সরকারি খরচে বলতে গেলে বিনে পয়সায় বাচ্চা হতো । তারপর দু দুটো আয়া দু' ছেলের। শুধু তাই, বিবির জন্য একটা স্টাডিও হয়েছে। আর সে কি না শাদি নিয়ে কত জল ঘোলা করেছিল ইত্যাদি।

স্বামীর কাছে রিপোর্ট দেওয়া ছাড়া শর্বরী আর কিছু করতে পারে না। আফতাব শুনে বলে, 'নাদিরার এখনো বাচ্চাকাচ্চা হলো না, ওঙ্কারের ফিনান্সিয়াল অবস্থাও তেমন ভালো নয়, ওর একটু জেলাসি হতেই পারে। তা ছাড়া ওঙ্কারকে সমানেই গভর্ণমেন্ট দূর দূর ডিস্ট্রিক্টে ফেলে রাখছে, ওসব আঘাটায় ছুটিতেও অনেক সময় নাদিরা গিয়ে থাকতে পারে না। ঠিকমতো ফ্যামিলি লাইফই ওদের হচ্ছে না। বি সিম্প্যাথেটিক। আমরা কত লাকি। আমি দেখ সাউথ বেংগলে রয়েছি। ইউকএন্ডে আসছি। কলকাতায় থাকা, রেগুলার ফ্যামিলি লাইফ, সমস্যা নয় ওদের মতো। কাজেই ওর গায়ের জ্বালা তো হবেই। একটু সহ্য কর।'

আফতাবের মতো আমিও নাদিরার নাক গলানো ব্যাপারটা হাল্কা করে দেখি, ফ্যামিলি থাকলেই থাকবে ফ্যামিলি পলিটিক্স, যেমন মাথা থাকলেই মাথা ব্যথা।

আসলে ততদিনে আমার মধ্যপ্রদেশ যাতায়াত ও আধখেঁচড়া সংসার ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। হেনার স্বামী বম্বেতে ভালো চাকরি পেয়ে চলে গেলে হেনাও কিছুকাল কলকাতা বম্বে করে শেষে ওখানে স্থিতু, দুটি বাচ্চা নিয়ে আপতত বাড়িতে। আমার আর কলকাতায় তেমন ভালো লাগে না। বন্ধুদের সঙ্গ আর আগের মতো মনপ্রাণ দখল করে নেই। এত দিনের ভাব, এত অন্তরঙ্গতা, পাশাপাশি কাজ। তা সত্ত্বেও যার যার সংসারের দুর্নিবার স্রোতে আমরা পরস্পরের থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছি, নিজেদেরই অজান্তে।

হঠাৎ এক রাতে শর্বরীর ফোন, 'কথা আছে।'

আমার শ্বশুরবাড়িতে তখন প্রবাসী দেওর ও জা ক'দিনের জন্য এসেছে। নিজের বন্ধু নিয়ে বসার স্পেস কই। ওর বাড়িতে আয়া চাকর বাকর। প্রাইভেসি নেই। শেষে কলেজে ক্লাস সেরে আমরা একটা রেস্তোরাঁয় বসি। 'কী ব্যাপার রে?'

'আবার সেই পুরনো ঝামেলা। মুসলমান হতে হবে।'

'সে কীরে। বিয়ের আগেই তো ফাইনাল হয়ে গিয়েছিল। তুই মুসলমান হবি না। যার জন্য তোরা সিভিল ম্যারেজ করলি। নতুন করে কী হলো?'

'আমি মুসলমান না হলে নাদিরা সব সম্পত্তি পাবে, আফতাবকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন আম্মি।'

'সে আবার কী। বুড়ির কি সব বাপের সম্পত্তি নাকি যে ইচ্ছেমতো দেবেথোবে? প্রপার্টি তো আফতাবের বাপ ঠাকুরদার। উনি সেকেন্ড ওয়াইফ মাত্র। সে রকম করতে পারেন নাকি? এই যে শুনি মুসলমানদের আইনে পরিবারের সকলে ভাগ পায়, কাউকে বঞ্চিত করা যায় না।'

'শোন আসল ব্যাপার হলো ওর বাবার ফার্স্ট ওয়াইফের ছেলেমেয়েরা সব পাকিস্তানের সিটিজেন। পাকিস্তান আমাদের এনিমি। পাছে এনিমি প্রপার্টি হয়ে যায়, আব্বাজান তাই বেঁচে থাকতেই আম্মির নামে সব করে দিয়ে গেছেন। যাতে ওরা তিনজন যারা ইন্ডিয়ায় আছে, তারাই সব পেতে পারে। প্রপার্টি তো অনেক। শুধু পার্কসার্কাসের নিজেদের বসত বাড়িটাই নয়, রিপন স্ট্রিট, ধর্মতলায়ও ওদের ম্যানশান আছে, দেশেও জমিজায়গা চাষবাস। রেগুলার ভালো ইনকাম। এখন আম্মির হয়ে আফতাবই দেখাশুনা করে, ন্যাচারালি শেয়ারও পায়। সে সব চলে যাবে। লাকিলি বেকবাগানের বাড়িটা আগেই আফতাবের নামে ছিল। তাই মাথার ওপর ছাদটা আছে। রোজ এ নিয়ে অশান্তি। আমি বলি, যদি সেরকম পরিস্থিতি দাঁড়ায়, এক্সট্রা ইনকাম দরকার, তাহলে এই বাড়িটা আগের মতো ভাড়া দিয়ে আমরা তো গভর্নমেন্টের বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের কমপ্লেক্সে একটা কোয়ার্টারে থাকতে পারি। তোমার কত কলিগ তো থাকে। তাতে কী প্রচণ্ড রেগে গেল, সেগুলো নাকি তার স্ট্যান্ডার্ডের নয়। ও যে নাদিরার মতোই ক্লাস কনশাস আগে বুঝতেই পারিনি। হ্যাঁ, চাকরবাকরদের সঙ্গে একটু রাফ্, তারাও সর্বদা জী হুজুর করে। ভেবেছিলাম ওটা মুসলমানি কায়দা।'

'তারপর?'

'প্রতিপদে কথা শোনায়, এত বছর মুসলমানের বিছানায় শুচ্ছ, মুসলমানের রান্না খাচ্ছ, মুসলমানের সংসার করছ। তোমার দুই ছেলে মুসলমান। আমির আর কামালকে তুমি ঢং করে হিন্দু নামে ডাকো, অমল কমল। তাদের শিখিয়েছ বাবা মা ডাকতে, আব্বু আম্মি নয়। তাতে কী তারা হিন্দু হয়ে যায়? তোমার হিন্দুয়ানি হিপোক্রিসি নয়তো কী।'

'কী জবাব দিলি?'

' প্রথম প্রথম কান্না আসত, কিচ্ছু বলতে পারতাম না। এখন বলি, আমার ধর্ম বিছানায় নয়, খাবার হাঁড়িতে নয়। আমার ধর্ম আমার মনে, আমার বিশ্বাসে। ঠাকুমার লক্ষ্মীজনার্দন আমার চোখের সামনে নেই, আছে আমার মনের মধ্যে। সে মন্দির কোনো সুলতান মাহমুদ, মহম্মদ ঘোরি, কোনো খিলজি, ঔরঙ্গজেব ভাঙতে পারবে না। ধর্ম ত্যাগ করার চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভালো।'

'কী বলে আফতাব?'

'একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। চীৎকার করে, পাঁচশো বছর যারা আমাদের পায়ের তলায় ছিল তাদের মুখে বড়ো বড়ো কথা মানায় না। আরো খুব বাজে বাজে কথা বলে আমি মুখে আনতে পারবো না। আমাকে ধরে এমন ঝাঁকুনি দেয় যেন মারার জন্য হাত নিশপিশ করছে নেহাত পারছে না। যেন একেবারে অন্য মানুষ। জানিস আমার ভয় করে। রূপকথার গল্পে থাকে না কোনো হিংস্র জানোয়ার মানুষের চেহারা নিয়ে শিকার ধরেছে তারপর আসল মূর্তি বেরিয়ে আসছে? আমি তো কী করব বুঝতে পারি না। তুই ভাব ছেলেরা আছে। সাড়ে তিন বছরের কমল ভাগ্যিস আয়ার কাছেই বেশির ভাগ সময় থাকে। কিন্তু পাঁচ বছরের অমল আমার নেওটা, সব কথার মানে বুঝতে না পারলেও বাবা যে আমার ওপর রাগ করছে, টের পায়। ভয়ে সিঁটিয়ে যায়, কখনো কান্নাকাটি করে। আফতাবকে বলি, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ কর। তাতে আরো ক্ষেপে যায়, 'তুমিই এ অবস্থার জন্য দায়ী। তোমার জেদ ওদের ফিউচার ডেস্ট্রয় করবে।' এভাবে দিনের পর দিন চলছে।'

'হোয়াট অ্যাবাউট দ্য লাস্ট রিসর্ট, শয্যা? যেখানে সাধারণত সব দাম্পত্য কলহের মধুরেণ সমাপয়েৎ।'

খানিকক্ষণ নীরব থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'সেটা হয় নেই, নয় একটা বিভীষিকা। এত ভায়োলেন্ট এত ইনসাল্টিং ভাবতে পারবি না। গালাগালি খিস্তি হাজার বছর ধরে হিন্দু মেয়েদের এভাবেই তারা ভোগ করেছে। সে আলাউদ্দিন খিলজি, আকবর বাদশা। এ সব না বললে ক্লাইম্যাক্স হয় না। বিজেতারা যেমন পরাজিত জাতির মেয়েদের রেপ করে নিজেদের দখলদারি সাব্যস্ত করে। ও বিজয়ী মুসলমান, আমি বিজিত হিন্দু, এটাই একমাত্র সত্য। আবার সকালে উঠে নরম্যাল যেন কিছুই অস্বাভাবিক ঘটেনি। মাঝে মাঝে মনে হয় আর নিতে পারছি না। কী করে ওর সঙ্গে থাকবো বল্?'

শর্বরীর চোখে জল। চারদিকে লোকজন। স্তম্ভিত আমি ওর হাতের ওপর হাত রাখি। এমন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ভাবতে পারি না, বুঝতেও পারি না। হ্যাঁ লোকেরা মাতালটাতাল হয়ে বউকে পেটায়, রেপ্ করে শুনেছি। কিন্তু ভদ্রঘরে শিক্ষিত শ্রেণিতে মদটদ না খেয়ে এমন অত্যাচার আবার ঠাণ্ডা মাথায়! সত্যি পুরুষ চরিত্রে আগ্রাসনের ভিত সেই আদিম যুগ থেকে রয়ে গেছে। এদের জানা অসম্ভব। চুপ করে থাকি। খানিক বাদে বলি, 'ধৈর্য ধর। শান্ত থাকার চেষ্টা কর। বিছানাটা সব নয়। ইগনোর কর এক্সপিরিয়েন্সটা। আফতাবকে বোঝা তুই হিন্দু জেনেই সে ভালোবেসেছিল, ধর্ম ছাড়বি না সিদ্ধান্ত পরিষ্কার শুনেই তোকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। সে সব কথা মনে নেই?'

'তুই কি ভাবিস এ সব আমি ওকে বলি না? হাজার বার বলি। কী উত্তর দেয় জানিস? হিন্দুরা সকলেই শেষমেশ মুসলমান হয়, তাই ও বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি চিরকাল এত অ্যাডামেন্ট এত একরোখা থাকব দুটো বাচ্চা হওয়ার পরও, সেটা ও ভাবতেই পারেনি। মেয়েরা ছেলে-মেয়ের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দেয়, তাই তড়িঘড়ি বাচ্চাকাচ্চা চেয়েছিল। ওর সব ক্যালকুলেশানই আমি মাটি করে দিচ্ছি। সোসাইটিতে সকলের সামনে ওর মাথা হেঁট। বোন দিব্যি হিন্দুকে কনভার্ট করতে পারল আর বড়ো ভাই হয়ে ও নিজের বউকে মুসলমান করতে পারল না।'

'কী উত্তর দিস?'

'প্রশ্ন করি, তোমার ইগোতে লাগছে বলে আমি চোদ্দ পুরুষের ধর্ম বিসর্জন দেবো, ভাবো কী করে। তাছাড়া ইগো কি খালি তোমারই থাকা লেজিটিমেট? আমার ইগো থাকতে পারে না? আমার সমাজ নেই? সেখানে আমার, আমার বাবামা আমার পরিবারের মুখ দেখানোর সমস্যা নেই? আমি হিন্দু বলে এসব তুচ্ছ? কী করল জানিস? বেড সাইড টেবিল দুটোয় বিয়ের সময় দুটো দারুণ ল্যাম্প কিনে সাজিয়েছিল, পোর্সেলিনের। সেগুলো ঠাঁই ঠাঁই করে মেঝেতে ছুড়ে ভাঙল। তারপর বেরিয়ে গেল। দুদিন বাড়ি এল না।'

'কোথায় থাকল, পার্কসার্কাসের বাড়িতে?'

'আবার কোথায়।'

'সেখানে নিশ্চয় আম্মি আর নাদিরার ফিনিশ শর্বরী জয়েন্ট অপারেশান চালু। শোন্ পরিস্থিতি জটিল। আমার মনে হয় মাসিমা মেসোমশাইকে একটু কনসাল্ট কর। ওঁরা তো নাতিরা হওয়ার পর থেকে অনেকটাই নরম।'

'খেপেছিস? মরে গেলেও আমি ওঁদের কাছে এসব কথা বলব না। তুই বুঝতে পারছিস না ওঁদের সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে যাকে বিয়ে করেছি সে যে আমাকে এভাবে ট্রিট করছে সে কথা স্বীকার করা মানে তো আমি হেরে গেলাম, ভুল করেছি

প্রমাণ হয়ে গেল, ঠিক যা ওঁরা বলেছিলেন।'

'দেখ্ বাবা-মায়ের সামনে ছেলে-মেয়ের অত ইগো থাকা উচিত নয়। তাঁরা তো নিজেদের অত অপছন্দ সত্ত্বেও তোর নির্বাচন মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তুই সন্তান। ভুল করছিস মনে করলেও তাঁরা তোকে পরিবার থেকে বের করে দেননি। অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মারা এটা করে থাকেন। তাছাড়া নাতিদের ওঁরা কত ভালোবাসেন সেতো তুই বহুবার বলেছিস। অন্যদিকে দেখ্ আফতাবের মা নাতিদের কাছে টানতেই পারলেন না, পাছে নাদিরা মাইন্ড করে। তোরই তো লাভ, অমল কমল একেবারে দাদু-দিদা বলতে অজ্ঞান। আজকে তোর এমন বিপদে তাঁরা পাশে দাঁড়াবেন বলেই আমার বিশ্বাস।'

'ওঁদের কাছে আমার ব্যর্থতা স্বীকারের চেয়ে মরে যাওয়া ভালো...'

'বার বার মরার কথা বলিস না তো। ছেলে দুটোর কথা ভাববি না খালি নিজের মানসম্মান বা বলা উচিত অভিমান নিয়ে থাকবি? বি প্র্যাকটিক্যাল। এটা সিরিয়াস সিচুয়েশান। তোর হাজব্যান্ড তোকে কনভার্ট করতে জবরদস্তি করছে, অ্যাবিউজ করছে। সরকারি চাকুরে হয়ে দেশের আইনকানুনকে কলা দেখাচ্ছে। কী ভাবে ও? তোকে স্টেপ নিতেই হবে। তার জন্য সবচেয়ে আগে তোর একটা নিরাপদ আশ্রয় চাই। কোথায় পাবি সঙ্গে সঙ্গে? বাবা মা তো বাইরের লোক নন, তাঁদের কাছে হারলেই বা এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। লাইফ ইজ আ লং কম্প্রোমাইজ, শর্বরী।'

'কেয়া, তুইও কম্প্রোমাইজের কথা বলছিস? আফতাবের মতো? থাক্, তোকে আর বিরক্ত করব না। আমি একাই ডিসিশান নেবো।'

'চিরকাল তাই নিয়েছিস, শর্বরী। যা ভালো বুঝিস কর। তবে আমাকে বলিস। না, বিরক্ত হবো না। এতদিনের সম্পর্কের সুবাদে তোর ভালো-মন্দ জানার অন্তত অধিকার আছে বলে মনে করি। অবশ্য তুই করিস কিনা জানি না।' আমার হাতটা ধরে শর্বরী, কিছু বলে না। দুজনে চুপচাপ বসে থাকি অনেকক্ষণ। তারপর যার যার বাড়ি।

অতঃপর আফতাব—শর্বরী নাটকের পরবর্তী দৃশ্য।

'আম্মি সামনে সপ্তাহে উকিল ডাকছেন উইল করবেন। আমাকে আলটিমেটাম দিয়েছেন। তার আগে তুমি মুসলমান হবে নাহলে নাদিরা সব পাবে আমি বঞ্চিত হবো, তোমার ছেলেরা কিচ্ছু পাবে না।'

'আমার ছেলেদের সম্পত্তির প্রয়োজন নেই।'

'বটে! বাংলা সিনেমার ডায়লগ! টাকার ভ্যালু তুমি বোঝ? কোনোদিন সংসার চালিয়েছো? আমাদের এই এস্টাব্লিশমেন্ট, এতগুলো কাজের লোক গাড়ি ড্রাইভার এই স্টাইলে থাকা খাওয়া, এসব আমার স্টেট সার্ভিসের আর তোমার প্রাইভেট কলেজের মাইনেতে হয়? নিজে তো বইখাতা আর ছেলেদের ছাড়া আর কোনোদিন কিছু জানো না। সংসারে কত খরচ হয় খেয়াল আছে?'

'এত খরচ না করলেও বাঁচা যায়। লোকে তো বাঁচে।'

'হ্যাঁ বাঁচে, যারা এত খরচে কখনো অভ্যস্ত নয় তারা। আমি বা আমার ছেলেরা তাদের মধ্যে পড়ে না। প্রশ্নটা আদৌ উঠছে কেন? তোমার অন্যায় জেদ, আর ইগোর জন্য। দেখ সুখ আশমান থেকে পড়ে না। পাঁচজনের সঙ্গে মানিয়ে চললে তবেই সুখ। কোনো ইনস্টিটিউশানে সকলে সমান হয় না, স্কুল-কলেজ, আফিস-কাছারি সব জায়গায় কারো না কারো কথা অন্যদের মানতে হয়। ঠিক সেই রকম ফ্যামিলিতেও। দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে হাজব্যান্ড ওয়াইফের সমান রাইট্স সমান স্টেটাস হয় না। অ্যাডজাস্ট সর্বদা মেয়েদেরই করতে হয়, সব সোসাইটিতে। নইলে ফ্যামিলি টেকে না।'

'তোমার নিজের বোন কতটুকু অ্যাডজাস্ট করেছে? সে তো স্বামীর নর্থ ক্যালকাটার গলির বাড়ি তার এক রাত্রি বাসেরও যোগ্য মনে করেনি। ননদ, ভাসুর, জা কারো সঙ্গে মৌখিক সম্পর্ক পর্যন্ত রাখে না, সবাই নাকি কেরানি মার্কা পাতি বাঙালি। ক'দিন আগে এসে ফলাও করে বলে গেল গরমের ছুটিতে কুচবিহারে ওঙ্কারের ওখানে গিয়েছিল, প্রত্যেকটা শুক্রবার অফিস টাইমে ওঙ্কারকে মসজিদে অন্য পাঁচটা মুসলমানের সঙ্গে নমাজ পড়িয়েছে। শহর সুদ্ধ লোক দেখুক কত সাচ্চা মুসলমান হয়েছে এসডিও সাহেব।'

'ওর কেসে না হয় ওঙ্কার অ্যাডজাস্ট করেছে...'

'অর্থাৎ অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপারটা হিন্দু মুসলমানের, পুরুষ-নারীর নয়।'

'আবার তুমি সেই রিলিজিয়ান টেনে আনলে। তোমার একটা অবসেশান হয়ে গেছে। সব কিছুতে রিলিজিয়ান।'

'কারণ তোমাদের জীবনের সব কিছুতেই রিলিজিয়ান। ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যাওয়া, হাত-মুখ, পায়ের পাতা, নাক-কান ধোওয়া থেকে খাওয়াদাওয়া, স্ত্রীর সঙ্গে শোওয়া, সব ইসলামের নির্দেশে। ক্লাসমেট কী কলিগদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তোমাদের সমস্ত আচার আচরণ ভাবনা চিন্তা সব ইসলামের জন্য। যেটুকু নয় বলে বাইরে থেকে মনে হয় সেটুকু ইচ্ছাকৃত অভিনয়।'

আফতাবের মুখ পাথর। 'তুমি কি বলতে চাও তোমার সঙ্গে বা ওঙ্কারের সঙ্গে আমি আর নাদিরা অ্যাক্টিং করেছি?'

'কী করেছ বা করনি নিজেরাই ভালো জানো।'

'সব কিছুর একটা লিমিট আছে শর্বরী। তুমি সব লিমিট ছাড়িয়ে গেছ। এরপর তোমার সঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়।' আফতাব উঠে বেরিয়ে যায়। তিন দিন বাদে ফোন করে বলে তাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের পাশবই চেকবই রেখে গেছে। প্রতি

মাসে ও যথারীতি টাকা জমা দেবে। শর্বরী যেন সংসার চালিয়ে নেয়। আপাতত ড্রাইভার পার্কসার্কাস আর বেকবাগান দু বাড়িতেই অ্যাডজাস্ট করে ডিউটি করবে। ও আলাদা থাকবে, পার্কসার্কাসের বাড়িতে। তাদের এই বিয়ে টেকানোর কোনো মানে আছ কিনা এখন ভেবে দেখা দরকার।

ছয়

জলে পড়ল শর্বরী। এতকাল অর্থনৈতিক স্বাধিকারসম্পন্ন স্ত্রী কলেজের মাইনের চেকটি স্বামীর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছে। অ্যাকাউন্টে চেক জমা দেওয়া, টাকা তোলা, কাজের লোকের মাইনে, বাজার দোকানের খরচ, ছেলেদের জামাকাপড় বইখাতা কেনাকাটার ব্যবস্থা, প্রয়োজনে ডাক্তার ডাকা, ওষুধপত্র সব কিছুই এতকাল আফতাব করে এসেছে। এমনকী যখন কৃষ্ণনগরে পোস্টেড ছিল তখনও। বিয়ের পর কোনো দিন নিজে চেক পর্যন্ত চাকুরে শর্বরী কাটেনি। হ্যাঁ, দায়িত্ব যেমন নেয়নি তেমনি দাবিও কখনো কিছু করেনি। সত্যি কথা বলতে কী দরকারও হয়নি। স্ত্রী ও ছেলেদের জন্য আফতাবের সর্বদা দরাজ হস্ত। শর্বরীর বাবা-মায়ের জন্য পুজোয় কেনাকাটা, স্বামী ছেলে-মেয়ে নিয়ে চন্দ্রিমা কলকাতায় এলে তাদের উপহারের কথা আফতাবই নিজে থেকে বলেছে, এমন কী দোকানে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে। যেমন করে ঈদের সময় তার দিকের সকলের জন্য।

মাঝগাঙে কাণ্ডারিহীন নৌকোয় দুটি বালক নিয়ে এক নারী। শর্বরী দিশেহারা। কাজের লোকেরাও দিব্যি বাড়ির আবহ, হুজুরের ভিন্ন বসবাসের সম্যক অর্থ বুঝে গেছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস। কাজকর্মে ঢিলে। ঘরদোর আর ঝকঝকে তকতকে নেই, ছেলেরা আর সর্বদা ফিটফাট থাকে না। শর্বরীর কথা এক কান দিয়ে শুনে তারা অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। সবচেয়ে মুশকিল অমল আর কমলকে নিয়ে। বাবা কোথায়, অফিস থেকে ফিরছে না কেন। শুধু নাওয়াখাওয়া শোওয়ায় বায়না। কোনোক্রমে সপ্তাহ দুয়েক শেষ। এক শুক্রবার সকালে আফতাব জানায় ড্রাইভারকে বলে দিয়েছে আজ ইস্কুল থেকে ফিরে আমির ও কামাল ও তাদের আয়া যেন পার্কসার্কাসের বাড়িতে চলে যায় জামাকপড় নিয়ে। ওখান থেকে সোমবার স্কুল করে এ বাড়িতে আসবে।

শর্বরীর রাতে ঘুম আসে না। অথচ আগেও তো সপ্তাহে কয়েক রাত একা থেকেছে, আফতাবের মফস্সলে পোস্টিংঙের সময়। তখন এত নিঃসঙ্গ লাগেনি। প্রতি রাত্রেই প্রায় ফোনে কথা হতো, শর্বরীর, সংসারের, ছেলেদের দৈনিক বৃত্তান্ত। সেও শেয়ার করত আফতাবের কাজের খুঁটিনাটি। এখন একাকিত্ব মানে নীরবতা। ছাড়াছাড়ি। এভাবে কতদিন চলতে পারবে। বিকল্প সুস্পষ্ট। হয় মুসলমান হয়ে দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফেরা অথবা স্থায়ী বিচ্ছেদ। ডিভোর্স মানে এই একা জীবন, বাবা-মার খেদ ও ছেলেদের নীরব সরব নিত্য অভিযোগের মোকাবিলা। ছুটির দিনে আফতারের তাদের সঙ্গ দাবি ন্যায্য, ছেলেরা তার একার নয়।

শর্বরী কেয়াকে কিছু বলে না, জানে সে আজকাল তার নিজের দুটি সংসারের সমস্যায় হিমশিম। হেনা বম্বেতে, তার চিঠিতে কলকাতা থেকে গিয়ে সেখানকার জলকষ্ট আর স্থানাভাব নিয়ে দৈনন্দিন যন্ত্রণার ফিরিস্তি। শর্বরীর দাম্পত্য সংকট তার কাছে যেন অন্য গ্রহের ঘটনা। তাছাড়া এ বিষয়ে নিজের মতামত বহুকাল আগেই সে জানিয়েছে, কিক দ্য...আউট। কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যান শোনার পাত্রী সে নয়। বাকি রইলেন বাবা-মা, তাঁদের বলার প্রশ্নই ওঠে না, অসম্ভব। অষ্টপ্রহর যেন একটা বোঝা মাথায় চেপে আছে। হালকা হবার কোনো উপায় নেই। দিন কাটে মাস যায়। নাদিরা এসে এসে শোনায়, 'শর্বরী প্লিজ বাস্তবটা স্বীকার কর, ভাইজান নো লংগার কেয়রস ফর ইউ। তোর এত আত্মসম্মান জ্ঞান, কেন ডিভোর্স করছিস না? আমাদের মতে শাদি হলে কবে ভাইজান তালাক দিয়ে দিত।'

নিরুত্তর থাকে শর্বরী।

আফতাবের পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তার নিজের আলাদা করে কোনোদিনই আদানপ্রদান নেই। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বামীর সঙ্গে হাজিরা দিয়েছে মাত্র। কাজেই এখন তাদের সঙ্গে বাক্যালাপেরও প্রশ্ন ওঠে না। আর বাপের বাড়ি তো থেকেও নেই। একটা মাত্র বোন, একেই দূরে থাকে তার ওপর সে বা তার স্বামী কেউই তার বিয়েটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি, তাদের পারিবারিক পরিধিতে এটা একটা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে পড়ে। আফতাবের বদান্যতা সত্ত্বেও তার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু ভদ্রতায় পরিণত। শর্বরীর মামা কাকা জ্যেঠা বা মাসিপিসিদের প্রতিক্রিয়াও বাবা মায়ের মতো। সখেদে মেনে নেওয়া। বিয়ে শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনে ডাকে নিমন্ত্রণ চিঠি আসে।

তার অতীতের পৃথিবী থেকে সে নির্বাসিত, আবার বর্তমানের দুনিয়াতেও প্রবেশ অধিকার নেই। আছে শুধু অমল কমলকে নিয়ে সংসার আর চাকরি। কাজে আগেই মন দিয়েছে। এবারে সংসারে মন দেয়। পড়াশোনা করা মেয়ে, খাতায় লিখে লিখে সংসার করতে শেখে। মায়ের গৃহিণীপনা মাথায় রেখে প্ল্যান করে। এ সংসারে অতিরিক্ত কাজের লোক। খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা প্রচুর, নোকরচাকর, চাকরানি, আয়া, ড্রাইভার সবাই চারবেলা খায়। জমিদারি স্টাইল কাঁটছাঁট করে মধ্যবিত্ত মাপে একটি ঠিকে মোটা কাজের লোক, পার্টটাইম রাঁধুনি ও দিনরাতের একজন আয়াতে আঁটাতে কোমর বেঁধে লাগে। ড্রাইভারকে কিছু করার উপায় নেই এত পুরনো। এ পাড়ায় ঠিকে ঝি দুস্প্রাপ্য। হিন্দু পাড়ায় ঠিকে কাজের কালচার



থাকে, খেটেখাওয়া গেরস্থ বউ পাওয়া যায়। এখানে বিরল। যদিও-বা পাওয়া গেল, দুদিনেই রান্নার লোক ওসমান কী ড্রাইভার জিয়াদ, কী পাশের বাড়ির চাকর, কোনো না কোনো পুরুষের সঙ্গে ঢলানি আরম্ভ করে। পাঁচ ছেলের মা-ও। একটা বদ্ধমূল ধারণা এদের মাথার মধ্যে হাতুড়ি মেরে ঢোকানো হয়েছে, শ্রমের বিনিময়ে সসম্মান জীবিকা অর্জন মেয়েদের জন্য নয়, পুরুষের শয্যাই তাদের বাঁচার উপায়। শর্বরী অবশেষে সংসারের সব কাজ শিখে যাচ্ছে। ভাগ্যিস স্বাস্থ্যটা মজবুত ছিল।

পরে একদিন কলেজে ফাঁকা স্টাফ রুমে শর্বরীর পরিবর্তিত জীবন যাপনের সংক্ষিপ্ত সমাচার শুনে আমি স্তম্ভিত।

'এত বড়ো কাণ্ড হয়ে গেছে আর তুই কিছু বলিসনি আমাকে।'

'আর কত তোর কাছে কাঁদুনি গাইব। নিজের কর্মের ফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়।'

'বাড়িতে কিছু বলেছিস?'

'না। তবে অমল আর কমল তো মাসে এক রোববার ওঁদের কাছে সারাদিন থাকে। নাতিদের সঙ্গে কথাবার্তায় জেনেছেন তাদের বাবা আর আমার সঙ্গে থাকে না। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন মা। বলেছি আম্মি শয্যাশায়ী, একা নাদিরার ঘাড়ে তাঁর দেখাশুনার সব দায় চাপাতে চায় না, তাই গিয়ে রয়েছে।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজ আর কী ।'

'বিশ্বাস করলেন?'

'করলেন না এমন কথা শুনিনি।'

'তা তুই কী করবি ভাবছিস? ডিভোর্স?'

'না। মা সারদার কথাগুলো মনে করি। যে সয় সে রয়।'

'কিন্তু আফতাব যদি ইনসিস্ট করে?'

'এ তো মুসলমানি বিয়ে নয় যে তিন বার তালাক বলেই বিবিকে বের করে দিতে পারবে। সিভিল ম্যারেজে স্ত্রী রাজি না হলে স্বামীর পক্ষে ডিভোর্স পাওয়া শক্ত।' খুব শান্ত স্থির শর্বরী। আগের মতো ভেঙে পড়া বিধ্বস্ত ভয়ভীত নয়। যেন নতুন এক নারীর জন্ম হচ্ছে।

বলি, 'সেই ভালো। হঠাৎ কোনো ডিসিশান নিস না। ছেলে দুজন তোদের মধ্যে চিরকালের বন্ড, সে কথা ভুললে চলবে না।'

একজাক্টলি। তবে মাসে তিনটে উইকএন্ডে পার্কসার্কাসের বাড়িতে নানি আর ফুফুর কাছে আমার শ্রাদ্ধ শুনছে, সেটা কাউন্টার করতে হবে।'

ক'মাস বাদে শুনি আফতাব ফিরে এসেছে। এখন আবার আগের মতো আদর্শ স্বামী।

'যাক বিরহে পিরিত বাড়ে প্রমাণিত।'

'বিরহটিই নয়। আসল ব্যাপার হলো ইস্ট পাকিস্তানে গণ্ডগোল। ওদের চারজন দাদা-দিদি পাকিস্তানে। দুজন আবার পাঞ্জাবি মানে ওয়েস্ট পাকিস্তানি বিয়ে করেছে, যাদের কোনো খবর নেই। লাকিলি ব্যাংকের দুলাভাই এখন ঢাকায় পোস্টেড। ছোট দিদি তো ঢাকাতেই হোটেলমালিকের বউ। ওরা ছেলেপুলে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। পাকিস্তানিরা নাকি ইস্ট পাকিস্তানে সাংঘাতিক কাণ্ডকারখানা করছে। অথচ ইসলামের ভিত্তিতে দুপক্ষই ইন্ডিয়া থেকে আলাদা হয়েছিল। মুসলমানরা এখন মুসলমানদের অত্যাচারে টিকতে পারছে না। যে পারে সে ইন্ডিয়ায় চলে আসছে। আম্মির ও পক্ষের দুটি ছেলেও ফ্যামিলি নিয়ে এসে হাজির। পার্কসার্কাসের বাড়ি একেবারে গিজগিজ করছে লোকে। উঠোনে তাবু খাটিয়ে থাকতে দিতে হবে এমনই নাকি পরিস্থিতি। তাই আফতাব ফিরে এসেছে।'

ইতিমধ্যে আমরা সবাই ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, টানাপোড়েন ভুলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মেতে গিয়েছি। দেড় কোটি বঙ্গভাষী হিন্দুকে চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে যারা পাকিস্তান কায়েম করেছিল আজ তারাই 'আমার সোনার বাংলা' গেয়ে পাকিস্তানের পিণ্ডি চটকাচ্ছে। এ যে দারুণ রোমহর্ষক নাটক। কাগজে কাগজে ফলাও করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অমানুষিক অত্যাচারের বৃত্তান্ত বেরতে থাকে। সকলে পূর্বের প্রতি সহানুভূতিতে একেবারে গদগদ। যদিও পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধের কারণ পূর্বপাকিস্তানের চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনা, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন আদৌ নয়, কারণ পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালেই বাংলাকে উর্দুর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। তবু বাংলা ভাষাকেই সূচিমুখ করে মুক্তিযুদ্ধের মিথ তৈরি হতে লাগল।

শুধু নাদিরা তাতে শামিল হলো না। তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। একেই সে লেড়কি হয়ে বাপের বাড়ির একটা পুরো তলা দখল করে রাজত্ব চালাচ্ছে, তাও আবার একটা গয়সালকে শাদি করেছে। বিবি-সহ সৎ দাদাদের অপ্রসন্ন আচরণ, উঠতে বসতে সৎ দুই দিদির খোঁটা শোনা, চার জোড়া দম্পতির সন্তানবাহিনির দৌরাত্ম্যে তার শান্তি ভীষণ ভাবে বিঘ্নিত। কস্মিনকালে মুখ বুজে সইবার পাত্রী ছিল না, এখন সেও দাঁতনখ বের করে। থেকে থেকেই উঁচু গলায় বলে, 'ইস্ কী আমার মুক্তিযুদ্ধ রে। বলি পাকিস্তান তো তোরাই বানিয়েছিলি। সারা বাঙ্গলার মুসলমানরাই তো দুহাত তুলে মুসলিম লিগকে ভোটে দিয়ে কলকাতায় নোয়াখালিতে রায়ট করে পাকিস্তান করেছিল। তখন তোদের শেখ মুজিব এই কলকাতায় লিগের অ্যাকটিভ মেম্বার ছিল না? আমাদের বাপ চাচারাও দিব্যি লিগের সঙ্গে জুটেছিল। বড়ো আপা, জাফরভাই সব কমিটিড পাকিস্তানি।'

দিদিরা হই হই করে বাধা দেয়, 'ওদের বাত ভুলে যা। ওরা সব 'খান' বনে গেছে। আংরেজদের পাল্লায় পড়ে লিগকে ভোট দিয়েছিল বাপ-চাচা। পাকিস্তানে পাঞ্জাবিদের দাপটে বাঙ্গালিদের হালত বহুত খারাপ। ওদের থেকে আলগ হতেই হবে?

নাদিরা রণে ভঙ্গ দেবার পাত্রী নয়। 'মুসলমানরা কত বাঙ্গালি আমাকে যেন কেউ জ্ঞান না দেয়। পদ্মার ওপারের ভূতগুলো তো ভাষাটাই জানে না। খামুযামু খাইলাম আইলাম বলে। আর এখানকার মুসলমানরাই-বা কী পদের বাঙালি। স্কুলে তো বাঙালি আর মুসলমান ভাগ থাকত। ক্লাস শুরু হওয়ার আগে পোর্টিকোর তলায় অ্যাসেম্বলিতে উইকে তিন দিন বাঙালিদের গান, দুদিন মুসলমানদের। বাঙালি মেয়েরা সব কোরাস গাইত, 'ধনধান্য পুষ্প ভরা', 'বল বল বল সবে', 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু', 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর'। আমরা মুসলমানরা চুপ করে থাকতাম। আমাদের যে দুদিন পালা পড়ত, ক'জন উর্দুবলা মেয়ে আরবি না কীসে একটা টানা কাঁদুনে সুরের কী গাইত, আমরা বাকিরা বুঝতামই না, গাইবার প্রশ্নও উঠত না। গানের ক্লাসে সব বাংলা গান শেখানো হতো, আমরা ক্লাসই করতাম না। এইতো হচ্ছে মুসলমানদের বাঙালি কালচার। তার ওপর তোমরা আবার ইংলিশ মিডিয়াম শিয়ালদা লোরেটোর মাল, সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ হিন্দি, বাংলায় কথা পর্যন্ত ঠিক করে বলতে পারো না। যামু-খামুদের সঙ্গে এককাট্টা হয়ে 'আমার সোনার বাংলা' করছ! ভণ্ডামি ছাড়া কী?

এ বাড়ির মেয়েদের মধ্যে একমাত্র সে বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলে পড়েছে। তাই উর্দুটা ঠিক মতো শিখেছে। সরকারি স্কুল, বেশিরভাগ স্টুডেন্ট বাঙালি অর্থাৎ হিন্দু। তাদের বাংলাও সচ্ছন্দ। লোরেটোয় পড়া দিদিদের উচিত জবাব দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাদের রাগ আরো বাড়ে। আর সৎ দাদাদের সঙ্গে তো বাক্যালাপই বন্ধ। যা নাদিরা চেয়েছিল।

তবে আম্মি বিশৃঙ্খল সংসারে শক্ত হাতে হাল ধরতে দেরি করেন না। প্রথমেই নিজের প্রথম পক্ষের ছেলেদের সপরিবারে অন্যত্র মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে ফেলেন। অতঃপর আদরের মেয়েকে সামলানো।

'দেখ্ এ বাড়ি ঘরদোর সবই তোর মরহুম আব্বাজানের। যাই অশান্তি করুক, ওরা তোর আব্বুরই মেয়ে। মানিয়ে চল্।" আফতাবও এ ব্যাপারে পুরো মায়ের পক্ষে, 'ওরা তো এক্সেপশান নয়। লাখ লাখ ইস্ট পাকিস্তানি বর্ডার ক্রস করে ইন্ডিয়ায় পালিয়ে আসছে। গভর্নমেন্ট শেল্টারে কী অবস্থায় রয়েছে, যা না গিয়ে দেখে আয়। আমাদের আব্বুর নিজের মেয়েরা বিপদের দিনে বাপের বাড়িতে নিশ্চয় থাকবে। এ নিয়ে অশান্তি করিস না।'

এমন বেহাল পরিস্থিতিতে কিনা বহু প্রতিক্ষিত ঘটনাটি ঘটল—নাদিরার অবশেষে সন্তানসম্ভাবনা। ব্যাপারটি ঘটেছে দিদিদের আগমনের আগেই। পাছে ফল্স হোপ প্রমাণিত হয় সে ভয়ে মাস তিনেক নাদিরা গোপন করেছিল। এখন কনফার্মড হয়ে আম্মিকে জানয়েছে, অর্থাৎ সর্বজনগোচর করেছে শুভ সংবাদ। আহ্লাদে আটখানা আম্মির সতীন-কন্যাদের সমঝে চলতে হুকুম জারি। দিদিরা আড়ালে ছোটি আম্মির মেয়েকে নিয়ে আদিখ্যেতার ঠেস দিলেও সামনা সামনি সস্নেহ আচরণে বাধ্য। প্রত্যেকের মা হওয়ার অভিজ্ঞতার বর্ণনায় যন্ত্রণার আধিক্যে নাদিরার কতটুকু সাহস বাড়ল কে জানে তবে তখনকার তুলনায় বেশি বয়সে সন্তান জন্ম নির্বিঘ্নেই ঘটল। আমি বহুকাল পর ওকে ফোন করলাম অভিনন্দন জানাতে। কারণ আমার বাচ্চা হওয়ার সময় ও খোঁজখবর করত।

'ভাইজান হচ্ছে পয়া, বুঝলি কেয়া। তার এ বাড়িতে ফেরায় আমার সুখা মরশুম খতম হলো।'

'আর ওঙ্কার ওরফে ওমরের যে বিবির ওপরে খসমের হক, তার কী করছিলি এতদিন?' ইচ্ছে করেই চিমটি কাটি।

'ওর অবার হক্! তুই হাসালি। টিপিক্যাল হিন্দু ভালো ছেলে। স্টুডেন্ট লাইফে বইখাতা নিয়ে থেকেছে তারপর ফাইল নিয়ে থাকে। নামকা ওয়াস্তে মরদ। ভাইজানের মতো আসলি মরদ নয়। বিয়ের আগে যদিই বা একটু জোশ ছিল পরে একেবারে সন্ন্যাসী।'

'সন্ন্যাসী কীরে বল ফকির।'

'ওই হলো।'

'যাক্, ফকির সাহেব শেষ পর্যন্ত আল্লার বান্দা পয়দা করার ফরজ পালন করলেন।'

খিলখিল করে হেসে ওঠে নাদিরা, 'সত্যি কেয়া, তোর সঙ্গে কথা বলে মজা আছে। তোর প্রাণের বন্ধু শর্বরী এমন গোমরামুখো সিরিয়াস কেন রে? খালি লেখাপড়া আর ছেলেদের নিয়ে লাইফ। ভাইজানের নসিবটা আমারই মতো।' ওঙ্কার/ওমর আর শর্বরীর মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। যাক্, তার মধ্যে গেলাম না। 'ভালো থাক।' বলে ফোন ছেড়ে দিই।

শর্বরীর কাছে শুনি নাদিরার সন্তানসম্ভাবনা জানার শুরু থেকে প্রতি মাসে তার মেডিক্যাল চেকআপ, তার ওষুধপত্র খাওয়াদাওয়া সব আফতাবের তত্ত্বাবধানে, যথা সময়ে যে নার্সিং হোমে শর্বরীর বাচ্চারা হয়েছে, তাকেও সেখানে নিয়ে গেছে, দিনভর পুরো লেবার সেখানে বসে থেকেছে। ওঙ্কার তখন বর্ডার ডিস্ট্রিক্ট মালদাতে পোস্টেড, ইস্ট পাকিস্তান থেকে বন্যার মতো দুর্গত ঢুকছে, ছুটি নিয়ে আসতে পারেনি। ছেলে হলে নাকি আফতাব মন্তব্য করেছিল, 'আবার ছেলে। শর্বরীর দুটো ছেলে, নাদিরারও ছেলে হলো। বাড়িতে একটা মেয়ে থাকলে ভালো ছিল।'

তার নিজের ছেলেরা তখন অনেকটাই বড়ো হয়ে গেছে। তাদের দুজন আয়ার মধ্যে যাকে শর্বরী ছাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে খবর দিয়ে আনিয়ে নাদিরার ছেলে হাসিমকে মানুষ করতে পার্কসার্কাসের বাড়িতে মোতায়েন করে দিল আফতাব। তাছাড়া আম্মির নজরদারি তো আছেই। ঝাড়া হাত পা নাদিরা ঠিক আগের মতো স্লিমট্রিম স্টাইলিশ হয়ে পড়াতে যায়। শর্বরীকে নাকি হাসতে হাসতে বলেছে, আরো তিনটে হিন্দু মেয়ে ঘরে আসবে। তোর আমির, কামাল আর আমার হাসিমের মতো তাদের আওলাদও সব মুসলমান হবে। এভাবে চললে আবার মুসলিম লিগ, ফের পার্টিশান। ইন্শাল্লা। হি হি হি।'

এদিকে ইন্ডিয়ান মিলিটারি ইস্ট পাকিস্তানে ইন্টারভিন করেছে, অতঃপর ক'মাসেই সারেন্ডার। এখন বাংলাদেশ স্বাধীন। পার্কসার্কাসের আবহ অনেকটাই স্বাভাবিক, দিদিদের যার যার সংসারে ফেরা নিশ্চিত শুধু সময়ের অপেক্ষা। টালমাটাল পর্বের ইতি হতে না হতে আমার স্বামী কোম্পানি বদল করে দিল্লিতে ভিন্ন লাইনে চাকরি পেলেন। আমাদের বহুবাঞ্ছিত বড়ো শহর, দেশের সেরা শহর যেখানে মেয়েদের পছন্দমতো পড়াশোনা করিয়ে নিশ্চিন্তে মানুষ করতে পারি।

হ্যাঁ, আমার কলকাতার এত বছরের চাকরিটা ছাড়তে হলো। দিল্লিতে নতুন ঘরগৃহস্থালী। শাশুড়িবিহীন সংসারে দিল্লির মতো জায়গায় মেয়েদের কার ভরসায় নিরাপদ রেখে আমি কতক্ষণ

বাইরে থাকতে পারি। স্বামী প্রস্তাব দিলেন, এখনি চাকরির চেষ্টা না করে বরং রিসার্চের কাজ নিলে সুবিধা। প্রতিদিন বাঁধা সময়ে বেরনোর দায় ক'বছর থাকে না, মেয়েরাও একটু বড়ো হয়ে যায়, বাড়তি ডিগ্রি লাভ করতে পারলে চাকরি পেতেও ভবিষ্যতে সুবিধা হতে পারে। প্র্যাকটিক্যাল পরামর্শ, কিন্তু আমি চাকরিতে অভ্যস্ত। সেটাই চাইছিলাম। ধীমানের কথা চুপচাপ শুনি, কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে যাই। না, সেরকম যুৎসই কিছু চোখে পড়ে না। মনে হয় বেশ আছে শর্বরী, স্থায়ী চাকরি, নিজের বাড়ি, স্থিতু সংসার।

জে এন ইউ-তে হাজির হয়ে যাদবপুরের রেফারেন্সে কয়েকজন প্রফেসরের সঙ্গে আলাপ করি। দুজন অধ্যাপক জানালেন তাঁদের আন্ডারে এখন এত স্কলার রিসার্চ করছে যে নতুন আর একজনকে নেওয়া সম্ভব নয়। একজন অধ্যাপিকা সম্ভবত নারী বলেই পরিবারের বাধ্যবাধকতার জন্যই যে আমার কেরিয়ারের এই হাল হৃদয়ঙ্গম করলেন। কৃপা করে সাজেস্ট করলেন সোশ্যাল সায়ান্সের যে ক'টা রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে সে সব জায়গায় বিভিন্ন প্রজেক্টে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অ্যাসোসিয়েট নেয়। আমার তো রেজাল্ট ভালো, সে সব কাজে কিছুকাল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর পিএইচ ডি করতে সুবিধা হতে পারে। দু একটা রেফারেন্সও দিলেন। একটা ইনস্টিটিউটে কয়েক মাসের চেষ্টায় একটা প্রোজেক্টে কাজ পেয়ে গেলাম। প্রোজেক্ট ডিরেক্টর সেই অধ্যাপিকার বিশেষ পরিচিত। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের পোস্ট, সাধারণত সদ্য পাশ করে বেরনোরাই করে। কিছু দক্ষিণাও বরাদ্দ। কলেজের মাইনের সঙ্গে তুলনা করে মন খারাপ কর না, ধীমানের উপদেশ। সম্পূর্ণ নতুন কাজ, চেষ্টা করি মন দিতে।

আবার ইনিংস শুরু। দু'পক্ষের গুরুজনদের কোরাসে বাহবা দান। ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটতে থাকে। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে কার্যত গবেষণার ঝি-চাকরগিরি, যত ফালতু কাজ গাধার খাটুনি। তবে এই বৃত্তে পরিচিতি ঘটল। ফলে প্রজেক্টটা শেষ হলে অন্য জায়গায় নতুন প্রোজেক্টে অ্যাসোসিয়েট হয়ে গেলাম। ভাতা বাড়ল। গবেষণার প্রায় মূল কাজটাই আমার ঘাড়ে। কৃতিত্বটা পেলেন ডিরেক্টর। দুটো প্রজেক্টে এমন অভিজ্ঞতার পর ঠিক করলাম ঢের হয়েছে। আর কাজের দরকার নেই। স্বাবলম্বনের বা বলা উচিত সংসারের বাইরে কিছু করার শখে ইতি। নির্ভেজাল হোমমেকার।

শর্বরীর সঙ্গে বিজয়া নববর্ষে একটা দুটো চিঠি আদানপ্রদান হয়। হঠাৎ একটা দীর্ঘ চিঠি পেলাম। এত দিনে সত্যিসত্যি আফতাবের আম্মি মৃত্যুশয্যায়। উইলের খসড়া অনেক দিন থেকেই তৈরি। সই করার আগে আল্লার কাছে তাঁর প্রার্থনা আফতাবের হিন্দু বিবি যেন কলমা পড়ে, তাহলে বংশের সব জমিজমা ঘরবাড়ি সম্পত্তিতে তার লেড়কাদের হক তিনি কবুল করে যাবেন। নইলে নাদিরার লেড়কা শেষেমেশ সব কিছুর ওয়ারিশ হবে। এখনো কি শর্বরী তার হিন্দু থাকার জেদ ধরে বসে থাকবে?

হ্যাঁ থাকবে। কারণ অমল কমলের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি পাওয়া না পাওয়ায় তার কিছু এসে যায় না। কোনো খেদ নেই। বরং নাদিরার ছেলে সবকিছুর মালিক হোক। আফতাব তো হাসিমকে নিজের আমির কামলের চেয়ে এতটুকুও কম ভালোবাসে না। বরং বোধহয় একটু বেশি। হাজার হোক হাসিমের বাবা-মা দুজনেই মুসলমান, কাজেই সে সাচ্চা মুসলমান।

'এই তাহলে তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

আফতাবের দ্বিতীয়বার গৃহত্যাগ। আম্মির দেহান্তের নিয়ম মেনে তার পুরো চল্লিশ দিনের শোক পালন কোরান পাঠ, যা থেকে শর্বরী পুরোপুরি বাদ। পার্কসার্কাসে তখন তার স্থায়ী বসবাস। তবে ছেলেরা এখন আর উইক এন্ড বাবার সঙ্গে কাটাতে যায় না। এখন তারা উঁচু ক্লাসে পড়াশোনা আর টিউসনের বাইরে সময়বয়সী অর্থাৎ পিয়ার গ্রুপ নিয়ে থাকে। ক্বচিৎ রবিবার আব্বুর সঙ্গে লাঞ্চ। যেমন যোধপুরে দাদু-দিদার সঙ্গে।

নাদিরা অভ্যাসমতো এসে এসে ফুট কাটে। কিছুদিন আগে খবর দিল বিলকিস নামে এক বাংলাদেশি নারীর আগমন ঘটেছে ভাইজানের জীবনে। ঢাকার দিদিরা কলকাতার আতিথ্যের প্রতিদান হিসেবে এই যোগাযোগটি ঘটিয়েছেন। শর্বরী বরাবরই তাদের কাছে অবাঞ্ছিত।

'আচ্ছা, তুই তো জানিস ভাইজান আর তোকে ভালোবাসে না, তোদের কোনো ফিজিক্যাল রিলেশানই নেই। হোয়াই ডোন্ট ইউ ডিভোর্স? তুই ভাইজানকে একা থাকতে মানে আনন্যাচারাল লাইফ লিড করতে বাধ্য করছিস। ইসলামে সেক্স ইজ রেকগনাইজড্ আজ নরম্যাল। সব নারী-পুরুষ শাদি করবে, সন্ন্যাসী হওয়াটওয়া নেই। সত্যি শর্বরী, একটু কনসিডারেট হ। দেখ্ তোর টাকা পয়সার তো কোনো অভাব ভাইজান রাখেনি। ছেলেরাও তোর কাছে আছে। এর চেয়ে ভালো টার্মস আর কী এক্সপেক্ট করিস?

শর্বরী চুপ করে দিনের পর দিন শোনে। তারপর একদিন জবাব দেয়, 'নাদিরা, তুই বেকার টাইম আর এনার্জি নষ্ট করছিস। আমি হিন্দু, তোমাদের মতো বিয়েটা আমাদের কাছে শুধু একসঙ্গে শোওয়ার লিগ্যাল কন্ট্র্যাক্ট নয়। আমি বিশ্বাস করি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু শরীরের নয়, নয় এক জীবনের। জন্মজন্মান্তরের। আমার ডিকশানারিতে ডিভোর্স নামে শব্দটি নেই। কোনোদিন বিয়ে ভাঙতে আমি রাজি হবো না। তুই বরং এ বাড়িতে আসিস না। আমার ডিসটার্বড্ লাগে।

ডায়ালগ তো ঝাড়ল। কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যাপারটা চাউড় হতে থাকে। লোকে কানাকানি করে, আফতাব হোসেন দ্বিতীয়বার শাদি করেছে, মুসলমান তো করতেই পারে। এবারে খাঁটি মুসলমান মেয়ে। কাকে বোঝাবে এটা স্রেফ গুজব, সত্যি হতে পারে না, ও মুসলমান হলেও তাদের বিয়ে মুসলমান মতে হয়নি। সিভিল ম্যারেজে স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা যায় না। লোকে গ্রাহ্যই করে না, আরে এমনকী একদিন শর্বরীর বাবা প্রসঙ্গটা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনছি আফতাব অন্য একটি বিয়ে করেছে। তা তুমি কী করবে ভেবেছ?'

শর্বরী কোনোক্রমে জবাব দিয়েছে, 'সব গুজব সত্যি হয় না, বাবা। ভাবার মতো কিছু ঘটেনি।'

বাইরে যতই নিজেকে অবিচলিত দেখাক আসল অবস্থা তো সঙ্গীন। এখন কেয়া পরামর্শ দিক তার কী কর্তব্য।

লম্বা চিঠি। পড়ে আমার ক'রাত ঘুম হলো না। শেষে লিখলাম, এই অসম্মানজনক পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। অনেক সহ্য করেছে। আর নয়। তার এখন এই বিয়ে থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। আমার উকিল পিতার কাছ থেকে দুজন দুঁদে ডিভোর্স ল'ইয়ারের নাম, ফোন নম্বরও পাঠালাম। কিছুকাল উত্তর নেই। ভাবলাম হয়তো মামলা কোর্টকাছারি নিয়ে ব্যস্ত। মাস ছয়েক পর জানতে চাই ডিভোর্সের কতদূর কী হলো।

'কেয়া, পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। আমি তোর রেফারেন্সের কোনো উকিলের কাছে যাইনি রে। কারণ আমি ডিভোর্স করব না। আমি বিশ্বাস করি আমাকে ছাড়া আফতাব আর কারোকে ভালোবাসতে পারে না। আমাদের মধ্যে বাধা কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়, বাধা ইসলামের ইতিহাস। দেড় হাজার বছর ধরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ওদের মাথায় হাতুরি মেরে ঢোকানো হয়েছে ইসলামের বিস্তারই প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য। যেনতেন প্রকারেণ। কোনো অমুসলমানের সঙ্গে এমন সম্পর্ক যদি হয় যে তার ওপর প্রভাব খাটাতে পারবে তাহলেই তাকে ইসলাম গ্রহণ করানো অপরিহার্য কর্তব্য। প্রোগ্রামককরা রোবোট যেমন ছকের বাইরে যেতে পারে না, তেমনি ওদেরও এই বাধ্যবাধকতা থেকে নিস্কৃতি নেই। আফতাব নিজেও করুণার পাত্র বলে আমি মনে করি। নাদিরার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক ভাই-বোনের মতো হোক ব না হোক, বিলকিস টিলকিসের সঙ্গে যত রাতই কাটাক, যার সঙ্গেই সংসার করুক, সে কিন্তু কাউকেই ভালোবাসে না। একদিন না একদিন এই শর্বরী রায়চৌধুরীর কাছে ফিরে আসবেই। আমি অপেক্ষা করব।'

প্রচণ্ড রেগে আমি লিখি, 'আঁতলেমি করে, থিয়োরি কপচে স্বামী স্ত্রীর সমাধান হয় না। কোরানে যাই থাক না কেন এখন আমাদের দেশের প্রত্যেকে যুক্তি মেনে অন্য ধর্মের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে। ভারত ইসলামিক স্টেট নয়। সেটা অস্বীকার করছিস কেন? নিজেকে একটা ভ্যাদভেদ মেলোড্রামাটিক উপন্যাসের নায়িকা করে তুলছিস। টিপিক্যাল সেকেলে হিন্দু সতীসাধ্বী স্ত্রী যে এককালে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত লম্পট স্বামীকে বেশ্যাবাড়ি বয়ে নিয়ে যেত। কী করে আজকের দিনে তোর মতো একজন মেধাবী, জীবনে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপিকা সমাজে শ্রদ্ধার আসনে থেকে নিজেকে এত ছোটো করতে পারে। আমি ভাবতে পারি না তোর সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্ঠতা ছিল, এত আমাদের মনের, মতামতের মিল ছিল। আজ আমরা দুই মেরুতে। যাক, তোর জীবন, সিদ্ধান্ত তোর। আমাকে আর তোদের ব্যাপারে জড়াস না।'

সেই শর্বরীর সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ। আমরা কেউই আর পরস্পরকে চিঠি লিখিনি। ওর সিদ্ধান্ত আমার চোখে মারাত্মক আত্মপ্রবঞ্চনা। আফতাব শুধু অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে শুচ্ছে না, যার-তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো পুরোদস্তুর সংসার করে বাস করছে। আর শর্বরী কি না এই বাস্তবটা অস্বীকার করে ফ্যান্টাসির অমর প্রেমে মজে রয়েছে। আমি সত্যি বীতশ্রদ্ধ। কেটে যায় ক'বছর। কলকাতায় যাওয়া হয় না। মুক্তির দশকের কলকাতা। বাবা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ি সকলের চিঠিতে এক কথা, তোমরা বাইরে আছো বলে আমরা নিশ্চিন্ত। এ শহর আর ভদ্রলোকের বাসযোগ্য নয়। আমাদের মতো বুড়োবুড়ির সঙ্গে বাঙালি ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীও শেষ হয়ে যাবে।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার বেশ কিছুদিন পর অবস্থার উন্নতি হলে কলকাতায় এলাম। বাংলা কাগজ পড়ছি কত দিন পর। দিল্লিতে পাওয়া যায় তবে কেন জানি না পূজাসংখ্যা ছাড়া বাংলা কিছু নেওয়া হয় না। আসলে ধীমান ইংরেজি প্রেফার করে আর মেয়েরা বাংলা পড়তে তেমন জানে না। কাজেই কলকাতায় বাংলা কাগজ হাতে পেয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি। একটা ছোটো খবরে দেখি কী একটি জরুরি প্রয়োজনে সরকার একটি কমিটি গঠন করেছেন যার সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন আফতাব হোসেন আই এ এস। ও আফতাব তাহলে ডবলিউবিসিএস থেকে প্রমোশান পেয়েছে, অত স্ক্যান্ডাল সত্ত্বেও। কৌতূহল হয়। ততদিনে শর্বরীর ওপর আমার রাগ অনেকটাই প্রশমিত। ধীমান সমানে বলে এসেছেন, 'দেখ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বাইরে থেকে বিচার করা যায় না। তোমার বান্ধবীর নিজস্ব জীবনদর্শন থাকতে পারে। নিজের মতটা ওর ওপর চাপিয়ে এত দিনের বন্ধুত্ব নষ্ট করছ কেন।'

সত্যি খবর নিলে হয়। কিন্তু খবর কোথায় নেব। বেকবাগানেই আছে, নাকি বাপের বাড়ি চলে এসেছে ডিভোর্স করে। ডিভোর্স না করলে আফতাব তো বাংলাদেশিকে বিয়ে করতে পারবে না। আর বিয়ে না করে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী পারিবারিক গৃহে খোলাখুলি অন্য একটি

স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকবে, যেখানে বাস করে তার নিজের অধ্যাপিকা বোন যে আবার ভাইয়ের সহকর্মীর স্ত্রীও বটে। আফতাবকে আমার যথেষ্ট ঠাণ্ডা মাথা এবং দায়িত্বশীল লাগত। কেরিয়ারে খুব মন, সুনামও করেছে শুনতাম, মেসোমশাইয়ের পর্যন্ত কানে গেছে। যার জন্য ওদের বিয়ের পর জামাইয়ের প্রতি বিরাগের তীব্রতা অনেকটাই প্রশমিত। ইতস্তত করে শর্বরীর বাপের বাড়িতে ফোন করি।

'হ্যালো।' বয়স্ক মহিলার গলা।

'মাসিমা, আমি কেয়া, শর্বরীর বন্ধু, চিনতে পারছেন?

'ও মা চিনতে পারব না কেন। তোমাকে সেই ছোটো থেকে দেখেছি। কতকালের বন্ধু তোমরা দুজন। তা কেমন আছো? দিল্লিতে আছো শুনছিলাম...।'

মেয়েদের, তাদের বাবার, আমার কাজকর্ম ইত্যাদির খবরাখবরের পর আমি আসল কথায় আসি।

'মাসিমা, আমি ঠিকানা ফোন নম্বরের খাতাটা দিল্লিতে ফেলে এসেছি। শর্বরীর নম্বর হাতের কাছে নেই। বাড়ি যাওয়ার সময় যদি না পাই অন্তত ফোনটা করতাম। কী ভাগ্যি আপনাদের নম্বরটা মনে ছিল। একটু ওর নম্বরটা দেবেন?'

'নিশ্চয়, ও তো থাকে বেকবাগানে জানোই তো, ফোন নম্বর.... 'যাক কার্য উদ্ধার। একই নম্বর এবং একই ঠিকানা। এমনও হতে পারে ডিভোর্সের পর শর্বরী ছেলেদের নিয়ে ও বাড়িতেই থাকে, আফতাব ওকে বাড়ি ছাড়তে বলবে বলে মনে হয় না। টাকা পয়সার ব্যাপারে সে কৃপণ ছিল না। নিজে সম্ভবত নতুন বিবি নিয়ে পার্কসার্কাসের বাড়িতেই সংসার করছে। বিয়ে হয়ে গেলে তো আর প্রবলেম নেই।

দ্বিধা কাটিয়ে শর্বরীকে এক সন্ধ্যায় ফোন করি।

হিন্দিতে মেয়ে গলায় জবাব, হাঁ জি মেমসাহাব হ্যাঁয়। আপ কৌন?'

এ আবার 'কেয়া' নাম বুঝবে কী। 'বোলো উনকি সহেলি।'

একটু বাদে পরিচিত ভারী কণ্ঠস্বর, 'কে বলছেন?'

'আমি কেয়া রে, শর্বরী!'

'কেয়া! তুই! এতদিনে মনে পড়ল?'

'তোর কথা বহুবার মনে পড়েছে। চিঠি লেখার আর সময়টময় হয় না রে। কলকাতায় এতকাল আসা পর্যন্ত হয়নি। দিল্লিতে যে কী ডিফিকাল্ট লিভিং ভাবতে পারবি না। সার্ভিসে কলকাতা তো স্বর্গ। অনেক বছর বাদে এসেছি। বল্ কেমন আছিস।'

'যেমন বরাবর থাকি।'

'এটা কি একটা উত্তর হলো? সবচেয়ে আগে তোর কাজকর্মের খবর বল্। সেই স্কুল লাইফ থেকে তুই কত ব্রিলিয়্যান্ট স্টুডেন্ট ছিলি, কেরিয়ারে অনেক ওপরে ওঠার কথা। এতদিনে পিএইচ ডি করে বইটই লিখে ডক্টর শর্বরী রায়চৌধুরী কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত?'

'না রে। পিএইচডি করাটরা আর হয়ে ওঠেনি। ওই কলেজের চাকরিটাই করে যাচ্ছি। বছরের পর বছর ক্লাসে এক লেকচার রিপিটেশান, পরীক্ষার এক কোয়েশ্চেন করা, পাঁজা পাঁজা একই খাতা দেখা, অবিরাম একটা চাকায় বাঁধা। তার ওপর বাড়িতে লাগাতার অশান্তি, মানসিক কষ্ট। কোনো রেহাই নেই। এ সব অগ্রাহ্য করে নতুন করে পড়াশুনা লেখালেখিতে মন দিতে পারলাম না। তোর তো সে সব ঝামেলা নেই। তুই কী করলি এত দিন?'

সংক্ষেপে বলি। নিজেকে শুধু হোমমেকার বলতে অপ্রস্তুত লাগে। 'দিল্লিতে সব এত দূর যে বাড়ি থেকে কাজের জায়গায় যাতায়াত করে একা হাতে সংসার সামলানো শেষে পেরে উঠলাম না। এত দিন মেয়েদের স্কুল হোমওয়ার্কের চাপ, টিউশান ছিল। এখন একজন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, অন্য জন সোশিওলোজিতে। একজনের শখ কত্থক নাচ, অন্য জনের বাংলা গান। সব কিছুতেই আমাকে থাকতে হয়। তোর খবর বল্। ছেলেরা কত বড়ো হলো, কে কী করছে।'

'একজন যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিঙে, অন্যজন এমসিএ মানে আজকাল কী হয়েছে না, কম্পিউটার সায়েন্স, তাতে মাস্টার্স করার প্ল্যান। বাবামায়ের লাইনে কেউ নেই। সময় বদলে গেছে।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। আর তাদের বাবার কী খবর? শেষ যখন তোর সঙ্গে চিঠিচাপাটি চলছিল তখন...'

'তারপর গঙ্গাপদ্মা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। তখন তো ও পার্কসার্কাসের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। একটা বাংলাদেশির সঙ্গে থাকত। আফতাব ওকে অফিসিয়েলি স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে পারত না। আমার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। নাদিরাকে দিয়ে সমানে ডিভোর্স করার জন্য চাপ দিত। নরমগরম দু'ভাবে। ডিভোর্সে রাজি হলে বাড়ি আমার নামে করে দেবে, ছেলেদের কাছে রাখতে পারবো, রাজি নাহলে মেন্টাল ক্রুয়েলটির চার্জ আনবে, কিছু পাবো না, ছেলেদেরও না ইত্যাদি। ক'বছর ধরে সমানে চলল। যা দিন আমার গেছে। একমাত্র তোকেই এ সব কথা বলতাম, তা তুই আমাকে ত্যাগ করলি।'

'ভেরি ভেরি সরি রে। আমার খুব অন্যায় হয়েছিল। নিজেকে দিয়ে তোর মানসিকতা তোর পরিস্থিতি বিচার করছিলাম। ক্ষমা করে দে প্লিজ। বল্ তারপর কী হলো। রাজি হলি?'

'হওয়ারই কথা নয় কি। কত বছর চাপ সহ্য করব। রাজি হওয়াটাই তো এ কাহিনির ক্লাইম্যাক্স। তার বদলে হলো অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। এক রবিবার সকালে আফতাব ফিরে এল। এমন ভঙ্গি যেন কয়েক বছর নয়, মাত্র কয়েক দিন ছিল না। যেন

অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছিল বা কোনো ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করে ফিরল। খুব ক্যাজুয়েলি জিজ্ঞাসা করল, 'লাঞ্চে কী মেনু।' ঠিক যেমন আগে করত। ঘটনা শুনলাম নাদিরার কাছ থেকে।

'কি খুব খুশি? ভাইজান গুটি গুটি পায়ে আবার তোমার কাছে ফিরে গেছে। ভেবো না তোমাকে ভুলতে পারেনি বলে ফিরেছে। আসলে যতই সেকুলার বল এটা তো হিন্দু স্টেট। হিন্দুদের আইনে এখন দ্বিতীয় বিয়ে চলবে না। রাইটার্সে আফতাব হোসেনের বাংলাদেশির সঙ্গে থাকা নিয়ে কানাকানি। এদিকে কাজে কর্মে ভাইজানের খুব সুনাম। তাকে ঠারেঠোরে জানিয়ে দেওয়া হলো আইএএসে প্রোমোশনের জন্য লিস্টে তার নাম টপে থাকলেও ওই লিভ টুগেদার না কী করছে, সেটা তার এগেইন্সটে যাচ্ছে, লিস্টে তো ক্লিন ইমেজের অন্যরা আছে, তাদের কাউকে প্রেফার করার চিন্তাভাবনা চলছে। যেই না কানে এল অমনি বাংলাদেশি টা-টা বাই বাই। ঘরের ছেলে ঘরে ফেরত।'

'আর অমনি আইএএসে প্রোমশন পেল?' ঠাট্টা করি।

'একজাক্টলি।'

'ওর কাছে প্রোমশনটা খুব ইম্পপর্টেন্ট, না রে?'

'ভীষণ। ওদের দাদা জাফর আইএএস-এ সেই প্রথম দিকে পরীক্ষা দিয়ে পায়নি। তাই পাকিস্তানে চলে গিয়ে ওখানকার সিভিল সার্ভিস জয়েন করে। ওখানে তো সোজা, হিন্দুদের সঙ্গে কমপিটিশন করতে হয় না। সাধারণত মুসলমানরা হিন্দু বা খ্রিস্টান, মানে অমুসলমানদের সঙ্গে মেরিটে কমপিট করে না। ওদের সে ট্র্যাডিশানই নেই। অটোমান সাম্রাজ্যে উজির বানাতো খ্রিস্টানদের মুসলমান করে। আমাদের দেশেও মুসলমান রুলাররা মাথার কাজ হিন্দুদের দিয়ে করাতো। এ সব উদারতার জন্য নয়, স্রেফ দরকারে। মুসলমানরা নিজেরা মনে মনে বিলক্ষণ জানে নিজেদের এলেম কতদূর। আফতাবকেই দেখ্ না, বাড়ির সেরা স্টুডেন্ট হয়েও প্রেসিডেন্সিতে না গিয়ে মৌলানা আজাদে পড়েছিল।'

'যাই হোক প্রোমশান পেয়ে তো মেরিট রেকগনাইজড্ হলো। স্বপ্ন সার্থক। আর আ হ্যাপি ম্যান সংসারে অশান্তি করে না। তুইও তাহলে হ্যাপি। সারদা মায়ের ফর্মূলা, যে সয় সে রয়, যেটা তুই মন্ত্রের মতো জপ করতিস, অবশেষে ফলল।'

'সবই কাকতলীয়। প্রোমশানের ব্যাপারটা নাও হতে পারত। তাহলে কী....'

'দেখ, ওই কী হলে কী হতো ভেবে দুঃখ করা অর্থহীন। যা হয়েছে তাই নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অন্য কথা বল্; তোর শরীরটরির কেমন আছে? আমার তো প্রচণ্ড স্পন্ডিলিওসিস, তার ওপর দিল্লি জলহাওয়া এত বছরেও শরীর মানিয়ে নিতে পারল না।'

'আমার হাঁটুর প্রবলেম, ভারী শরীর তো। দোতলার শোয়ার ঘর থেকে একতলায় নামা একটা কসরত। নিক্যাপ পরে কলেজে যাই। শোন্ আমরা এখন মধ্যবয়স্ক, এ সব হবেই। শরীরের কথা বাদ দে। কতদিন তোর সঙ্গে দেখা হয় না। ফিরে যাওয়ার আগে একদিন আসতে চেষ্টা কর।'

করি। সেটা ছিল শনিবার বেলা সাড়ে চারটে। শেষ মুহূর্তে কলকাতার শপিং সেরে সময় বের করা, আগে থেকে ফোন করতে পারিনি। বেকবাগানের বাড়িতে বেল্ দিতে একটি মাঝবয়সি স্ত্রীলোক দরজা খুলল। 'কিসকো চাহিয়ে?' বললাম, দিল্লি থেকে এসেছি, মালকিনের সহেলি। সে দোতলায় খবর দিতে চলল। সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে থাকি। একটু বাদেই শর্বরী সিঁড়ির মাথায়। হ্যাঁ আরো ভারী হয়ে গেছে, মুখখানা একই আছে। 'কেয়া, এলি তাহলে, দাঁড়িয়ে কেন। যা বাইরের ঘরে গিয়ে বস, তুই তো চিনিস। আমি আস্তে আস্তে নামি।' রেলিং ধরে একটা একটা ধাপ এক পা এক পা করে নামে।

'তুই আগে নাম, একসঙ্গে বসব।'

পিছন থেকে বেরিয়ে এসেছে আফতাব, খুব একটা বদলায় নি। আমাকে দেখেই বলে, 'আরে কেয়া, কতদিন বাদে তোমাকে দেখছি।'

সিঁড়ির ওপাশ দিয়ে নামতে নামতে স্ত্রীর বাহু ধরে, 'এসো, আমি নামিয়ে দিই।'

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয় শর্বরী।

'ডোন্ট টাচ্ মি। কতবার বলেছি না তুমি আর কোনো দিন আমাকে ছোঁবে না। হ্যাঁ, আমাদের আগে রিলেশান ছিল, দুটো ছেলে আছে। সে রিলেশান তুমি ডেস্ট্রয় করেছো। এখন আমরা জাস্ট স্ট্রেঞ্জার্স, এক ছাদের তলায় দুজন অচেনার বসবাস, দ্যাট্স অল্। মোতি, ইধার আও, হাত পাকড়ো।'

কাজের স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে হাত ধরে নামায়। প্লেন জমিতে মোটামুটি ঠিকই হেঁটে এসে আমার সঙ্গে বৈঠকখানায় ঢুকে সামনের সোফাটায় ধপ করে বসে। অপ্রস্তুত মুখে আফতাব নীরবে তার পিছন পিছন।

ঘরের আবহ হালকা করতে আমি মুখে হাসি টেনে বলি, 'যদিও বহু দেরিতে তবু, আফতাব ভাই কংগ্র্যাটস ওন ইওর ওয়েল ডিজার্ভড্ প্রোমশান।'

'থ্যাঙ্কস। তা তোমার কী খবর। হাজব্যান্ড, ছেলে-মেয়ে কাজকর্ম?'

সব বলা হলো। 'তোমরা দুই বন্ধু এত দিন বাদে মিট্ করছ। অনেক কথা আছে নিশ্চয়। আমি বরং উঠি, একটু চা টা করতে বলি।'

'না না বসুন। ও সবের দরকার নেই।'

আফতাব কানে নেয় না। 'এতদিন বাদে এলে, অন্তত 'মিঠাই'য়ের সিঙারাকচুরি তো খাবে চায়ের সঙ্গে। বাঙালিকে

মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়া যায় নাকি। বসো বসো।' রান্না ঘরের দিকে চলে যায়।

'না প্লিজ, শর্বরী। আমি জাস্ট দেখা করতে এলাম, কালই ফেরত যাচ্ছি। প্রচুর প্যাকিং রয়েছে।'

'কী এত প্যাক করবি?

'আরে এত বছর বাদে আসা। কলকাতার মতো শপিং করে সুখ দিল্লিতে নেই। বিশেষ করে আমার বাপের বাড়ির পাড়ায়, মানে রাসবিহারী গড়িয়াহাটে। রাস্তায় বেরলেই কিছু না কিছু কিনে ফেলছি। মেয়েরা তো সিম্পলি থ্রিলড্। এখন প্যাক করতে অবস্থা কাহিল।'

'ওই একটা জিনিস, শপিং। আমি কোনোদিন শিখতে পারলাম না।'

'আসলে মেয়েলি কাজকর্মে তোর কোনোদিনই উৎসাহ ছিল না। তুই হচ্ছিস জাত ইন্টেলেকচুয়েল।'

'হুঁ! ভারী ইন্টেলেকচুয়েল। একটা থার্ড রেট মেয়ে কলেজে ঘসটে যাচ্ছি, পিএইচডিটা পর্যন্ত করতে পারিনি। সেই আদ্দিকালের প্রিপেয়ার করা লেকচার বছরের পর বছর বমি। ক'জনই-বা শোনে।'

'দেখ্ সংসার সামলে ছেলেপুলে মানুষ করে ঘরের বাইরে চাকরি করাটাই একটা অ্যাচিভমেন্ট। সবাই কি পারে? এই আমাকেই দেখ্ না। তোর তো একটা আলাদা আইডেন্টিটি আছে। নিজেকে অহেতুক ছোটো করছিস। নাদিরার খবর কীরে?'

'দিব্যি আছে। ছেলেকে ইউএসএ তে পাঠাবার জন্য এখন থেকে রেডি হচ্ছে।'

'আর ওঙ্কার?'

'ঠিকই আছে। তবে ও আইএএস-এ প্রোমশান পায়নি বলে নাদিরা খুব বিটার। সমানেই বলে সব কমিউনাল। ওঙ্কার কনভার্টেড হয়েছে বলে ওপরওয়ালারা ওকে ভালো চোখে দেখে না। সিসিআর অ্যাভারেজ দেয়। তাই প্রোমশানের লিস্টে নাম ওঠে না।'

'কী অদ্ভুত! ওর নিজের দাদা মুসলমান হয়ে প্রোমশান পেল কী করে।'

'যুক্তির ধার ধারে না এরা।'

'ওঙ্কার কি এখন পার্কসার্কাসের বাড়িতে থাকে?'

'ও তো বেশিরভাগ সমই দূরের ডিস্ট্রিক্টে পোস্টেড। কলকাতায় আসতে বোধহয় চায়ও না। এলে কোয়ার্টার পেয়ে সেট্ল করতে করতে আবার বদলি। বেকার খাটুনি। মফস্সলে ঝামেলা কম।'

খারাপ লাগে শুনে। বেচারা বিশেষ কিছুই জীবনে পেল না, অথচ মেরিটোরিয়াস, চমৎকার স্বভাব, অন্তত আমি যা দেখেছি। কলকাতার ছেলে হয়ে জীবনের বেশিরভাগটাই কাটছে পাড়াগাঁয়ে। আমরাও কলকাতার বাইরে থাকি। কিন্তু রাজধানী বলে কথা, অন্তত রাস্তাঘাট দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। কলেজের পুরনো কলিগদের হালচাল, হেনার সঙ্গে শেষ কবে যোগাযোগ হয়েছে, দুজনের বাবা-মা, ছোটো বোনেদের কুশল সংবাদ আদানপ্রদান। এবার বিদায়। ঠিক হয় যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করবো।

কথা হলো বটে কিন্তু কাজের বেলা এক আধবার চিঠি লেখা, শেষে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছায় পর্যবসিত। আসলে ভূগোল সব কিছুর নিয়ামক। সামনাসামনি যোগাযোগ, দেখাসাক্ষাতের বিকল্প নেই। দুজনের জীবন দুটো ভিন্ন খাতে বয়ে চলেছে। আমাদের দেশে মধ্যবয়সে বৈপ্লবিক কিছু ঘটে না। সেই গয়ংগচ্ছ জীবনযাপন। তার ওপর আমি এখন আর বাইরের কাজেও নেই। নেট রেজাল্ট শর্বরীর সঙ্গে বন্ধুত্বের একটা উল্লেখযোগ্য কমন ফ্যাক্টর হারিয়ে গেল। পরিবার ছাড়া আর কিছু আলোচনার রইল না। সেখানে ঘটনার কুশীলব এখন পরবর্তী প্রজন্ম। ছেলে-মেয়েদের কৃতিত্ব নিয়ে প্রচলিত অকথিত প্রতিযোগিতাটা আমাদের দুজনেরই রুচিতে বাধে। ফলে কারোরই লেখার মতো বিশেষ কিছু থাকে না। চিঠিতে গল্প করার অভ্যাসটা কেউ আয়ত্ত করতে পারিনি। কাজেই ধীরে ধীরে কখন কে জানে সম্পর্ক চলে গেল।



চা-টা ঠাণ্ডা জল। সেই লিভিং রুমে বসে আছি। বেলা পড়ে এসেছে। একেবারে হারিয়ে গিয়েছিলাম অতীতে। আমাদের দিল্লি ফেরার দিন এসে যায়। বেশ কয়েক বার ভেবেছি চন্দ্রিমাকে ফোন করব, ওর বাড়িতে গেলে হয়। তারপর আগের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে পিছিয়ে যাই। কত কষ্ট ওর জন্য শর্বরীকে পেতে হয়েছে। হ্যাঁ দায়ী ঠিক ও নয়, ওদের মা, তবু। শেষে ভাবি দেখাসাক্ষাৎ করে সামাজিকতার দরকার নেই, শুধু শর্বরীর খবরটা নিলে হয়, কেমন আছে জানিই না। বেলা এগারোটা নাগাদ ফোন করি, এতক্ষণে গৃহস্থালীর কাজ সারা হয়ে যাবার কথা। 'হ্যালো চন্দ্রিমা, আমি কেয়াদি। ব্যস্ত ছিলে নাকি?'

'না না। বল কেয়াদি, কবে আসছ আমাদের বাড়িতে?'

'সেটাই হচ্ছে না বলতে ফোন করেছি। আমাদের থাকার মেয়াদ শেষ। দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল।'

'কী যে কর। তোমারা তো সব রিটায়ার্ড। দুদিন পরে গেলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো। কী বললে, আগে থেকে টিকিট কাটা, যাতায়াত একসঙ্গে? দূর! এতদিন বাদে দেখা ভাবলাম জমিয়ে গল্প করব।'



‘ফোনেই করা যাক। মনে আছে তোমার দিদির সঙ্গে আমি ল্যান্ড লাইনে কত আড্ডা দিতাম?’

‘মনে নেই আবার। সবাই রাগ করত। সারাদিন স্কুলে কলেজে একসঙ্গে, বাড়ি ফিরেও আবার গল্প। কী এত কথা।’

‘সত্যি। কোথায় গেল সে সব দিন। এখন তো যোগাযোগই নেই। আসলে আমরা দুজনে কেউ চিঠিতে গল্প করতে পারি না। তাই। আচ্ছা ও আছে কেমন?’

‘মোটামুটি বয়স অনুপাতে ঠিকই আছে। মনটন এখন ভালো। ছেলেরা দুজনেই ওয়েল এস্টাব্লিশড্।’

‘বাঃ সে তো খুব ভালো খবর। তা কী করছে তারা?’

‘সে তো এক একটা গল্প। বড়ো অমল যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার জানো তো? ও একটি বাঙালি ক্লাসমেটকে বিয়ে করেছিল, টিকল না। দুজনে এক জায়গায় চাকরি পেল না, অনেক চেষ্টা করেও। মেয়েটা এমন কেরিয়ার মাইন্ডেড সংসারের জন্য চাকরি ছাড়বে না। শেষে ডিভোর্স। তখন অমল দুবাই চলে গেল একটা কোম্পানিতে কাজ নিয়ে।

ক'বছরের কনট্র্যাক্ট ছিল, শেষ করে অন্য একটা কাজ শুরু করে দিল।'

'বাঃ দুবাইতে ওরকম থেকে যাওয়া যায় বুঝি?'

'তা জানি না। তবে অমল ওখানে বিয়ে করেছে, ওর স্ত্রী গাইনি। ওর বাবার তো প্রচণ্ড আপত্তি ছিল এ বিয়েতে। কারণ মেয়েটি শিয়া। আর এরা হলো সুন্নি। আমরা তো জানিই না মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি আদায়-কাঁচকলায়। সায়ারা নাকি ক'দিন আলাপের পর কমেন্ট করেছিল অমলকে সুন্নি বলে মনেই হয় না। অমল তাড়াতাড়ি জবাব দিয়েছিল, 'আমার মা সুন্নি নন, তিনি কলকাতার হিন্দু, কলেজের প্রফেসর।

তবে ওদের কোনো ইস্যু নেই। ওর স্ত্রী সায়রারও আগে একটা বিয়ে ছিল। প্রথম পক্ষের একটি ছেলেও আছে। ওরা ডাক্তার হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসঙ্গে দুবাই গিয়েছিল। সেখানে বনিবনা হল না, বর ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল। সায়রা রয়ে গেল। তারপর অমলের সঙ্গে বিয়ে, অন্তত আমি তাই জানি। কে যেন বলছিল অমলের সঙ্গে আগেই ভাব সেজন্যই স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। যাই হোক, বিয়ে করে নিজেরা হ্যাপি। মুশকিল হলো সুন্নি মেজোরিটি দুবাইয়ে শিয়াদের পার্মানেন্ট থাকার অনেক ঝামেলা। শেষে ওরা দুজনেই কাজ পেয়ে চলে গেছে কী যেন জায়াগাটা, হ্যাঁ, কুয়াইট। ওখানে শিয়া অনেক। ইন্ডিয়ানও আছে তবে বেশিরভাগই মাল্লু আর তামিল। এখন ভালোই সেটলড্।'

'বেশ সাকসেস স্টোরি। খালি একটা ছেলে বা মেয়ে থাকলে পারফেক্ট হতো।'

'অমল ওর ওই সৎছেলেকে খুব ভালোবাসে। প্রথমে ছুটিতে ছুটিতে আসত। তার বাবা আবার বিয়ে করেছে, নতুন ফ্যামিলিও হয়েছে। বেচারি এ পক্ষের ছেলেটি নেগলেক্টেড ফিল করত। অমল ওকে টাইম দিত, আদর দিত। ওর স্বভাবটা খুব নরম। এখন ছেলেটা ওদের কাছেই থাকে।'

'তাহলে তো আর প্রবলেম নেই। আর ছোটো কমল? সে কোথায়?'

'কমল আইটি-র কাজ নিয়ে ইউএস-এ গিয়েছিল। ওখানে একজন আমেরিকান ইন্ডিয়ানকে বিয়ে করে সিটিজেন হয়ে গেছে। মানে মেয়েটির বাবা হোয়াইট আমেরিকান, মা পাঞ্জাবি হিন্দু। ঠিক দিদিদের মতো মিক্সড ম্যারেজ। তবে কমলের পাঞ্জু শাশুড়ি খুব দাপুটে, মেয়ে মঞ্জুকে একেবারে হিন্দু বানিয়েছে, নাতনি নেহাকেও। আসলে কমল আর মঞ্জু সকাল থেকে সন্ধে চাকরির জন্য বাইরে থাকে, দিদিমাই নাতনিকে দেখাশোনা করে। একেবারে কবজা করে ফেলেছে।'

'মানে সেও পুরো দস্তুর হিন্দু?'

'সেন্ট পারসেন্ট।'

'খুব মজার ব্যাপার তো। আর কমলের আমেরিকান শ্বশুর, সে তো খ্রিস্টান, তার কোনো ভয়েস নেই?'

'শুনি সে নাকি প্রায় হিন্দু হয়ে গেছে। ক্রিসমাস ইস্টারের মতই হোলি, দেওয়ালি ঘটা করে মানে। খায় রোটি তরকা, লসসি, গাজরের হালুয়া। বাড়িতে পাজামা পাঞ্জাবি পরে রিল্যাক্স করে।'

'কী অবস্থা সাহেবের।' আমি হাসতে শুরু করি। 'তা কমল ফ্যামিলিতে একটু মুসলিম ইনপুট দেয় না?'

'কোথা থেকে দেবে বেচারা? ছোটো বেলায় যা পার্কসার্কাসের বাড়িতে কাবাব বিরিয়ানি খেয়েছে, ঈদে নতুন জামাকাপড় কেনাকাটা দেওয়া থোওয়া আর ইফতারের খাওয়া দেখেছে। যদিও রমজান তার বাপ কোনো দিন রেখেছে কি না সন্দেহ। সে তো অর্ধেক সময় ফ্যামিলিতে থাকতই না। জানোই তো সব। আমরা দূরে থাকলেও সব খবরই কানে আসত। অমল কমল দিদির কাছে আর আমাদের বাড়িতেই মানুষ। ওদের চালচলন অনেকটাই বাঙালি।'

'ভেরি ইন্ট্রেস্টিং। জীবন যে কোন্ দিকে যাবে কেউ বলতে পারে না। শর্বরী তাহলে কমলের বিয়েতে খুশি?'

'সে একটা মজার ব্যাপার। জানো মুসলমানের সঙ্গে মেয়ের বিয়েতে প্রথমে ওর শাশুড়ির খুব আপত্তি ছিল। সে নিজে ওয়েস্ট পাঞ্জাবের রিফিউজি ফ্যামিলির মেয়ে তো। যখন শুনল কমলের মা ইস্ট বেঙ্গলের হিন্দু এবং তার ফ্যামিলিও টেকনিক্যালি রিফিউজি, এবং মুসলমান বিয়ে করেও সে হিন্দুই আছে, তখন মহিলা রাজি হলো।'

'যাক শর্বরীর হিন্দুত্ব তার দুই ছেলের বিয়েতেই কাজে লাগল। তা বেয়ানে বেয়ানে সম্পর্ক কেমন?'

'দারুণ। এক বার দিদিরা গিয়েছিল আমেরিকা, ছেলের কাছে, বেয়ান তো তাকে মাথায় করে রেখেছিল। একে হিন্দু তায় বাঙালি এবং প্রফেসর, দিদির হেভি প্রেস্টিজ। কলকাতায় গেলে দিদির সঙ্গে দেখা কর, দেখবে কী খুশি।'

'খুব ভালো লাগল সব শুনে। অনেক কথা হলো, এবারে ছাড়ি?'

'সবই তো দিদির কথা। আমার কথা আর হলো কই, কেয়াদি।'

দিদির প্রতি সেই ঈর্ষা এখনো রয়েছে।

'তোমার তো প্রথম থেকেই সাকসেস স্টোরি। কথায় বলে না সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।'

'এমনি এমনি হয়নি কেয়াদি। সেই শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেওর নিয়ে সংসার করতে হয়েছিল। তার মধ্যে ছেলে-মেয়ে মানুষ। জানো আমার ছেলেও ফরেনে। স্টেটসে আছে, আইবিএম-এ। নিজের এলেমে। দিদির ছেলেদের মতো বউদের কৃপায় নয়। মেয়ে কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, জামাইও, বান্দ্রা ওয়েস্টে ফ্ল্যাট...'

‘খুব ভালো কথা। আমাদের নেক্সট জেনারেশান কত উন্নতি করছে।’

আমি এবারের আলাপে ক্ষান্তি দিতে চাই।

চন্দ্রিমা নাছোড়বান্দা, ‘শুধু শ্বশুর শাশুড়িকে নয়, বাবা মাকেও আমি দেখেছি। বাবার প্রস্টেট ক্যানসারে টাটা মেমোরিয়েলে এনে পুরো ট্রিটমেন্ট করিয়েছি। বাঁচলেন না। তারপর মা একা, আমার কাছেই এনে রাখলাম, এখানেই মারা গেলেন। দিদি দেখ আগাগোড়া কলকাতাতেই আছে। বাবা মায়ের জন্য কিচ্ছু করতে পারল না। নিজের পছন্দমতো বিয়ে, আর সারা জীবন ধরে সেই বিয়ের হ্যাঁপা সামলাতেই চলে গেল।’

এত বছর পরেও চন্দ্রিমা সেই একই আছে, সর্বদা শর্বরীর সঙ্গে তুলনা।

‘মাসিমা মেসোমশাইয়ের আশীর্বাদ তোমার ওপরে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভালো থাকো। আজ রাখি।’

এবারে ডিসেম্বরে কলকাতায় এসেছি। ট্যাক্সিতে গড়ের মাঠ ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। শীতের কলকাতা। এ সময়টা আমরা ছেলে-মেয়েরা কী ভীষণ এনজয় করতাম। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল, গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, গঙ্গার ধার বেড়াতে নিয়ে যেতেন বড়োরা। ক্রিসমাসে বাবা কেকের বাক্স হাতে বাড়ি ঢুকতেন। সকলের পার্কস্ট্রিট কী নিউ মার্কেটের হাইক্লাস বিলিতি ট্র্যাডিশানের প্লাম কেক কেনার সঙ্গতি ছিল না। পাড়ার লজেন্স চকোলেটে দোকানে বাঙালি বেকারির তৈরি কিশমিশ বাদাম দেওয়া মামুলি টিফিন কেক বা কিটকিটে মিষ্টি রংবেরং আইসিংয়ের পেস্ট্রি আমাদের কাছে অমৃত।

কলেজে পড়ার সময় সাহেব পাড়ায় হলিউডের ছবির নেশা আমাদের মতো বাংলা মিডিয়ামে পড়া মেয়েদের একটা আশ্চর্য বাতিক ছিল। সব কিছু সাহেবি ছিল উঁচু দরের। তখন চৌরঙ্গির ফুটপাথ ঝকঝকে মসৃণ জনবিরল। এখনো চোখ বুজলে দেখতে পাই আমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স শর্বরী, হেনা ও আমি হেঁটে যাচ্ছি, গ্র্যান্ড হোটেলের আর্কেড, নীরা, ক্যাপ্রি সব রেস্তোরাঁ, পর পর দোকানের শোকেসে সাজানো বিলিতি স্টাইলের পাথর বসানো গহনা। নিশ্চয় হিরেটিরে হবে। আমাদের দেখিয়াই সুখ। সে সব অমলিন দিনগুলোর সঙ্গে আমাদের স্মৃতির কলকাতা একাত্ম। তবে শুধু স্মৃতিই। বর্তমানে চৌরঙ্গির পারিপাট্য সৌন্দর্য নির্জনতা আভিজাত্য সব নিশ্চিহ্ন।

শ্বশুরবাড়িতে আর কেউ নেই, আমরা প্রবাসী দেওর ননদের সঙ্গে একমত হয়ে বাড়ি প্রোমটারকে বেচে দিচ্ছি। ব্যবস্থা করতে তাই শেষবারের মতো সকলে একত্র হয়েছি। প্রত্যেকে বিষণ্ণ, কলকাতার বাড়িতে সকলের মূল শিকড়। আমারও। বাপের বাড়ি বাবা মা জীবিত থাকতেই প্রোমটারকে দেওয়া হয়ে গেছে, নিজেদের জন্য একটা ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন, শেষ ক’বছর সেখানেই কেটেছে। সেটাও বেচে দিলাম আমরা। আমি দিল্লিতে, ছোটো বোন ব্যাঙ্গালোরে স্থায়ী। কাজ হয়ে গেলে ধীমান নোটবই খুলে পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের ফোন নম্বর খুঁজতে খুঁজতে বলে, ‘কলকাতায় আর আসা হবে কি না সন্দেহ। ওঠার জায়গাই রইল না। আমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। ওপারে যাওয়াও শুরু হয়ে গেছে। শেষবারের মতো যারা যারা আছে তাদের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া যাক।’

একদিন শর্বরীকে ফোন করি। রেকর্ড করা সমাচার, দিস টেলিফোন নাম্বার ডাজ নট একজিস্ট। কী ব্যাপারে রে বাবা। তারপর মনে হলো আজকাল অনেকে ল্যান্ড লাইন রাখে না, মোবাইলে কাজ চালায়। সে নম্বর তো আমার জানা নেই। ইতস্তত করে এক সকালে বেকবাগানের বাড়িতে সশরীরে হাজি হই। বাড়িটা এবারে খুবই ম্লান মনে হলো, আগের মতো চটক নেই। অনেক ক্ষণ বেল্ দিতে শেষে একটি স্ত্রীলোক দরজা খুলল। হ্যাঁ মেমসাহেব আছেন। ওপরে চলে যান।’ বিস্মিত হই। ওপরে তো জানতাম শুধু দুটো বেডরুম আর বাথরুম।

‘উপরে কাঁহা?’ ‘উনকো বেডরুমমে। যাইয়ে যাইয়ে।’ কিন্তু কিন্তু মনে উঠি। শর্বরীর শারীরিক অবস্থা যে এত খারাপ দোতলার শোওয়ার ঘরেই থাকে এমন কোনো ইঙ্গিত তো চন্দ্রিমার কথায় ছিল না। আগে কোনো দিন ওর বেডরুমে আসিনি। কোনটা ওর ঘর জানিও না। আন্দাজে সামনের ঘরের ভারী পর্দার বাইরে থেকে ডাকি, ‘শর্বরী আমি কেয়া।’

‘কেয়া! আয় আয় ভেতরে আয়।’ ঢুকি। ডাবল বেড খাটে পাশাপাশি শুয়ে শর্বরী ও আফতাব। একজনের পরনে রংচটা নাইটি, অন্যজনের ঢলঢলে আধময়লা পাঞ্জাবি, পাজামা। আমি অপ্রস্তুতের চূড়ান্ত। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে বেরিয়ে যেতে যেতে কোনো ক্রমে বলি, ‘সরি সরি, তোরা বিশ্রাম করছিস, আমি নীচে বসি, রেডি হয়ে আয়।’

‘আরে এখানেই বস। নীচে আর নামি না। লাইফ ইজ নাউ সিমপ্লিফায়েড।’ খিলখিল করে বাচ্চা মেয়ের মতো হেসে ওঠে। আফতাব নির্বিকার নীরব যেন সামনে কিছুই ঘটছে না, আমাকে দেখতেই পায়নি। মাথাটাথা ঠিক আছে তো দুজনের। আমি একবারে স্তম্ভিত। স্বামী স্ত্রীর সাধারণ আব্রু, বাইরের লোকের সঙ্গে শিষ্টাচার, সব শিকেয় উঠে গেছে। এ ভাবে হাসতে কোনোদিন আমি শর্বরীকে দেখেছি? দেখেছি আফতাবের এমন সজ্জা এমন অদ্ভুত ঔদাসীন্য?

চেহারাও কত পালটে গেছে। শর্বরী পুরো হাতি, আর আফতাব একেবারে কঙ্কালসার। গালটাল ভেঙে, চুল সব উঠে যেন জরাগ্রস্ত স্থবির। আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল। কোনোক্রমে ড্রেসিং টেবিলের টুলটা নিয়ে শর্বরীর দিকে বসি। বলি, ‘কেমন আছিস? গত বছর চন্দ্রিমার সঙ্গে বম্বেতে

বাঙালিদের পুজো মণ্ডপে দেখা। তোকে বলেছে?'

মাথা হেলায়, হ্যাঁ, 'তোকে এক্সপেক্ট করছিলাম। কী খাবি চা না কোক? কিছু না বলিস না।'

একহাত ওপরের দিকে তুলে খাটের মাথার কাছে ঝোলা সুইচ টেপে। 'এটা কলিং বেল বুঝলি। তলা থেকে কাজের লোককে ওপরে আনার জন্য লাগিয়েছি। আগে মোবাইলেও ডাকতাম। এত পাজি অনেক সময় ধরে না, পরে বলে শুনতে পায়নি, মোবাইলটা ভুলে কোথায় ফেলে রেখেছিল। একের নম্বরের গাছ....'' দ্বিতীয়বার স্তম্ভিত হই। এ ধরনের বাজারি ভাষা শর্বরীর মুখে কোনোদিন শুনব কল্পনাও করিনি।

ধীমান ও মেয়েদের খবর ইত্যাদি মামুলি আলাপের পর কলকাতার বাড়ি প্রসঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা বলি, বাপের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ি সব পাটই চুকে গেল। আত্মীয়স্বজন বন্ধু, যারাই এ খবর শুনেছেন দুঃখ প্রকাশ করেছে। শর্বরীর প্রতিক্রিয়া অদ্ভুত। দারুণ উৎসাহ।

'তুই চুকিয়ে দিলি? ভেরি গুড। ও সব বাপঠাকুর্দার বাড়িটাড়ি রেখে কী লাভ। শেষ পর্যন্ত সবই তো ইতিহাস হয়ে যায়, মানে ডেড্। আমাদের এ বাড়ির ভবিষ্যৎ কী জানিস? কমলের মেয়ে নেহা আর অমলের সৎছেলে রিসাদ উত্তরাধিকারী। একজন খ্রিস্টান দাদু হিন্দু দিদিমার পুরো হিন্দু নাতনি, বাপের পদবি ছাড়া মুসলমানত্ব কিছুই নেই। অন্যজন, মানে রিসাদ, আরো সরেস। তার বাপ মা চোদ্দ পুরুষ শিয়া। রিসাদকে সায়রার প্রথম স্বামী ওদের ছেলে হিসাবে দিতে রাজি হয়েছে এই কন্ডিশানে যে সে শিয়াই থাকবে, সুন্নি সৎবাপের ধর্ম নেবে না। হি হি হি। কলকাতার এক খানদান সুন্নি পরিবারের ওয়ারিশ কি না হলো শিয়া! এ যে হিন্দু হবার মতো কেলেঙ্কারি রে। হি হি হি।'

সমানে হাসতে থাকে। অপ্রস্তুত লাগে। থামাবার জন্য জিজ্ঞাসা করি, 'নাদিরার খবর কী রে? সে তো সেই কবে থেকে ছেলেকে ইউএসএ পাঠাবার জন্য তোড়জোর করছিল? পাঠাতে পারলো?'

'হ্যাঁ। স্কুল শেষ করতে না করতেই তার মামু লেগে পড়ে তাকে স্যাট্ (স্কলাস্টিক অ্যাপ্টিচিউড টেস্ট) পরীক্ষায় বসিয়ে সেই অল্প বয়স থেকে পুরো কলেজ ইউনিভার্সিটি ওখানে করালো। বাড়ির ছেলেদের মধ্যে তার সেরা কেরিয়ার চাই। কেরিয়ার তো অ্যাভারেজ বাঙালির মতো, জেনারেল স্ট্রিমে গ্র্যাজুয়েট তারপর এমবিএ। তবে চলনবলনে একেবারে মার্কিনি সাহেব। তারপর যা হলো সেটাই মোস্ট ইন্ট্রেস্টিং। দারুণ একটা বিয়ে করল, বউ ফিনান্সে এক্সপার্ট মেম। না, এও শেষ নয়। মেম আবার ইহুদি। হি হি হি হি। ওদের এক ছেলে, তার নাম কি জানিস? এজ্‌রা। হ্যাঁরে, ইহুদি মায়ের ইহুদি ছেলে। সেটাই ওদের নাকি নিয়ম। শুধু মুসলমানদেরই নিয়মকানুন থাকবে, অন্যদের থাকতে নেই। এতো ইন্ডিয়া নয়। ইউএসএ যেখানে ইহুদিদের দাপট মুসলমানদের চেয়ে ঢের ঢের বেশি। আমাকে চিরকাল নাদিরা কথা শুনিয়ে এসেছে। ফ্যামিলিতে একমাত্র হিন্দু থেকে কী লাভ, নেক্সট জেনারেশানে তিন ছেলেই মুসলমান, তাদের সকলের ছেলে-মেয়েরাও মুসলমানই হবে, যাকেই বিয়ে করুক না কেন। এখন বোঝ ঠেলা। অমুক মাজারের পির সাহেবের আর অমুক সুফির মুরিদের ওয়ারিশদের সম্পত্তি, পার্কসার্কাসের বাড়ি, রিপন স্ট্রিট ধর্মতলার ম্যানশান যার ভাগও অমল আর কমল হিন্দু মায়ের ছেলে হবার অপরাধে পেল না, সে সব সম্পত্তির একমাত্র হকদার হবে এক ইহুদি। হি হি হি হি।'

এবারে আর তার হাসি থামাতে পারি না।

আফতাবের দিকে তাকাই। এতক্ষণ সে ছিল মূক ও বধির। এখন অন্ধও, কিছু না দেখা চোখে সামনে দেওয়ালের দিকে চেয়ে আছে।

(বাস্তবের কোনো চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য কাকতালীয়।)

With Best Compliments from -

A Well wisher

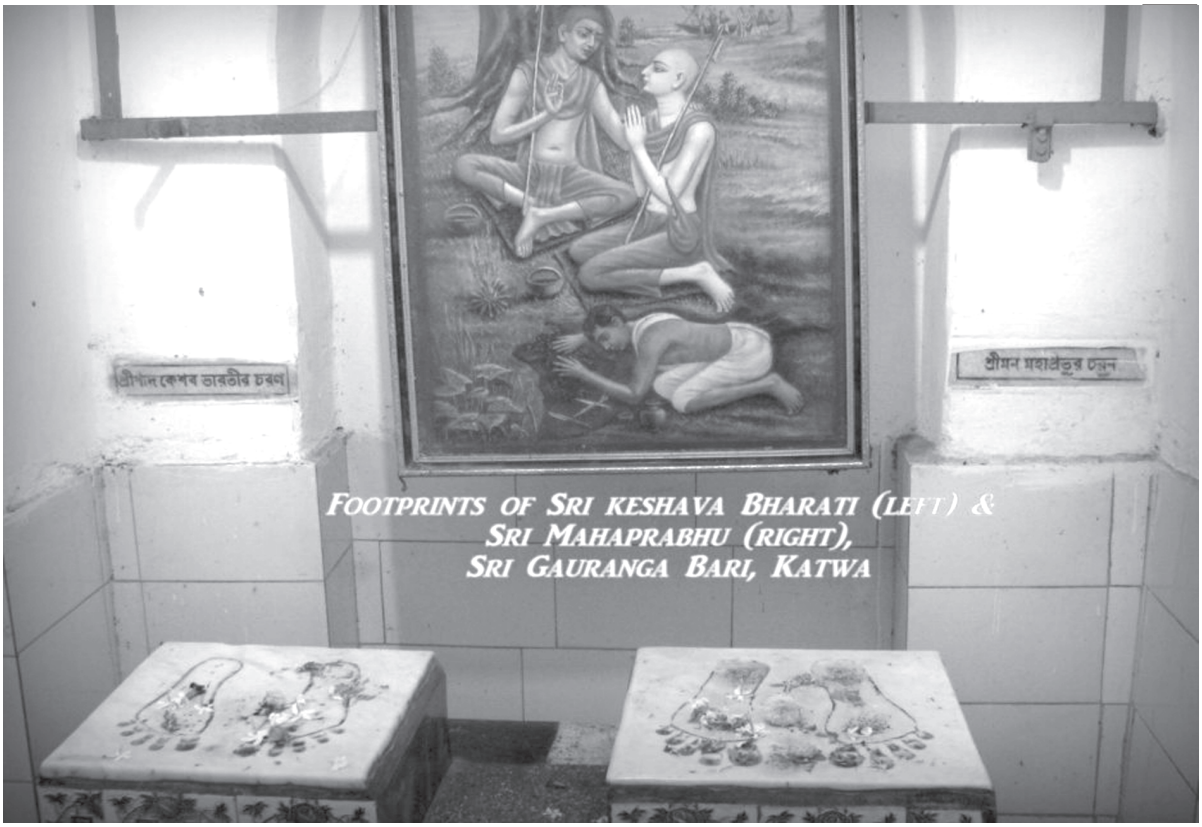

FOOTPRINTS OF SRI KESHAVA BHARATI (LEFT) &
SRI MAHAPRABHU (RIGHT),
SRI GAURANGA BARI, KATWA

লোকবিস্মৃত কেশব ভারতী

প্রবীর আচার্য

নবদ্বীপের নিমাই মিশ্র কাটোয়ার গঙ্গাতীরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে জগদ্‌বিখ্যাত হন। ব্যাস! এইটুকু। কেশব ভারতী নামক মানুষটি সম্পর্কে এর বেশি তথ্য জানার আগ্রহ গত পাঁচশো বছরে সাধারণ মানুষের হয়নি। আর হলেও-বা পাবে কোথায়? গত পাঁচশো বছরে কেশব ভারতীর জীবনী লিখে রাখার তাগিদ আসলে কারও হয়নি। আর এতদিন পর এসব যোগসূত্র হারিয়েও গেছে।

কাজটা হাতে নিয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রসমীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখি বিভিন্ন স্থানে কেশব ভারতীর বংশধর হওয়ার দাবিদার প্রচুর। কিন্তু তাঁদের কাছে নেই কোনো প্রামাণ্য নথি, পুথিপত্র বা বংশলতিকা। তবে গ্রাম্য প্রবাদ প্রবচন এবং লোককাহিনি প্রচুর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বৈষ্ণব ক্ষেত্রগুলিতে। দেনুড় থেকে একটি বংশলতিকাও উদ্ধার করা হয়েছে। আবার তৎকালীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ঘেঁটে যা কিছু কুচোকাঁচা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার অধিকাংশই পরস্পর বিরোধী। সবকিছু সংগ্রহ করে মন্তব্য-সহ পরপর সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখানে। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাঠকবর্গের বিবেচনাধীন।

আমার শিক্ষক ড. কালীচরণ দাসের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই প্রবন্ধ লেখা কখনই সম্ভব হতো না। বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থ থেকে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে দিয়েছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ আমাকে উজ্জীবিত করেছে। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষেত্রসমীক্ষায় সহায়তা করেছেন। এছাড়া সাহায্য করেছেন দেনুড় পাটবাড়ির উজ্জ্বল ব্রহ্মচারী, বাবু ব্রহ্মচারী, সুলোচন মোহান্ত। খাটুন্দির শিক্ষক শান্তি ঘোষ ও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। আউরিয়া গ্রামের শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ ভারতী। প্রত্নতাত্ত্বিক সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, এশিয়াটিক সোসাইটির কিউরেটর ড. জগৎপতি সরকার, অধ্যাপক ড. বীরেন হালদার, লিপি চৌধুরী, বিশ্বনাথ মুখার্জি, অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম চক্রবর্তী প্রমুখ আরও অসংখ্য মানুষের সাহায্য নিয়েছি, তাঁদের সকলের কাছে

আমি কৃতজ্ঞ।

পূর্বজন্ম (বৈষ্ণবীয় বিশ্বাস) : বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের সমকালে তাঁর অনুচরগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক কালেও তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বিশ্বাস অনুযায়ী তৎকালীন সান্দীপনি ঋষি ও গর্গ ঋষির সম্মিলিত রূপ হিসেবে কেশব ভারতী গৌরাঙ্গদেবের সমকালে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণ ও বলরাম সান্দীপনি মুনির কাছে শাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন এবং সান্দীপনি ঋষি শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন দিয়েছিলেন। তাই এই জন্মে তিনি গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গুরু হলেন। মতান্তরে কৃষ্ণ-সহচর অক্রুর কেশব ভারতী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এইসব বিশ্বাসের পিছনে ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। তবুও বৈষ্ণবগ্রন্থের সূত্রগুলি এখানে তুলে দেওয়া হলো। ভক্তমাল গ্রন্থ অনুযায়ী—

ভগবান কৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র দিলা যেঁহ।
অবন্তীতে বাস সান্দীপনি মুনি তেঁহ।।
কেশব ভারতী সেহ গৌরাঙ্গেরে সন্ন্যাসী।
করিয়া লইয়া গেল নবদ্বীপ শশী।।

আবার স্বরূপ নির্ণয় গ্রন্থ অনুযায়ী—

পূর্বে গর্গ নামে যাঁর আছিলেক খ্যাতি।
এবে সেই তত্ত্ব হৈলা কেশব ভারতী।।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থের ৭৬৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, তৎকালীন গোস্বামীগণ চৈতন্যদেবকে ভগবান রূপে প্রতিপন্ন করার পর নিজেরাও তাঁর দেবত্বের অংশীদার হতে দাবি করলেন। যেমন চৈতন্য স্বয়ং বিষ্ণু, নিত্যানন্দ বলরাম, অদ্বৈত সদাশিব, কেশব ভারতী সান্দীপনি মুনি, নরহরি দাস মধুমতী, রামানন্দ বিশাখা, কালা কৃষ্ণদাস লবঙ্গ সখা ইত্যাদি। এভাবে চৈতন্যদেবের প্রয়াণের পর তৎকালীন গোস্বামীগণ নিজেদের উপর দেবত্ব আরোপ করে জনগণের পূজা দাবি করলেন। কারণ শ্রীচৈতন্যদেব কখনই অলৌকিকত্বকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁকে অবতার প্রতিপন্ন করতে চাইলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন। সার্বভৌমের মতো প্রবীণ পণ্ডিত তাঁকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলায় তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলেছিলেন—

প্রভু কহে সার্বভৌম আর কথা কহ।
আতাল পাথাল কথা / কেন বা বলহ।।

জন্মস্থান, জন্মসময় ও বংশপরিচয় : হরিদাস দাসের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' অনুসারে কেশব ভারতী ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে কুলিয়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।*[০১]

প্রেমবিলাস গ্রন্থের (রচনাকাল ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে) ১৩ সংখ্যক বিলাসে বলছে—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিল কালিনাথ আচার্য।
কুলিয়াবাসী বিপ্র সর্বগুণে বর্য।
মাধবেন্দ্র শিষ্য হঞা করিল সন্ন্যাস।
কেশব ভারতী নামে জগতে প্রকাশ।

এই শ্লোক থেকে জানা যাচ্ছে কেশব ভারতীর পূর্বাশ্রমের নাম কালীনাথ আচার্য। তাঁর আদি জন্মস্থান নবদ্বীপের নিকট কুলিয়া গ্রামে।

আবার 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের ১২ তরঙ্গে ৩৭২ শ্লোকেও বলা হচ্ছে কুলিয়া গ্রাম নবদ্বীপের কাছে। কোলদ্বীপ শব্দের অপভ্রংশ থেকে কুলিয়া নামের উৎপত্তি। তিনদিকে গঙ্গা বেষ্টিত দ্বীপকে কোলদ্বীপ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ গঙ্গার কোলে দ্বীপটি অবস্থিত। কেশব ভারতীর শৈশবেই কুলিয়া গ্রাম গঙ্গাগর্ভে চলে যায়।*[০২]

উদ্ভব দাসের শ্রীপাট পরিক্রমা গ্রন্থে বলা হয়েছে—

বাল্যকালে কেশবের দেন্দুড়ায় স্থিতি।
বৃন্দাবন দাসের হয় যথায় বসতি।।

এক্ষেত্রে 'স্থিতি' শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সম্ভবত কুলিয়া গ্রামেই কেশব ভারতীর জন্ম হয়। তারপর কুলিয়া গ্রাম গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে দেন্দুড়ায় তাঁরা স্থিতিশীল হন। সেক্ষেত্রে কেশবের বাল্যকাল দেন্দুড়ায় অর্থাৎ দেনুড় গ্রামে কেটেছে।

দেনুড়ের শ্রীপাটবাড়ির সেবাইত উজ্জ্বল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে হরিদাস মোহন্ত রচিত ও প্রকাশিত 'বেদব্যাসই বৃন্দাবন' নামক একটি প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায়। তা থেকে কেশব ভারতীর যে বংশলতিকা পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে মুকুন্দমুরারীর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ বলভদ্র ও কনিষ্ঠ রামভদ্র। ছোট ভাই রামভদ্র পরবর্তীকালে কেশব ভারতী নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আনুমানিক ১৩৮০ শকাব্দে (১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দ) মাঘী শুক্লা একাদশী তিথিতে রামভদ্র জন্মগ্রহণ করেন। উপনয়ন পর্যন্ত বাল্যকাল তিনি দেনুড় গ্রামেই কাটান। এই গ্রন্থে কুলিয়া গ্রাম বা কালীনাথ আচার্যের কোনও উল্লেখ নেই। তবে বলা হচ্ছে শৈশবে আট বছরকাল তিনি দেনুড় গ্রামে কাটান।

কথা হচ্ছে উপনয়নের পর তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং আট বছর কাল দেনুড় গ্রামে কাটান। কিন্তু আট বছরে উপনয়ন হয় না, উপনয়ন হয় ন'বছরে। অর্থাৎ কালীনাথ বা রামভদ্র ন'বছর বয়সে ১৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গৃহত্যাগ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে জন্মের পর এক বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কুলিয়া গ্রামে থাকা স্বাভাবিক।

তাঁর দেনুড়ে বসবাসের স্মারক হিসেবে ছোট্ট দুটি পুষ্করিণী আজও বর্তমান। একটি মাঠের মাঝে যার নাম কেশবগড়। গ্রামের প্রবীণ মানুষরা বলেন তার পাড়ে ছিল শান্তি কুটির। বালক রামভদ্র সেখানে নাকি সাধন ভজন করতেন। অপর পুকুরটি গ্রামের মধ্যে, তার নাম ভারতী খিড়কি। দেনুড়ে কেশব ভারতীর শ্রীপাটবাড়িতে মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের ভৈমী একাদশী তিথিতেই কেশব ভারতীর আবির্ভাব তিথি পালন করা হয়ে থাকে। সে উপলক্ষ্যেও তাঁর ভ্রাতার বংশধরগণ শ্রীপাটে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ, মহোৎসব আদির আয়োজন করেন। সেখানে নাতিবৃহৎ গোল একটি ধাতুফলকে লেখা আছে, 'শ্রীপাদ কেশব ভারতীর বাল্যলীলাস্থান শ্রীপাট দেনুড়'।*[০২]

কেশব ভারতী অকৃতদার, কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলভদ্রের কুলজী বা বংশলতিকা থেকে বর্তমান বংশধরদের হদিশ পাওয়া যায়। রামভদ্রের দেনুড় গ্রামে অবস্থানকালে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলভদ্রের বংশধরগণ ওই গ্রামেই বসবাস করতেন। ওই বংশের ভোলানাথ ব্রহ্মচারী একজন ইতিহাস সচেতন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং শতবর্ষ পূর্বে 'গৃহস্থ' নামক পত্রিকায় আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তাঁর পারিবারিক গ্রন্থভাণ্ডার থেকে হাতেলেখা পুথির জীর্ণ কয়েকটি পাতা খুঁজে পান। তাতে রয়েছে—

গৌড় দেশে রাঢ়ভূমে দেন্দুড়া নামেতে গ্রামে
কেশব ভারতী পরকাশ।
যিঁহ গৌরাঙ্গের কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্রদানে
জগতের পুরাইলা আশ।।...[০৩]

গৃহত্যাগ, শিক্ষা ও সন্ন্যাস : কেশব ভারতীর সন্ন্যাস গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। উদ্ভব দাসের 'পাটপরিক্রমা' গ্রন্থ অনুসারে উপনয়নের পরই রামভদ্র ভট্টাচার্য গৃহত্যাগ করে বৃহত্তর জীবনের পথে বেরিয়ে পড়েন। ভারত ভ্রমণ করতে করতে তিনি এসে পড়েছিলেন দক্ষিণ ভারতে। সেখানে আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে নানা স্থান পর্যটন কালে তাঁর সাথে পরিচয় হয় বৈষ্ণব সন্তজন শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর। মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

একচক্রা ধামের নিতাইবাড়ির মোহন্ত এবং সুলেখক জীবশরণ বাবাজীর মতে রামভদ্র গৃহত্যাগ করে এ দেশ সে দেশ ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ ভারতের তৈলঙ্গদেশে বৈদুর্যপত্তনম নামক নগরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানেই গাঙ্গোলভট্ট নামে জনৈক পারঙ্গম পণ্ডিতের কাছে তিনি বেশ কিছুকাল শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন।

লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর 'সমন্ধনির্ণয়' গ্রন্থে বলেছেন, দক্ষিণ দেশে অবস্থানের সময়েই রামভদ্র শৃঙ্গেরী মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অদ্বৈতবাদী দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতী গোষ্ঠীর কোনও সন্ন্যাসীর নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তীর্থ ভ্রমণকালে শ্রীমৎ লক্ষ্মীপতি পুরীর শিষ্য মাধবেন্দ্র পুরীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। ভাববিহ্বল মাধবেন্দ্র পুরীর ভগবত-আবেশ, শাস্ত্রজ্ঞান, শরণাগতি, নিগূঢ় রসবোধে লুব্ধ মুগ্ধ হয়ে কেশব ভারতী তাঁর কাছে দশাক্ষরী শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এখানে বিচার্য রামভদ্র মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তাঁর পদবি হতো পুরী। কেশব ভারতীর পরিবর্তে তিনি কেশব পুরী হতেন। তাই শৃঙ্গেরীমঠে ভারতী গোষ্ঠীর কোনও নাম না জানা সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

পূর্বোক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারীর পারিবারিক জীর্ণ*[০৪] পুথি থেকে জানা যাচ্ছে নিমাইয়ের জন্মের আগেই কেশব ভারতী শৃঙ্গেরী মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতী গোষ্ঠীর কোনও সন্ন্যাসীর নিকট। মাধবেন্দ্র পুরী যে তাঁর সন্ন্যাস গুরু, এ কথার কোনও প্রমাণ এখানে নেই। মাধবেন্দ্র পুরীর জ্ঞান ও ভক্তিতে আবিষ্ট হয়ে কেশব ভারতী তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার দীক্ষা গ্রহণ করে থাকতে পারেন।*[০৫]

সন্ন্যাস ও দীক্ষা গ্রহণের পর কেশব ভারতী ক্রমিক তীর্থ পর্যটনে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উপস্থিত হন কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত খাটুন্দি গ্রামে। সেখানে তিনি আশ্রম গড়ে তুলে স্থিতু হন। খাটুন্দি হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর (২০০৩ সালে অবসরপ্রাপ্ত) নিকট সেই গ্রামের লোকপ্রবাদগুলি থেকে জানা যায় কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল কুলাই এবং খাটুন্দির মধ্যবর্তী স্থানের মাঠের মাঝে। তখন খাটুন্দি গ্রাম ছিল কান্দরের দক্ষিণ পাড়ে। বর্তমানে সেই কান্দর খাটুন্দি গ্রামের উত্তর দিকে বইছে। কেশব ভারতী মাঠের মাঝখানে শ্মশানে তাঁর আশ্রম তৈরি করেন। তিনি বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ এনে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই কৃষ্ণরায় বিগ্রহ এখনও খাটুন্দি গ্রামে পূজিত হন। কৃষ্ণরায়ের পাশেই রয়েছেন রাধিকা বিগ্রহ। এই রাধিকাদেবী লক্ষ্মীর ধ্যানে পূজিতা হন। তবে যেখানে কেশব ভারতীর মূল আশ্রম ছিল সে জায়গা কান্দরের গর্ভে চলে যাওয়ায় এখন গ্রামের মধ্যে কৃষ্ণরায়ের মন্দির রয়েছে। গ্রামের মধ্যে এক চত্বরে সাতটি দুর্গামন্দির অবস্থান করছে। তার মাঝে রয়েছে কৃষ্ণরায় মন্দির ও ভোগঘর। দুর্গাপূজায় পাঁঠাবলির সময় কৃষ্ণরায়ের মন্দির বন্ধ রাখা হয়।

ঊষাপতি ও নিশাপতি নামে দুই ভাই খাটুন্দির আশ্রমে কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সম্ভবত তাঁরা ভট্টাচার্য বংশীয় ছিলেন। কারণ বর্তমানে খাটুন্দির ভট্টাচার্যগণ নিজেদের কেশব ভারতীর বংশধর বলে দাবি করেন। কিন্তু তাঁদের কাছে কেশব ভারতীর কোনও বংশলতিকা বা তাঁদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের কোনও কুলজী নেই। তাই অনুমান করা যায় খাটুন্দির ভট্টাচার্যরা কেশব ভারতীর শিষ্য পরম্পরা, যাঁদের পূর্বপুরুষ ঊষাপতি ও নিশাপতি। খাটুন্দির জনশ্রুতি অনুযায়ী কেশব ভারতীর জন্মস্থানও সেখানেই। ঊষাপতি এবং নিশাপতি কেশব ভারতীর সন্তান। কিন্তু তা হতে পারে না, কারণ কেশব ভারতী তো অকৃতদার ছিলেন।

খাটুন্দিতে কেশব ভারতীর অবস্থানকালে তাঁর ফিরে আসার সংবাদ পৌঁছে যায় দেনুড় গ্রামে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ বলভদ্রের পুত্র গোপাল খাটুন্দিতে কাকার কাছে উপস্থিত হন। তিনি কাকাকে দেনুড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু অনুনয়-বিনয় করতে থাকেন। কিন্তু কেশব ভারতী দেনুড়ে ফিরে যাননি। ইতিমধ্যে তিনি খাটুন্দিতে ব্রজযুগল, শ্রীরাধা, গোপীনাথ, জগন্নাথদেব, শ্রীকৃষ্ণরায়, দ্বাদশ বালগোপাল, বিষ্ণুচক্র, শালগ্রাম প্রমুখের সেবা বসিয়েছেন। সেই বিগ্রহগুলি থেকে ভারতী ভাইপো গোপালকে শ্রীরাধা, গোপীনাথ, শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ, পাঁচটি বালগোপাল মূর্তি ও চারটি শালগ্রাম শিলা দেন দেনুড়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তিনি গোপালকে

দীক্ষা দিয়ে ব্রহ্মচারী উপাধি দান করেন। গোপাল কাকাকে ফিরিয়ে আনতে না পেরে বিষণ্ণ মনে এই বিগ্রহগুলি নিয়ে দেনুড়ে এসে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। গোপালের পুত্র গোপীনাথ ব্রহ্মচারীই দেনুড়ের ব্রহ্মচারী বংশের আদি পুরুষ। দেনুড়ে কেশব ভারতীর আদি বসতবাটি তথা পাটবাড়িতে সেই বিগ্রহগুলি আজও পূজিত হয়। শ্রীপাটের মূল মন্দিরটি দালান রীতির এবং তার বাম প্রকোষ্ঠে কেশব ভারতীর প্রস্তর মূর্তি বিরাজমান। দেনুড়ে ব্রহ্মচারী বংশে অনেক সুসন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কারকর্তা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সুলেখক ভোলানাথ ব্রহ্মচারী, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে গোপালের দাদা মদন খাটুন্দিতে কাকার কাছে উপস্থিত হন। তিনিও কাকার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কেশব ভারতী তাঁকে 'ভারতী' উপাধি দান করেন। মদন কাকার কাছে বিগ্রহ প্রার্থনা করলে তিনি গোপালকে আদেশ করেন দুটি বালগোপাল মূর্তি মদনকে দেওয়ার জন্য। মদন তাঁর ভাই গোপালের নিকট ওই দুটি বিগ্রহ গ্রহণ করে তাঁর মামার বাড়ি আউড়িয়ায় শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। আউরিয়া গ্রামটি কাটোয়া মহকুমার দাঁইহাট ব্লকে অবস্থিত। আউরিয়ার বর্তমান ভারতী পদবিধারী ব্রাহ্মণগণ এই মদনের বংশধর। আউরিয়ার ভারতী বংশের আদি পুরুষ তিনিই। তাঁরা অবশ্য নিজেদের কেশব ভারতীর বংশধর বলে দাবি করেন। ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে আউরিয়ার ভারতী উপাধিধারীগণ আউরিয়াকে কেশব ভারতীর আদি জন্মস্থান বলে দাবি করেন। সেখানে কেশব ভারতীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৩০০ বছরের পুরানো মেলা এখনও অনুষ্ঠিত হয়। কেশব ভারতীর বংশধরদের বাড়িতে একটি বালগোপালের নিত্যসেবা আজও পালাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। অপরটি রয়েছে কেশব ভারতীর নতুন মন্দিরে। গ্রামে ঢোকার মুখেই স্কুলের পাশে সেই মন্দির অবস্থিত।

গোপাল ও মদনকে বিগ্রহ দানের পর কেশব ভারতী বাকি বিগ্রহগুলির সেবার ভার দান করেন তাঁর খাটুন্দির শিষ্য ঊষাপতি ও নিশাপতিকে। খাটুন্দিতে কেশব ভারতীর আশ্রমের দক্ষিণে কুলাইগ্রামের রাজা ছিলেন শূদ্র। তিনি ছিলেন প্রভাবশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং উচ্ছৃঙ্খল। তিনি কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা নিতে চাইলে কেশব ভারতী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ওই ধনাঢ্য ব্যক্তি নানা উপায়ে কেশব ভারতীকে উত্যক্ত করতে থাকেন। নিরুপায় কেশব ভারতী তাঁর আশ্রমের উপাস্য বিগ্রহগুলির সেবা পূজার ভার ঊষাপতি ও নিশাপতিকে দান করে কাটোয়ায় চলে আসেন। সেখানে গঙ্গাতীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সাধন-ভজনে মন দেন।

ইতিমধ্যে ভারতী বেশ কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে 'কৌস্তুভপ্রভা'ও 'ক্রমদীপিকা'*[০৬] উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হচ্ছে 'ক্রমদীপিকা' গ্রন্থখানি বিষ্ণুমন্ত্রোদ্ধারক তন্ত্রগ্রন্থ এবং সেটি এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় রয়েছে।*[২১] মৌলিক গ্রন্থের পাশাপাশি বিভিন্ন শাস্ত্রের ভাষ্যও তিনি রচনা করেছিলেন। 'উপনিষদ প্রকাশিকা' নামক টীকা গ্রন্থে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন ইত্যাদি প্রধান বারোটি উপনিষদের ভাষ্য তিনি রচনা করেছিলেন। শ্রীভাগবতব্যাখ্যা নামে গ্রন্থ এবং শ্রীমদ্ভগবতগীতার 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামে ভাষ্যও তিনি রচনা করেছিলেন। এই 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক গ্রন্থখানির বৃন্দাবনে মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে কেশব ভারতীর পরিচয় দিতে গিয়ে 'কেশব ভারতীকে' 'কেশব কাশ্মীরি' নামক পণ্ডিতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। কেশব কাশ্মীরি আসলে কাশ্মীর দেশনিবাসী এবং নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে তিনি মহাপ্রভুর সাথে শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত হয়েছিলেন। যাই হোক এইসব গ্রন্থাদি প্রণয়নের ফলে বাঙ্গলা তথা ভারতের পণ্ডিত সমাজে কেশব ভারতীর খ্যাতি তখন তুঙ্গে।*[০৭]

কাটোয়ার কর্মকাণ্ড : কাটোয়ায় এসে কেশব ভারতী সুরধ্বনি গঙ্গার তীরে আশ্রম স্থাপন করেন। গঙ্গার তীরবর্তী সেই জায়গাটি তখন নির্জন ছিল। একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের তলে তিনি কুটীর স্থাপন করেন।*[০৮]

ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথায় আছেন কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম।।

—চৈতন্যভাগবত/বৃন্দাবন দাস

কেশব ভারতীর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিকে কাটোয়ার মানুষ সাগ্রহে গ্রহণ করেন। গঙ্গার তীরবর্তী কাটোয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সুচারু। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গ্রন্থপ্রণেতা হিসেবেও মানুষ তাঁকে সমীহ করতে থাকেন। ভারতের মহা মহা পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীগণ তাঁর আশ্রমে যাতায়াত করতে থাকেন। ফলে শাস্ত্র আলোচনা শুনতে গঙ্গাতীরে ভারতীর আশ্রমে যাতায়াত শুরু হয় সাধারণ মানুষেরও। সন্ন্যাসী ও ভক্ত সমাগমে ভারতীর আশ্রম বেশ সরগরম হয়ে থাকতো। ভারতীর আশ্রমে যেসব সন্ন্যাসীরা শাস্ত্র আলোচনা করতে আসতেন তাঁদের নাম আছে জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে।*[০৯]

মাধুকরী করতে কেশব ভারতী কাটোয়া জনপদ সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াতেন। সেই সূত্রে পণ্ডিত সমাজ বেষ্টিত নবদ্বীপেও তাঁর যাতায়াত ছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ও খাতির ছিল।

নিমাই মিশ্রের দাদা বিশ্বরূপ নিমাইয়ের অপেক্ষা আট বছরের বড়ো ছিলেন। তাঁর ষোলো বছর বয়স হলে পিতা-মাতা বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন। ফলে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলের আদিলীলায় আছে—

ষোড়শ বরিষ পুত্র ভেল বয়ক্রম।
বিবাহের যোগ্য রূপ-যৌবন-সম্পন্ন।। (আদি/৪৩৩)

বিশ্বরূপ কাটোয়ায় কেশব ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে ষোলো বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ

করে শঙ্করারণ্য নামে খ্যাত হন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত আছে—

কাটোয়ায় কেশব ভারতী নিবস্যে।
বিশ্বরূপ তার স্থানে লভিল সন্ন্যাসে।।
গুরু নাম থুইল তার শঙ্করারণ্য।
গৌরাঙ্গ ধরিব নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।(২০/১৫/১৭)

তবে অনুমান করা হয় বিশ্বরূপ সরাসরি কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। তাঁর আশ্রমে অরণ্য গোষ্ঠীর কোনও সন্ন্যাসীর নিকট তিনি শৈবমন্ত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যার জন্য তাঁর নাম হয় শঙ্করারণ্য। আবার শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত অনুসারে শঙ্করারণ্য পুরী। সেক্ষেত্রে কেশব ভারতীর আশ্রমে পুরী গোষ্ঠীর কোনো সন্ন্যাসীর কাছে তিনি দীক্ষা নিতে পারেন। ভারতীর কাছে দীক্ষা নিলে নাম হতো শঙ্কর ভারতী।*[১০] (চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা : ৯/২৯৯)

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের বৃহৎবঙ্গ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের আগে মাকে বলেছিলেন নিমাই বড়ো হলে, তার লেখা গ্রন্থগুলি তাকে পড়তে দিতে। কিন্তু শচীদেবী সমস্ত পুঁথিপত্র গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল বড়ো ছেলের মতো ছোটো ছেলেও পুঁথিপত্র পড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে।

বৃন্দাবন দাসের মতে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর ১৪১৬ শকাব্দে (১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ) বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নিমাইয়ের উপনয়ন হয়। তখন তাঁর বয়স ৮ বছর ২ মাস।

এরপর কাটোয়ার আশ্রমে ভারতীর আরও পনেরোটা বছর কেটে গেছে সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্র আলোচনা করে। তখন সময়টা ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দ (মাঘ মাসের প্রথম দিকে)। মাধুকরী করতে কেশব ভারতী উপস্থিত হলেন নবদ্বীপ নগরে। চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম নাটকের চতুর্থ অঙ্কে কেশব ভারতীর নবদ্বীপ আগমনের উল্লেখ আছে। কেশব ভারতী সেদিন নিমাইয়ের বাড়িতে ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন।

প্রভু তাঁরে নমস্কারি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন।।
তুমিতো ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি করো মোর সংসার মোচন।।
—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত/আদিলীলা ১৭/২৬৯-২৭০)

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, কোনও সন্ন্যাসী নবদ্বীপে উপস্থিত হলে নিমাই নাওয়া-খাওয়া ভুলে তাঁর পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতেন। কেশব ভারতীর সঙ্গে নবদ্বীপ নগর পরিক্রমা কালে নিমাই কেশব ভারতীর কাছে গোপনে অনুরোধ রেখেছিলেন তাঁকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য এবং তাঁর সম্মতিও আদায় করে নিয়েছিলেন। মহাত্মা শিশির ঘোষ তাঁর 'শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত' গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৬) বলেছেন—''নিমাই বাড়িতে বসিয়া আছেন, এমন সময় কেশব ভারতী আইলেন। নিমাই' কে এলো? কে এলো?' বলিয়া উঠিয়া আসিলেন। শুদ্ধচিত্ত কেশব ভারতীকে দর্শন মাত্র নিমাইয়ের অন্তরের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। ভারতী ঠাকুরও শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া পুলকিত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'তুমি শুক না প্রহ্লাদ?' এইরূপ স্তুতিবাদ শুনিয়া নিমাই কান্দিয়া উঠিলেন, তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। তিনি অনেক যত্ন করিয়া ভারতীজীকে ভিক্ষা করাইলেন ও তাঁর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি দেখাইলেন।*[১১] কিন্তু ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া শচীদেবী আক্ষেপ করিয়াছিলেন,

বড় সাধ ছিল নদীয়া-বসতি।
কাল হয়ে এল মোর কেশবভারতী।।*[১২]

নিমাইকে সন্ন্যাস দান : এরপর বছর খানেক কেটে গেছে। দিনটা ছিল ১৪৩১ শকাব্দের ২৭শে মাঘ, বৃহস্পতিবার। গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি।*[১৩] প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে কেশব ভারতী কাটোয়ার আশ্রমে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে শাস্ত্র আলোচনায় রত। এমত সময়ে নদীয়ানন্দন শচীদেবীর আদরের দুলাল ভাবে বিভোর অবস্থায় উপস্থিত হলেন। আস্কন্ধ লালিত চাঁচর কেশ, দীর্ঘদেহী, লাবণ্যময় পুরুষ 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' বলতে বলতে তড়িতগতিতে এসে লুটিয়ে পড়লেন কেশব ভারতীর পদপ্রান্তে। শশব্যস্তে নারায়ণ স্মরণ করে ভারতীজী তাঁকে বললেন, 'কে তুমি বাপু আমাকে প্রণাম করো?' নিমাই করজোড়ে বললেন, 'আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী, আমাকে নিমাই বলে লোকে ডাকে। আমি পূর্বে আপনার চরণ দর্শন করেছি তখন আপনি আমাকে আজ্ঞা করেছিলেন যে, আমাকে সন্ন্যাস দিবেন, তাই আমি এসেছি। এখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করলাম। প্রভু আমাকে সন্ন্যাস দিন, আমি আর কৃষ্ণ বিরহ সইতে পারছি না, কৃপা করুন।' বলতে বলতেই আবেগে মূর্ছা গেলেন।'

কেশব ভারতীর সমস্ত কথা স্মরণ হলো। তিনি বললেন, 'তুমি পথশ্রান্ত, উপবেশন কর, বিশ্রাম কর, তারপর বিবেচনা করা যাবে।' এদিকে নিমাই 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' রবে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। তাঁর দরবিগলিত অশ্রুতে শুষ্ক মাটি ভিজে যাচ্ছে। কেশব ভারতী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কিন্তু এই করুণ দৃশ্য দেখে তিনিও চোখের জল ধরে রাখতে পারছেন না।

তিনি হতভম্ব, বিষণ্ণ, নির্বিকার! না না অপূর্ব দর্শন ২৪ বছরের যুবাকে কখনই সন্ন্যাস দেওয়া যায় না। সন্ন্যাস ধর্ম বড়ো কঠিন। কঠোর, নির্মম তার রীতিবিধি। এই যুবকের কোমল অঙ্গে তা সইবে কেন! এদিকে নিমাই কৃষ্ণপ্রেমের আবেগে কাতর হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন আর মাঝে মাঝেই সংবিৎ হারাচ্ছেন।

গঙ্গার স্নানযাত্রীরা এই দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন নিজেদের অজান্তেই। ভিড় বাড়তে থাকে ক্রমশ। কাটোয়ার মানুষ নবদ্বীপের পূর্ণশশীকে দেখে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছেন না কেন তিনি মাটিতে আছাড়িপিছাড়ি করে কাঁদছেন।

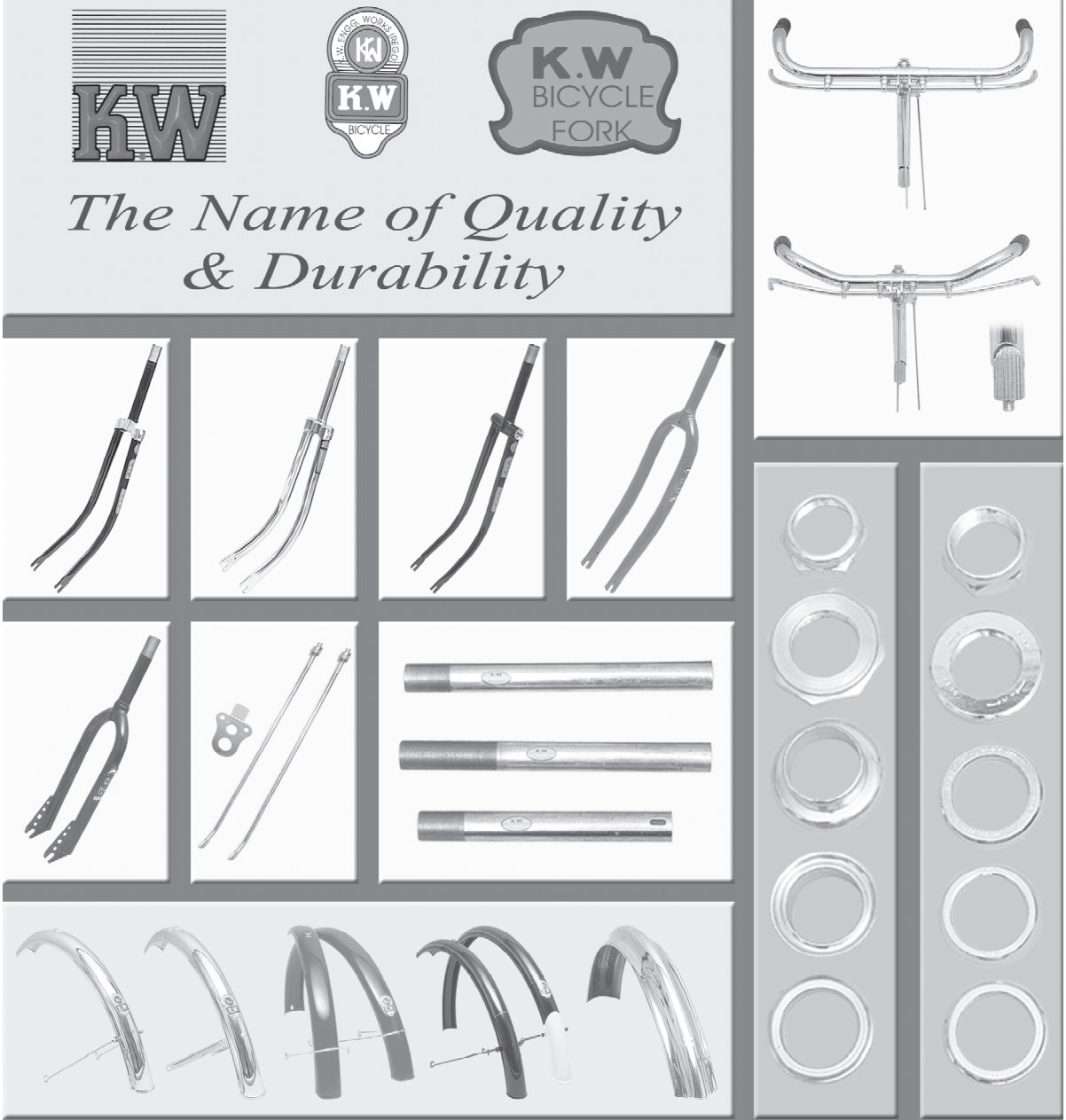

K. W. Engineering Works (Regd.)

B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

এদিকে নবদ্বীপ থেকে পাঁচজন উপস্থিত হলেন নদীয়াশশীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁরা হলেন চন্দ্রশেখর আচার্য, পণ্ডিত দামোদর, মুকুন্দ নিত্যানন্দ ও বক্রেশ্বর। বটবৃক্ষের তলে কেশব ভারতীর সামনে নিমাইকে দেখে তাঁরা আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। নিমাই তাঁদের দেখে বলে উঠলেন, 'তোমরা এসেছ ভালোই হয়েছে। আমি সন্ন্যাস নেব, বৃন্দাবন যাব।' নিমাইকে নিয়ে নবদ্বীপের পঞ্চজন মহানন্দে নামসংকীর্তন সহকারে নৃত্য শুরু করে দিলেন। সে নৃত্যে যোগদান করলেন কেশব ভারতী-সহ আশ্রমের সব সন্ন্যাসী। নবদ্বীপের দলকে দেখে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—যাক বাবা! এঁরা নিশ্চয় নিমাইকে নবদ্বীপে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এই ভাবেই কেটে গেল বৃহস্পতিবার দিনটা।*[১৪]

পরদিন আঠাশে মাঘ, শুক্রবার। সকালবেলা কাটোয়ার মানুষ ভিড় করেছেন গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের তলায়। সকলেই নবদ্বীপের নবীন পণ্ডিতের দর্শন চায়। নিমাই তখন কেশব ভারতীর কাছে আকুলিবিকুলি করছেন সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য। আর মহাবিড়ম্বনায় পড়ে কেশব ভারতী অস্থির হয়ে রয়েছেন। ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছেন নিমাই, আর চৈতন্য হলেই বলে উঠছেন, প্রভু! আমাকে দয়া করুন, আমাকে সন্ন্যাস দিন, আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে, আর ধৈর্য রাখতে পারছি না প্রভু!

কেশব ভারতী তাঁকে বললেন, তুমি বয়সে নবীন, যুবা, তোমার মা ও কিশোরী স্ত্রী রয়েছেন। তোমাকে আমি সন্ন্যাস দিতে পারি না।

নিমাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, কিন্তু প্রভু আপনি আমার কাছে প্রতিশ্রুত আছেন যে আমাকে সন্ন্যাস দেবেন।

এ কথার উত্তর কেশব ভারতী আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন, তাই বললেন, সে প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই রক্ষা করব, কিন্তু সন্ন্যাসের সময় আছে। পঞ্চাশ বছর পূর্ণ না হলে ক্রোধের নিবৃত্তি হয় না। তুমি এখন সংসার ধর্ম পালন কর, সময় হলে আমি নিজেই তোমাকে সন্ন্যাস দেব।

নিমাই কাকুতি-মিনতি শুরু করলেন, প্রভু তাহলে যাদের অল্প আয়ু তাদের কি সন্ন্যাস হবে না?

নারাজ কেশব ভারতী বললেন, তোমার সন্তানসন্ততি হয়নি, তুমি মা ও স্ত্রীর কাছে অনুমতি নিয়ে এস। তিনি মনে মনে ভাবছেন কোনওক্রমে একে একবার ফেরত পাঠাতে পারলেই হয়। তারপর তিনি চম্পট দেবেন। তাঁকে আর খুঁজে পায় কে? এই নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক কাজ থেকে তিনি অব্যাহতি পেতে চান।*[১৫]

এদিকে খবর পেয়ে নবদ্বীপের প্রখ্যাত অধ্যাপক নিমাইকে দেখতে কাটোয়া এবং আশপাশের জনপদ থেকে বহু জনতা হাজির হয়েছেন সেই গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের তলে। খোল করতাল সহযোগে তাঁরা হরিনাম সংকীর্তনে মাতিয়ে দিচ্ছেন। কেশব ভারতীকে নারাজ দেখে তাঁরাও খুব খুশি। আশ্রমের সাধু-সন্ন্যাসীরা এবং নবদ্বীপ থেকে আগত পঞ্চজন-সহ স্বয়ং নিমাইও তাঁদের সাথে নৃত্য সহকারে নাম গানে যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। এর মাঝেই তিনি কেশব ভারতীর কাছে আকুলিবিকুলি করছেন সন্ন্যাস মন্ত্র নেওয়ার জন্য। আর বলছেন, আমি মা ও স্ত্রীর কাছে অনুমতি নিয়েই এসেছি।

ভারতী গোঁসাই মনে মনে অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠলেন। তিনি স্পষ্ট করে বলে দিলেন, তুমি মায়ের কাছে ফিরে যাও। সাক্ষাতে মা ও স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে পুনরায় নিয়ে এসো। নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, দামোদর, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ এবং সমবেত জনতা ভারতীর এই কথায় অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে জয়ধ্বনি করে উঠলো।*[১৬]

এদিকে কেশব ভারতী পড়েছেন মহাসংকটে। তিনি ভাবছেন এ বস্তুটি কোনও সাধারণ মনুষ্য নয়, স্বয়ং ভগবান। আমি যদি এঁকে দীক্ষা দিই, তবে তো ইনি আমাকে প্রণাম করবেন। তাহলেই তো আমার ইহজনম পরজনমের সমস্ত পুণ্যার্জনের হয়ে যাবে জলাঞ্জলি। আবার যদি এঁর কথা অমান্য করি সেও মহাপাতকের কাজ। মহা দোলাচলে পড়ে তিনি অস্থির।

এদিকে নিমাই তাঁর পঞ্চ সহচরকে নিয়ে ফের নবদ্বীপে মা ও স্ত্রীর অনুমতি আনতে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন। ইতিমধ্যে কেশব ভারতী নিজের অন্তর থেকে কিছু একটা সংকেত পেয়ে বলে উঠলেন, আর অনুমতি আনতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বিশ্বম্ভর। তোমরা সন্ন্যাসের আয়োজন করো।

সমবেত জনতা এতক্ষণ কেশব ভারতীর অনুকূলে ছিল। তারা এখন খেপে গিয়ে চ্যাঁচাতে লাগলো, এই ব্যাটা বুড়ো সন্ন্যাসীকে চ্যাংদোলা করে গঙ্গার ওপারে ফেলে দিয়ে আয়। ও বেটাই যত নষ্টের গোড়া। কেশব ভারতী জোড়হাত করে তাদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, বাবারা মায়েরা তোমরা আমাকে বধ করো। তাহলে আমি এই নিদারুণ কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাই। জনতা দেখল কেশব ভারতীর কোনও দোষ নেই।

ইতিমধ্যে পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে এলেন যুগস্রষ্টা চিরকালের জননায়ক স্বয়ং গৌরাঙ্গ দেব। সমবেত জনতার উদ্দেশে তিনি জোড়হাত করে বললেন, বাবা ও মায়েরা, তোমরা কি দেখছো না, তোমাদের সন্তান কৃষ্ণবিরহে কী রকম কষ্ট পাচ্ছে? তোমরা অনুমতি করো আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি। মেসো চন্দ্রশেখর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন আদারের নিমাইকে। তাঁকেই অনুরোধ করলেন, বাপ, তুমিই আমার অভিভাবক, আমার সন্ন্যাসের আয়োজন কর।

কাটোয়াবাসীরা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। শুরু হলো তুমুল নাম সংকীর্তন। এভাবেই কেটে গেল শুক্রবার দিনটা।

পরের দিন ২৯ মাঘ ১৪৩১ শকাব্দ, ইংরেজি ২৬ জানুয়ারি ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ, ৯১৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার পূর্ণিমা তিথি।*[১৩] প্রত্যুষকালে গদাধর ও নরহরি নবদ্বীপ থেকে এসে উপস্থিত হলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের আগে মস্তক মুণ্ডনের পালা। কিন্তু বেঁকে বসলেন

নরসুন্দর। মধু নাপিত তথা বিশ্বুদাস ঘোষণা করলেন এই যুবকের আস্কন্ধলালিত চাঁচর কেশ কিছুতেই মুণ্ডন করতে পারবেন না। বহু অনুনয়-বিনয়েও কাজ হলো না। অবশেষে আদেশের অবতারণা করলেন জগৎপতি। মধু কাঁদতে কাঁদতে গৌরাঙ্গদেবের কাছে নিবেদন করলেন, 'প্রভু তখন পারানির কড়ি নেবে না তো?' মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গৌরাঙ্গদেবের মুখমণ্ডল। যা বোঝার বুঝে গেলেন বিশ্বুদাস। কাঁদতে কাঁদতে মস্তক-মুণ্ডন করতে বসলেন মধু নাপিত। মুণ্ডিতমস্তক গৌরাঙ্গদেব ছুটলেন গঙ্গায় স্নান করতে। কেউ একজন মস্তকমুণ্ডনের জায়গায় একটা বিল্বদণ্ড পুঁতে দিল। চিহ্নিত হয়ে গেল মহা তীর্থস্থান।

গঙ্গায় স্নান করে এসে বিশ্বম্ভর কেশব ভারতীর হাত থেকে তিনখানি গেরুয়া বস্ত্র গ্রহণ করলেন। একখানি কৌপীন আর দুখানি বহির্বাস। এবার তিনি কেশব ভারতীর কানে কানে এক স্বপ্নের কথা শোনালেন। ওই স্বপ্নে কী মন্ত্র পেয়েছেন, তা শোনালেন ভাবী গুরুকে। গুরু সেই মন্ত্রেই নিমাইকে দীক্ষা দিলেন। বৈষ্ণবীয় মত অনুযায়ী এইভাবে জগদ্‌গুরু বিশ্বম্ভর কৌশলে কেশব ভারতীকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে আপন শিষ্য করে, তাঁর কাছে পুনরায় মন্ত্রদীক্ষা নিলেন। কেশব ভারতী পরিচিত হলেন জগদ্‌গুরুর গুরু হিসেবে।*[১৭]

এবার নামকরণের পালা। গুরু কেশব ভারতী তাঁকে নতুন নামে চিহ্নিত করবেন। পূর্বাশ্রমের বিশ্বম্ভর নাম তাই এখন পরিত্যাজ্য। ভারতীগোঁসাই চিন্তা করে দেখলেন এই মহাসন্ন্যাসীকে পরম্পরাগত ভারতী পদবিতে বেঁধে রাখা যাবে না। শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের গণ্ডিও এক্ষেত্রে অপাংক্তেয়। কিছুক্ষণ চিন্তা করে কেশব ভারতী বললেন, নিমাই তুমি জগৎবাসীকে শ্রীকৃষ্ণ নামে চৈতন্য করাবে, তাই এখন থেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।*[১৮]

কেশব ভারতী তাঁর (১৪৫৮–১৫১০ খ্রিঃ) বাহান্ন বছর বয়সে ২৩ বছর ১১ মাস ৬ দিন বয়সি (সন্ন্যাস ২৯ মাঘ ১৪৩১ শকাব্দ—জন্ম ২৩শে ফাল্গুন ১৪০৭ শকাব্দ) বিশ্বম্ভরকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পরই চৈতন্যদেব 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' বলে বৃন্দাবনের উদ্দেশে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগালেন। কেশব ভারতী পিছন থেকে ডেকে বললেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তোমার দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে যাও। ফিরে এসে চৈতন্যদেব গুরুর হাত থেকে দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ করলেন। গুরু তাঁকে অনুরোধ করলেন, আজকের দিনটা আমার আশ্রমে কাটিয়ে যাও। গুরুর অনুরোধে সেই দিনটা কেশব ভারতীর আশ্রমে কাটালেন শ্রীচৈতন্যদেব। সারা দিন রাত্রি সাধুসন্তদের নিয়ে চলল হরিনাম সংকীর্তন-সহ নৃত্য।*[০৯]

নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হইয়া।।
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর বিষ্ণুভক্তি বাঢ়িল তখন।।
পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি।।
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে।
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে।।
ভারতীরে কৃপা হইল প্রভুর দেখিয়া।
সর্বগণ হরি বোলে ডাকিয়া ডাকিয়া।।
সন্তোষে গুরুর সনে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য।।
চারি বেদে ধ্যানে যারে দেখিতে দুষ্কর।
তার সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসীবর।।....
.....এই মতো সর্বরাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি।।

—চৈতন্যভাগবত (৩/১/৩৭০)

উত্তর চরিত : পরদিন পয়লা ফাল্গুন রবিবার শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবেন। সারারাত নৃত্য ও সংকীর্তন এর পর প্রাতঃকৃত্য সেরে তিনি কেশব ভারতীর কাছে বিদায় নিতে গেলেন। ভাববিহ্বল ভারতী গোস্বামী বলে উঠলেন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তোমার বিরহ আমি সহ্য করতে পারবো না। আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবো।'

গুরু বোলে আমিও চলিবো তোমার সঙ্গে।
থাকিব তোমার সনে সংকীর্তন রঙ্গে।।
তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিমে মুখে করি হরিধ্বনি।।
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী।।

—শ্রীচৈতন্যভাগবত

চৈতন্যদেব তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও ভাবোন্মত্ত। পথের নিশানা তিনি পাবেন কী করে? তাই গুরু চললেন আগে আগে। তাঁর সঙ্গে চললেন নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য ও মুকুন্দ, সবার পশ্চাতে গোবিন্দ।*[১৯]

মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ অমিয়নিমাইচরিতে ভারী সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, 'কেশব ভারতী বলিতেছেন, ''শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! আমি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমি তোমার সঙ্গে যাইবো, আমাকে তুমি অনুমতি করো।'' গৌরাঙ্গ বলিলেন, ''গোঁসাই যে আজ্ঞা।'' (দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩০৮) প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যদেব তখন বাস্তব জ্ঞানশূন্য। গুরু ভারতী গোঁসাই তাঁর পথপ্রদর্শক হয়ে রাঢ়ভূমি পরিক্রমা করালেন এবং শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে হাজির হলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে।

কাটোয়ারে গৌরাঙ্গ ভারতী গৃহবাসে।
শান্তিপুরে চলিলেন অদ্বৈত সম্ভাষে।।

অনেক পারিষদ সঙ্গে গঙ্গা তীরে তীরে।
সমুদ্রগড়ি পার হৈঞা গেলা শান্তিপুরে।।
(চৈতন্যমঙ্গল/জয়ানন্দ, পৃষ্ঠা–৯৩)

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হওয়ার সুবাদে অদ্বৈত আচার্য ও কেশব ভারতী হলেন গুরুভাই। সেই সূত্রে দুজনের মধ্যে ছিল অন্তরঙ্গতা। শাস্ত্র আলোচনা করতে বা মাধুকরী করতে কেশব ভারতী প্রায়ই যাতায়াত করতেন অদ্বৈত আচার্যের গৃহে। গুরু-সহ নবীন সন্ন্যাসী এবং তাঁর সহচরদের সাদরে বরণ করে নিলেন আচার্য মহাশয়। তখন মহাপ্রভুর ভুল ভাঙলো যে তিনি বৃন্দাবন যাওয়ার পরিবর্তে শান্তিপুরে ফিরে এসেছেন। এদিকে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে কয়েকদিন ধরে চলল মহাসমারোহ, নামসংকীর্তন এবং শাস্ত্র আলোচনা। এই সময় একজন সন্ন্যাসী অদ্বৈত আচার্যের কাছে কেশব ভারতীর পরিচয় জানতে চান। কেশব ভারতীর সম্যক পরিচয় পেয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে যান। তিনি বলে উঠলেন শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিমার্গের পথিক। আর কেশব ভারতী হলেন শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত মায়াবাদী সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানমার্গের পথিক। সেক্ষেত্রে কেশব ভারতী চৈতন্যদেবের গুরুদেব হন কীভাবে?



যাহা হইতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার।
তার গুরু কেমতে বলহ আছে আর।।

অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্য এবং কেশব ভারতীকে পাশাপাশি দেখিয়ে বললেন, গুরু শিষ্যকে সাক্ষাৎ তো দেখতে পাচ্ছেন, তবে আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

এত ভাবি বলিলা অদ্বৈত মহাশয়।
কেশব ভারতী চৈতন্যের গুরু হয়।।
দেখিতেছ গুরু তান কেশব ভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসাহ আমা প্রতি।।

এর থেকেই বোঝা যায় কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে রাঢ় পরিক্রমা সেরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহ পর্যন্ত গেছিলেন। সেখান থেকে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলের উদ্দেশে যাত্রা করলে কেশব ভারতী কাটোয়ায় নিজের আশ্রমেই ফিরে আসেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে ভারতী গোঁসাই সম্ভবত কাটোয়ার আশ্রমেই ছিলেন।

পরবর্তীকালে দ্বিতীয়বার নীলাচলে যাওয়ার সময় কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী হয়েছিলেন। প্রতিবার রথযাত্রার সময় বঙ্গদেশ থেকে ভক্তের দল পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য যেতেন। বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে এইসব যাত্রীর তালিকা পাওয়া যায়। তালিকাগুলিতে কেশব ভারতীর কোনও নাম নেই। অর্থাৎ প্রতিবার রথের সময় তিনি বাঙ্গলা থেকে পুরী যেতেন না। তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গেই পুরীতে অবস্থান করতেন।*[২০]

চৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় বহু জায়গাতেই পাওয়া যায় ভারতী গোঁসাই পুরীতে তাঁর প্রধান শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাথে শাস্ত্র আলোচনায় অন্তরঙ্গ মুহূর্ত যাপন করছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থানকালে পুরী, ভারতী ইত্যাদি দশনামী সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসী আসতেন তাঁর সাথে শাস্ত্র আলোচনা করতে। এইসব তর্কবাগীশ সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে জ্ঞান বড়ো না ভক্তি বড়ো এই নিয়ে বিতর্কে প্রায়ই জড়িয়ে পড়তেন। তাঁরা চৈতন্যদেবকে আক্রমণ করতেন শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত জ্ঞানমার্গের নিয়মকানুন নিয়ে। চৈতন্যদেব এইসব নিয়মকানুনের ধার না ধরে, কেবলমাত্র নাম সংকীর্তনের মাধ্যমেই ঈশ্বর লাভের কথা প্রচার করতেন। দিব্যোন্মাদ চৈতন্যদেবকে এইসব বিতর্কে প্রধান সহায়তা করতেন তাঁর গুরুদেব কেশব ভারতী। শ্রীচৈতন্যদেবের অশান্ত বিক্ষুব্ধ মনকে তিনি নানা উপায়ে শান্ত করে তুলতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে কেশব ভারতীর প্রভাব ও ভূমিকা ছিল অসীম। গুরুকে তিনি শ্রদ্ধাও করতেন সর্বাধিক। কেশব ভারতীও পুরীতে মহাপ্রভুর অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতেন। এই ভাবেই গুরু শিষ্য জগন্নাথদেবের আশ্রয়ে মহানন্দে দিনযাপন করছিলেন।

৪৭ বছর ৪ মাস ৭ দিন বয়সে জগন্নাথদেবের মন্দিরে রহস্যময়ভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে। দিনটি ছিল ১৪৫৫ শকাব্দের ৩১ আষাঢ়, রবিবার, শুক্লা সপ্তমী তিথি। ইংরেজি ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ। গুরু কেশব ভারতীর বয়স তখন ৭৫ বছর। সেই সময় তিনি কোথায় অবস্থান করছিলেন সে সম্পর্কে তৎকালীন বৈষ্ণব গ্রন্থে কোনও তথ্য পাওয়া যাবে না। সম্ভবত তিনি পুরীতে অবস্থান করলেও অকুস্থলে ছিলেন না। সেজন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণ সম্পর্কে নানা প্রকার আলৌকিক গল্পের অবতারণা করার সুযোগ পেয়েছেন জগন্নাথদেবের পাণ্ডারা।

মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পর কেশব ভারতী কাটোয়ায় ফিরে এসেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোনও তথ্য তৎকালীন বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি মথুরা কিংবা বৃন্দাবনে চলে

যান। যার জন্য কাটোয়া-কেন্দ্রিক স্থানীয় বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতেও কেশব ভারতীর পরবর্তী জীবনী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

তবে কাটোয়ায় একটি পাথুরে প্রমাণ জাজ্বল্যমান রয়েছে। কাটোয়া গৌরাঙ্গ বাড়ির চত্বরে ঢুকে বামদিকে একটি স্বতন্ত্র সংকীর্ণ অঙ্গনে ছোট্ট একটি সমাধিমন্দিরকে কেশব ভারতীর পূর্ণ সমাধি বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু ওই সমাধিমন্দিরে কেশব ভারতীর কোনও তিরোধান দিবসের উল্লেখ নেই। মথুরা-বৃন্দাবন অথবা অন্য কোনও বৈষ্ণব ক্ষেত্রে কেশব ভারতীর সমাধি আছে কিনা তারও কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। গৌরাঙ্গ বাড়ির সেবাইতরা অবশ্য এই সমাধিটিকেই কেশব ভারতীর পূর্ণ সমাধি বলে দাবি করেন। ঠিক কত বছর বয়সে কেশব ভারতীর প্রয়াণ ঘটে সেটাও জানা যায় না। তবে এটা অনুমান করা যায় চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণের পর কেশব ভারতী অল্পদিনই জীবিত ছিলেন। হয়তো শেষ জীবনটা তিনি কাটোয়া আশ্রমেই কাটিয়েছিলেন। সেজন্যই কাটোয়াতেই তাঁর সমাধি রয়েছে। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে এরিয়াদহের গদাধর দাস এসে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানে মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন। কিন্তু তখন কেশব ভারতী প্রয়াত হয়েছেন। অনুমান করা যেতে পারে ১৫৩৪/৩৫ খ্রিস্টাব্দে ৭৬/৭৭ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটেছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য রুখতে শঙ্করাচার্য সনাতন ধর্মকে কঠোর শাস্ত্রীয় বিধানে বেঁধে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এইসব শাস্ত্রীয় বিধান ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের কুক্ষিগত হয়ে যায়। তাছাড়া তাঁর প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণও তাঁর প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদকে মেনে চলতেন। মাধবেন্দ্র পুরী প্রথম এইসব শাস্ত্রীয় বিধানকে আবেগধর্মী পথে চালিত করেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে ভক্তিবাদের আন্দোলনে গোটা দেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তার অন্যতম মূল স্তম্ভ ছিলেন কেশব ভারতী। দশনামী সম্প্রদায়ের দশটি শাখার মধ্যে ভারতী সম্প্রদায় সবচেয়ে নীচে। শ্রীচৈতন্যদেব এই নীচু ভারতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীকে গুরুপদে বরণ করে সমস্ত ভেদাভেদকে দূর করে দিলেন। এখানেই কেশব ভারতীর সার্থকতা।

তথ্য বিস্তার

***১. (ক) :** গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে আরও বলা হয়েছে মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির বংশে কেশব ভারতীর জন্ম হয়। অন্যমতে ইনি উমাপতি ধরের বংশধর। 'চুঁচুড়ার ব্রহ্মচারীগণ, নদীয়ার কলাবাড়ি, গোপালপুর ও মুর্শিদাবাদে, বাগপুরের শিমলায়ীগণ, মেদিনীপুরের ভট্টাচার্যগণ, গুপ্তিপাড়ার ভট্টাচার্যগণ, মামযোয়ানি ও কৃষ্ণনগরের সরকার গোষ্ঠীগণ নিজেদের কেশব ভারতীর বংশীয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন।' (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান : বিমানবিহারী মজুমদার, পৃষ্ঠা–৬৩৭) দেনুড়ের ব্রহ্মচারীরা নিজেদের ডিংশাই মতের সন্তান ও কেশব ভারতীর ধারা বলে দাবি করেন।

(খ) : কাটোয়া থানার আউরিয়া গ্রামে কেশব ভারতীর শ্রীপাঠ থেকে প্রকাশিত কেশব ভারতীর জন্মতিথি উদযাপন সম্পর্কিত একটি পুস্তিকায় (১৪২৪ বঙ্গাব্দ) বলা হয়েছে, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের অধঃস্তন ডিংশায় সতেরো সন্তান রায় পরমানন্দ বংশে মুকুন্দ মুরারী ভারতীর পুত্র বলভদ্র ও রামভদ্র (কেশব)। ভারতী তাঁদের বংশগত পদবি। আউরিয়া গ্রামে কেশব ভারতীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ৩০০ বছরের পুরানো একটি মেলা হয়।

***০২.** বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন কেশব ভারতী এবং চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস দুজনেই দেনুড় গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

উল্লেখ্য, নবদ্বীপ থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার পশ্চিমে কেতুগ্রাম থানায় কুলাই নামে একটি বৈষ্ণব ক্ষেত্র বা গ্রাম রয়েছে। এছাড়া দেনুড়ের পশ্চিমে কুলীন গ্রাম নামে একটি বৈষ্ণব ক্ষেত্র আছে। অনেক গ্রন্থেই দেখলাম কুলাই, কুলীন ও কুলিয়া গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, নবদ্বীপের কাছে বর্তমানে কুলিয়া নামে কোনও গ্রামের অস্তিত্ব নেই, যদিও আগে ছিল।

***০৩, নাম ও পদবি বিভ্রাট :**

ক) : ডক্টর গুরুপদ অধিকারী তাঁর 'বৈষ্ণব ও শৈবতীর্থ দেনুড়' প্রবন্ধে বলেছেন, কেশব ভারতীর আদিনাম কালীপদ মুখোপাধ্যায়, তাঁরা মুখোপাধ্যায় বংশজাত। অপরদিকে দেনুড়ের কেশব ভারতীর শ্রীপাটের সেবাইতদের মতে কেশবের দাদা বলভদ্রের বংশধরগণের পদবি হলো ব্রহ্মচারী। অর্থাৎ বলভদ্র এবং রামভদ্রের পিতা মুকুন্দ মুরারির পদবি ছিল ব্রহ্মচারী। আনন্দবাজার পত্রিকায় (০৩.০১.২০২০) প্রকাশিত গিরিধারী সরকারের লেখায় শেষোক্ত তত্ত্বের সমর্থন মেলে।

খ) : আঞ্চলিক ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক শিবশঙ্কর ঘোষ, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী ও হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে কেশব ভারতীর জন্মস্থান দেনুড় গ্রাম।

গ) : আবার 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ ও 'ভারতকোষ অভিধানে' বলা হয়েছে কেশব ভারত বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং তাঁর জন্মস্থান নবদ্বীপের কাছে কুলিয়া গ্রামে। তিনি কোনওদিনই দেনুড় গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন না। কুলিয়া গ্রাম থেকেই তিনি সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেন। পরবর্তী কোনও সময় হয়তো দেনুড় গ্রামে এসে কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন। স্থানীয় লোককথায় জানা যায় মাঠের মধ্যে কেশবগড়ের পাড়ে শান্তি কুটির নামে কেশব ভারতীর সাধন কুটির ছিল। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বর্ধমান গেজেটে' দেনুড়কে 'সিট অফ কেশন ভারতী' বলা হয়েছে।

ঘ) : শ্রী মধুসূদন তত্ত্ব বাচস্পতি তাঁর 'A Short History of Vaishnavas in Bengal' গ্রন্থে বলেছেন, 'শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গুরু শ্রীপাদ কেশব ভারতী বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে আনুমানিক

১৩৮০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে ভৈমী একাদশী তিথিতে ভরদ্বাজ গোত্রীয় শুদ্ধশোত্রীয় মুকুন্দ মুরারির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

ঙ) : ডক্টর সুশীল কুমার দে তাঁর 'Vaishnava faith and movement of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন—'He is said to have belonged to the village of Dendura in the district of Burdwan and born of Bengal Brahmin ancestry.'

চ) : লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধনির্ণয়' গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় কেশব ভারতীর পূর্বনাম রামভদ্র ভট্টাচার্য। বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থে বলেছেন, কেশব ভারতীর জন্মস্থান দেনুড়গ্রাম।

ছ) : আউরিয়া থেকে প্রচারিত একটি ছাপা প্রচারপত্রে জানা যাচ্ছে দেনুড়ের বৃন্দাবন দাসের পাটবাড়িতে রাখা অতি প্রাচীন একটি পুঁথিতে (সম্ভবত চৈতন্য ভাগবতের মূল পাণ্ডুলিপি) চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবান দাস আপন পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

এবে কহি মুঞি কিছু শুন পরিচয়।
কহিবার কথা নয় তবুও সে কহয়।।
মোদদ্রুম দ্বীপে বাসুদেব দত্তের শ্রীপাটে।
বাল্যকাল কেটেছিল জননী নিকটে।।
তারপর নিত্যানন্দ কৃপা করি মোরে।
টানিলেন নিজস্থানে বহু কৃপা করে।।
রাঢ় দেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচারিয়া।
উপনীত হইল শেষে দেন্দুড়া আসিয়া।।
কেশব ভারতী যথা করি বাল্যলীলা।
শৃঙ্গেরী মঠেতে গিয়া সন্ন্যাস লইলা।।
তার ভ্রাতুষ্পুত্র হয় গোপাল ব্রহ্মচারী।
যার পুত্র গোপীনাথ অতি সদাচারী।।
এই গ্রামে তিঁহো বাস করেন তখন।
নিত্যানন্দ সহ মোরা আইলা যখন।।
গোপীনাথ আর ভক্ত রামহরি দাস।
অনেক ভক্তের সঙ্গে আইলা প্রভু পাশ।।

প্রাচীন এই পুথির তথ্য বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। কারণ এই পুথি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে অন্য সূত্রগুলির সাথে যোগসুত্র স্থাপন করা যায়।

জ) : নদীয়ার কুলিয়া গ্রামে কেশব ভারতীর জন্ম হলে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হওয়ার সম্ভবনা বেশি। কারণ নদীয়ায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের প্রাচুর্য রয়েছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মৈত্র, সান্যাল, ভাদুড়ী, লাহিড়ী ও বাগচী এই পাঁচটি পদবি। কিন্তু কালিনাথের পদবি আচার্য। আচার্য পদবিটি শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক সময়ে রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা পাণ্ডিত্যের জন্য 'আচার্য' উপাধি বা শিরোপা পেতেন। এই উপাধি বা শিরোপা তাঁরা পদবি হিসেবেও ব্যবহার করতেন। তাছাড়া কুলিয়া থেকে দেনুড় বাসস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পদবির পরিবর্তনও তাঁরা করে থাকতে পারেন।

***০৪. :** ভোলানাথ ব্রহ্মচারীর পারিবারিক জীর্ণ পুথির অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে—

গৌড় দেশে রাঢ়ভূমে দেন্দুড়া নামেতে গ্রামে
কেশব ভারতী পরকাশ।
যিঁহ গৌরাঙ্গের কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্রদানে
জগতের পুরাইলা আশ।।
শুনিয়া তাঁহার নাম আগ্রহ হঞাছে প্রাণ
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
মনে করি প্রাণভরি সবর্দা তাঁহারে হেরি
ভালো করি নয়ন মেলিয়া।।
গৌরাঙ্গ জন্মের আগে অতিশয় অনুরাগে
শ্রীশৃঙ্গেরী মঠেতে যাইয়া।
মুড়াঞা মাথার কেশ ধরিলা সন্ন্যাস বেশ
দেশে দেশে ভ্রমেণ ঘুরিয়া।।
হেন শ্রীভারতী সঙ্গ পাইয়া প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ
ব্রজরসে মাতিয়া উল্লাস।
সদা কাঁদে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়
রসাবেশে অট্ট অট্ট হাস।।

***০৫. : ক) :** বিশিষ্ট গবেষক শিবশঙ্কর ঘোষের মতে—'বঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীই প্রথম আবেগধর্মী প্রেমভক্তি প্রচার করে ভক্তিরসের আদি সুত্রধার হিসেবে সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করায় কেবল কেশব ভারতীই নন, তখনকার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকুলের অনেকেই যেমন, শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য, কামারহাটির ঈশ্বরপুরী, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে প্রেম ও ভক্তির রসধারায় সিক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বঙ্গে অনেক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, যাঁরা শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ত্যাগ করে ভক্তিকেই মুক্তি লাভের উপায় বিবেচনা করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই কেশব ভারতীর অনুরাগী ছিলেন।'

খ) : ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তার 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থের ৭১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন মাধবেন্দ্র পুরীর আনুমানিক জীবৎকাল ১৪০০–১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ, কিন্তু অন্তর্জাল সূত্রে পাওয়া যায় ১৪২০–১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ নিমাইয়ের জন্মের (১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ) কিছু আগে-পরে তিনি দেহ রাখেন। মাধবেন্দ্র পুরী নিজে ছিলেন শ্রী লক্ষ্মীপতি পুরীজীর শিষ্য। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, কেশব ভারতী ও ঈশ্বরপুরী প্রধান। বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পাঁচশো বছরের পদাবলী গ্রন্থে বলেছেন, মাধবেন্দ্র পুরী বাঙ্গালি ছিলেন। তাঁর লেখা একটি বাংলা পদ পাওয়া যায়—'সজল ধনী চন্দ্রবদনী।' যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী তাঁর 'যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থে বলেছেন, মাধবেন্দ্র পুরী কেশব ভারতীকে 'ক্লীং

কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ' এই দশাক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

গ) : চৈতন্যচরিতামৃতে মাধবেন্দ্র পুরীর ১৩ জন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়—ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশব পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহ তীর্থ, সুধানন্দ পুরী, অদ্বৈত আচার্য, রঙ্গপুরী ও রামচন্দ্রপুরী। (বিমানবিহারী মজুমদার পৃষ্ঠা-৫৪০)

***০৬.** : এশিয়াটিক সোসাইটির কিউরেটর ডক্টর জগৎপতি সরকারের বদান্যতায় ক্রমদীপিকা গ্রন্থখানি প্রতিলিপি উদ্ধার করা হয়েছে। শেষাংশে গ্রন্থখানির সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

***০৭) :** বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থের ৬৩৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন বিভিন্ন বৈষ্ণব বন্দনার পুথিতে কেশব ভারতীর বন্দনা পাওয়া যায়।

শ্রীকেশবভারতীং বৈ সন্ন্যাসীগণপূজিতাং।
বন্দে যয়াকৃতঃ ন্যাসীন্যস্তধর্ম্মা মহাপ্রভুঃ।।
(শ্রীজীব গোস্বামী, পদ সংখ্যা ১২৩-৪)

কেশব ভারতী বন্দো সান্দীপনী মুনি।
প্রভু যারে নিজ গুরু করিলা আপনি।
(দেবকীনন্দন, পদ সংখ্যা ৪৪)

কেশব ভারতী প্রতি বন্দো নম্র হইয়া অতি
যে করিল প্রভুকে সন্ন্যাসী।
(বৃন্দাবন দাস, পদ সংখ্যা ৪২)

***০৮ :** পরবর্তীকালে সেই স্থান গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সেই স্থান সংলগ্ন আংশিক ভূমিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল কাটোয়ার গৌরাঙ্গ মন্দির ও কেশব ভারতীর সমাধি। তার পাশে গড়ে ওঠে বৈষ্ণবপাড়া। (*গ্রাম সমীক্ষার কাটোয়া অংশ দ্রষ্টব্য।)

লোকবিস্মৃত কেশব ভারতী দ্বিতীয় পর্ব

***০৯ : ক) :** দশনামী সম্প্রদায়ের ভারতী গোষ্ঠীভুক্ত নৃসিংহ ভারতী, গোবিন্দ ভারতী, গিরি গোষ্ঠীভুক্ত রামগিরি, ব্রহ্মগিরি, মহেন্দ্রগিরি, প্রদ্যুম্নগিরি, দ্বিতীয় ব্রহ্মগিরি, সত্যগিরি, পুরী গোষ্ঠীভুক্ত বিশ্বপুরী, শ্বরপুরী, রঘুনাথপুরী, রামচন্দ্রপুরী, গোপালপুরী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, পরমানন্দপুরী, অরণ্য গোষ্ঠীভুক্ত শঙ্করারণ্য, বামারণ্য, কাশিপুরারণ্য, সরস্বতী গোষ্ঠীভুক্ত শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী, ভার্গব সরস্বতী, অবধূত গোষ্ঠীভুক্ত গড়ুরাবধূত, অচ্যুতানন্দ, হরিনন্দী, সুখানন্দ প্রমুখ। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল অনুযায়ী এইসব সন্ন্যাসীরা নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় কেশব ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। (এই শঙ্করারাণ্য নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ হতে পারেন)

খ) : যেসব সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কেশব ভারতীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁদের সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা নবম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশটি শাখার তাৎকালিক প্রধান হলেন—

পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ।।
এই নব মূল বিকশিত বৃক্ষ মূলে।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে।।

অর্থাৎ কেশব ভারতী তখন ভারতীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দশটি শাখার অন্যতম একটি শাখার পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দশম শাখাটির প্রধান ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী স্বয়ং।

গ) : অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের ২০৪ ও ২০৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন, শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভারতের চার প্রান্তে চারটি প্রধান মঠ আছে। শৃঙ্গগিরি মঠে পুরী, ভারতী, সরস্বতী সম্প্রদায়, সারদা মঠে তীর্থ ও আশ্রম সম্প্রদায়, গোবর্ধন মঠে বন ও অরণ্য সম্প্রদায়, যোশীমঠে গিরি, পর্বত ও সাগর সম্প্রদায়ের প্রধান সন্ন্যাসীগণ অবস্থান করেন।

***১০. :** মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের শ্রী অমিয় নিমাই চরিতের ষষ্ঠ খণ্ড তৃতীয় অধ্যায় পৃষ্ঠা ৯৩-এ পুনরায় বিশ্বরূপের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। —'প্রভু (চৈতন্যদেব) ত্রিবাঙ্কুর ত্যাগ করিয়া ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় দেশে প্রবেশ করিলেন। ..... সেখান হইতে পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুরে গমন করিলেন। এই স্থানে তাহার অগ্রজ বিশ্বরূপ অতি আশ্চর্যরূপে নিত্যধাম চলিয়া যান। শিবানন্দ সেন তখন সেখানে ছিলেন। তিনি দেখিলেন বিশ্বরূপের আত্মা দেহ ছাড়িয়া সহস্র সূর্যের ন্যায় চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া শিবানন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (অমিয় নিমাই চরিতের লেখা থেকে চিত্রটি পরিষ্কার বোঝা যায় না)

***১১. : ক) :** তুমি প্রভু ভগবান জানিনু নিশ্চয়।
সর্বজন প্রাণ তুমি নাহিক সংশয়।।
এ বোল শুনিয়া প্রভু ব্যথিত অন্তর।
ন্যাসী নমস্কারী বলে বচন মধুর।।
তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়।
সেকারণে যেথা সেথা দেখ কৃষ্ণময়।।
বল বল ন্যাসীবর করুণা করিয়া।
কবে কৃষ্ণ অন্বেষিব সন্ন্যাসী হইয়া।।
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কবে দেশে দেশে যাব।
কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথে মুই পাব।।
চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবন দাস

খ) : প্রশংসাং স্বা শ্রুত্বা দ্বিগুণ বিকলোহসৌ পুনরপি,
প্রকামং চক্রন্দায়মপি পুনরাহাতি চকিত।
ভবান্ দেবোবিষ্ণুর্বিদিতমিমেবং খলু ময়ে
ত্যুপাকর্ণ্য শ্রীমান্নস নমিহকর্ত্তুংস চকমে।।
চৈতন্যচরিতামৃত/৫৪

গ) : আর কথোদিনে শ্রীকেশব ভারতী।
আইলা সন্ন্যাসী বর অতি শুদ্ধমতী।।

মহাতেজ ন্যাসীবর মহাভাগবত।
পূর্বার্জিত কত পুণ্যের পর্বত।।
আচম্বিতে আসিয়া দেখিল বিশ্বম্ভর।
বিশ্বম্ভরে দেখি হৃষ্ট হইলা ন্যাসীবর।।
উঠিয়া ঠাকুর করে চরণ বন্দন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রেম ঝরে দু নয়ন।।
প্রভু অঙ্গ নিরখিয়ে সেই ন্যাসীরাজ।
মহাবুদ্ধি ন্যাসীবর বুঝিলেন কাজ।।
কেশব ভারতী গোঁসাঞি কহিল বচন।
তুমি শুক প্রহ্লাদ কী হেন লয় মন।।
এবোল শুনিয়া পুণঃ প্রভু বিশ্বম্ভর।
কান্দয়ে দ্বিগুণ ঝরে নয়নের জল।।
তবে পুনঃ কহে ন্যাসি বিস্মিত হৈয়া।
অনুমান করি মনে নিশ্চয়ই করিয়া।।
তুমি প্রভু ভগবান জানিল নিশ্চয়।
সর্বলোক প্রাণ তুমি নাহিকো সংশয়।।
এবোল শুনিঞা প্রভু করয়ে রোদন।
কতদিনে পাবো আমি কৃষ্ণের চরণ।।
তোর কৃষ্ণে অনুরাগ অতি বড় হয়।
তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময়।।
কতদিনে কৃষ্ণ মুঞি দেখিবারে পাবো।
তোমার এমন বেশ কবে মোর হব।।
কৃষ্ণের উদ্দেশে মুঞি দেশে দেশে যাবো।
কোথায় গেলে প্রাণনাথ কৃষ্ণ মুঞি পাবো।।
সন্ন্যাসীর বেদ্য কথা কহি বিশ্বম্ভর।
দণ্ডবৎ হৈঞা প্রভু যান নিজ ঘর।।
শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহিলা উত্তর।
সন্ন্যাসীরে লৈঞা তুমি যাহ নিজঘর।।
প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর।
সন্ন্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর।।
ভিক্ষা করি সেদিন বঞ্চিয়া ন্যাসীবর।
যথাস্থানে প্রভাতে চলিলা যতীশ্বর।।
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস প্রভুর নিকটে।
সন্ন্যাসী বিজয়ী কথা কহে করপুটে।।
এবোল শুনিয়া প্রভু কাতর অন্তরে।
সন্ন্যাসীকে মনে করি গেলা নিজঘর।।
ঘরে গিয়া মনে মনে অনুমান করি।
দৃঢ়াইল সন্ন্যাস করিব গৌরহরি।।
ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিলো মুকুন্দ।
প্রভু রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ।।
আইলেন যথা আছে সব ভক্তগণ।
কান্দিয়া কহিবো সব ভক্তের চরণ।।
শুন শুন সর্বজন আমার উত্তর।
সন্ন্যাস করিব এই প্রভু বিশ্বম্ভর।।
যাবৎ থাকে দেখ নয়ন ভরিয়া।
শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পুরিয়া।
(চৈতন্যমঙ্গল/লোচন দাস/মধ্যখণ্ড/পৃষ্ঠা-১২৩)

***১২. :** যেদিন চলিলা প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে।।
শুন শুন নিত্যানন্দ স্বরুপ গোসাঞি।
একথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চজন ঠাঁঞি।।
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয়ই চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।।
ইন্দ্রাণী নামেতে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম।।
তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এ পঞ্চ জনারে কথা কহিবা বিদিত।।
—(চৈতন্যভাগবত/পৃষ্ঠা–২৪০)

***১৩, :** স্বামী কানু পিল্লাইয়ের ইন্ডিয়ান এফিমেরিস ব্যবহার করে সুখময় মুখোপাধ্যায় শকাব্দ ও খ্রিস্টাব্দের সমন্বয় সাধন করেছেন।

***১৪. : ক) :** গৌর গৌর বাড়ি গৌরপাড়া : ডক্টর কালীচরণ দাস প্রমুখ।

খ) : বৈষ্ণবক্ষেত্র দেনুড় : সম্পাদনা : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ) : শ্রীপাট দেনুড় : সম্পাদনা গিরিধারী সরকার এবং নরহরি মোহান্ত।

ঘ) : কাটোয়া দর্শন : ডক্টর কালী চরণ দাস।

***১৫. :** এত অনুমানি সন্ন্যাসী করিলা উত্তর।
সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ ঘর।।
সাক্ষাতে জননী ঠাঁঞি লইবে বিদায়।
তোর পত্নী সুচরিতা যাবে তাঁর ঠাঁঞি।।
সাক্ষাতের সবার ঠাঁঞি বিদায় হইয়া।
আইসহ মোর ঠাঁঞি সবা বুঝাইয়া।।
মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায়।
আসন ছাড়িয়া মুঞি যাবো অন্য ঠাঁঞি।।
(চৈতন্যমঙ্গল/লোচন দাস)

***১৬. :** শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত : মহাত্মা শিশির কুমার কুমার ঘোষ।

***১৭. সন্ন্যাস গ্রহণ :**

ক) : গঙ্গার হইয়া পার গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কন্টকনগর।।
যারে যারে আজ্ঞা প্রভু করিয়াছিল।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা।।
অবধূত চন্দ্র গদাধর শ্রীমুকুন্দ।

With Best Compliments from -

Kaka Ram Babu Ram Aggarwal

Office : B-XXIII / 2891, Link Road, Near Samrala Chowk, Ludhiana

Ph. : 2604287, 5031390

Fax : 0161-5021390, Mob. : 98158-44800

E-mail : dhruv@krbr.in

With Best Compliments from -

NITIN ENTERPRISES

Engineers & Die Castings

HAND TOOLS

D-138A, Phase-V, Focal Point, Ludhiana

M: 9814025239, 9814126239

(O) 0161-2676985

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য আর ব্রহ্মানন্দ।।.....
.....আইলেন প্রভু যথা কেশবভারতী।
মত্ত সিংহ প্রিয়বর্গের সংহতি।।
অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাঁহার।
উঠিলেন কেশব ভারতী পুণ্যবান।।
দণ্ডবৎ প্রণাম প্রভু করিয়া তানে।
করযোড় করি স্তুতি করেন আপনে।।
অনুগ্রহ তুমি মোরে করো মহাশয়।
পতিত পাবন তুমি মহা কৃপাময়।।....
....ক্ষণেক সম্বরি নৃত্য বৈসে বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দিগে সর্ব অনুচর।।
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব ভারতী।
আনন্দ সাগরে পূর্ণ হই করে স্তুতি।।
যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে।।
তুমি যে জগত গুরু জানিল নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয়।।
তবু তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত কারণে।
করিবা আমারে গুরু হেন লয় মনে।।....
....সর্বশিক্ষা গুরু গৌরচন্দ্র বেদে বোলে।
কেশব ভারতী স্থানে তাহা কহে ছলে।।
প্রভু বোলে স্বপ্নে মোর কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কখন।।
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে।
এত বলি প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে।।
ছলে প্রভু কৃপা করি তারে শিষ্য কৈল।
ভারতীর মনে মহাবিস্ময় জন্মিল।।
ভারতী বলেন এই মহামন্ত্র বর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর।।
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি।।

খ) : প্রাতঃকালে উঠি প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি।
সন্ন্যাস করিব দৃঢ়াইল গৌর হরি।।
কাঞ্চননগরে আছে ভারতী গোসাঞি।
সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই।।
চলিলা তো মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে।
গঙ্গা সন্তরণে যান ছাড়ি নবদ্বীপে।।
গঙ্গা নমস্কারি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়ে।
বজর পড়িল যেন সভার মাঝারে।।....
..... কাঞ্চননগরে আইলো প্রভু বিশ্বম্ভর।
যথা আছে কেশব ভারতী ন্যাসীবর।।
পরম ভকতি করি পরনাম করে।
উঠিয়া সম্ভ্রমে ন্যাসি নারায়ণ স্মরে।।
বড় ভাগ্য মানি দোঁহে সরস সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভর বলে মোরে করহ সন্ন্যাস।।
এই মনে দুইজনে আছে এক কালে।
আইলা নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আদি মেলে।।
সন্ন্যাসীরে নমস্কারি প্রভু নমস্কারে।
হাসিয়া কহে প্রভু ভাল হইল আইলে।।
তোমার গমনে মোর সকল মঙ্গল।
সন্ন্যাস হইবে মোর জনম সফল।।
এবোল বলিয়া পুন ভারতী সম্ভাষে।
প্রণতি মিনতি করে সন্ন্যাসের আশে।।
ভারতী কহয়ে শুন বিশ্বম্ভর।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে কান্দয়ে অন্তর।।...
....একদিন রাত্রি শেষে দেখিলু স্বপন।
সন্ন্যাসের মন্ত্র মোরে কহিল ব্রাহ্মণ।।
.....দেখ দেখি এই বটে হয় কিবা নহে
ইহা বলি ভারতীর কর্ণে কহে মন্ত্র।
প্রকারে হইলা গুরু আপুনি স্বতন্ত্র।।
বুঝিলো সকল কাজ ভারতী গোসাঞি।
সন্ন্যাস করাবো তোরে শুনহ নিমাঞি।।
এ বোল শুনিঞা প্রভু নাচে আনন্দে।
হরি হরি বোলয়ে গভীর মেঘনাদে।।

—(চৈতন্যমঙ্গল/লোচনদাস/পৃষ্ঠা–১৪০)

গ) : নবদ্বীপচন্দ্র গৌর গুণের সাগর।
গণসহ নদীয়া বিহরে নিরন্তর।।২৩
প্রকারে সকলে জানাইলা মনকথা।।
কন্টক নগরে আইলা শ্রীভারতী যথা।।২৪
সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন গৌর রায়।
হইল সর্বত্র ধ্বনি শুনি লোকে ধায়।।২৫
কী বালক যুবক-বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ গণ।
হইল মোহিত করি গৌরাঙ্গ দর্শন।।২৬
শ্রীচারু চাঁচর কেশ পানে সবে চাঞা।
চিত্রের পুত্তলি প্রায়ই রহে দাণ্ডাইয়া।।২৭
স্ত্রী-পুরুষগণের মনেতে হয় ভিত।
তাহা একমুখে কহিবে কেবা কত।।২৮
অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র কহে সবা প্রতি।
আশীর্বাদ কর কৃষ্ণে হউক ভক্তি।।২৯
ঐছে কহি রহে প্রভু ভারতীর ঠাঁই।
ভারতীরে কহেন বিলম্বের কার্য নাই।।৩০
ভারতী ব্যাকুল কিছু না পারে কহিতে।
নাপিত আইল তথা প্রভুর আজ্ঞাতে।।৩১
আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়া প্রণমিয়া পদতলে।

শ্রীমস্তকে হস্ত দিয়া ভাসে নেত্র জলে।।৩২
শ্রীশিখা মুণ্ডন করি প্রভুর ইচ্ছায়।
কী কৈনু কী কৈনু বলি ভূমিতে লুটায়।।৩৩
শ্রীমস্তকে দেখি শ্রীশিখার অদর্শন।
চতুর্দিকে লোক সব করয়ে ক্রন্দন।।৩৪
ক্ষিতি সিক্ত অসংখ্য লোকের নেত্র জলে।
কেহ কিছু না শুনে ক্রন্দন কোলাহলে।।৩৫
যুবা স্ত্রী-পুরুষ ধৈর্য ধরিতে না পারে।
শিরে করাঘাত করি নিন্দে বিধাতারে।।৩৬...
.....শ্রী কেশব ভারতী সন্ন্যাস করাইলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম পণ্ডিতের থুইলা।।৫১
.....ভক্তিরত্নাকর দ্বিতীয় তরঙ্গ

ঘ) : শ্রীচৈতন্য পার্ষদ কুলাই গ্রামের বাসুদেব ঘোষের ১২৬ সংখ্যক পদ—

গৌরাঙ্গে সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কান্দিলা।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম নিমাইয়ের দিলা।।
প্রভু কহে গুরু মোর পুরাহ মনসাধ।
কৃষ্ণে মতি হউক এই দেও আশীর্বাদ।।
ভারতী কান্দিয়া বলে মোর গুরু তুমি।
আশীর্বাদ কী করিব কৃষ্ণ দেখি আমি।।

ঙ) : অদ্বৈত আচার্য শাখা ভুক্ত সমসাময়িক নবদ্বীপবাসী অনন্ত আচার্য-এর একটি পদে—

অখিলের গুরু হরি ভারতীরে গুরু করি
মন্ত্র দিয়া করিলা গ্রহণ।।

চ) : দশাক্ষরী গোপাল মন্ত্র : 'ওঁ ভগবতে বাসুদেবায়' (এই মন্ত্রটি নারদ ধ্রুবকে দিয়েছিলেন)

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর মতে মন্ত্রটি হল 'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম।'

***১৮ : নামকরণ :**

ক) : .....তবে নাম থুইবার কেশব ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিল মহামতি।।
চতুর্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব।।
এ থেকে কোথাও যে না থাকে হেন নাম।
থুইলে যে ইহার আমার পূর্ণকাম।।
মূলে ভারতীর শিষ্য ভারতী যে হয়ে।
ইহানে তো তাহা থুইবার যোগ্য নহে।।
ভাগ্যবান ন্যাসীবর এতেক চিন্তিতে।
শুদ্ধ সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে।।
পাইয়া উচিত নাম কেশব ভারতী।
প্রভু বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধ মতি।।
যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য কীর্তন প্রকাশিয়া।।
এতেক তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সর্বলোক তোমা হৈতে যাতে হইল ধন্য।।
এই যদি ন্যাসিবর বলিলা বচন।
জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হৈল তখন।।
চতুর্দিকে মহা হরিধ্বনি কোলাহল।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব সকল।।
ভারতীরে সর্ব ভক্ত করিল প্রণাম।
প্রভুও হইল তুষ্ট লভিয়া স্বনাম।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম হইল প্রকাশ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সর্বদাস।।
হেনমতে সন্যাস করিয়া প্রভু ধন্য।
প্রকাশিলা আত্মনাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।।
(চৈতন্যভাগবত/বৃন্দাবন দাস, পৃষ্ঠা–২৪৪)

খ) ঃ ....বুদ্ধি অনুসারে কহে যার যেই মানে।
হেন কালে শুভ বাণী উঠিল গগনে।।
ধ্বনি শুনি সর্বলোক হইল চমৎকার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম করহ ইহার।।
নিদ্রারূপা মহামায়া দেবী ভগবতী।
আচ্ছাদিল সর্বজন ছন্ন হইল মতি।।
যতেক করযে সব নিদের স্বপনে।
আপনি ঠাকুর সভার করায় চেতনে।।
আপনেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুঝায়ে সভারে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তেঁই বলিহ ইহারে।।
এতেক বচন যবে দৈব মুখে শুনি।
আনন্দিত সর্বলোক করে হরিধ্বনি।।
আনন্দ হৃদয় প্রভু বলে হরিবোল।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম আজি হইতে মোর।।
গুরুর চরণে করি প্রণতি বিস্তর।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল বিশ্বম্ভর।।
গমন উদ্যোগ দেখি সেই ন্যাসিরাজ।
ডাকে হের দণ্ড ধর না করহ ব্যাজ।।
গুরুর বচন শুনি লেউটিয়া আসি।
সবসন দণ্ড পাইয়া লহুলহু হাসি।।
গ্রহণ করিল গুরুর সবসন দণ্ড।
প্রণতি করয়ে বহু ভকতি প্রচণ্ড।।
গুরুর আজ্ঞায় প্রভু সেদিন তথায়।
গুরুভক্তি করি সুখে বঞ্চিলা গোসাঞি।।
রজনী বৈষ্ণব মেলে করে সংকীর্তন।
গুরুর সংহতি নৃত্য করয়ে মোহন।।
কেশব ভারতী নাচে প্রেমানন্দ সুখে।
ঠাকুর নাচয়ে হরিবোলে সর্বলোকে।।

প্রেমানন্দে পূর্ণ দোঁহে পাশরে আপনা।
ব্রহ্মসুখ আল্প করি মানরে দুজনা।।
এই মনে কতক্ষণে নৃত্য অবসানে।
বসিয়া কহয়ে ন্যাসী বিশ্বম্ভর শুনে।।
মোর হাথ হইতে দণ্ড কে নিলে আমার।
দণ্ডাগ্র পঁরশি পুন বোলে নাচবার।।
ইহা বিহ্বল হইয়া নাচে পুন।
ঠাকুর নাচয়ে আর অপরূপ শুন।।

(চৈতন্যমঙ্গল/লোচনদাস/পৃষ্ঠা–১৪৩)

***১৯. ক) :** গুরু বলে আমিহ যাইবো তোমার সঙ্গে।
থাকিব তোমার সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে।।

খ) : অথ গুরো পাদং তমোনুজ্ঞাপ্য মাধবঃ।
তদাজ্ঞায়া ব্রজদ্দেশং রাঢ় গুঢ়ো মহাভূজ।।

মুরারি গুপ্তের কড়চা (৩/৩/১)

(অর্থাৎ অতঃপর গুরুর চরণ বন্দনা পূর্বক ও তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে মহাবাহু শ্রীহরি গূঢ়ভাবে রাঢ়ভূমির পথে ব্রজভূমির উদ্দেশে যাত্রা করেন।)

***২০. :** রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা (কাটোয়া মহকুমা) : বঙ্কিম ঘোষ।

***২১. : ক্রমদীপিকা :** বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ করা হচ্ছে 'ক্রমদীপিকা' গ্রন্থখানি কেশব ভারতী রচিত এবং সেটি এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এশিয়াটিক সোসাইটির কিউরেটর ডক্টর জগৎপতি সরকারের বদান্যতায় ক্রমদীপিকা গ্রন্থখানির প্রতিলিপি উদ্ধার করা হয়েছে। পুথিটির উপরে রাবার স্ট্যাম্পের ছাপে লেখা রয়েছে, 'presented by K T Pandurang'। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণ আচারিয়া তামান আচারিয়া পাণ্ডুরং (০১.০২.১৯১৮ — ২২.০৪.২০১৭) সাহেব পুথিটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে জমা দিয়েছিলেন। পাণ্ডুরং সাহেব ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত এবং ব্যাঙ্গালোর ও কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

এশিয়াটিক সোসাইটির ক্যাটলগে বইটি সম্পর্কে লেখা হয়েছে— Krama Dipika by Kashmiraka Keshava Bhatta with the commentry vivarani by Govinda Bhattacharya and Laghu satavarsa stotram by Sri Nivas Acharya with commentary Gurubhaktiman dakini by Purusottam Prasad : ed. with Hindi translation by Sudhakar Malaviya, Varani, 1989.

মূল পুথিটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত ভাষা না জানায় আমাকে পাঠোদ্ধারে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক ডক্টর বীরেন হালদার ও লিপি চৌধুরী। তবে গ্রন্থখানি আগাগোড়া অনুবাদ করে দিয়েছেন নানুর চণ্ডীদাস স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবীণ সংস্কৃত শিক্ষক বিশ্বনাথ মুখার্জি। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ক্রমদীপিকা' নামকরণের 'ক্রম' শব্দটি সংস্কৃত ও ল্যাটিন ভাষায় একই অর্থ বহন করে। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান অনুযায়ী এর অর্থ পরম্পরা, নিয়ম, অনুসরণ, পদ্ধতি, প্রণালী। সে দিক থেকে বৃহত্তর অর্থে ক্রম বলতে ব্যাকরণকেও বোঝায়। সেজন্যই উপক্রমণিকা মানে ব্যাকরণ।

কার্যক্ষেত্রে গ্রন্থখানি খুব উচ্চ মানের সংস্কৃত ব্যাকরণ। এতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের নিয়ম কানুন বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা লিখতে যেমন খুব সুসংহত পরিচ্ছন্ন বাক্য ব্যবহার করা হয় ঠিক সেরকম সুসংহত বাক্যে গ্রন্থখানি লিখিত। গ্রন্থখানি পাঁচটি পটল অর্থাৎ ভাগে বিভক্ত। প্রথম পটলের প্রথম ভাগে উচ্চারণ অনুসারে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ভাগগুলি লিপিবদ্ধ। পরের অংশে ণত্ব বিধান এবং ষত্ব বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের শুরুতে দেব-দেবীর বন্দনা পূর্বক লেখক নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন তিনি স্কন্দবারি নিবাসী নরহরি, নিজের পিতা ও মাতার নৃসিংহ ও লক্ষী। আবার প্রথম পটলের শেষে বলা হচ্ছে গ্রন্থখানি নৃসিংহ বিরচিত। পঞ্চম পটলের শেষে গ্রন্থের রচনাকাল বলা হয়েছে ১৭৫৩ শকাব্দের পৌষ মাস। গ্রন্থকারের নাম হিসাবে বলা হয়েছে পুস্তকটি উদ্দাট্টীবাল ভট্টের পুত্র রামের দ্বারা লিখিত, উপনাম হতোলবার।

এহেন গ্রন্থ কীভাবে কেশব ভারতীর নামে প্রক্ষিপ্ত হলো বোঝা খুবই দুষ্কর। বিশেষত পাণ্ডুরং সাহেবের মতো প্রখ্যাত অধ্যাপক যখন এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। হয়তো কেশব ভারতী বিরচিত অন্য কোনও ক্রমদীপিকা গ্রন্থ থাকতে পারে।

কেশব ভারতীর বংশ লতিকা

(হরিদাস মোহন্ত বিরচিত ও প্রকাশিত 'বেদব্যাসই বৃন্দাবন' প্রাচীন গ্রন্থ থেকে) : মুকুন্দ মুরারীর দুই পুত্র, বলভদ্র ও রামভদ্র। রামভদ্র কেশব ভারতী নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বলভদ্রের দুই পুত্র, আউরিয়াবাসী মদন ভারতী ও দেনুড়বাসী গোপাল ব্রহ্মচারী। মদন ভারতীর সাত পুত্র—রামদেব, দুর্গাদাস প্রমুখ।

অপরদিকে গোপাল ব্রহ্মচারীর পুত্র গোপীনাথ, তস্য পুত্র চণ্ডীচরণ তস্য পুত্র গোবিন্দরাম। গোবিন্দরামের দুই পুত্র, মাতুলালয় সরডাঙ্গাবাসী কালাচাঁদ ও দেনুড়বাসী নারায়ণ। কালাচাঁদের দুই পুত্র, সহস্ররাম ও কৃষ্ণচন্দ্র। সহস্ররামের দুই পুত্র রামজয় (অপুত্রক) ও রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র সৃষ্টিধর। অপরদিকে দেনুড়বাসী নারায়ণের পুত্র কমলাকান্ত তস্য পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর। কৃষ্ণকিঙ্করের তিন পুত্র সদাশিব, কৃষ্ণদেব ও প্রাণকৃষ্ণ। সদাশিব ও কৃষ্ণদেবের বংশধর নেই। প্রাণকৃষ্ণের* বংশলতিকা ছকে দেওয়া হচ্ছে। (মুকুন্দ মুরারীর ষোলোতম উত্তরপুরুষ তথা সনৎ কুমারের পুত্র উজ্জ্বল ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।)

গ্রাম সমীক্ষা ঃ

১. দেনুড় গ্রাম : দেনুড় বা দেন্দুড়া গ্রামটি কালনা মহকুমার

অন্তর্গত মন্তেশ্বর থানায় খড়ি নদীর তীরে। গ্রামের মধ্যে একটি সংকীর্ণ গলির ভিতরে রয়েছে কেশব ভারতীর পাটবাড়ি। প্রশস্ত নাটমন্দিরের সামনে দালানরীতির মন্দিরে রয়েছে কেশব ভারতীর প্রস্তরময় মূর্তি, শ্রী জগন্নাথ, রাধাগোবিন্দ ও বালগোপাল মূর্তি এবং বেশ কিছু শালগ্রাম শিলা। নাটমন্দিরে রয়েছে হাতে আঁকা কেশব ভারতীর প্রতিকৃতি। নিত্য সেবা ছাড়াও মাঘী শুক্লা একাদশীতে কেশব ভারতীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এখানে বাৎসরিক উৎসব হয়। কেশব ভারতীর ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ব্রহ্মচারীর বংশধররা এখানে সেবাইত। মন্দিরের চারপাশে তাঁদের বসতবাটি। এই ব্রহ্মচারী বংশের শাখা পার্শ্ববর্তী পুটশুড়ী ও শরডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা।

কালাজ্বরের ঔষধ ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কারক শরডাঙ্গা নিবাসী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (০৬.০৭.১৮৭৫ — ০৬.০২.১৯৪৬) এই বংশের সন্তান। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি শরীর তত্ত্বে পি এইচ ডি (১৯০৪) ডিগ্রি ছাড়াও বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল, কলিকাতা ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল ও কারমাইকেল কলেজে শিক্ষকতা করতেন।

অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতের একজন সুখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিক। ১৯১৪–১৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান মহারাজাদের আনুকূল্যে যে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার স্মরণিকায় অম্বিকাচরণ রচিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবেদান্তও এই বংশের একজন সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে গৃহস্থ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'গোপাল দাস বাবাজী ও দধিয়া বৈরাগ্যতলা' প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাস স্ট্যান্ড থেকে ২০০ মিটার পূর্বে মাঠের মাঝখানে রয়েছে হরিতকী তলায় ছোট্ট একটি নিত্যানন্দ স্মৃতিমন্দির, আমবাগান এবং ধরা পুকুর। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে রথযাত্রায় পুরী যাওয়ার পথে এখানেই নিত্যানন্দ বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাসকে রেখে গিয়েছিলেন। রামহরি সরকার নামে এক কায়স্থ গৃহস্থ বৃন্দাবন দাসকে দেনুড়ে প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামে ঢুকে প্রথমেই পড়ে বৃন্দাবন দাসের পাটবাড়ি।

বৃন্দবান দাস (১৫০৭–১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দ) এই দেনুড় গ্রামেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী গ্রন্থ চৈতন্যভাগবত রচনা করেন। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের দুই বছর পর ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে গ্রন্থটি রচনা করেন। পরবর্তীকালে লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হয়। তখন মা নারায়ণী দেবীর নির্দেশে তিনি তাঁর গ্রন্থের নাম পালটে 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন। বৃন্দাবন দাসের এই পাটবাড়িতেই কাচের বাক্সে চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের মূল পুথিটি সংরক্ষিত আছে। সেবাইতরা পুথিটি দেখাতে বা ছবি তুলতে দিতে অপরাগ। তাছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতের দশম খণ্ডের একটি পাণ্ডুলিপি নিত্যানন্দ বৃন্দাবন দাসকে দিয়েছিলেন। সেটিও এর সাথে রাখা আছে। এই পুথিটি নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবকে পাঠ করে শোনাতেন গদাধর পণ্ডিত। এতে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব নিজের হস্তাক্ষরে টীকা লিখে রেখেছেন। পাটবাড়িতে বড়ো নাটমন্দিরের সামনে দুটি ঘর বিশিষ্ট দালান মন্দির। সেখানে বৃন্দাবন দাসের মর্মরমূর্তি পূজিত হয়। দারু নির্মিত গৌর-নিতাইয়ের নৃত্যরত মূর্তি অন্য কক্ষে পূজিত হয়। তার ডান দিকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ। অষ্টধাতু নির্মিত রাধিকা এবং প্রস্তরময় শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিও রয়েছে, রয়েছে প্রস্তর নির্মিত চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী ছোট্ট দুর্গা মূর্তি। তাছাড়া চৈতন্য অনুগামী দ্বাদশ গোপালের বিগ্রহও রয়েছে। বিগ্রহগুলির নিত্য সেবা হয়।

গ্রামের প্রান্তে রয়েছে অতি প্রাচীন দেন্দুড়েশ্বর বা দিনেশ্বর শিব মন্দির। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আটচালা শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গের পাশেই রয়েছে বিক্রমচণ্ডীর দুই ফুট প্রায় প্রস্তরময় প্রাচীন বিগ্রহ। কঙ্কালসার বিক্রমচণ্ডীর অষ্টভুজ মূর্তিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের মাঝে একটি অতি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় পঞ্চরত্ন টেরাকোটা মন্দির রয়েছে। সমুদ্রগড়ের জমিদারের দেওয়ান দেনুড়বাসী পরীক্ষিত চক্রবর্তী এই দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরটি পরিত্যক্ত হওয়ায় এখানকার বিগ্রহ শ্রীরাধা, গোপাল ও দুটি শিবলিঙ্গ বাড়ি বাড়ি পালাক্রমে পূজিত হয়। পূর্বে দেনুড় থেকে মধুমঙ্গল নামে একটি উচ্চমানের পত্রিকা প্রকাশিত হত।

২. আউরিয়া গ্রাম : কাটোয়া মহকুমার দাঁইহাট ব্লকের অন্তর্গত আউরিয়া গ্রামের পূর্বনাম ছিল চন্দ্রহাটি। তার নিদর্শন স্বরূপ গ্রামে এখনও চন্দ্রহাটি পাড়া আছে। গ্রামের মাঝে ভারতী পাড়ায় তিনটি জীর্ণ পরিতক্ত টেরাকোটা মন্দির আছে, প্রথম মন্দিরটিতে টেরাকোটা লিপিও আছে। মাঝের মন্দিরে একটি শ্বেতপাথরের জীর্ণ ফলকে লেখা আছে 'কেশব ভারতী প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির'। এই ফলকটি দেখে সকলের মতো আমিও প্রথমে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল মন্দির তিনটি ৫০০ বছরের পুরনো। সেই জন্য প্রথম মন্দিরের টেরাকোটা লিপির পাঠ দেওয়া হলো। কাছাকাছি দালানভাঙ্গা নামে একটি জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসাবশেষকে স্থানীয় মানুষ কেশব ভারতীর পিতা মুকুন্দমুরারির আদিবাড়ি বলে উল্লেখ করে থাকেন। দালানভাঙার পাশে ডোবার পাড়ে আর একটি জীর্ণ টেরাকোটা মন্দির রয়েছে। ভারতী বংশীয়দের দাবি কেশব ভারতীর মামার বাড়ি দেনুড়, সেই কারণে তাঁর জন্মস্থান দেনুড় বলা হয়। কিন্তু তাঁর পিতৃভূমি আউরিয়া গ্রাম।

গ্রামে ঢুকতেই ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত চারুচন্দ্র দত্ত বিদ্যানিকেতন। এই বিদ্যালয়ের পাশেই কুড়ি বছর আগে নির্মিত কেশব ভারতীর মন্দির রয়েছে। মন্দিরে কেশব ভারতী ও চৈতন্যদেবের মৃন্ময় মূর্তি পূজিত হয়। শতবর্ষ পূর্বে ১৩২২ বঙ্গাব্দে আউরিয়া গ্রামের সন্তান শিবপদ চক্রবর্তী (১৩০১—১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)

কেশব ভারতীর নামে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে সেই স্কুল অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান স্কুলের মাঠে কেশব ভারতীর জন্মদিন উপলক্ষে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ভৈমী একাদশীতে তিনশো বছরের পুরনো মেলা হয়। পরদিন দ্বাদশী তিথিতে হয় অন্নমহোৎসব। ত্রয়োদশীতে কেশব ভারতীর তৈলচিত্র নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন সহকারে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। আগে হাতে আঁকা ছবি ছিল। তৈলচিত্রটি পূজিত হয় স্কুল পার্শ্ববর্তী মন্দিরে। ১৩২২ বঙ্গাব্দের পর প্রভাস ভারতী ও শিবপদ চক্রবর্তীর উদ্যোগে মেলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ভারতী বংশীয়রা দাবি করেন তাঁদের কাছে কেশব ভারতীর হাতে লেখা তালপাতার পুথি ছিল। প্রায় দেড়শো বছর আগে এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক সেই পুথি কলকাতায় নিয়ে যান ছাপানোর জন্য। কিন্তু তিনি আর ফেরতও দেননি, ছাপানওনি।

ভারতী পাড়ায় যে তিনটি জীর্ণ টেরাকোটা মন্দির আছে তার প্রথমটির লিপির পাঠোদ্ধার করে দিয়েছেন বোলপুর নিকটস্থ মুলুক গ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয় সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতে টেরাকোটা লিপির হরফ বাংলা প্রাকৃত, কিন্তু ভাষাটা সংস্কৃত।

প্রথম বাক্য—সপ্তেন্দু সপ্তেন্দু গণে যসাকেঃ
দ্বিতীয় বাক্য—বংশের কোষান্তর মন্দিরঞ্চঃ
তৃতীয় বাক্য—শ্রী রায় * স্ত্রী জয়যুক্ত বিপ্রঃ
চতুর্থ বাক্য—তা * * কে পাস বসায় কিং
পঞ্চম বাক্য—শকাব্দ। ১৭১৭ সন ১২০২ সাল।

প্রথম বাক্যে—সপ্তেন্দু = সাত ইন্দু। ইন্দু = চাঁদ = এক। অর্থাৎ সপ্তেন্দু সপ্তেন্দু = ৭১৭১, অঙ্কস্য বামা গতি নিয়মে ১৭১৭ শকাব্দ। লিপির পাঠ্য অংশের মূল বক্তব্য হল—১৭১৭ শকাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বিপ্র সস্ত্রীক শ্রী রায় জয়যুক্ত হন।

রায় পদবির আগের নামের অংশটি ভেঙে গেছে। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৭১৭ শকাব্দ বা ১২০২ বঙ্গাব্দে। তিনটি মন্দিরই পরিত্যক্ত শিব মন্দির, ভাঙামন্দির থেকে শিবলিঙ্গগুলিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কেশব ভারতীর ভাইপো মদন ভারতীর কোনও বংশধর এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন ২২৬ (১৩২৮ — ১২০২ = ২২৬) বছর আগে। কেশব ভারতী শৈব ছিলেন সেজন্যই হয়তো তাঁরা শিব মন্দির স্থাপন করেছিলেন।

৩. খাটুন্দি গ্রাম : গ্রামটি কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম ব্লকের অন্তর্গত। এই গ্রামের ভট্টাচার্য বংশীয়রা নিজেদের কেশব ভারতীর বংশধর বলে দাবি করেন। তাঁদের আরও দাবি কেশব ভারতী খাটুন্দি গ্রামের সন্তান। কেশব ভারতী প্রায় পাঁচশো বছর আগে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ বৃন্দাবন থেকে এনে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মঠও স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের আরও দাবি কেশব ভারতী খাটুন্দি গ্রামে টোল চালাতেন। গ্রামের মাঝে কৃষ্ণরায় মন্দির রয়েছে। কৃষ্ণ রায়ের পাশে রাধাবিগ্রহের পূজা লক্ষীর ধ্যানে হয়। কৃষ্ণরায় মন্দিরের চারিদিকে সাতটি দুর্গা মন্দির রয়েছে একই চত্বরে। ঠাকরুন পুকুরপাড়ে বহু পুরনো ভাঙা ইটের একটি ধ্বংসাবশেষকে কেশব ভারতীর আদি ভিটে বলে তাঁরা দাবি করেন। গ্রামে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির নাম খাটুন্দি উচ্চ মাধ্যমিক হাইস্কুল। ২০২০ সালে ছাত্রসংখ্যা ৬৮৭ জন এবং শিক্ষক ২৪ জন। এই গ্রামের ভট্টাচার্য বংশীয়রা যথেষ্ট শিক্ষা অনুরাগী। তাঁরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত গ্রামে টোল চালাতেন। কেশব ভারতীর শিক্ষাব্যবস্থার ধারা বজায় রাখতে প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে খাটুন্দি গ্রামের খ্যাতি আছে। ওই গ্রামের সৃষ্টিধর স্মৃতিতীর্থ (ভট্টাচার্য), চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য কাটোয়া চাউলপট্টিতে কালী চতুষ্পাঠী নামে টোল চালাতেন।

০৪. কাটোয়া জনপদ : মেগাস্থিনিসের (৩০২—২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে কাটোয়ার উল্লেখ আছে 'কাটদ্বীপ' ও 'কাটাদুপা' নামে। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন এবং সপ্তম শতাব্দীতে হিউ এন সাং-এর বর্ণনাতেও কাটোয়ার নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে কাটোয়া ইন্দ্রাণী পরগনার অন্তর্ভুক্ত হয়। নবদ্বীপের বিশ্বরূপ এবং বিশ্বম্ভর দুজনেই কাটোয়াতে সন্ন্যাস গ্রহণ করায় মাতা শচীদেবী কাটোয়াকে কণ্টকনগর আখ্যা দিয়েছিলেন। বর্তমানে কাটোয়া পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা শহর। **(১৪ ঘ)**

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেব যখন অপ্রকট হন তখন কেশব ভারতীর বয়স ৭৫ বছর। সম্ভবত তিনি মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরে কাটোয়ার আশ্রমে ফিরে আসেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই দেহ রাখেন। এরিয়াদহের গদাধর দাস নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভু অপ্রকট হওয়ার পর তিনি নবদ্বীপে শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁরাও গত হলে ১৫৩৫ সাল নাগাদ গদাধর দাস কাটোয়ায় ফিরে এলেন। তখন কেশব ভারতীর আশ্রম পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ। জায়গাটা পরিষ্কার করে তিনি ভজন কুটির নির্মাণ করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর এবং অজয় নদের তীরবর্তী কুলায় গ্রামের বাসুদেব ঘোষের সহযোগিতায় তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহ স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাসুদেব ঘোষের (মতান্তরে কংসারি ও দৈতারি ঘোষ) বাড়ির নিমগাছ থেকে তিনটি চৈতন্যদেবের বিগ্রহ তৈরি করা হলো। বড়ো বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করা হলো চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানটিতে, একটি চালাঘর তুলে। মধ্যম বিগ্রহটি পাঠানো হলো পূর্ববঙ্গের ভাগ্যকুল বা গঙ্গানগর গ্রামে। এবং ছোট বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করা হলো শ্রীখণ্ড গ্রামে। বিদ্যানন্দ ঠাকুর ও যদুনন্দন চক্রবর্তী নামে দু'জন যুবক ভক্ত গদাধরের সহযোগী হলেন। দীনহীন ভাবে নিত্য সেবা চলতে থাকলো।

১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গদাধর দাস দেহ রাখলেন। যদুনন্দন ও বিদ্যান্দকে সাহায্য করতে এবং মহাপ্রভু বিগ্রহের নিত্যসেবা টিকিয়ে রাখতে এগিয়ে এলেন শ্রীনিবাস আচার্য, নরহরি সরকার

ঠাকুর এবং খেতুরির নরোত্তম দাস ঠাকুর। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র কোনও এক সময় কাটোয়ায় এসেছিলেন। সম্ভবত তাঁর উদ্যোগে এবং ভক্তবৃন্দের প্রচেষ্টায় মহাপ্রভুর ছোট খাটো একটি মন্দির, নাটমন্দির এবং তুলসীমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে খেতুরীর মহোৎসবে যোগদান করার পথে জাহ্নবা দেবীর নেতৃত্বে বিরাট এক বৈষ্ণব দল কাটোয়ায় এসে হাজির হয়। মহাপ্রভুর দক্ষিণের খোলবাদক কালাকৃষ্ণ দাস কাটোয়া সংলগ্ন আকাইহাটে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানেই তারা রাত্রিযাপন করেন। আকাইহাট আশ্রমে জাহ্নবী দেবী একটি মাধবীলতা ওই সময়ে রোপণ করেন। সেই মাধবীলতাটি এখনও পর্যন্ত আশ্রমে বর্তমান। জায়গাটির বর্তমান নাম মাধবীকুঞ্জ।

জাহ্নবীদেবী-সহ বৈষ্ণব দল কালাকৃষ্ণ দাসকে নিয়ে মহাপ্রভুর মন্দির তথা কেশব ভারতীর সমাধি পরিদর্শন করেন। তাঁরা দীনহীন মন্দিরের উন্নয়নের ব্যবস্থাও করেন।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত কাটোয়ার গৌরাঙ্গ বিগ্রহ বা মন্দির সম্পর্কে বিশেষ কিছু আর জানা যায় না। সম্ভবত গঙ্গার ভাঙনে মন্দির এবং তৎসংলগ্ন বেশ কিছু জায়গা গঙ্গাগর্ভে চলে যায়। তবে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা রেভারেন্ড লঙের এক বিবৃতিতে জানা যায় কাটোয়ায় গৌরাঙ্গপ্রভুর এক মন্দির রয়েছে। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই পূর্বতন মন্দিরের জায়গার অংশবিশেষে নতুন করে মন্দির স্থাপন করা হয়। ১৯৮০ সালের মন্দির সংস্কারের সময় একটি প্রাচীন ফলক পাওয়া যায় যাতে খোদিত ছিল ১২৫৯ বঙ্গাব্দ (১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ)। ওই সময় মহাপ্রভুর পাকা মন্দির, মন্দির নাট, দ্বিতল দোলমঞ্চ ও তুলসীমঞ্চ ছিল। তার পাশে গড়ে ওঠে বৈষ্ণবপাড়া। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের বন্যায় সেই শ্রীপাটও আংশিক গঙ্গাগর্ভে চলে যায়। বর্তমান মন্দির তারপর সংস্কার করে স্থাপিত হয়। কাটোয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি অনুযায়ী তাঁর শৈশবে অর্থাৎ প্রায় শতবর্ষ আগে কালীবাড়ি ঘাটের কাছে আদি গঙ্গাঘাটের ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত। তৎকালে এই ঘাট 'কেশব ভারতী গোঁসাই ঘাট' নামে পরিচিত ছিল। এখানেই সেই বিখ্যাত বটগাছের নীচে ছিল কেশব ভারতীর আশ্রম, বর্তমানে তা গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত।

বর্তমানে কাটোয়া মৌজার (জে এল নাম্বার ২১) ১২৮৭ সংখ্যক দাগে মহাপ্রভুর মন্দির অবস্থিত। সেখানে তোরণ পার হয়ে বামদিকে অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে কেশব ভারতী ও মন্দির প্রতিষ্ঠাতা গদাধর দাসের পূর্ণ সমাধি রয়েছে। মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডনের কেশ ছোট্ট একটি ধাতব কলসীতে রাখা থাকতো। সেই কেশগুচ্ছ-সহ কলসীটি গদাধর দাসের সমাধির সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের স্মৃতিবিজড়িত গৌরাঙ্গ মন্দির কাটোয়ার একটি দর্শনীয় স্থান। **(১৪ক)**

কাটোয়া সংলগ্ন ঘোষহাট মৌজায় (জে এল নাম্বার ২২) ৬৭৪ নম্বর দাগে মাধাইতলা আশ্রম অপর একটি বৈষ্ণবক্ষেত্র। জনশ্রুতি নবদ্বীপ থেকে কাটোয়া আসার পথে গৌরাঙ্গদেব এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। অন্য আরেকটি প্রবাদে বলা হয় চৈতন্যদেব বৃন্দাবন এবং পুরী চলে গেলে জগাই মাধাই দুই ভাই এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সাধন-ভজনে মন দেন। তাঁদের অবর্তমানে আশ্রমের বিশাল এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে যায়। ১০৩৭ বঙ্গাব্দে বৃন্দাবনবাসী সিদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রী গুরুচরণ দাস বাবাজী মাধাইতলা এসে এই তীর্থ উদ্ধার করেন এবং মাধাইয়ের সমাধি চিহ্নিত করেন ও গৌরনিতাই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ নাগাদ নিতাইরমণ দাস বাবাজী এই আশ্রমের হাল ধরেন এবং উন্নয়নের কাজকর্ম করেন। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে এই আশ্রমে সহস্র বর্ষব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। আশ্রমের উন্নয়ন-সহ সেই নাম যজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে।

কাটোয়া শহরের দুই কিলোমিটার দক্ষিণে আকাইহাট মৌজায় কালাকৃষ্ণ দাসের শ্রীপাটবাড়ি অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণবক্ষেত্র। কালাকৃষ্ণ দাসের জন্ম ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর ডানদিকের খোলবাদক এবং তার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সহচর। পরবর্তীকালে তিনি নিজের জন্মভূমিতে ফিরে এসে শ্রীপাট স্থাপন করে সাধন-ভজনে মন দেন। তাঁর অবর্তমানে এই শ্রীপাট জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে যায়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাধাইতলার মোহান্ত নিতাই রমণ দাস বাবাজী এখানে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করে নিত্যসেবার ব্যবস্থা করেন। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে কাটোয়ার এস ডি এল অ্যান্ড এল আর ও সাহেব শ্রী বীরেন্দ্র দাস মহাশয় এই আশ্রমের প্রভূত উন্নয়ন করেন। প্রায় কুড়ি বিঘা জায়গার উপর অবস্থিত এই আশ্রম বর্তমানে কাটোয়ার অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

কাটোয়া সংলগ্ন যাজিগ্রাম মৌজায় অবস্থিত শ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীপাট একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণবক্ষেত্র। শ্রীনিবাস আচার্যকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর বলা হয়। বাঁকুড়ার মল্লরাজা বীর হাম্বীর ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। তাঁরই উদ্যোগে যাজিগ্রাম শ্রীপাট স্থাপিত হয়। অনেক ভূসম্পত্তি তিনি এই আশ্রমকে দান করেছিলেন। শহর কাটোয়া থেকে এক কিলোমিটার পশ্চিমে এবং বর্ধমান কাটোয়া রেল পথের ধারে অবস্থিত এই আশ্রমটির বর্তমানে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এই বৈষ্ণবক্ষেত্রটিও কাটোয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান।

কাটোয়া কাশীগঞ্জ পাড়ায় সখির আখড়া অপর একটি বৈষ্ণব ক্ষেত্র। প্রায় দুই বিঘা জায়গা জুড়ে আশ্রমটি অবস্থিত। পূর্বে এটি বৈষ্ণবীদের আশ্রম ছিল। এখানে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ পূজিত হয়। ভূমি স্পর্শ মুদ্রায় একটি ছোট বুদ্ধমূর্তিও রাখা আছে। তাতে বিম্বুদাস নামটি খোদিত আছে। যার জন্য লোকের বিশ্বাস এটি মহাপ্রভুর ক্ষৌরকার বিম্বুদাস অর্থাৎ মধু নাপিতের আশ্রম। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে আশ্রমটিতে নিত্যসেবা নিত্যপাঠ ইত্যাদি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। □

ভোটরঙ্গ ও কয়েকজন কুশীলব

শেখর সেনগুপ্ত



শীতের সকালেও এভাবে যে মেঘেরা জাঁকিয়ে যুথবদ্ধ হতে পারে, ভাবনার বাইরে। প্রথমে ছিল আবছা-আবছা। পরে তারা ঘনত্ব পায়। তারপর মিনিট বিশেক ধরে বৃষ্টি। হু হু কম্পন। বাতের ব্যথা চাগিয়ে উঠে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ প্রায়। চিকিৎসা তো সেই হোমিওপ্যাথ। পরিস্থিতি যা, ডাক্তারের বদনাম মুখ ফস্কে বেরিয়ে আসতেই পারে। তবে অবাক কাণ্ড, বৃষ্টি থামতেই ব্যথা অর্ধেক। বুঝি দৈববলে বলীয়ান নরেশ গুহ অকপটে অর্ধাঙ্গিনী বীণাকে তাঁর প্রস্তাব দিতেই সাড়া মিলল ইতিবাচক। দু'জনই বেরিয়ে পড়লেন প্রাতর্ভ্রমণে। নরেশবাবুর পড়তি বয়সের হাড়-প্রধান দেহকাণ্ডে পাটভাঙ্গা পাজামা-পাঞ্জাবি। মধ্যবয়স্কা বীণার সৌখিনতা মালুম হয় ঝকমকে

NAVYUG®
COGGED, VEE & POLY BELTS

Environmental Friendly
ISO 14001 : 2015 Certify Unit

NAVYUG

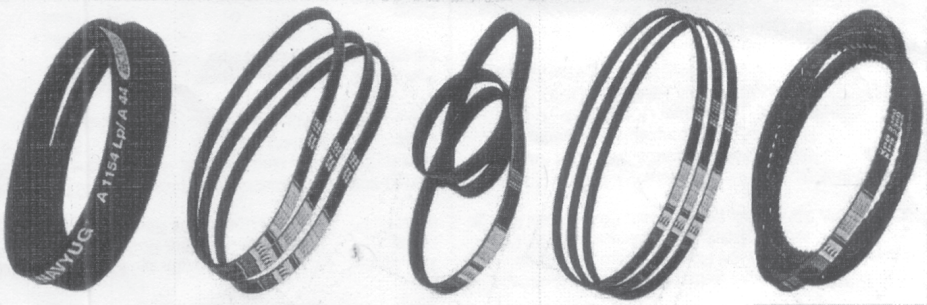

ACCREDITED
Management System
Certification
MSCB-119

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

IS : 2494
ISI
CM/L NO. 9065679

BSCIC Certifications BSCIC Private Limited.
ISO 9001:2008

RECOGNISED STAR EXPORT HOUSE BY GOVT. OF INDIA

Manufacturers & Exporters of : Vee, Cogged & Poly Belts
For Industrial & Automotive Application

Winners of Export Excellence Awards from AIRIA & CAPEXIL

Supplies to OEMs, Railways, STUs, ASRTU, BHEL etc.

NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009 (PB.)
Phones : 0181-4299900/ 01/ 02/ 2420551
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com



কমবয়সিনীদের পক্ষে মানানসই রঙিন সিল্কের শাড়িটার দিকে নজর পড়লে। দুর্মুখের দল কে কী বলছে না বলছে, থোড়াই কেয়ার। মর্নিংওয়াক সহজসাধ্য নয়। পুরসভার বদান্যতায় পথের অবস্থা অকহতব্য। ছোটো-বড়ো কত কিসিমের ফাটল ও গর্ত এড়াতে শরীরটাকে অনেকবার দোল খাওয়াতে হয়। কোথায় যেন লারেলাপ্পা ছন্দের গানে মাইক জাগাতে চাইছে সবাইকে। তারই সঙ্গে একাধিক মসজিদের আল্লা-আল্লা রব তৈরি করছে বেসুরো শব্দের ঠোকাঠুকি। কোথাও আবদ্ধ থকথকে কালো জলে উড়ন্ত পোকা-মাছির উল্লাস, কোথাও আবার 'দিদি'র ছবির তলায় সাত সকালেই দাপুটেদের তাল ঠোকা, —পুরনির্বাচন যে আগতপ্রায়। আয়রে আয়, না এলে করবি পরে হায় হায়।

মেহগনি রং শাড়ি সামলে বীণাও এই সব অতিক্রম করতে শিখেছেন। আর নরেশবাবু তো পারিপার্শ্বিকতা বিচারে বেশ ঝানু। তিরিশ বছর ধরে এই এলাকায় সাঁতার কেটে চলেছেন। সবুজের পর লাল পতাকা, আর এখন তো জোড়া ফুলের দিদি-দিদি-দিদি। চূর্ণ পথ, আবদ্ধ নালা, বর্ডার পেরিয়ে আসা লোকদের নিয়েই যেন মুখ্যত ভিড়ে-ভিড়াক্কার। গুহ পরিবার ভেসে তো রয়েছে, ব্যাস, এভাবেই জীবনের.....। নরেশবাবু চাকরি করতেন সেটেলমেন্ট অফিসে। বাল্যকাল থেকেই টুকটাক লেখালেখি। ইতিউতি ছাপাছাপি। দু-দশ টাকা সম্মানমূল্যও আসত। এতদিনে এই শেষ পর্বে তাঁর একটি গল্প সংকলনও ছাপা হয়েছে। প্রকাশকের বুকের পাটা আছে বটে। তবে তিনি ক্রমশই তিক্ততায় আবৃত। বইটির বিক্রির বহর দুমদাম তো নয়ই, বরং নিতান্ত ঘুমন্ত। অথচ আবার ওরই মধ্যে একটি বাজারচালু সাহিত্যপত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে গল্পগুলির— বঞ্চিত অপরিজ্ঞাতপ্রায় লেখককে পুরস্কৃত করবার প্রচ্ছন্ন দাবি! ভাবা যায়! নরেশ গুহ অবশ্য নির্বিকার। আকাশের দিকে চেয়ে শ্বাস ছাড়েন, 'আমি ওদের চিনি।'

কয়েক চক্কর ঘোরাঘুরির পর বাড়ি ফিরতেই পুত্রবধূ নবীনা গুহবাবুর হাতে ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'বাবা, আপনার তো ভুলো মন! খেয়াল আছে তো, আজ দিদিরা আসছেন কানপুর থেকে। সঙ্গে আপনার নাতিও। দুপুরে নাতিকে অন্য ধরনের গল্প শোনাতে হবে। আপনার ওই জটিল গল্প নয়।'

গুহবাবু মাথা নাড়েন—মনে আছে, নিশ্চয় মনে আছে। নাতিকে গল্প শোনাতে হবে, এটাও ঠিক। কিন্তু ঠিক কী ধরনের গল্প... ভাবতে হবে। ভাবনা এক অভিমুখ ছেড়ে অন্য অভিমুখ খোঁজে। মেয়ে-জামাই আসবে! সে যে মহাপর্ব। কন্যার বিয়ে হয়েছিল কানপুরে। জামাতা বাঙালি নয়। স্টিল ফ্যাক্টরির মধ্যপ্রদেশীয় ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ের আগে ছিল কলকাতায়। সদ্য খড়্গপুর আইআইটি থেকে তকমা লাভ করেছে। বাংলা বলে চমৎকার। মজবুত স্বাস্থ্য। মজবুত প্রেমও। কলেজে পাঠরতা কন্যার বিয়েতে হাজার কয়েক টাকাও ব্যয় করতে হয়নি নরেশ গুহকে। নাতির বয়স সাত পেরিয়েছে। সব সময় কেমন একটা মরিয়া ভাব। বাহ্, বাহ্। শুভদিন, আনন্দের দিন। পুত্রবধূ নবীনা যখন 'বাবা' বলে ডাক দেয়, বেশ ভালো লাগে। শুকনো কণ্ঠনালি দিয়ে যেন জলপ্রবাহ নামে। পিওর ওয়াটার। স্বাদও মনোরম।

ওই দেখুন, হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে বাজারের দিকে চলেছেন নরেশ বাবু। মুখে মাস্ক পরে নিতে ভুল হয়নি। দিদির ক্লাবের সদস্যদের অনেকেই মাস্ক-বিরোধী। কিছু

যে বলবো ওদের, সাহসে কুলায় না। দুটো উপেক্ষাসূচক কথা বলে বসলে গুহবাবুও পালটা কিছু বলে উঠতে পারেন। তাতে যদি 'কেলো' হয়...। না, থাক। ওদের যত এড়ান যায়, ততই ভালো। কানে আসছে জেনারেটারের শব্দ। অর্থাৎ কখন যেন কারেন্ট গেছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এলেই স্বস্তি। নবীনা আবার সময় সময় পায়ে নূপুর পরে। কেন পরে, কে জানে? হয়তো মনোরঞ্জনের বাসনা, নবীনার চলাফেরা একটু নায়িকাসুলভই হোক না কেন। পরপর অত কথা বলতে পারে যখন, নূপুরের ধ্বনিও একটু শোনায় কালেভদ্রে। এই সব আকাশকুসুম ভাবনাও আসে নরেশবাবুর সাদা-কালো চুলে ঢাকা মাথায়! গল্প লেখেন যে। প্রকাশক বা সম্পাদক চাইলে এক নাগাড়ে লিখে দু'মাসে একখানা দশফর্মার উপন্যাসও নামিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তেমন অফার কোথায়? অন্যদের অগ্রাহ্য করে দিদি বন্দনায় কলম ধরো। প্রকাশক, সম্পাদক দূরত্ব কমিয়ে আনবেন নিশ্চিত। এ সত্যটা মনোরঞ্জন যতটা বোঝে, তিনি তা বোঝেন না বা বুঝতে চান না। চশমাটা খুলে রুমালে খোলা চোখ মুছলেন নরেশবাবু। হুঁ,মনোরঞ্জন তাঁর ছেলে। একমাত্র ছেলে। নরেশবাবু ও বীণাদেবী তাঁদের ওই ছেলেকে মনপসন্দ করে গড়ে তুলতে পারেননি। বাপের মেধা ও মায়ের নম্রতা দুটোরই টানাটানি অবস্থা ওর। কোনও রকমে এইচ. এস. টপকাবার পর বইপত্তরকে তাঁর একরকম টা-টা....। যেহেতু ধুরন্ধর, আবেগপ্রবণতা নেই বললেই চলে। স্বার্থের খাতিরে গতর খাটায়, হাতের কাজে যে নিপুণতা তা উড়িয়ে দেবার নয়। কোনও কিছুকে একবার টার্গেট করলে, তাকে মুঠোর মধ্যে নেওয়া চাই; অন্যথায় হিতাহিত জ্ঞান হারালেও হারাতে পারে। অর্থাৎ স্বভাবে সে ঠিক তার লেখক বাপের মতো নয়, আবার মায়ের মতোও বলা যাবে না। একটা বিষয়ে হুঁশ ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা—পুরুষ হয়ে যখন জন্মেছি, তখন মাল কামাতেই হবে। যেন-তেন-প্রকারেণ। যে ছোকরার পকেটে মালকড়ি নেই, তার তো অদৃশ্য রক্তক্ষরণ অনিবার্য। অতএব টাকার খোঁজে মনোরঞ্জন গুহ বেপরোয়া। তখন তার বিরক্তমুখে এমন খিস্তির পর খিস্তি যে তা কানে গেলে নরেশ গুহর যেন মাথায় বাজ পড়ে একটার পর একটা। তা যাই হোক, ওই পয়সার টানেই ছেলেটা তাঁর পরিশ্রমীও তো খুব। আগে এখানে-ওখানে কাজে-অকাজে গতর খাটাত। কিছুদিন একটা রিপেয়ারিং কোম্পানির হয়ে অ্যাকোয়াগার্ড সারিয়ে বেড়াচ্ছে। মেশিনটার চরিত্র ও কর্মক্ষমতা তার যেন হাতের তালুতে লেখা। কোথাও দশ মিনিটেই রিপেয়ারিং কমপ্লিট; কোথাও সূর্য পাটে বসেছে, ঘনিয়েছে অন্ধকার, মনোরঞ্জন গুহর মেকানিজম তখনও সুরাহা করে উঠতে পারেনি। কত জায়গায় যে ছুটতে হতো তাকে। ডুব দেবার উপায় নেই। কোম্পানির মালিক ভীষণ কড়া। এমনিতে সাড়াশব্দ বিশেষ না থাকলেও ওই সময় উঠতে-বসতে খিস্তি-খেউড়। প্রচুর ফালতু অভিযোগ ঝুলি থেকে বের হতেই থাকে। পালটা চেঁচামেচি বিলকুল নাস্তি। কারণ তিনি আবার দিদির দলের এক উঠতি নায়ক। তবে চেঁচামেচি সহ্য করতে হলেও মনোরঞ্জনের মাসিক বেতন মন্দের ভালো। বিগ বাজারে ঢুকে পছন্দের শার্ট কিনতে প্রথমে তিতিবিরক্ত হলেও পরে একখানা কিনেছে বটে— যে জামায় সাদা বক উড়ছে পকেট থেকে ঘাড় অবধি, পিছনে আবার একখানা দোপাটি ফুটেছে যেন। প্যান্ট অবশ্য একরঙা—একটি কালো, অন্যটি ধূসর। মাথার চুল বক্সার ক্লেসিয়াস ক্লেকে মনে করায়। এখানেই শেষ নয়, নায়ক-নায়ক মনোরঞ্জনকে ইদানীং আপনারা নিশ্চয় দেখে থাকবেন, একখানা গর্জনমুখর দু'চাকায় চেপে ঝড় তুলে যাতায়াত করছে—পুরসভার পথে যতই খাদ ও গর্ত থাক, ওই দ্বিচক্রের গতি ও গর্জন থামবার নয়। মনোরঞ্জন গুহ কীভাবে অমন একখানা বস্তুর মালিকানা পেল, আপনাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাকে আবার আঙুল তুলতে হচ্ছে সেই নড়বড়ে বয়স্ক লোক নরেশ গুহর দিকেই। চাকরি থেকে অবসর নেবার সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যত মুদ্রা পেয়েছেন, সবটাই স্থায়ী আমানতের রূপ নিয়েছে স্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে। তার ওপর ব্রাঞ্চের যিনি সার্ভিস ম্যানেজার, সেই নিত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় আবার সাহিত্য পাঠক। নরেশবাবু তাঁর সবেধন নীলমণি গল্পসংকলনের একটি কপি উপহার দিয়েছিলেন ব্যাঙ্ক আমলা মিঃ চ্যাটার্জিকে। সুতরাং মিস্টার গুহর ছেলে বাইক কিনতে ব্যাঙ্ক লোন তো পেতেই পারেন। তবে হ্যাঁ, ফর্মালেটিস অনেক। মনোরঞ্জনের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন শাখা প্রবন্ধক মিঃ শিব কিশোর পোড়েল এবং লোনের গ্যারান্টার হতে হয়েছে বাবু নরেশ চন্দ্র গুহকে। ছেলে যেদিন নতুন গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি ফিরল, মা তথা তৎকালীন সংসারের অধিকর্ত্রী এমনভাবে ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বিড়বিড়িয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন যেন তিনি একজন উচ্চস্তরীয়া সাধিকা।

তারপর সেই দুই চাকার কী গর্জন, কী ঝড়! মনোরঞ্জনকে ঘিরেই এর তার মাথায় প্রশ্নের ঝাঁপি। এরকম একটা শক্তপোক্ত ডাকাবুকো ছোকরাকে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। রুলিং পার্টির ছেলেরা কথা কইতে শুরু করেছে, আবার হাত ও লালঝান্ডার গলাতেও আন্তরিকতা। মনোরঞ্জন নিজেই এরপর একটা রিপেয়ারিং সেন্টার খুলে বসেছে। আয় বাড়ছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে। ব্যাঙ্কের লোনও আধাআধি শোধ হয়ে এল। চিন্তা বা অসন্তোষের হেতু নেই। এই যখন পরিস্থিতি, তখনই এমন এক বাড়ির অ্যাকোয়াগার্ড সারাতে ঢুকল মনোরঞ্জন, যে বাড়ির কর্তা আবার শাসক দলের স্থানীয় হোমড়াচোমড়াদেরই একজন। একটি কালো শেড মুদি দোকানের মালিক হতে পারেন, কিন্তু কটমটিয়ে যদি কোনও লোকের দিকে তাকান, সেই লোকের মুখাবয়বে ভীতির রেখা ফুটে উঠতে বাধ্য। তাঁর বউও নারীমঙ্গল সমিতির মূর্তিময়ী প্রাণ। এই কোনও অনুষ্ঠানে আহ্লাদে আত্মহারা তো পরমুহূর্তে অপছন্দের মহিলা

বা পুরুষের বাপান্ত শুরু করে দিলেন। এদেরই প্রথমা কন্যা নবীনা, নরেশ গুহর পুত্রবধূ।

নবীনার সঙ্গে মনোরঞ্জনের বন্ধনকে আপনারা-আমরা অর্থাৎ যাঁরা প্রথাবাহী, তারা সাধারণ বলি না। ওই যে এইমাত্র যাঁর কথা বললাম, তিনিই হলেন এলাকার সুপরিচিত গৌরাঙ্গ পোদ্দার এবং তারই স্ত্রী প্রকারান্তরে মহিলা নেত্রী অর্পিতা পোদ্দার। পোদ্দার স্বামী-স্ত্রীর তিনটি কন্যা। প্রথমটি নবীনা, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়া, তৃতীয়টির নাম তৃতীয়া। নামে বৈচিত্র্য আছে, কী বলেন?

ওই পোদ্দার বাড়িরই অ্যাকোয়াগার্ড সারাতে পা রেখেছিল মনোরঞ্জন। মোবাইল কল করেছিল নবীনাই। কলিংবেল বেজে উঠতেই ফ্ল্যাট বাড়ির কপাট খুলেছিল আর কেউ নয়, সেই নবীনা। মুহূর্ত কয়েক দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চিত্রার্পিত। নবীনা দেখছে, সত্যিকারের এক বলিষ্ঠ তরুণকে, যাকে সে বেশ কয়েকবার বাইকে উড়ন্ত অবস্থায় দেখলেও ঠিক মাপ নিতে পারেনি, আপ্যায়ন দূরের কথা। মনোরঞ্জনেরও মুগ্ধতা কানায়-কানায়। মাথা থেকে পা অবধি যৌবনের প্রবাহ প্রথম দর্শনে অনভিজ্ঞ পুরুষকে বিস্মিত, মুগ্ধ, বিমূঢ় করবেই। অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে নিজেকে সংশোধন করতে পারবে আর ক'জন।

অতঃপর নবীনা-মনোরঞ্জন জুটিকে কিছু লোক দেখতে পেল পুরসভার ঝোপঝাড়, ভাঙা চেয়ার, গোরু-মোষ কবলিত ভাঙা প্রাচীরে ঘেরা পার্কে, তিলি পাড়ার পুকুরের ধারে, কালীমন্দিরের পিছনে, বর্ডার টপকে চলে আসা মুসলমানদের বড়ো আশ্রয় জোড় মসজিদের অদূরে। দু'জনেরই প্রেমঝটকা ক্রমেই কামনির্ভর। কেলেঙ্কারি একেবারে থেঁতলে দেবার আগেই নবীনার বাবা, মুদিদোকানদার, পাড়ার জবরদস্ত রাজনৈতিক নেতা গৌরাঙ্গ পোদ্দারকে দেখা গেল, সাত তাড়াতাড়ি দোকানের ঝাঁপ টেনে দিয়ে গুটি গুটি পায়ে চলেছেন নরেশ গুহর নিবাসের দিকে। শ্মশ্রু ও গুম্ফ বিমণ্ডিত চোয়াল একটু যেন শিথিল, অনিশ্চয়তার ছোপ লেগে আছে দুই চোখে।

ডোরবেলের আওয়াজ পেয়ে কপাট যে খুলল, সে আবার খোদ মনোরঞ্জনই। আদুল গা, স্ফীত পেশী, পরনে খাকিরং হাফপ্যান্ট।

'মেসোমশাই।'

'বাবা বাড়ি আছেন?'

'আছেন। আপনি ভেতরে আসুন।'

চা এল, ডিমের ওমলেট এল।

দুই পড়ন্ত বয়স্কের মানুষ মুখোমুখি। তবে পোদ্দারের সেই পরিচিত বাজখাই গলার বিলকুল রূপান্তর। কোথায় সেই সব অশ্রাব্য কথার ছড়াছড়ি? তিনি যে এখন এক মিনমিনে আবেদক, যাঁর ক্ষোভ নেই, দাপট নেই, বিনয়ের কুলতিলক—নরেশ গুহর প্রতিভার বন্দনায় গদগদ, যদিও



পোদ্দার আজ অবধি সাহিত্যের 'স' মাড়াতে যাননি। কথা হয়ে গেল, এই মাঘের ষোলো তারিখেই সানাই বাজবে। গর্ভবতী নবীনা মনোরঞ্জনের গলায় মালা ঝোলাবে।

শহরের উপান্তে সেই উৎসবে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের অনেকের বাড়িতেই দিদির ফোটো ঝোলে অথবা জোড়াফুলের পতাকা ওড়ে।

গুহ পরিবারের পুত্রবধূ হয়ে এল বটে নবীনা, অনেক আনন্দ, বিনয় বিতরণ করল, কিন্তু মা হতে পারল না। মৃত সন্তান প্রসব। পেটে বাচ্চা এসেছে টের পেতেই কোনো এক হাতুড়ের কাছ থেকে মাঝে মাঝেই বড়ি এনে দিত মনোরঞ্জন। তাতেই সর্বনাশ অন্তিম হয়েছে। রাখঢাক না করেই আপনাদের জানাচ্ছি, নবীনা আর কোনও দিনই মা হতে পারবে না।

দুই

বাজারে যাবার পথ দুটো—একটা আঁকাবাঁকা গলিপথ, অন্যটা সদর। দুটোরই কানেকশন মার্কেট ঢোকার মুখে। নরেশ গুহ মুখ্যত গলিপথের বশীভূত—উচ্চগ্রামে শব্দের আদান-প্রদান, পথ ভাঙ্গাচোরা তো নয়ই, গলিবাসীদের নিজস্ব যত্নে ও চেষ্টায় কোথাও কোথাও যেন গালিচা পাতা। আজ কিন্তু আনমনা লেখক সদর ধরেই বাজারমুখি। লোকের রকমারি গাড়ির জট ঠেকিয়ে চলার স্ফূর্তি, এখানে জটলা, ওখানে নেতিয়ে থাকা রাজনৈতিক পতাকা, ছোটো ছোটো শিব মন্দিরে, কালী মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, মাঝে মাঝে অহংকারজ্ঞাপক স্লোগান—ইচ্ছে হয় জোড়হস্তে প্রার্থনা করতে,—বাবারে, এবার একটু থাম, একটু সহবতে অভ্যস্ত হ', যাঁর সমর্থনের জোরে তোদের হুংকার গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তনের বাজনা, তোরাই এবার তাঁর পতন ঘটাতে চলেছিস রে। বাঁক নিতেই মণিখোলা। পথের ওধারে স্থানীয় হাইস্কুল; আর সেই স্কুলের গেট জুড়েই একটি প্রকাণ্ড কাগুজে মূর্তি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। না, দিদির ছবি নয়। পরিবর্তে যার ছবি, সে গুহবাবুর বিলক্ষণ পরিচিতা। স্থানীয় নামি মুসলিম পরিবারের যুবতী রাবেয়া ফতেমা বিবি। স্বামী পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক। দিদি ক্ষমতায় আসবার পর দু'দফায় বড়োসড়ো পদোন্নতির পর এখন 'নবান্ন'-এ তাঁর প্রখর কর্তৃত্ব। ঠিক আছে। কিন্তু তাঁর বিবি পুরনির্বাচনে প্রার্থী! কেমন যেন একটু হৃৎকম্প অনুভব করেন গুহ। খানিক দাঁড়িয়ে ফতেমা বিবির ছবির লেখা অক্ষর ও চিহ্নকে চেনার চেষ্টা করতেই পিছনে যেন মুখঝামটা—কী অমন করে দেখছেন কাকু? ভোটটা দেবেন। আর তো মাত্র দু'সপ্তাহ! গুহবাবুর সৌভাগ্য কী দুর্ভাগ্য, ভাববার অবকাশ নেই। মানিব্যাগ উজাড় করে বাজার করলেন—চিকেন আর ভেটকি দুটোই ঢুকল তাঁর ব্যাগে। ফেরার সময় গুনে দেখলেন, কিয়ৎক্ষণ ধরে—মণিখোলা থেকে বাজারমোড়, এইটুকু পথেই তিন-তিনটে প্রকাণ্ড চিত্ররূপ ফতেমা বিবির। এখন অবধি প্রার্থী একবারের জন্যও তাঁর শরণাপন্ন হননি, যদিও গুহবাবুর পরিচিতি ও মান্যতা এলাকায় অবহেলা করবার মতো নয়। তাছাড়া ফতেমাও তাঁকে খুব ভালোকরেই চেনে। একাধিক সংস্কৃতিক, আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানে নিজে তাঁর ডেরায় এসে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে ক'বার। আলোচনায় টানা সওয়ালে হরেক প্রসঙ্গ উঠলেও দিদির প্রসঙ্গ তো কখনও ওঠেনি। আর এখন? ওই জোড়হস্তের চিত্রময়ী আবেদন! সময়টা কি কৌশিকী অমাবস্যার?

তিন

কন্যা এসেছে, জামাতা এসেছে, নাতি এসেছে, কত আলোচনা, হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে গ্রহণ। বকবকানি সত্ত্বেও বাকবিতণ্ডার ব্যাপারই নেই। মুঠে মুঠো আনন্দ। একটাই দৃষ্টিকটু ব্যাপার। হঠাৎ মনোরঞ্জন ও নবীনাকে কারা যেন ডেকে নিয়ে গেল। ওরা দু'জন বেরিয়ে যাচ্ছে যখন, তখন মেয়ে, জামাই ও নাতিকে খুশি করতে অনেকদিন বাদে বৃদ্ধ লেখক, গৃহস্বামী নরেশ গুহ শুরু করে দিয়েছেন গান গাইতে,—যে গান একদা নৌকায় ভ্রমণকালে তরুণ সুভাষ চন্দ্র বসু গেয়ে শুনিয়েছিলেন নৌকার মাঝিকেই ঃ

কবে আবার নাচবি শ্যামা
মুণ্ডমালা দুলিয়ে গলে,
ওই কালো মেঘের অন্ধকারে
তোর হাতের খড়্গ উঠুক জ্বলে।
মা তোর ত্রিনয়নের বহ্নিশিখায়
ছাই করে দে মনের কালি
আমি ভয়ঙ্করে করবো না ভয়,
তুই অভয়মন্ত্র দে মা কালী।
ওমা, বারে বারে ডাকবো তোমায়
মা হয়ে পালাবি কোথায়,
এবার রাঙা জবার অর্ঘ্যমালা
দিব মা তোর চরণ তলে।'

গান শেষ হবার মিনিট চল্লিশের মধ্যে যেন সদর্পে ফিরে এল মনোরঞ্জন ও নবীনা। মনোরঞ্জন বুঝি ঘোষণা করে, 'আর তেরো দিন বাদে ভোট। এখানকার বুথে যাদের দায়িত্ব, আমি ও নবীনা সেই দলে আছি। তারই মহড়া দিয়ে এলাম।'

গুহবাবু বললেন, 'ফতেমার বড়ো বড়ো কাট আউট দেখলাম। ও কিন্তু—'

কথা শেষ করতে দিল না নবীনা, 'ও নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না।'

'আমাদের তো ভোট আছে।'

'থাকুক। আপনাদের ভোট আমরা দু'জনেই দিয়ে দেব।'

'সে কী! তোমাদের ভোট?'

'সেটাও দেব।'

'এ আবার কী কথা!'

এবার দাবড়ানি মনোরঞ্জনের, 'বলা হচ্ছে, তোমাকে ওই দিন ঘরেই থাকতে হবে মাকে নিয়ে। তোমাদের ভোট দেবার দায়িত্বটা আমাদের দু' জনের।

ব্যাস, আর কোনও কথা নয়। তুমি নাতিকে আর একটা গান গেয়ে শোনাও। দিদিকে তোমার লেখা পড়ে শোনাও। আবার কী? ব্যাস।...'

নরেশ গুহ চশমার কাচ মোছেন। চোখে জল আসাটাও এক জাতের বাতিক। তখন মনে হয়, তারকাছে কোনো জনমনিষ্যি নেই। সকল প্রশ্ন চেপে চুপে যতদিন আর বেঁচে থাকা যায়। □

হিন্দুত্ব সতত গতিশীল, তার গন্তব্য পূর্ণতার দিকে

শ্রী রঙ্গাহরি

হিন্দুত্ব অতি প্রাচীন বিষয়। যখন থেকে হিন্দু জাতির উদ্ভব হয়েছে তখন থেকে হিন্দুত্বও বিদ্যমানতা লাভ করেছে। যাকে হিন্দু বলা হয় তারই বৈশিষ্ট্যগত ভাব হলো হিন্দুত্ব। যেমন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব আর দেবতার দেবত্ব। তাকে হিন্দুর স্বত্ত্ব, অস্মিতা বা পরিচিতি বলা যেতে পারে। সবচেয়ে সরল শব্দ হবে সত্ত্ব। আপনত্ব হলো তার অর্থ। ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হল 'অস্মিতা'। সংস্কৃতে 'আমি আছি' বলতে অহং অস্মি বলা হয়। এই অস্মির ভাবই হলো 'অস্মিতা'। হিন্দিতে তাকে 'হুঁ-পন' আর ইংরেজিতে 'am-ness' বলতে পারি (বাংলায় অস্মিতা বলা যেতে পারে)। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ ব্যক্তিত্ব থাকে। একইভাবে হিন্দুর অনন্য ব্যক্তিত্ব হল হিন্দুত্ব। হিন্দুর সমগ্র জীবনসর্বস্বের দ্যোতক হলো এই শব্দ। হিন্দুর সামগ্রিক জীবনের কিছু অংশ যেমন আচরণ, বিশ্বাস, উপাসনা পদ্ধতিকে হিন্দুত্ব বলা ভুল হবে। এতে অংশকে পূর্ণ মনে করার মতো ভুল হয়ে যাবে। সেজন্য যাকে আমরা 'হিন্দুইজম' বলে এসেছি তাকে হিন্দুত্ব মনে করা যুক্তিহীন হবে। হিন্দুত্বকে 'হিন্দুনেস'(Hinduness) বলা যেতে পারে, কিন্তু 'হিন্দুইজম' কখনোই নয়। হিন্দুত্ব শব্দ জীবন সম্পর্কিত আর হিন্দুইজম হলো বিশ্বাস সম্পর্কিত। তাই যতদিন হিন্দু থাকবে ততদিন হিন্দুত্ব থাকবে। হিন্দুত্ব থেকে হিন্দুকে পৃথক করা সম্ভব নয়। এখানে পণ্ডিত নেহরুর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ''এটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, হিন্দুধর্ম প্রচলিত ধারণায় কোনো ধর্ম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী প্রগাঢ় এর প্রাণশক্তি এবং টিকে থাকার ক্ষমতা। এই ধর্মে একজন নাস্তিককেও (যেমন ঋষি চার্বাক) বলা যাবে না যে তিনি হিন্দু নন। হিন্দুধর্ম তার সব সন্তানকে আঁকড়ে ধরে থাকে।" It has been often remarked that Hinduism is hardly a religion in the usual sense of the words. And yet what an amazing tenacity it has got, what a tremendous power of survival ! One may even be a proffessing athiest-- as the old philosopher Charwaka was-- and yet no one dare say he has ceased to be a Hindu-- Hinduism clings on to its children almost despite them. (J Nehru.). মনযোগ দিয়ে পড়ুন, এখানে 'হিন্দুইজম'-এর চেয়ে 'হিন্দুত্ব'-কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।



হিন্দুত্বের প্রবাহ ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামের পরেই শুরু হয়। উনিশ শতকের পরবর্তী সময়ে তিন প্রকারের হিন্দু দৃষ্টিগোচর হয় যার স্পষ্ট উল্লেখ মহর্ষি অরবিন্দ তাঁর 'ভারতের পুনরুত্থান' পুস্তকে করেছেন। প্রথম শ্রেণী ছিল **দাস মনোভাবাপন্ন**। তারা কেবল ইংরেজদেরই নয়, সমস্ত সাদা চামড়ার লোকেদের নিজের আর দেশের হর্তাকর্তা মনে করত। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল **গতানুগতিক**। 'পাশ্চাত্যম্ সর্বমুত্তমং, অস্মাকং সর্বমধমং' ছিল তাদের দৃষ্টিকোণ ও ব্যবহার। তাদের স্বভাবই ছিল আত্মনিন্দা আর আচরণ ছিল পরানুকরণ। তৃতীয় শ্রেণী

ছিল **নবজাগ্রত ও কর্তৃত্ববান**। নিজেদের ত্রুটি উপলব্ধি করে তা সংশোধন করার ক্ষমতা এদের ছিল। এই তিনপ্রকার ভারতীয় হিন্দুসমাজ অনুযায়ী চিন্তন শুরু করে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ তিনপ্রকার হিন্দুত্ব দেখা গেল—**পরাধীন হিন্দুত্ব, পরানুগামী হিন্দুত্ব ও প্রবুদ্ধ হিন্দুত্ব**।

ইতিহাস সাক্ষী যে, এর মধ্যে তৃতীয়শ্রেণীর প্রবুদ্ধ হিন্দুত্ব অতি দ্রুতই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। সেই সময় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে 'ভারত এক রাষ্ট্র নয়', 'হিন্দু বলে কোনো জাতি নেই', 'হিন্দু শব্দটিই মিথ্যা'। প্রবুদ্ধ হিন্দুত্ব এর প্রতিবাদী জবাব দেয়। পশ্চিমি জগতে জয়ধ্বজা উড্ডীন করে ভারতে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীলঙ্কা থেকে লাহোর পর্যন্ত প্রকাশ্য জনসভায় বার বার ঘোষণা করেন যে, ''সিন্ধু নদের পারে বসবাসকারী লোকেদের প্রাচীন কালে পার্শিরা হিন্দু নাম দেয়। সেই নাম আমরা গ্রহণ করেছি। তা স্বীকার করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। প্রাচীন যুগে এখানে একটিমাত্র উপাসনা পদ্ধতি ছিল। বর্তমানে এখানে অনেক উপাসনা গোষ্ঠী রয়েছে কিন্তু হিন্দুস্থানে বসবাসকারী সকলেই হিন্দু। মুসলমান হোক বা খ্রিস্টান তাদের সকলেরই হিন্দু অভিধা স্বীকার করা উচিত। তারা সকলেই হিন্দু অভিধার যোগ্য। (খণ্ড—৩/১১৮)

এটুকু বলেই তিনি থামেননি। হিন্দু জাতির কর্তব্যবোধের উপর জোর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—''যখন কোনো একজন ব্যক্তি নিজেকে তুচ্ছ মনে করে নিজের পূর্বপুরুষদের প্রতি লজ্জা অনুভব করে, তখন বুঝতে হবে তার বিনাশ আসন্ন। সম্প্রতি হিন্দু বলা বর্জনীয় ও অপমানজনক এমন এক কথা তৈরি হয়েছে। কিন্তু সে নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নাই। বিশ্বের যে কোনো ভাষার যে কোনো শব্দের চেয়ে হিন্দু শব্দ শ্রেষ্ঠ এটা আমাদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করতে হবে" (খণ্ড—৩/২৮৯)।

হিন্দু জনগণও এই ভাবের মর্ম অনুধাবন করেছে। ফলস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যর্থনা সভায় প্রায় সব আমন্ত্রণপত্রে তাঁকে 'হিন্দুরাষ্ট্রের অগ্রদূত' বলে লেখা হয়েছিল।

সেই উন্মাদনা নিয়ে ওই দশকেই মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক তাঁর কেশরী পত্রিকায় হুংকার ছাড়েন যে, ''হিন্দুত্ব ছেড়ে দিলে রাষ্ট্রীয় পরিদৃশ্য ভবিষ্যতে ভালো হবে এমন যদি কারও মনে হয় তবে তা সম্পূর্ণ ভুল। আমারা আগামীতে যে তেজোদীপ্তময় অবস্থা প্রাপ্ত হতে চাই তা হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবেই হওয়া উচিত" (কেশরী, ১২ জানুয়ারি, ১৯০৬)।

কেবল এটুকুই নয়, তিনি স্বকীয় ভঙ্গিতে খ্রিস্টমতের উপর প্রত্যাক্রমণও করেন। প্রকারান্তরে খ্রিস্টমতের সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা, কট্টরবাদকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসে ভাবাত্মক ভাবে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করেন---'**প্রামাণ্যবুদ্ধির্বেদেষু, সাধনানামনেকতা– উপাস্যানমিনিয়ম্ হিন্দুধর্মস্য লক্ষণম্**' (বেদের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত বিশ্বাস, সাধনমার্গের বিবিধতা, উপাসকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা–এই হলো হিন্দুধর্মের লক্ষণ।

মনযোগ দিয়ে ব্যাখ্যাটি পড়ুন। জানতে পারবেন এখানে হিন্দুধর্ম থেকে খ্রিস্টতত্ত্বের তুলনা করা হয়েছে, খ্রিস্টতত্ত্বের তুলনায় হিন্দুধর্মকে উৎকৃষ্ট বলা হয়েছে।

এই বিচারধারার আরও লোক সারা দেশে যেখানে যেখানে ছড়িয়ে ছিলেন, যারা খুব একটা বিখ্যাত নন, কিন্তু প্রতিভাবান, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন চেন্নাইয়ের কস্তুরী আয়েঙ্গার। তিনি ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। মহানগরে 'হিন্দু' নামে একটি ইংরেজি সংবাদপত্র শুরু করেন। পত্রিকাটি সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধ। লক্ষ্য করার বিষয় যে, আজও তার হেডলাইনের নীচে মুদ্রিত আছে India's National News Paper since 1878 (১৮৭৮ সাল থেকে প্রচলিত ভারতের জাতীয় সংবাদপত্র)। এর তাৎপর্য কী? হিন্দু শব্দটি রাষ্ট্রীয়। সাম্প্রদায়িক নয়। সংকীর্ণ নয়। সম্ভবত পাঞ্জাবেও ওই নামে সংবাদপত্র ছিল। একথার তাৎপর্য এটাই যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অনুসারে হিন্দু স্বাভিমানে গৌরবান্বিত শ্রেণী দাস মনোভাবাপন্ন ও পরানুগামীরা থাকা সত্ত্বেও সক্রিয় ছিলেন।

একই শ্রেণীতে অগ্রগামী বিদ্বান ছিলেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। তিনি তাঁর ভাষণ অথবা বক্তব্য সরাসরি ইংল্যান্ডে ইংরেজদের সামনে রাখতেন। সেখানকার ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের আলোচনাসভায় তিনি বলেছিলেন , ''পারসিরা, তারপর পশ্চিমের আক্রমণকারীরা সিন্ধুনদীর পাড়ে বসবাসকারী জনসমাজকে হিন্দু বলত।....মূল নিবাসী জনজাতি, পিছিয়ে পড়া অন্ধবিশ্বাসী গোষ্ঠী, সুশিক্ষিত দ্রাবিড়, বৈদিক শিক্ষায় শিক্ষিত —সকলেই হিন্দু, কেননা সকলেই এক মায়ের সন্তান।"

এই আলোচনাসভা এতটা প্রভাবশালী ও জ্ঞানদীপ্ত ছিল যে সে বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সুবিখ্যাত ইংরেজ লেখক সি.ই.এম. জোদ 'Counter Attack From The East' নামে পুস্তক লিখে ফেলেন।

এই সময় দাস মনোভাবাপন্ন আর পরানুগামীদের মানসিকতা একদমই আলাদা ছিল। মূল থেকে উৎপাটিত করে তারা নিজেদের আলাদা মনে করত । একটা মজার উদাহরণ দিই। গোয়া কোঙ্কণের অংশ। অতএব ওখানকার সকল বাসিন্দা কোঙ্কণী। কিন্তু সেখানকার ধর্মান্তরিত ক্যাথলিকরা ধর্মান্তরিত না হওয়া হিন্দুদেরই কোঙ্কণী বলে, নিজেদের কোঙ্কণী মনে করে না। ইংরেজি অভিধানে দেখুন, তাতে 'কোঙ্কণী'-র অর্থ দেওয়া হয়েছে 'inhabitant of Konkani region, wrongly Hindu' বর্তমানেও গোয়েঙ্কাদের মধ্যে 'কোঙ্কণী'-র অর্থ হিন্দু,

গোয়েঙ্কারা খ্রিস্টান নয়। এজন্যই সেসময়ের রাষ্ট্রবাদীরা বলতেন 'ধর্মান্তরের অর্থ রাষ্ট্রান্তর'।

প্রায় এই কালখণ্ডেই যুগপৎ অস্মিতার বোধেরও জাগরণ ঘটে। এই আত্মজাগৃতির পুরোধা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ। সেই উজ্জ্বল সেনানীদের একজন ছিলেন ঋষি অরবিন্দ। এই মহান দ্রষ্টাগণ হিন্দু শরীরের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর আত্মারও উপলব্ধি করেন এবং তার প্রচার করেন। সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম দ্রষ্টা ছিলেন যিনি বলেছিলেন বিশ্বের প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি বিশেষ প্রকৃতি রয়েছে আর তা রাষ্ট্রের আত্মা। পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্র তার কারণেই পরিচিতি লাভ করে। স্বামীজী তাঁর 'ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' পুস্তকে বলেন, ইংল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য হলো বাণিজ্য, ফ্রান্সের হলো রাজনীতি এবং ভারতবর্ষের হলো ধর্ম। পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দ প্রকাশ্যে বললেন 'সনাতন ধর্মই ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব'।

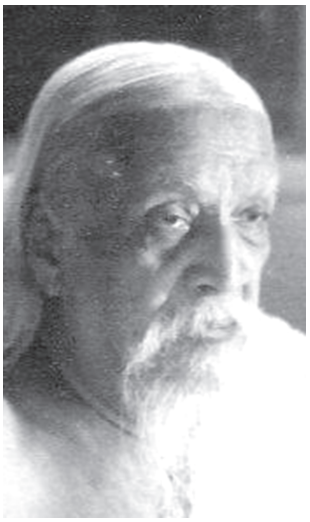



সেই সময় আমাদের দেশে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত নামে একজন বিদেশি মহিলা দার্শনিক আসেন। ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানে তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন। কেরলের মহাকবি শঙ্কর কুরুপ্প (জ্ঞানপীঠ পুরস্কৃত) তাঁর নামের উচ্চারণ 'বসন্তাম্বা' করেন। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তিনি যা বলেন তা উল্লেখযোগ্য, ''যখন বিধাতা পৃথিবী পৃষ্ঠে একেরপর এক রাষ্ট্র প্রেরণ করেন তখন প্রত্যেককেই বার্তা রূপে এক-একটি শব্দ দেন যা হয়ে ওঠে তাদের জীবন-স্বর। ইরানকে প্রদত্ত শব্দ ছিল শুচিতা। কালদিয়াকে প্রদত্ত শব্দ বিজ্ঞান। গ্রিসকে প্রদত্ত শব্দ সুন্দরতা। রোমকে প্রদত্ত শব্দ নিয়ম এবং ভারতকে ঈশ্বরের জ্যেষ্ঠ সন্তানের জন্য প্রদত্ত সর্বার্থকারী বিশেষ শব্দ **ধর্ম**। ধর্ম ইংরেজিতে অনুবাদ করা দুষ্কর। সংক্ষেপে তার অর্থ হলো কর্তব্যের সংহিতা—সামাজিক কর্তব্য, পশুপাখির প্রতি কর্তব্য এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। পঞ্চাশের বেশি শতাব্দী থেকে ভারত এই প্রেমপূর্ণ বার্তা সম্পূর্ণ জগতে প্রসারিত করে আসছে।" এভাবে হিন্দুত্বের অস্তিত্ব ও অস্মিতাকে উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে আমাদের রাষ্ট্রাভিমানী মনীষীগণ সকল দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন।

বিংশ শতকের শুরুতেই ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ হয়। তারপর তার পরিণামস্বরূপ সেখানে নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদয় হয়। বিশেষত ইউরোপের রাষ্ট্রগবেষকেরা ওই বিষয়ে অনেক গবেষণা করেন এবং সেই মন্থন থেকে 'রাষ্ট্রীয়তা' নামের তাজা বিষয় উঠে আসে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রীয়তা শব্দটির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও প্রায় সকলেই ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন যে, দেশবাসী, মত-পথ, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি যখন যেখানে সমান, তখন সেখানকার লোকসমূহ 'রাষ্ট্র' হয়ে যায়। এই বিচারধারার তরঙ্গ পরাধীন ভারতেও ওঠে আর এখানকার রাজনৈতিক নেতারাও ভারতের রাষ্ট্রীয়তার সন্ধান করতে শুরু করেন। এই পৃষ্ঠভূমিতে রয়েছে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের হিন্দুত্বের অনুসন্ধান। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহামনীষীর তিরোধানের পর আন্দামানের কারাবাস থেকে মুক্ত হয়ে দেশের মাটিতে এসে পড়েন এবং কোঙ্কনের রত্নগিরিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ক্রান্তিবীর সাভারকর ছিলেন সংগ্রামী দেশভক্ত। শুধু ভারত নয়, তাঁর কাছে ভারতের স্বাধীনতাও ছিল স্বয়ং কল্যাণময়ী মা দুর্গা। তাঁর মৌন তপস্যার ফল হলো খ্যাতিপ্রাপ্ত হিন্দুর সংজ্ঞা। ''**আসিন্ধুসিন্ধুপর্যন্তা যস্য ভারতভূমিকা পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতিস্মৃতঃ**'' (১৯২৩ সাল)। এর আগে অন্য কেউ এভাবে হিন্দুর সংজ্ঞা তুলে ধরেননি। লোকামান্য তিলকের শ্লোক হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা নয়, তা হল ব্যাখ্যা। তিনি হিন্দুধর্মের তিনটি বিশেষ লক্ষণের কথা বলেছেন। ক্রান্তিবীর সাভারকরের 'হিন্দুত্ব' একটি বিস্তৃত নিবন্ধ যা যুক্তিসঙ্গত ও সময়োপযোগী। বহু দৃষ্টান্তে পূর্ণ, তা খণ্ডন করা কঠিন। যুক্তিবাদী পাঠক এই লেখকের সামনে শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়বেন।

কিন্তু আজ, ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছরে সেই মূল্যবান মৌলিক প্রতিবেদনটি পড়ার সময় বলতে হয় যে তা আজকের সমস্যার সমাধানে পর্যাপ্ত নয়। রাষ্ট্রীয়ত্ব সম্পর্কিত কল্পনাগুলি সারা বিশ্বেই বদলে গেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে পরিভাষাও।

সেই নিবন্ধে, আর্য আগমন তত্ত্বের ব্যাখ্যাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পুস্তকের প্রথম ভাগে সেই সঙ্কেত বিভিন্ন বাক্যে রয়েছে। বর্তমানে সেই সিদ্ধান্ত অনেক গবেষণার ফলে ভিত্তিহীন এবং

বাতিল হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হলো, পরিভাষায় আসা পিতৃভূ শব্দটি স্পষ্টতই ভারতীয় অর্থযুক্ত নয়। অথর্ববেদের 'মাতা ভূমি' প্রয়োগই উপযুক্ত। পরবর্তী বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার সমস্ত সংগ্রামেই 'ভারতমাতা কী জয়' শব্দ সর্বত্র ধ্বনিত হয়েছে। সাভারকরজীর নিবন্ধের পূর্বভাগে 'মাতৃভূ' শব্দ বহুবার এসেছে। তবুও সংজ্ঞাতে পিতৃভূ শব্দ কেন এল, তা একটি রহস্য। পশ্চিমি পরিভাষাতে প্রযুক্ত fatherland শব্দের রূপান্তরই পিতৃভূ। ভারতের কোনো ভাষাতেই এই শব্দের প্রয়োগ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপরিচিত।

আর তৃতীয় কথা হলো, রাষ্ট্রীয় অস্মিতার বিষয়ে এই পরিভাষা যথোচিত নয়। যদিও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সেই ধারণার বহিঃপ্রকাশ করেন যা সম্পর্কে পশ্চিমি জগৎ পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। রাষ্ট্রের আত্মার কল্পনা সেই সব রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণার মধ্যে ছিল না। 'আসিন্ধু-সিন্ধু' সংজ্ঞাতে সেই দিকটি দেখা যায়।

হিন্দুত্ব পুস্তকটির প্রকাশন ১৯২৩-এ হয়। দুই বছর পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থাপনা হয়। সঙ্ঘের ধ্যেয় যেমন প্রতিজ্ঞাতে বলা হয়—হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু সমাজের সংরক্ষণ করে হিন্দুরাষ্ট্রকে স্বাধীন করার কথা ছিল। কিন্তু সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা কখনও হিন্দু শব্দের সংজ্ঞার দিকে যাননি। কোনো প্রকারের তর্কবিতর্কে না যাওয়া ছিল তাঁর কার্যশৈলী। হিন্দু শব্দের সংজ্ঞার অভাবের জন্য তিনি চিন্তিতও ছিলেন না। তবুও হিন্দু নাম নিয়ে কাজ করতে করতে সঙ্ঘের কাজ ২২ বছর অগ্রসর হয়, আশানুরূপ বিস্তার লাভ করে।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশে নতুন পরিবেশ উৎপন্ন হয়। সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদয় হয়। যেন নতুন পৃথিবীর উদ্ভব ঘটে। নানান রকমের বৈশ্বিক সংগঠন বা সংস্থার আবির্ভাব ঘটে। তার কারণে নতুন প্রত্যাশা, নতুন সমস্যা, নতুন কর্তব্য আদির উৎপত্তি ঘটে। ভারতের পক্ষেও এই বৈশ্বিকপ্রবাহ থেকে অলাদা থাকা সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকেও এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে চিন্তন মন্থন করতে হয়।

তখন থেকে পরম পূজনীয় শ্রী গুরুজীর বৌদ্ধিকে এক নতুন বিষয় শোনা যেত—'ভারতবর্ষের বৈশ্বিক কর্তব্য', 'হিন্দুর বৈশ্বিক মিশন', তখন থেকে সঙ্ঘ অধিকারীদের বক্তব্যে 'কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্' বিষয় উঠে আসে। যখন আমি চেন্নাইয়ে প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে যাই সেখানে গণগীতের মধ্যে একটি ছিল 'বিশ্বমখিলমুদ্ধর্তুং নির্মাতা বয়ং, হরিণা প্রেষিতা বয়ম্'—অর্থাৎ 'সমস্ত বিশ্বের উদ্ধার হেতু আমরা ঈশ্বরের দ্বারা নির্মিত ও প্রেষিত।' ফলে সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের অন্তঃকরণে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীগুলি আরও অর্থপূর্ণ মনে হয় (ভারতের বিশেষ বার্তা, ভারতের বিশেষ কর্তব্য, ভারতের বিশেষ ভাগ্য)। এখানে আমাকে স্বর্গীয় অশোক সিংঘলের ভক্তিগীতির পঙ্‌ক্তি

With Best Compliments from -

AHUTI DEALERS PRIVATE LIMITED

CIN - U52390WB2010PTC154516

12/1, Nellie Sengupta Sarani, Kolkata- 700 087

Ph. No. 033-2252-3520, E-mail : ahutidealers2010@yahoo com

মনে আসছে—''হে দেহ বিশ্ব, আত্মা হ্যায় ভারত মাতা, সৃষ্টি প্রলয় পর্যন্ত অমর য়হ নাতা।"

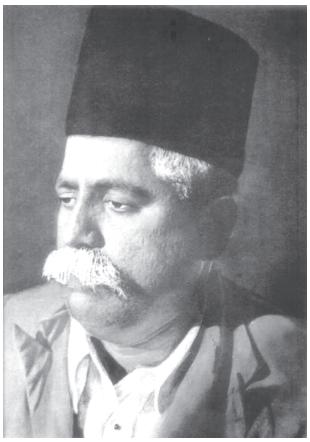

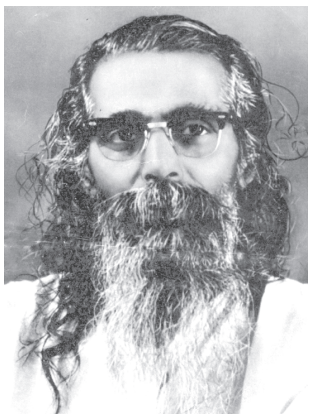

যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে সেই সময়কালে বিশ্বের বহুদেশই স্বাধীনতা পেয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে উপনিবেশবাদের সমাপ্তি ঘটে এবং সারা বিশ্বে নতুন নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রেরও উদয় হয়। তার মধ্যে ব্রহ্মদেশ, ত্রিনিদাদ, থাইল্যান্ড, মালেশিয়ার মতো দেশ ছিল যেখানে হিন্দুসংখ্যা নগণ্য ছিল না। সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের নেতারাও তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন সুরক্ষিত রাখতে তৎপর ছিল। তারাও নিজেদের পরম্পরাগত শিকড়কে সুদৃঢ় রাখার বিষয়ে চিন্তিত ছিল। তারা সকলেই ভারতের কাছ থেকে পথনির্দেশ ও সহযোগিতা চেয়েছিল। সঙ্ঘকাজ তো ভারতে বাড়ছিলই। সেই সময় ব্রহ্মদেশের সর্বোচ্চ বিচারপতি উ চান থুন, আমেরিকার ভূখণ্ডের ত্রিনিদাদের সাংসদ শম্ভুনাথ কপিলদেব, আমেরিকা থেকে পণ্ডিত উষরবুদ্ধর মতো প্রখর বিদ্বানরা পূজনীয় গুরুজীর সঙ্গে দেখা করেন। দু'তিনদিন তাঁর সঙ্গে থাকেন আর মনের কষ্ট সেই মহান হিন্দুসংগঠকের সামনে ব্যক্ত করেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশে যাওয়া ব্যবসায়ী স্বয়ংসেবকদের থেকেও বহু তথ্য পূজনীয় গুরুজীর কাছে ব্যক্তি বা পত্রের মাধ্যমে পৌঁছাতে থাকে। সঙ্ঘে এই সবেরই বৈচারিক মন্থন হয়। তার পরেই পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ও সাবধানতার সঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা হয়।

তখন এক নতুন সমস্যার উদয় হয়। তা ছিল সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধির সমস্যা। নতুন সংগঠনের দৃষ্টিতে কারা হিন্দু? আধুনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী তার ঘোষণা ও লিপিবদ্ধ করা অনিবার্য ছিল। তাই প্রথমবার স্বাধীন ভারতে হিন্দু শব্দকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ট্রাস্টি দ্বারা পরিভাষিত করা হয়। সেই অনুসারে তাদের মধ্যে অতি গভীর চিন্তন মন্থন হয়। তা থেকে যে নির্যাস উঠে আসে তা হলো ঃ

১। ভারতীয়র্ষিসংপ্রোক্তান ইহামুত্রার্থসাধকান্।
যোঽঙ্গীকরোতি দ্রোতি সশ্রদ্ধং সৎসিদ্ধান্তান সনাতনাম্।।

২। মহাত্মভির্দিব্যশীলৈঃ কালে কালে প্রবর্তিতান্।
সম্প্রদায়ানাদ্রিয়তে সঃ সর্বান্ পরমার্থিকান্।।

৩। যত্রকুত্রাপি জাতোসবাস্তু যা কোঽপি জননা।
সচ্ছিলোদারচরিতঃ সোঽত্র হিন্দুরিতি স্মৃতঃ।।

সমস্যা নতুন, আকাঙ্ক্ষা নতুন আর পরিভাষাও নতুন।

যাঁরা ভারতীয় ঋষির দ্বারা উক্ত লৌকিক ও পারলৌকিক অর্থ প্রতিপাদনকারী সনাতন সত্যনিষ্ঠ সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধাপূর্বক মান্য করেন, যাঁরা মহাত্মা দিব্য পুরুষদের দ্বারা যুগ যুগ ধরে প্রবর্তিত সম্প্রদায়গুলিকে সমাদর করেন, তাঁরা জন্ম অনুসারে বা নিবাস অনুসারে যেখানকারই হোন, সেই সুচরিত্রবান মানুষ হিন্দু নামে অভিহিত হবেন।

এখানে পরিভাষিত হিন্দু কোনো দেশের সীমা দ্বারা আবদ্ধ নয়। তাঁরা ভারতে সৃষ্ট আধ্যাত্মিক মত ও পথকে মান্যতাকারী ও আস্থাবান। দেশ, বংশ, সভ্যতার মতো তথ্যে আবদ্ধ নন। এখানে পরিভাষিত হিন্দু ১৯২৩ সালে সাভারকর দ্বারা পরিভাষিত হিন্দু নয়। তার প্রধান কারণ বিশ্বে আসা পরিবর্তন। পরিভাষার খোঁজ করা বিদ্বানদের সামনে সমস্যা ছিল সামাজিক ও ধর্মীয়। তাঁদের রাজনৈতিক সম্পর্ক সামান্যই ছিল। তাঁদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের পরম্পরাগত প্রাণস্বরূপ সমাজকে খ্রিস্টীয় ধর্মান্তরণের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করা, বিশ্বগুরু হওয়ার জন্য পুষ্ট করা। এর জন্যই তাঁরা প্রয়োজন অনুসারে উত্তরের সন্ধান করেছেন।

এমনই একটি উদাহরণ। ভারত সরকার ১৯৫৮ সালে হিন্দু বিবাহ অধিনিয়ম চালু করে। সেই অধিনিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুর ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক ছিল। শুরুতেই বলা হয়েছে যে, ''উপাসনা পদ্ধতির দিক থেকে বীরশৈব, লিঙ্গায়েত, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, অন্য পন্থ যেমন বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, জনজাতি এবং যারা খ্রিস্টান বা মুসলমান নয় তাদের সকলকেই হিন্দু মানা হবে।" উপরোক্ত অধিনিয়মকে ক্রিয়ান্বয়ন করতে এই ব্যাখ্যাটি ছিল নিতান্তই আবশ্যিক এবং যোগ্য।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাধ্যবাধকতা ছিল ভিন্ন। শতাব্দী থেকে ধর্মান্তরিত স্বজনদের মধ্যে অর্থাৎ তথাকথিত সংখ্যালঘুদের মধ্যে গতানুগতিক 'ধর্মান্তর থেকে রাষ্ট্রান্তর'-এর মিথ্যাজ্ঞান কীভাবে মেটানো যায়, এটাই ছিল চিন্তার বিষয়। সেই অনুসারে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বক্তব্য আসতে শুরু করে।

With Best Compliments from -

Luxmi Tea Co. Private Limited

17, R. N. Mukherjee Road
Kishore Bhawan
Kolkata - 700 001
Ph. No. 2248-4437 / 4227
Fax No. 2243-0177
E-mail : mail@luxmitea.com
Web.: www.luxmigroup.in

Group Gardens :-

NARAYANPUR T.E.
SHYAMGURI T.E.
MONMOHINIPUR T.E.
MANOBAG T.E.
BHUYANKHAT T.E.
MANU VALLEY T.E.
GOLOKPUR T.E.
PEARACHERRA T.E.
JAGANNATHPUR T.E.
SAROJINI T.E.
FULBARI T.E.
URRUNABUND T.E.
MAKAIBARI T.E.
KENDUGURI T.E.
MORAN T.E.
SEPON T.E.
ATTABARIE T.E.
LEPTKATTA T.E.
ADDABARI T.E.
DIRAI T.E.
MAHAKALI T.E.

বিশেষ করে পূজনীয় গুরুজী তাঁর একান্নতম জন্মদিনের অভ্যর্থনা সভাতে তিনি এই বিষয়কে তথ্যপূর্ণ ভাবে রাখেন। রাষ্ট্রধর্ম, কুলধর্ম ও ব্যক্তিধর্ম এই তিনের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সমস্ত জনতার অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির উপাসনা পদ্ধতি তার ব্যক্তিগত। ধর্মান্তর থেকে রাষ্ট্রান্তর হয় না। এর জন্য তাঁর পূর্বপুরুষ বদলায় না।

একবার প্রখ্যাত বিদ্বান ড. সৈফুদ্দিন জিলানি শ্রীগুরুজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মধুর বার্তালাপে মগ্ন হন এবং পরে লিখিতভাবে ব্যক্ত করেন যে, ''দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে আমার এই মনে হয়েছে যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একমাত্র শ্রীগুরুজীই দিশা নির্দেশ করতে পারেন।''

আনন্দের বিষয়, পরিবর্তিত পরিবেশে, ব্যতিক্রমীভাবেই হোক না কেন 'আমি বংশগত ভাবে হিন্দু, যদিও আস্থাগত কারণে মুসলমান' এই প্রকার বলার মতো সৎসাহস বিচারপতি মহম্মদ করিমভাই চাগলার মধ্যেই দেখা যায়। ''আমার সংস্কৃতি হিন্দু, কিন্তু আমার উপাসনা পদ্ধতি খ্রিস্ট'' —এমন বক্তব্য প্রকাশ্যভাবে ভাবে দিতে দেখা যায় উচ্চস্তরীয় পাদরি জোসেফ পারেক্কাট্টিলকে। ভগবান রাম ও কৃষ্ণ বিষয়ক ভক্তিগীতির রচয়িতা ইউসুফ আলি কেচেরীকে কেরলের আধুনিক রসখান বলা যেতে পারে।

কিছুদিন আগে যখন বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বলেন যে, হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণকারী সমস্ত নর-নারী হিন্দু। তখন কেরলের এক সাংবাদিক টিপ্পনী করেন যে এটা আরএসএস-এর চালাকি। কিন্তু সেই সাংবাদিক এটা জানতেন না যে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১৯৮৩-তে তালজাইয়ে অনুষ্ঠিত পশ্চিম মহারাষ্ট্রের প্রান্তীয় শিবিরের সমাপন অনুষ্ঠানে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজী বলেছিলেন, ''এখানকার মুসলমানরা বংশগত ভাবে হিন্দু। কেবলমাত্র তাদের উপাসনাপদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য তাদের রাষ্ট্রীয়তার পরিবর্তন হয় না। তাদের সকলকেই রাষ্ট্রীয় ধারাতে একরূপ হওয়া উচিত।''

তার চারবছর আগে ১৯৭৯ সালে বিহারের জামশেদপুরে একটি প্রকাশ্য সভায় তিনি বলেছিলেন যে, ''হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু রাষ্ট্রীয়তাকে মান্যতাকারী সকলেই হিন্দু, তাদের উপাস্য আলাদা হলেও।''

হিন্দুস্থানে বসবাসকারী হিন্দু— এই সমীকরণে আশ্চর্যের কী আছে! বিশ্বের রীতি দেখুন। আফগানিস্তানের অধিবাসী আফগান। উজবেকিস্থানের অধিবাসী উজবেক। কিরগিস্তানের নিবাসী কিরগিজ। তুর্কিস্তানের নিবাসী তুর্ক। কাজাকাস্তানের নিবাসী কাজাগ। তাজিকিস্তানের নিবাসী তাজিক। সেই নিয়মেই হিন্দুস্থানের অধিবাসী হিন্দু।

বাস্তবে সঙ্ঘের রীতি শুরু থেকেই সামূহিক ও সমন্বয়ের। কালচক্রের বিপরীত গতির কারণে হিন্দুস্থানের হিন্দু আত্মবিস্মৃতির গহ্বরে ডুবে যায় এবং দাসত্বের শিকার হয়। দাসত্বের সেই অন্ধকার সময়ে প্রায় সকলেই নিজেদের অসংগঠিত ভাবত, কখনই তাদের সংগঠন সম্ভব নয় বলে মনে করত। হিন্দুদের অসঙ্ঘবদ্ধতা প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে সকলকে আত্মস্থ করার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে পড়েছিল। মহাকবি দিনকরের গ্রন্থ 'সংস্কৃতি কে চার অধ্যায়'-এর প্রস্তাবনাতে জওহরলাল নেহরু স্পষ্ট লিখেন যে, ''মধ্যকালীন যুগে হিন্দুস্থানের পাচকশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।''

সেই সময় অমৃতবাহক গরুড়ের মতো উপস্থিত হন সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার। তিনি তাঁর পৌরুষ এবং কৃতিত্বের দ্বারা হিন্দুদের সংগঠিত করা শুরু করেন। প্রায় এক শতক পর প্রমাণিত হয়েছে যে হিন্দু সংগঠন সম্ভব। বর্তমানে সমগ্র ভারতে সবচেয়ে বেশি পরিব্যাপ্ত বিশাল সংগঠন হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। তার প্রত্যেক সক্রিয় স্বয়ংসেবকের মধ্যে আত্তীকরণের ভাব জেগে ওঠে। ভগিনী নিবেদিতার শব্দ ছিল 'পরাক্রমী হিন্দুত্ব' (অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্)। বর্তমানে হিন্দুত্ব ওটাই। তা বিজয়শালিনী সংহত কার্যশক্তির পরিচায়ক।

প্রখর দেশভক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁর 'হিন্দুত্ব' নামক বহুমূল্য গ্রন্থে তাঁর অদ্ভুত দূরদর্শিতার চিত্র তুলে ধরেন যা তিনি কল্পনানেত্রে দেখেছিলেন। তাতে তিনি বলেন (পৃষ্ঠা. ৮৬)—''সম্ভবত আগামী কোনো সময়ে হিন্দু অভিধানে হিন্দুস্থানের সকল জনগণই হিন্দু নামে পরিচিত হবে। কিন্তু সেইদিন তখনই আসবে যখন মত-পথের আগ্রাসী ভাব নিঃশেষ হবে, সাম্প্রদায়িক পন্থীয় কট্টরবাদী নিষ্কাসিত হবে এবং সম্প্রদায় কেবলমাত্র 'ইজম' হয়েই রয়ে যাবে।''

আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের অগ্রদূত আচার্য শঙ্কর শিষ্যদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করার সময় গ্রামের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে সশিষ্য শঙ্খধ্বনি করতেন এবং বলতেন, 'যারা এই সমবেত শঙ্খধ্বনি শুনেছে তারা সকলেই আমার শিষ্য হয়ে গেছেন।'' কী অপরিমিত প্রখর আত্মবিশ্বাস! তেমনই বর্তমান প্রবুদ্ধ ভারতের উদাত্ত উদ্ঘোষ—'হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণকারী সকলেই হিন্দু।'

সংক্ষেপে বলতে গেলে হিন্দুত্ব গতিশীল; স্থিতিশীল নয়। যুগোপযোগী, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হওয়ার চেতনা তার মধ্যে নিহিত। মনুর মাছের মতো তারও গন্তব্য পূর্ণতার দিকে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)

বাঁধন

সন্দীপ চক্রবর্তী





নীলাম্বর দাস বকের মতো গলা উঁচু করে আকাশ দেখতে দেখতে বলল, গতিক সুবিধের নয় সাধুদা। মনে হচ্ছে ভাসাবে। শালা কার্তিক মাসেও জল।

সাধুচরণ ভুরু কুঁচকে তাকাল, আড়তে বসে গাল পাড়িস কেন বল তো? তোকে অনেকবার মানা করেছি। কথা কানে যায় না, না কি?

নীলাম্বর জিভ কাটল। সাধুচরণের বিড়ির আড়তে শালা কথাটাও গালাগালি। এমনকী, বউয়ের ভাই বা দাদার কথা বলার সময়ও শ্যালক বলতে হয়।

নীলাম্বর এই আড়তে তিরিশ বছর কাজ করছে। সাধুচরণের পছন্দ-অপছন্দ ও ভালোই জানে। তবুও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। মশলার কুলোটা কোলে টেনে নিয়ে বলল, না মানে, আজ হাটবার কিনা, তাই বলছিলুম।

সাধুচরণ বিড়িতে বাঁধন দিচ্ছিল। এই একটা কাজ! এ সময় সাধুচরণ কথা বলে না। ওর মন চোখ আর আঙুল এক হয়ে যায়। দুটো শক্ত আর একটা নরম বাঁধন দিয়ে সাধুচরণ বলল, হাটবার তো কী হয়েছে! একদিন না হয় বেচাকেনা একটু কম হবে। তাই বলে তুই প্রকৃতি মাকে গাল পাড়বি!

নীলাম্বর কিছু বলল না।

শনিবার মানেই নারানপুরে সাজো সাজো ব্যাপার। ফি-হপ্তায় হাট বসে। আশপাশের বিশটা গাঁয়ের গেরস্থ থেকে শুরু করে দোকানদার এমনকী বড়ো বড়ো পাইকাররা পর্যন্ত নারানপুরের হাটে আসে চাল কিনতে। যখন ঢেঁকিতে ধান ছেঁটে চাল হতো তখন জলপথে গ্রাম-গ্রামান্তরে পাড়ি দিত নারানপুরের ধান। এখানকার প্রাচীন লোকেরা এখনও দামোদরের ঘাটে শয়ে শয়ে নৌকো লাগার কথা বলে। ঢেঁকির দিন আর নেই। নারানপুরেই এখন তিনটে চালকল। সরু-মোটা নানা রকম চাল লরি-ট্রাকে চেপে চালান হয়। সব মিলিয়ে বেশ বড়ো ব্যাপার।

কিন্তু আজ কারবারিদের কপাল মন্দ। হাট জমে ওঠার আগেই বৃষ্টি নামল। ক্রেতারা যে যেখানে পারল দৌড়ে পালাল। হাটের সব দোকানই অস্থায়ী। বৃষ্টি নামলে চাল ভিজে যায়। ভিজে চাল বিক্রি হতে চায় না। পাইকারদের হাঁকডাক আর ক্রেতাদের মাথা বাঁচাবার ব্যস্ততায় হাটতলার অবস্থা যা হল তা বলার নয়।

সাধুচরণ এই সময় রোজ বাড়ি যায়। পারুল ভাত নিয়ে বসে থাকে। সাধুচরণ অনেকবার বলেছে, আড়তে কত কাজ থাকে। আমার দেরি হলে তুই খেয়ে নিবি। কিন্তু বাবাকে না খাইয়ে পারুল কোনওদিন খায় না। সেই সকাল থেকে সংসারের কাজ করে পারুল। দুটো মানুষের সংসার হলেও কাজ তো কম নয়। গেরস্থের সংসারে মঙ্গল-অমঙ্গল বিচারের ভার যাদের ওপর তাদের মুখের হাসি দেখে বোঝার উপায় থাকে না হাসিটা আসল না নকল! সাতসকালে একমুঠো মুড়ি খেয়ে দুপুর পর্যন্ত চালিয়ে দেয়। জিজ্ঞাসা করলে বলে, এতক্ষণ কেউ না খেয়ে থাকতে পারে। আমি তো এই একটু আগেই খেলুম।

পারুলের কথাই ভাবছিল সাধুচরণ। প্রকৃতি যদি অল্পে রেহাই না দেন তা হলে পারুলকে আজ অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে।

হঠাৎ একটা কোলাহল শোনা গেল। মাঝবয়েসি একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, কই গো সাধুদা, কোথায় গেলে? সাদা সুতো আর লাল সুতো দু'শো করে দিয়ে দাও দেখি।

লোকটার নাম গোপাল মণ্ডল। জয়রামহাটির স্টেশন বাজারে বড়ো দোকান। একদিকে চা আর অন্যদিকে পান বিড়ি সিগারেট। মেলা খদ্দের। সাধুচরণের সঙ্গে প্রায় বিশ বছরের সম্পর্ক। গোপাল ব্যবসা করলেও ওর ব্যবহার ভারী আন্তরিক। মানুষকে আপন ভাবতেও পারে, মানুষের আপন হতেও পারে। গোপালের ব্যাগটা নিয়ে নীলাম্বর মাল গুছোতে শুরু করল। সাধুচরণ বলল, এত তাড়া কীসের রে গোপাল। অন্য কোথাও যাবি না কি?

এই ব্যাংডাকানি জলে কোথায় যাব সাধুদা! সোজা বাড়ি। এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরুতে পারলে দুটো দশের গাড়িটা পেয়ে যাব।

বউমার শরীর এখন ভালো তো? আর তোর ছেলে সে কেমন আছে?

ওরা সব ভালো আছে। পারুলের কী খবর?

সাধুচরণ ম্লান হাসলেন, কী করে ভালো থাকবে বল! তুই তো সবই জানিস। এত ঘটা করে বিয়ে দিলুম, তা মেয়ে আমার দু'মাসের মধ্যে শাঁখা ভেঙে সাদা কাপড় পরে ফিরে এল। রোজ বলি, যা হয়েছে ভুলে যা। আমি পাত্তর দেখছি। বিয়ে করে আবার সংসার কর।

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from N.D. Rly. Station

Only 1 km. from Connaught Place

Homely Atmosphare

Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road

Ram Nagar,

New Delhi - 110055

Phones : 23622767, 23623398, 23618232

STD : 23530775, 23533398,23618232

Cont : 9811044543

E-mail : arya_tourist_lodge@yahoo.co.in

Fax : 91-11-23636380

হ্যাঁ, তাই তো করা উচিত। দুমাসের বিয়ে আবার বিয়ে নাকি? তা, কী বলে পারুল?

কিছু বললে তো আমি বেঁচে যেতুম রে গোপাল। কিছুই বলে না। আসলে কী জানিস—সাধুচরণ হঠাৎ কথা থামিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর আবাঁধা একটা বিড়ির গায়ে আঙুল বুলিয়ে বলল, আমার বোকা মেয়েটা যে মোটে বাঁধতে জানে না। আমার বাঁধা বিড়ি খেয়ে লোকে কত প্রশংসা করে। কটা পাক দেওয়ার পর গেরো দিতে হয় শেখার জন্য কত ছেলে আমার কাছে আসে। অথচ দেখ, আমার মেয়ে হয়ে পারুল বাঁধতে শিখল না। এর থেকে বড়ো দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে।

নীলাম্বরের মাল গোছানো হয়ে গিয়েছিল। গোপাল ব্যাগটা নিয়ে বলল, তবুও চেষ্টা করে যেতে হবে। যদি বলো আমিও না হয় একদিন যাব। আজ উঠি।

বৃষ্টি কমতে সাধুচরণ আড়ত থেকে বেরোল। ছাতা নেই। ভিজে ভিজেই যেতে হবে। পাকা রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুর হবে। দুলেপাড়ার মেঠো রাস্তা ধরল সাধুচরণ। কাদায় চটি পরে হাঁটা যায় না। বাধ্য হয়ে চটিজোড়া হাতে নিতে হলো।

পারুল অপেক্ষা করছিল। সাধুচরণের পায়ের শব্দ পেয়েই দৌড়ে এল। বৃষ্টি কমলেও মানুষের দুর্গতি তাতে কমেনি। এইটুকু পথ আসতে আপাদমস্তক ভিজে গেছে সাধুচরণ। পরনের ধুতিটাও কাদায় মাখামাখি। এক বালতি জল দাওয়ায় রেখে পারুল বলল, আগে ভালো করে পা ধোও। কাপড় উঠোনেই থাক। বিমলি এসে কেচে দেবে। তারে শুকনো গামছা আছে। মাথা মোছ ভালো করে। এই অসময়ের জলে কেউ ভেজে? বলিহারি তোমার আক্কেল। কেন, যুধিষ্ঠির কাকার ছাতাটা নেওয়া যেত না? একটু পরেই তো ফেরত দিয়ে দিতে।

বকুনি খেয়ে কৈফিয়ত দেবার মতো করে সাধুচরণ বলল, মনে ছিল না রে মা। ভাবলুম তুই না খেয়ে বসে আছিস। তাড়াতাড়ি ফিরলে তবু দুটো মুখে দিতে পারবি।

থাক। অনেক হয়েছে। এক বেলা না খেয়ে থাকলে মানুষ মরে যায় না।

আপাতদৃষ্টিতে পারুলের কথায় আঘাত পাওয়ার মতো কিছু ছিল না। কিন্তু দুঃখী হৃদয় কোন কথায় আঘাত পায় বলা মুশকিল। সাধুচরণ হঠাৎ চটে গিয়ে বলল, আবার ওই কথা। বুড়ো বাপের সামনে মরার কথা বলতে তোর লজ্জা করে না। বলি, এই মুখ সেদিন তোর কোথায় ছিল? দু' মাসের কচি বউকে ফেলে রেখে হতভাগাটা কেনা মেয়েছেলের সঙ্গে ফুর্তি করতে যাচ্ছে দেখে তুই এমন মান করতে পারলি না? বলতে পারলি না, যদি যাও ফিরে এসে আমার মরা মুখ দেখবে? বললে তো হতভাগাটা ঘরে থাকত। রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ে মরত না।

সাধুচরণ কাঁদতে কাঁদতে দাওয়ায় বসে বড়ল। ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জগৎ তো বাঁধনের বশ। কেউ বাঁধবে কেউ বাঁধা পড়বে। তবে না সৃষ্টি বজায় থাকবে। এই সহজ কথাটা সাধুচরণ কাউকে বোঝাতে পারে না। পারুল মেয়েমানুষ। সৃষ্টির আধারস্বরূপ। সে যদি ফুল ফুটিয়ে ধরে রাখতে না পারে তা হলে ফল আসবে কেমন করে?

অনেকক্ষণ পর সাধুচরণ শান্ত হলো। পারুল বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। মানুষটা আজকাল অল্পতেই ভেঙে পড়ে। কখনও রেগে যায়। কখনও কাঁদে। মাঝে মাঝে বলে, মেয়েমানুষ হয়ে বাঁধতে শিখলি না মা, তোর কী হবে বল দেখি।

পারুল কিছু বলে না। কথাটা ওর সত্যি বলে মনে হয়। ও বাঁধতে পারে না। আঙনে জ্যোৎস্না থই থই করে কিন্তু চোখের জলে সেই আলোকে ধুইয়ে দিতে পারে না পারুল। না, যে মানুষ তার কখনও হয়নি, উলটে বিয়ের রাতে বলেছিল, তার অন্য মেয়েমানুষ আছে—তাকে বাঁধতে পারেনি বলে পারুলের কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু যে ওর হয়েছিল—সেই বাঁশরিয়াকেও তো ও বাঁধতে পারেনি। অথচ সে বাঁধা পড়তেই এসেছিল। পারুলের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। শিশুর মতো বসে থাকা সাধুচরণের হাতদুটো ধরে ও বলল, এবার ঘরে চলো বাবা। বেলা অনেক হলো।



শ্বেতপাথরের বেদির ওপর প্রতিষ্ঠিত কষ্টিপাথরের নাড়ুগোপালের সামনে বসে জ্ঞানদাসের পদ গাইছিল নটবর দাস। একটু আগে গোপালকে প্রাতরাশ দেওয়া হয়েছে। খাওয়ার পর গান না শুনলে গোপালের মন খারাপ হয়ে যায়। মন ভালো হলে তিনি লীলা করবেন। নটবরের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বেশি হবে না। চেহারাটি তপোবনের ঋষিদের মতো। নাড়ুগোপালের মন্দির এবং সিদ্ধিনাথ জীউ কৃষ্ণপ্রেম সঙ্ঘের মহন্ত হলেও গোপালকে গান শোনানোর কাজটা এখনও সে নিজেই করে।

গাইতে গাইতে ভাব এসেছিল নটবরের। হুঁশ ফেরার পর দেখল দূরে কে যেন বসে আছে। কাছে যেতে বোঝা গেল পারুল। নটবর হেসে বলল, এ কী দিদি! এতদূরে কেন? কাছে না গেলে গোপাল তোমার কাছে আসবেন কী করে?

পারুল বলল, গোপালের কাছে তো শুধু সধবা আর কুমারীরাই যায়। আমি কী করে যাব মহন্তকাকা?

নটবরের চোখে ছায়া ঘনাল, ছিঃ দিদি! তোমাকে না বলেছি আমরা সবাই একই কৃষ্ণের কোটি কোটি অংশ। সেখানে সধবা বিধবা কুমারী বলে কিছু নেই। যাও দিদি গোপালের কাছে যাও।

তবুও পারুল গেল না। অনেকদিন আগে মুকুজ্যেদের মেজ গিন্নি এই নিয়ে এক ঝুড়ি কথা শুনিয়েছিল। সেই থেকে পারুল গোপালের কাছে যায় না। দূর থেকে দেখে প্রণাম করে চলে যায়। গোপালের কাছে ও নিজের জন্য কিছু চায় না। শুধু বলে, বাবাকে

ভালো রেখো ঠাকুর। আর—পারুলের প্রার্থনা হঠাৎই যেন থমকে যায়। না-বলা কথাগুলো গলার কাছে দলা পাকায়। কিন্তু বলা হয় না।

একটা অবুঝ কান্নাকে বুকের মধ্যে গোপন করে চলেই যাচ্ছিল পারুল। মালতী পিছু ডাকল, অ পারুল শুনছস? তরে একটা কথা কইব বইল্যা কহন থাইক্যা খাড়াইয়া আছি।

পারুল থমকাল। মালতী ওর ছেলেবেলার বন্ধু। এখন আশ্রমে কাজ করে। হেসে বলল, কী কথা রে?

মালতী ফিসফিস করে বলল, মুখুজ্যেদের জগদ্ধাত্রী পুজোয় এবার শাঁখারিপাড়া যাত্রাপার্টি পালা গাইবে। অদের দলে বাঁশি কে বাজায় তুই জানস?

বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল পারুল। কিন্তু মালতীকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বলল, আমি কী করে জানব!

তরেই তো জানতে হবে রে পারুল। কারণ অদের বাঁশরিয়ার নাম হইল গে ঘনশ্যাম। বলেই খিলখিল করে মালতী হাসল। তারপর পারুলের হাত ধরে বলল, গতকাল শাঁখারিপাড়ার দল গেরামে আইছে। কাল রাতে ঘনশ্যাম তো মন্দিরেও আইছিল। পাঁচ বছর পর আইল অথচ একটুকুন বদল নাই। সেই উদাসপানা চোখ, ঘাড় অবধি লোটানো চুল। আর হাসি দেখলে তো মনে হয় মুখটা বুকের মইধ্যে চাইপ্যা ধরি।

আঃ মালতী! মন্দিরে কেন এসেছিল কিছু জানিস?

মালতী উদাস গলায় বলল, গোপালরে বাজনা শোনাতে। সে যে কী বাঁশি আমি তরে বুঝাইতে পারুম না পারুল। শুনলে পরে মনে হয় ঘরদুয়ার ফেইল্যা অর লগে চইল্যা যাই। যা চায় সব দিয়াথুইয়্যা নিঃস্ব হই। বলতে বলতে চোখ বুজে ফেলল মালতী। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখল পারুল নেই। কখন চলে গেছে ও বুঝতে পারেনি।

আজকের আকাশ একেবারে ঝকঝকে। হেমন্তের রোদ্দুরে সোনালি রং ধরেছে। সোনায় মোড়া আদিগন্ত ধানখেতের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে মন আপনা থেকেই উদাস হয়ে যায়।

সাধুচরণ গিয়েছিল বিলাসপুরে। ফেরার পথে দেখল হাইস্কুলের মাঠে কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। একটা বড়ো তাঁবুর গায়ে সাইনবোর্ড লটকানো, শাঁখারিপাড়া যাত্রাপার্টি। পালার নাম কৃষ্ণের মথুরাযাত্রা। শাঁখারিপাড়ার অধিকারী বৃন্দাবনের সঙ্গে সাধুচরণের পরিচয় আছে। হাতে সময় থাকলে দু'দণ্ড গল্পগাছা করা যেত। কিন্তু আড়াইটে বেজে গেছে। আড়তে নীলাম্বর একা। সাধুচরণ দাঁড়ল না।

দুজন খরিদ্দার সাধুচরণের জন্য অপেক্ষা করছিল। দুজনেরই টাকা কম পড়েছে। চেনা লোক। সাধুচরণ খাতায় বাকি লিখে তাতে সই করিয়ে লোকদুটোকে বিদায় করল। নীলাম্বর বলল, খবর শুনেছ? ঘনশ্যাম ফিরে এসেছে।

সাধুচরণ ভুরু কুঁচকে তাকাল, কে বলল?

যুধিষ্ঠির। ওর সঙ্গে গতকাল দেখা হয়েছে। এখন ঘনশ্যাম শাঁখারিপাড়া যাত্রাদলে বাঁশি বাজায়। এবারে মুখুজ্যেরা জগদ্ধাত্রী পুজোয় ওদেরই বায়না দিয়েছে।

হাইস্কুলের মাঠে যাত্রাদলের তাঁবুগুলো সাধুচরণের চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর তাতেই মানুষটা কেমন যেন বদলে গেল। কর্কশ ভঙ্গীতে বলল, আমার সামনে আসার সাহস ও ছোঁড়ার হবে না। আমি না থাকতে যদি আসে তা হলে ভাগিয়ে দিবি।

নীলাম্বর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, একটা কথা বলছি সাধুদা, রাগ করো না। ঘনার আজকাল খুব নাম। ও আর সেই আগেকার ঘনা নেই। তা ছাড়া পারুলও তো.....

নীলু! ঝাঁঝিয়ে উঠল সাধুচরণ, মুখ সামলে কথা বলবি। ঘনা যদি পারুলের নখের যুগ্যিও হতো আমি ভেবে দেখতাম। তা যখন নয় তখন এসব কথা যেন আমি আর কখনও না শুনি।

নীলাম্বর কিছু বলল না।

সাধুচরণের মন অস্থির। বাঁধন দিতে গিয়ে পাকের সংখ্যা গুনতে ভুল হলো। মশলা বেশি পড়ে যাওয়ায় এক-আধটা বিড়ি এমন ফুলে উঠল যে দেখলে হাসি পায়। কোল থেকে মশলার কুলো নামিয়ে সাধুচরণ বলল, আজ তুই একাই সামলে নে নীলু। আমার জরুরি কাজ আছে।

আড়ত থেকে বেরিয়ে সাধুচরণ প্রথমে ভাবল বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু বাড়িতে পারুল আছে। এখন ও নিজের সঙ্গে থাকতে চায়। নিজের মনকে বুঝতে চায়। পারুল থাকলে সেটি হবার জো নেই। ঘুরতে ঘুরতে ও চলে গেল দামোদরের ঘাটে। হেমন্তের দামোদর বড়ো শান্ত। মাঝবিকেলের পড়ন্ত আলোয় সিঁদুরের ছোঁয়া লাগা দামোদরের ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল সাধুচরণ। ছোটো ছোটো ঢেউ সরিয়ে কখন যেন ভেসে উঠল ঘনশ্যামের মুখ। শীতের গন্ধ মাখা হাওয়ার সাম্পানে চড়ে ভেসে এল রাখালিয়া বাঁশির সুর।



একসময় ঘনশ্যামকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসত সাধুচরণ। ঘনশ্যামের যখন পাঁচ বছর বয়েস ওর মা মারা যায়। ওর বাবা শ্রীধর দাস ছিল গোপাল মন্দিরের মৃদঙ্গ বাদক। বেকার-বাউন্ডুলে মানুষ। মাঝে মাঝেই মৃদঙ্গটি গলায় ঝুলিয়ে উধাও হয়ে যেত। দু'তিন মাস পর ফিরে এসে সাধুচরণের উঠোনে গিয়ে হাঁক পাড়ত, জয় গুরু!

ঘনশ্যামের লেখাপড়ার বালাই নেই। বাবা থাকলে তবু শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে বসায়। মৃদঙ্গের ঘোলাটে চামড়ায় গাবের আঠা লাগাতে লাগাতে বলে, অ আর আ ভেন্ন জাত বাবা। আ লেখার সময় একটা বাড়তি হাত লাগে। নইলে সব একাকার হয়ে যায়। ঘনশ্যাম যত্ন করে বাড়তি হাত লাগায়। কিন্তু বাবা না থাকলে

এসব চিন্তা নেই। তখন রতন মাঝির নৌকোই ওর ঘরবাড়ি। সাতসকালে দামোদরের ঘাটে এসে রতনের জন্য বসে থাকত ঘনশ্যাম। রতনের দেখা পেলেই বলত, আমায় সমুদ্দরে নিয়ে যাবে রতনকাকা। আমি কখনও সমুদ্দুর দেখিনি।

রতন ভালোবাসত মা-মরা ছেলেটাকে। ওর মনে হতো স্বয়ং গোপাল মন্দির থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে যাওয়ার বায়না করছে। ঘনশ্যামকে নৌকোয় বসিয়ে লগি ঠেলত রতন। বহুড়িয়ায় নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বউয়ের জিম্মায় ঘনশ্যামকে রেখে বলত, সারাদিন এখানে থাকো গোপাল ঠাকুর। বৈকালে এসে তোমায় নিয়ে যাব।

রতনের বাঁজা বউ ঘনশ্যামকে স্নান করিয়ে, খাইয়ে পরিয়ে সারা দুপুর কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকত। সে খেজুরির মেয়ে। জন্ম ইস্তক সমুদ্র দেখছে। সমুদ্রের গল্পে কেটে যেত সারা দিন। বিকেলবেলায় বলত, কাল আবার আসবে তো গোপাল? কাল তোমাকে আমি আরও বড়ো সমুদ্দুরের গল্প বলব। দেখবে তার তল নেই, কূল নেই। এত বড়ো যে ভাবলে পরে পেন্নাম করতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু বড়ো সমুদ্রের গল্প আর শোনা হলো না। হঠাৎ এক সর্বনাশা জ্বরে মারা গেল রতনের বউ। পরে রতন আবার বিয়ে করেছিল। ওর সৌভাগ্য দ্বিতীয় পক্ষটি বন্ধ্যা নয়। ছেলের বাবা হবার পর রতনের পৃথিবী গেল বদলে। শূন্যতা না থাকলে শূন্যস্থান পূরণের আর কোনও দরকার থাকে না। ঘনশ্যামের কথা ও একরকম ভুলেই গেল। কিন্তু ঘনশ্যাম কী করে ভোলে! ও রতনের বাঁজা বউকেই মা বলে ডেকেছে। মা আর সমুদ্র ওর কাছে এক। সারাদিন দামোদরের ঘাটে বসে থাকত ঘনশ্যাম। রতন আগেকার মতো রোজ আসত না। রতনকে দেখতে পেলে ঘনশ্যাম দৌড়ে গিয়ে বলত, আমি মায়ের কাছে যাব কাকা। সমুদ্দুরের গল্প শুনব। রতন এটা-সেটা নানান স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রাখত ঘনশ্যামকে। কিন্তু একদিন আর পারল না। সেদিন কী কারণে যেন ওর মনটা ভালো নেই। ঘনশ্যাম বায়না করতেই রুক্ষ গলায় বলল, তোমার মা মরে গেছে বাপু! আমাকে আর জ্বালিয়ো না।

এত বড়ো শোক ঘনশ্যাম কীভাবে সহ্য করেছিল বলা মুশকিল। কিন্তু করেছিল। শ্রীধর একটা বাঁশি কিনে দিয়েছিল ছেলেকে। ধীরে ধীরে ওই বাঁশিকেই বন্ধু করে নিল ঘনশ্যাম। দামোদরের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক-একদিন ও অনেকদূর চলে যেত। ঘোলা জলে ভেসে থাকা রোদ্দুরের নানা ছাঁদের খেলাঘরের দিকে তাকিয়ে বুঁদ হয়ে থাকত সারাদিন। পথচলতি লোকজন বাঁশি শুনে থমকে দাঁড়াত। পুরস্কারও জুটে যেত মাঝে মাঝে।

এইভাবেই বড়ো হচ্ছিল ঘনশ্যাম। কিন্তু আবার বাধা পড়ল। শ্রাবণ মাসের এক সন্ধ্যেবেলায় গ্রামে ফেরার পথে সাপের কামড়ে মারা গেল শ্রীধর। ঘনশ্যাম একটুও কাঁদেনি। ভয় পায়নি। মালসা ভাঙার পর চিতার দিকে তাকানো নিষেধ। তবুও ঘনশ্যাম আড়চোখে তাকিয়েছিল। চিতার আগুন তখন ঘিরে ফেলেছে শ্রীধরকে।

ঘনশ্যামকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল সাধুচরণ। বিড়িতে যেমন বাঁধন দেয় তেমনি নরম গলায় বলল, বাবা নেই তো কী হয়েছে ঘনা! আমি তো আছি। তোর জ্যাঠা। তুই আমার কাছে থাকবি। তোর জ্যাঠাইমা খুব খুশি হবে।

পার্বতী সত্যিই খুব খুশি হলো। ওর নিজের ছেলে নেই। ঘনশ্যাম সেই অভাব পূর্ণ করল। ভাত বেড়ে দিয়ে পার্বতী ওর খাওয়া দেখে। খাওয়া শেষ হবার পর বলে, ও কী ঘনা! মাছটা তো ভালো করে খেলিই না। বলা বাহুল্য, পার্বতীর অভিযোগটি সত্যি নয়। ঘনশ্যাম পুরো মাছটাই খেয়েছে। শুধু কাঁটাগুলো পড়ে আছে! কিন্তু পার্বতীর আরেকটা মাছ দেওয়ার ইচ্ছে। ঘনশ্যামের বাবু হয়ে বসে ছোটো ছোটো আঙুল দিয়ে কাঁটা বেছে মাছ খাওয়ার দৃশ্যটি ওর বড়ো প্রিয়। রোজই দেখে, তবুও আশ মেটে না।

জ্যাঠাইমাকে পেয়ে ঘনশ্যামের জীবনে মাতৃস্নেহের উৎস আবার খুলে গিয়েছিল। আর পারুলের মধ্যে ও পেয়েছিল পরম নির্ভরযোগ্য এক বন্ধুকে। পারুলের পুতুলখেলায় ও ছেলেপুতুলের বাবা হয়। পুতুলের বিয়ের নহবতখানায় ঘনশ্যাম নিজেই বসে বাঁশি বাজাত। সেই সুর পারুলের অন্তরে বাজতে থাকে। খেলা ভুলে পারুল বলে, তুমি এত ভালো বাজাও কী করে ঘনাদা? ঘনশ্যাম বাজনা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি শিখবে পারুল? খুব সহজ, এই দ্যাখো। পারুল চেষ্টা করে। কিন্তু ওর বুকে দামোদর নেই, রতন মাঝির বাঁজা বউয়ের সমুদ্দুর নেই, মালসা ভেঙে বাবার চিতার দিকে ফিরে চাওয়া নেই—তাই বাঁশি বাজে না। চোখ ভরা জল নিয়ে পারুল বলে, আমি বাজালে ও বাজবে না ঘনাদা। বরং তুমি বাজাও আমি শুনি।

খেলতে খেলতে বড়ো হচ্ছিল দুজনে। বড়ো যত হাচ্ছিল বদলে যাচ্ছিল চোখের ভাষা। একে অপরকে বোঝার মন। সাধুচরণ দুজনকেই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। পারুল পড়াশোনায় খারাপ নয়। কিন্তু ঘনশ্যামকে স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখে কার সাধ্যি। ইংরেজি গ্রামারের দুর্বোধ্য নিয়মকানুন আর বীজগণিতের রহস্য পিছনে ফেলে ও দামোদরের পাড়ে ঘুরে বেড়ায়। স্কুল থেকে ফিরে ঘনশ্যামকে বাড়িতে না পেয়ে পারুল সোজা চলে যায় দামোদরের পাড়ে। ঘনশ্যামের নাড়িনক্ষত্র ওর জানা। ঘনশ্যাম এখন দামোদরের পাড়ে বটগাছের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বাঁশি বাজাচ্ছে। সামনে তিনজন মুগ্ধ শ্রোতা। দুটো ছাগল আর একটা গোরু। পারুল হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, তুমি কি চিরকাল গোরু-ছাগলকেই বাজনা শোনাবে ঘনাদা? কেন, তোমার বড়ো বাজিয়ে হতে ইচ্ছে করে না? বলতে বলতে চোখে জল এসে যায় পারুলের। ঘনশ্যাম অবাক হয়ে পারুলের জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর বুকের ভেতর বইতে থাকা দামোদর সমুদ্দুরের আশা ত্যাগ করে গঙ্গাকে খোঁজে। মিশে যেতে যায়। অনেকক্ষণ পর ঘনশ্যাম বলে,

আমার গঙ্গা হবে পারুল? আমি তা হলে নিশ্চিন্তে ঝাঁপ দেব। বাঁধা পড়ব তোমার কাছে। তারপর তোমার যা ইচ্ছে আমায় গড়ে নিয়ো।

ঘনশ্যাম ক্লাস টেনের গণ্ডী পেরোতে পারল না। অগত্যা সাধুচরণ ওকে আড়তের কাজে লাগিয়ে দিল। এ কাজ ঘনশ্যামের পছন্দের নয়। পারুলও বলে, তোমাকে বড়ো বাজিয়ে হতে হবে ঘনাদা। আড়তে বসে বিড়ি বাঁধা তোমার কাজ নয়। কথাটা মানে ঘনশ্যাম। আজকাল ও যাত্রাদলে বাঁশি বাজাবার স্বপ্ন দেখে। যাত্রাদলের ওস্তাদ বাঁশরিয়াদের ও দেখেছে। আসরপিছু ওরা পাঁচশো টাকা করে পায়। বাবুদের বকশিসটা উপরি। শুধু কি টাকা? ওদের কত সম্মান! কৃষ্ণযাত্রায় কিঙ্কর দাস বাঁশি বাজাবে শুনলে একবেলায় সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। এসব কথা একবার মনে পড়লে বিড়ি বাঁধায় ওর মন থাকে না। তখন সাধুচরণ ধমক দেয়, কোন দিকে তোর মন বল দিকি ঘনা! কখন থেকে ডাকছি সাড়া দিস না কেন? ঘনশ্যামের সংবিৎ ফেরে। তবে যতই ধমক দিক, সাধুচরণ জানে ঘনশ্যামই ওর উত্তরাধিকারী। ঘনার হাতেই বেঁচে থাকবে ওর কারিগরি। বাঁধনের মর্ম সাধুচরণই শিখিয়েছিল ঘনশ্যামকে। প্রথম প্রথম গেরোটা শক্ত করে ফেলত ও। ফলে বিড়ির মুখে আগুন জ্বলত ভাঁটার মতো কিন্তু ধোঁয়া নামত কম। মাত্র দুবছরের মধ্যে ঘনশ্যাম পাকের টান আর গেরোর আঁটের সম্পর্ক বুঝে নিয়েছে। এমন মায়ার বাঁধন এ তল্লাটে একমাত্র সাধুচরণই দিতে পারত, এখন ওর দোসর হয়েছে ঘনশ্যাম। খরিদ্দাররা যখন ঘনশ্যামের বাঁধা বিড়ির প্রশংসা করে সাধুচরণের মনে হয় সব কৃতিত্ব ওরই। জহুরি জহর চিনেছিল বলেই না আজ ঘনশ্যাম হিরের মতো ঝলমল করছে।

বহুমাত্রিক জীবন চিরকাল একদিকে বয় না। তার খাত বদলায়। বদলে যায় গতিধারাও। পারুল আঠারো বছরে পা দেওয়ার পর পরই সাধুচরণ মেয়ের জন্য পাত্র দেখা শুরু করল। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগে তার মতামত নেওয়ার রীতি নারানপুরে নেই। সুতরাং পারুলের মতামত কেউ নেয়নি। পারুলও ঘনশ্যামের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা সাহস করে বাড়িতে বলতে পারেনি। ভেবেছিল ঘনশ্যাম বলবে। বিড়ির বাঁধন দিতে মশগুল ঘনশ্যাম কিছু বলল না দেখে ওর প্রতি তীব্র অভিমানে পারুল মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু যেদিন শিবু ঘটক আড়তে এসে সম্ভাব্য কয়েকজন পাত্রের ছবি দেখিয়ে বলল, এদের মধ্যে তুমি যে কোনও একজনকে বেছে নিতে পারো সাধুদা। গ্যারিন্টি দিচ্ছি একেবারে রাজযোটক হবে। —সেদিন ঘনশ্যাম চাবুকের ঘা খেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শিবু আড়ত থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র ঘনশ্যাম অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সটান বলল, পারুলের জন্য তোমায় পাত্তর দেখতে হবে না জ্যাঠা। আমি পারুলকে বিয়ে করব। পারুলও তাই চায়। তুমি ওকে একবার জিজ্ঞাসা করো।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সাধুচরণ। ঘনশ্যামকে ও ভালোবাসত ঠিকই কিন্তু সে ভালোবাসা ছিল দয়া আর করুণার যোগফল মাত্র। ঘনশ্যামকে ও কোনওদিনই নিজের সমকক্ষ মনে করতে পারেনি। সুতরাং ঘনশ্যামের এমনতরো বেয়াদপিতে সাধুচরণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বলল, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব হতভাগা! বোকা মেয়েটাকে হাত করে আমার টাকাপয়সা বাগাতে এসেছ?

সেদিন কেঁদে ফেলেছিল ঘনশ্যাম। বিশ্বাস করতে পারেনি। এই কি সেই সাধুচরণ যে ওকে শ্মশান থেকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল? ক্লাস টেনের পরীক্ষায় ফেল করার পর এই মানুষটাই কি বলেছিল, ইস্কুলের পরীক্ষায় পাশ না দিতে পারলে কেউ মরে যায় না রে ঘনা। আমি ক'টা পাশ দিয়েছি? আমি কি মরে গেছি। তুই বাঁধন দিতে শেখ। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘনশ্যামের মন উথাল-পাতাল করে। বুঝতে পারে না যাকে পেয়ে ও বাবার অভাব ভুলেছিল সে কখন এমন বদলে গেল। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে ঘনশ্যাম বলেছিল, তোমার টাকা পয়সা আমি চাই না জ্যাঠা। আমি পারুলকে ভালোবাসি। ওকেই শুধু চাই বিশ্বাস করো।

সাধুচরণ বিকারগ্রস্তের মতো বলেছিল, ভালোবাসা! কাঁতায় আগুন অমন ভালোবাসার। তুই ভাবলি কী করে তোর মতো হাভাতে হাঘরের সঙ্গে আমি পারুলের বিয়ে দোব? দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে। আর কখনও যদি তোকে আমার ত্রিসীমানায় দেখি তা হলে জেনে রাখ তোর একটা হাড়ও আস্ত থাকবে না।

দামোদরের কাছে ফিরে গেল ঘনশ্যাম। বটগাছের নীচে বসে রইল অনেকক্ষণ। জীবন এত নিষ্ঠুর কেন কে জানে! যখনই ও কোনও স্বপ্ন দেখে জীবন ভেঙে দেয়। সমুদ্দুরের কাছে যেতে চাইল, হলো না। পারুল ওর গঙ্গা হবে বলেছিল, তাও হতে দিল না। গঙ্গা যদি না থাকে ঘনশ্যাম কার কাছে নতজানু হবে। কাকে বলবে, আমি খড়কুটোর মতো সামান্য। ভেসে আসি, ভেসে যাই। আমাকে তুমি ধারণ করো। আমাকে আমার সমুদ্দুরে পৌঁছে দাও।



বৃন্দাবন অধিকারীর ঘুম ভাঙতে রোজই বেশ বেলা হয়ে যায়। মাতাল-দাঁতাল মানুষ। ঘুম ভাঙার পর রাতের খোঁয়ারি কাটানোর জন্য নানারকম কসরত করতে হয়। সব সেরে বৃন্দাবন যখন তাঁবুর বাইরে এল তখন বেলা প্রায় দশটা।

ঘনশ্যাম বেরোচ্ছিল। বৃন্দাবন পিছু ডাকল, সাতসকালে কোথায় যাচ্ছিস রে ঘনা?

এই একটু গোপাল মন্দিরে যাব।

বৃন্দাবন বিশ্রীভাবে হাসল, মন্দিরে নাকি অন্য কোথাও! তোর তো শুনেছি এ গাঁয়ে একটা বাঁধা মেয়েছেলে আছে।

ঘনশ্যাম থমকে দাঁড়াল। বৃন্দাবনকে ও মোটেই পছন্দ করে না। লোকটা যেমন মাতাল তেমনই লম্পট। তবে চরিত্র জিনিসটা



যে যার ব্যক্তিগত। তাই নিয়ে ঘনশ্যাম কিছু বলতে পারে না। বলেও না। কিন্তু পারুলকে নিয়ে অসভ্যতা করলে ও ছাড়বে না। বৃন্দাবনের কাছে গিয়ে ও বলল, বাঁধা মেয়েছেলে তোমার মতো ইতরদের থাকে। আমার থাকে না। ফের যদি এরকম বাজে মশকরা করো তা হলে কিন্তু দলের অধিকারী বলে তোমাকে আমি রেয়াত করব না বৃন্দাবনদা।

বৃন্দাবন চটে গেল, আমি ইতর! এত বড়ো কথা! তুই কি জানিস আমি চাইলে এখনই তোর চাকরি খেয়ে ফেলতে পারি?

ঘনশ্যাম হাসল, খাও না! এলেমটা একবার দেখি। বলো তো আমি নিজেই ছেড়ে দিচ্ছি তোমার কাজ। আমার চাকরির অভাব হবে না বৃন্দাবনদা। তুমি বরং ভাবো ঘনশ্যাম দাসের বাঁশি না বাজলে তোমার কৃষ্ণযাত্রার দল চলবে কি না!

ইলেকট্রিকের শক খেয়ে বৃন্দাবন চুপ করে গেল। কাল রাতের তরল পদার্থ যেটুকু পাকস্থলীতে পড়ে ছিল তাও কোনও রন্ধ্রপথ খুঁজে নিয়ে তলিয়ে গেল বোধহয়। কারণ বেশ মোলায়েম স্বরে বৃন্দাবন বলল, আহা রাগ করছিস কেন! আমি তো রসিকতা করছিলাম। তোর কত নাম আমি কি জানি না? বিলেসপুরের অক্ষয় মণ্ডল যে তোর জন্য টাকার থলে হাতে বসে আছে তাও জানি। মন্দিরে যাচ্ছিলি, যা ঘুরে আয়। আজ কিন্তু আসর, সেটা মনে রাখিস বাবা।

ঘনশ্যাম অবশ্য মন্দির গেল না। দামোদরের ধারে ওর ফেলে যাওয়া বটগাছের নীচে বসল। পাঁচটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু জায়গাটা বিশেষ বদলায়নি। যে ঘাটে রতন মাঝি নৌকো লাগাত এখনও সেখানে দুটো নৌকো বাঁধা। রতনের কথা ওর খুব একটা মনে পড়ে না। কিন্তু তার বউকে ও ভোলেনি। আর ভোলেনি পারুলকে। এবার নারানপুরে আসা তো পারুলেরই জন্য। মুখুজ্যেদের বায়না পাবার পর বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করেছিল, কীরে যাবি তো? না কি মানা করে দোব? বৃন্দাবন ঘনশ্যামের সব কথাই জানে। ঘনশ্যাম না গেলে কৃষ্ণযাত্রা হবেও না। তাই তার এই প্রশ্ন। ঘনশ্যাম পাঁচ বছর ধরে এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করছে। সুতরাং ওর না যাবার প্রশ্নই উঠে না। তাই বলেছিল, যাব। তুমি ওদের জানিয়ে দাও। ঘনশ্যাম আকাশে ভগবানের দিকে তাকিয়ে হাসল। ভগবানের বিরুদ্ধে ওর কোনও অভিযোগ নেই। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। পাঁচ বছর আগে সাধুজ্যাঠা অপমান করে তাড়িয়ে না দিলে কি ও নিবারণ মাস্টারের সন্ধান পেত? আর নিবারণের মতো ওস্তাদ বাঁশরিয়া হাতে ধরে না শেখালে ও আজকের ঘনশ্যামও হতে পারত না। এখন ও আসর পিছু হাজার টাকা করে নেয়। দামি জামাকাপড় পরে। গত বছর দশ হাজার টাকা দিয়ে মোবাইল ফোন কিনেছে। না, এই ঘনশ্যামকে হাঘরে হাভাতে বলে তাড়িয়ে দেওয়া অত সহজ নয়।

আসর শুরু হবার আগেই প্যান্ডাল ভরে গেল। বৃন্দাবনের দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় চমৎকার। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে গেল ঘনশ্যাম। রাধার বিরহ আর কৃষ্ণের মথুরাযাত্রার সময় ব্রজবাসীর বুকফাটা আর্তনাদ মূর্ত হয়ে উঠল ঘনশ্যামের বাঁশিতে। পালা শেষ হবার পর মুখুজ্যেদের বড়োকর্তা সদাশিববাবু ঘনশ্যামকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ধন্য তোর

সাধনা ঘনা। আজ মা সরস্বতী স্বয়ং ভর করেছিলেন তোর ওপর।

মালতী এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে জল। ঘনশ্যাম বলল, পালা ভালো হয়েছে মালতী?

পালা আর শুনলাম কই গো ঘনাদা! শুধু তো কাইন্দলাম। যে মানুষ এমন কইর‍্যা কাইন্দায় না জানি সে নিজে কত কাইন্দে! দুঃখ একটাই। পারুলটা কাইন্দতে পারল না।

সে বুঝি আসেনি?

মালতী চোখ মুছে হাসল, সাইধ্যসাধনা কইর‍্যাও আনতে পারলাম না। মুখপুড়ি পাথরপানা মুখ কইর‍্যা বইস্যা রইল। আমি তো আর রামচন্দর নই যে পাষাণীরে অহল্যা বানাইয়া দিমু। সে তুমি পারো ঘনাদা। আর কেউ পারে না।

রাত বেশি হয়নি। সবে আটটা। ঘনশ্যাম প্যান্ডাল থেকে বেরিয়ে একটা নিমগাছের নীচে দাঁড়াল। মাথায় চিন্তার বোঝা। যে কাজ করার জন্য ও নারানপুরে এসেছে তার সময় হয়ে গেছে। ভাগ্য ওর সঙ্গে চিরকাল শঠতা করেছে। ভাগ্যের ভরসা ও করে না। ওর সম্বল পুরুষকার। জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে ওর অর্জন বলতে ওই একটাই—পুরুষকার! কাউকে কিছু না বলে ঘনশ্যাম নিঃশব্দে পাকা সড়কের দিকে এগিয়ে গেল।

পারুলের মনটা আজ ভালো নেই। মালতী তাকে অনেকবার পালাগান শুনতে যাবার কথা বলেছিল। ও যায়নি। যাবার যে ইচ্ছে ছিল না, তা নয়। কিন্তু উপায় ছিল না। ডালে কাঠি দিতে দিতে পারুল মালতীর কথাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে ফুটন্ত ডালের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, আমায় ক্ষমা করে দে। বাবা জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র বাধাত। পাহারা দেবে বলে আজ বিকেলেই আড়ত থেকে চলে এসেছে। কী করে যাই বল!

তবে পালা দেখা হয়নি বলে পারুলের কোনও দুঃখ নেই। শুধু একটিবার ঘনশ্যামকে দেখার ইচ্ছে ছিল। অনেক কষ্টে ইচ্ছেটাকে দমন করেছে পারুল। হয়তো বিয়ে করেছে। কিংবা ভালোবেসেছে কাউকে। যাত্রাদলে তো সুন্দরীর অভাব নেই। মালতী কতটুকুই—বা জানে। এই অবস্থায় পারুলকে দেখলে ঘনশ্যাম কি বিব্রত হত না? তার চেয়ে ও যেমন আছে থাক না। ওর সুখেই তো পারুলের সুখ। হঠাৎ কবেকার বাতিল এক কান্না পারুলের অস্থিমাংস ভেদ করে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ডাল পোড়ার গন্ধ পেয়েও ফিরতে পারল না।

কোথায় কতদূরে চলে গিয়েছিল পারুল কে জানে! হুঁশ ফিরল উঠোনের দরজা খোলার শব্দে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়াল পারুল। যত্ন করে জল ঢালল পোড়া ডালে। নিশ্চয় নীলাম্বর। সাধুচরণ আগে বাড়ি চলে এলে নীলাম্বরই আড়ত বন্ধ করে চাবি দিয়ে যায়। ভালো করে চোখ মুছে গলা থেকে কান্নার শেষ চিহ্নটিকে পর্যন্ত বিদায় দিয়ে বলল, নীলুকাকা এলে? দাঁড়াও আসছি।

কোনও সাড়া নেই। হাওয়ার খসখস শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। পারুল রান্নাঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থমকালো। কান্নার দাগ কি থেকে গেল কোথাও? আর একবার চোখ মুছে বলল, নীলুকাকা সাড়া দিচ্ছ না কেন?

কিছুক্ষণ পর সাড়া পাওয়া গেল, পারুল আমি ঘনশ্যাম।

পারুলের মনে হলো ও স্বপ্ন দেখছে। এ কখনও সত্যি হতে পারে না। ঘনশ্যাম এখানে কী করে আসবে! পরক্ষণেই আতঙ্কে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরোতে গিয়ে নুনের বাটি উলটে পড়ল। একটা রেকাবিতে হলুদ বেটে রেখেছিল। পা পড়ল হলুদের ওপর। পায়ে হলুদ মেখে রোয়াকে গিয়ে দেখল ঘনশ্যামই বটে। বদলায়নি, একটুও বদলায়নি মানুষটা! চোখে সেই আলো। ঠোঁটে সেই হাসি। ঘাড়ে লুটিয়ে পড়া চুলের বাহার বেড়েছে বই কমেনি। কথার পাহাড় জমে ওঠে পারুলের বুকের ভেতর। কিন্তু কথা বলবে কী—ওর দেখাই তো ফুরোয় না। যেন দেখতে দেখতে এই রাত—এই জীবন কেটে যায় তো যাক।

ভালো আছ পারুল?

নৈঃশব্দ্যের আড়ালটুকু ভেঙে পড়া মাত্র পারুলের আতঙ্ক আবার ফিরে এল। পিছন দিকে একবার তাকিয়ে সভয়ে বলল, তুমি এখানে কেন এসেছ ঘনাদা! চলে যাও। বাবা জানতে পারলে অনর্থ বাধাবে।

ঘনশ্যাম হেসে বলল, আজ আমি সাধুজ্যাঠার সঙ্গে দেখা করব বলেই এসেছি। ভয় পেয়ো না। যাও, সাধুজ্যাঠাকে ডেকে দাও।

না ঘনাদা, তা হয় না। বাবা আবার তোমাকে অপমান করবে।

SAHARA®

Air Coolers, Storage Water Heaters,
Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans,
Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :
SAHARA Electrical Appliances

D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

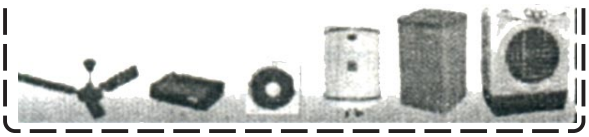

করুক। আজ আমাকে সাধুজ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। ডেকে দাও পারুল।

পারুল ওর গলা সামান্য চড়িয়ে বলল, আমি পারব না। তুমি কেন বুঝতে পারছ না, বাবার বয়েস হয়েছে। এই বয়েসে উত্তেজনা ভালো নয়। কথার পিঠে কথায় একটা বিপদ হয়ে যেতে পারে। তুমি যাও ঘনাদা।

ঘনশ্যামকে যেতে হলো না। সাধুচরণ চলে এল। —কার সঙ্গে কথা বলছিস রে পারুল? নীলাম্বর এল নাকি? ...তারপর উঠোনে ঘনশ্যামকে দেখে অবাক হয়ে বলল, তুই! তুই এখানে কী করছিস?

ঘনশ্যাম প্রণাম করার জন্য নীচু হতেই সাধুচরণ পিছিয়ে গিয়ে বলল, থাক। তোকে না আমি এ বাড়িতে ঢুকতে মানা করেছিলাম। কেন এসেছিস তুই? টাকার লোভ এখনও যায়নি বুঝি!

টাকার লোভ আমার কোনওদিন ছিল না জ্যাঠা। থাকলে তোমায় মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আগে আড়তটা দখল করতাম। ভালোবাসার জন্য গাঁ ছাড়তাম না।

সাধুচরণ কিছু বলল না। পারুল আড়চোখে দেখল বাবাকে। খুব রেগে গেলে মানুষটা হয় এরকম চুপ করে যায় নয়তো প্রচণ্ড চিৎকার করে। একবার উত্তেজনার কারণে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। যতীন ডাক্তার বলেছিল, তোর বাবার রক্তের চাপ বেশি। সাবধানে রাখবি। যেন উত্তেজিত না হয়।

ঘনশ্যাম বলল, রাগ করো না সাধুজ্যাঠা। টাকার লোভে আমি আসিনি। একটা কথা বলার জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি।

পারুল হাতজোড় করে বলল, তোমার পায়ে পড়ি ঘনাদা। তোমায় কোনও কথা বলতে হবে না। তুমি যাও এখান থেকে।

আঃ পারুল! ওকে বলতে দে। ঘনা তুই বল। সাধুচরণ বলল। পারুল বাবাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। উত্তেজনার কণামাত্র খুঁজে পেল না। যেন কোনও ভোজবাজিতে সাধুচরণ হঠাৎই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে গেছে।

আমি পারুলকে বিয়ে করতে চাই জ্যাঠা। ওকে সারা জীবন সুখে রাখার দায়িত্ব নিতে চাই।

পারুল ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। এর পরে কী ঘটবে ও অনুমান করতে পারে। কিন্তু সাধুচরণ ঘনশ্যামকে নিষ্পলক চোখে দেখতে দেখতে বলল, কিন্তু আমার মেয়ে বিধবা সেটা কি জানিস?

ঘনশ্যাম হাসল, আমি সবই জানি। বিধবা তো কী হয়েছে জ্যাঠা। ওর যদি কুষ্ঠও হত তা হলেও আমি ওকেই বিয়ে করতাম। ও পাশে না থাকলে আমার বাঁশি যে বাজে না জ্যাঠা। আর কতদিন নিজেকে মিছিমিছি ভুলিয়ে বাজাব বলো তো?

সাধুচরণ হতবাক হয়ে চেয়ে রইল ঘনশ্যামের দিকে। ছোটবেলা থেকেই ও বাঁশিঅন্ত প্রাণ! গোপাল মন্দিরের গোয়ালে বসে ও বাঁশি বাজাচ্ছে আর কমলা নামের দেশি গাই ওর গা চেটে দিয়ে আদর করছে—এ দৃশ্য সাধুচরণের নিজের দেখা। যে বাঁশির সুর গোরুবাছুরের মনও স্পর্শ করত, সে বাঁশি নাকি পারুল ওর পাশে নেই বলে বাজে না। সাধুচরণের মন হাহাকার করে উঠল। পাঁচ বছর আগে ঘনশ্যামকে নিজের থেকে অনেক নীচে রেখে ওর বিচার করেছিল সাধুচরণ। গোপাল ওর অহংকারের উচিত শাস্তি দিয়েছেন। ব্যর্থ করে দিয়েছেন ওর বাঁধনের সাধনা। মহন্ত নটবর ঠিক বলে, গোপাল কখন কার চোখ খুলে দেবেন তিনিই জানেন। তাঁর দয়া হলে অন্ধও দেখতে পায় গো সাধুদা। সাধুচরণের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ইষ্টদেবতাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলল, পারিনি, পারিনি গো গোপাল। তোমার দেখানো পথে চলতে পারিনি। তার জন্য আমাকে যত খুশি শাস্তি দাও। কিন্তু আমার মেয়েটা যেন ঘর পায়।

ঘনশ্যামকে কিছু না বলে সাধুচরণ পারুলকে বলল, তুই কী বলিস মা?

সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগে নদী যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে পারুলের মন তেমনই হয়ে উঠল। কতবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও নিজেকে প্রবোধ দিয়েছে, সে আসবে একদিন। ঠিক আসবে। কিন্তু মন শান্ত হয়নি। প্রশ্ন করেছে, এই কি আর জীবন? যে জীবনে দিন আসে দিন যায়। কিন্তু দিন বদলায় না। ঈশ্বর জানেন পারুল কোন দুর্মর আকাঙ্ক্ষায় ওর দিনবদলের কারিগরের জন্য অপেক্ষা করেছে। আজ যখন সেই সৌভাগ্য স্বয়ং উপস্থিত তখন ওর তো চঞ্চল হবারই কথা। লক্ষ লক্ষ বাঙালি মেয়ের মতো লজ্জায় মাথা নীচু করে নিঃশব্দে প্রকাশ করার কথা ওর মনোভাব। কিন্তু ও তা করতে পারল না। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অসহায় বৃদ্ধের মুখ। সে মুখ সাধুচরণের। কতদিনই-বা বাঁচবে মানুষটা! পারুল যদি না থাকে তা হলে শেষ বয়েসে সাধুচরণকে কে দেখবে? কে সেবা করবে? মরার সময় কেই-বা গঙ্গাজল দেবে? পারুলের মনে পড়ল যতীন ডাক্তারের কথা, তোর জন্যেই সাধুদা বেঁচে আছে। তুই না থাকলে বেশিদিন বাঁচবে না। পারুল অসহায়ের মতো ঘনশ্যামের মুখের দিকে তাকাল। তারপর আবাল্যের আকাঙ্ক্ষাকে দামোদরের জলে ভাসিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমি ওকে বিয়ে করতে পারব না বাবা। হিন্দু মেয়ের ক'বার বিয়ে হয়! তুমি ওকে চলে যেতে বলো।

সাধুচরণ অবাক হয়ে বলল, এসব তুই কী বলছিস মা! আজকাল কত বিধবা মেয়েই তো বিয়ে করে। এতে তো কোনও অন্যায় নেই।

আছে। সে তুমি বুঝবে না। ওকে চলে যেতে বলো বাবা। আর যেন কখনও না আসে।

পারুলের দিক থেকে বাধা আসতে পারে ঘনশ্যাম ভাবেনি। সত্যি কথা বলতে কী এই পারুল ওর অচেনা। পারুল চিরকাল ওকে ছায়া দিয়েছে। ওর বুকে বহতা দামোদর পারুলের মধ্যে পেয়েছে গঙ্গাকে। সেই ছোটবেলায় একবার সমুদ্দুর হারিয়েছিল। আজ গঙ্গাও হারিয়ে গেল। মর্মাহত ঘনশ্যাম বলল, কেন বিয়ে করবে না পারুল? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?

এতকিছুর পরেও ও কথা তোমার মনে এল ঘনাদা? তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে মাথা নীচু করে চলে যেত বোধহয়।

তোমার নাম হয়েছে তো, তাই কেউ অপমান করলেও গায়ে মাখো না।

সাধুচরণ রেগে গেল, মুখ সামলে কথা বল পারুল। আমি না হয় অবুঝ ছিলাম। তুই তো নয়। তা হলে আজ অবুঝপনা করছিস কেন?

আমার বোধবুদ্ধি সব গেছে বাবা। তোমার বুদ্ধি দিয়ে ওকে বোঝাও। আর বোঝানো শেষ হলে খেতে এসো। রাত তো আর বসে নেই।

কথাগুলো খোলামকুচির মতো দুই বিমূঢ় শ্রোতার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে পারুল ভেতরে চলে গেল।

আকস্মিক ঝড়ে ঘর ভেঙে পড়লে মানুষ যেমন কথা হারিয়ে বোবা দৃষ্টি মেলে সেই ভাঙা ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে, সাধুচরণ আর ঘনশ্যাম সেইভাবে একে অপরের দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে ঘনশ্যাম বলল, আমি এখন যাই জ্যাঠা। রাত অনেক হলো।

উত্তাল সমুদ্রে খড়কুটো হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় সাধুচরণ বলল, চলে যাবি? আর আসবি না, না?

ঘনশ্যাম কিছু বলল না। সাধুচরণের অপমান ও সহ্য করতে পারে। যশস্বী হয়ে ফিরে এসে তার জবাবও দিতে পারে। কিন্তু পারুলের প্রত্যাখ্যান ওর কাছে মৃত্যুর সমান। সাধুচরণ বলল, তুই বিশ্বাস কর ঘনা, পারুল যা বলল তা ওর মনের কথা নয়। এবারও ঘনশ্যাম কিছু বলল না। চৌকাঠ পেরোবার সময় সাধুচরণের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ কানে এল। তবুও ও পিছন ফিরে দেখল না।



সাধুচরণ ধরে নিয়েছিল ঘনশ্যাম আর কখনও ফিরবে না। পারুলেরও ঘর হবে না কোনওদিন। দুশ্চিন্তায় সাধুচরণের সারা রাত ঘুম এলো না। সকালে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। বেলা যত বাড়ল জ্বরও পাল্লা দিয়ে পাড়তে থাকল।

দুপুরে সাধুচরণ প্রায় বেহুঁশ। পারুল খবর দিল যতীন ডাক্তারকে। যতীন ডাক্তার দেখে বলল, ভালো বুঝছি না রে পারুল। বুক পিঠ সব পরিষ্কার। অথচ এত জ্বর! আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি। ডিসপেন্সারি থেকে কাউকে দিয়ে আনিয়ে নে।

যতীন ডাক্তার চলে যাওয়ার পর পারুল মালতীর জন্য অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। অন্যদিন পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে মালতী এইসময় একবার আসে। আগডুম-বাগডুম গল্প করে চলে যায়। আজ আসতে এত দেরি করছে কেন? ও এলে ওকেই ডিসপেন্সারিতে পাঠাত পারুল। দুপুরবেলায় যতীন ডাক্তার ডিসপেন্সারিতে থাকে না। কম্পাউন্ডার হারুদা থাকে। ওষুধপত্তর কারও লাগলে দিয়ে দেয়। সাধুচরণকে কাকা বলে হারুদা। সাধুকাকার অসুখ শুনলে বসিয়েও রাখবে না। কিন্তু সে মুখপুড়ি এলে তো! নির্ঘাত গোপাল মন্দিরের নতুন ভাঁড়ারির সঙ্গে বসে মশকরা করছে।

পারুল ভয়ে ভয়ে দেখল সাধুচরণকে। না, এখনও কোনও হুঁশগম্যি নেই। মাঝে মাঝে শুধু বুকের রোগা খাঁচাটা ওঠানামা করছে। অসুস্থ মানুষটাকে একলা ফেলে রেখে ডিসপেন্সারিতে যেতে সাহস পাচ্ছিল না পারুল। জ্বরের ঘোরে পাশ ফিরতে গিয়ে যদি খাট থেকে পড়ে যায়! কথাটা মনে হওয়া মাত্র পারুলের শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। মুহূর্তের জন্য মনে হল, থাক ও যাবে না। কিন্তু সময়ে ওষুধ না পড়লে তো জ্বরও কমবে না। অগত্যা আরাধ্য গোপালের হাতে সাধুচরণের রাখালির ভার সঁপে বেরিয়ে পড়ল পারুল।

দুপুরবেলায় রাস্তায় বিশেষ লোকজন নেই। মাঝে মাঝে দু' একটা সাইকেল। মুখুজ্যেদের মেজগিন্নি এক পাঁজা বাসন মেজে ঘাট থেকে ঘরে ফিরছিল। পারুলকে দেখে বলল, এই ভরদুপুরে কোথায় যাচ্ছিস পারুল?

বাবার খুব জ্বর মেজ কাকিমা। তাই যতীন কাকার ডিসপেন্সারিতে যাচ্ছি ওষুধ আনতে।

মেজগিন্নি বাঁকা হেসে বলল, অ। কাল রাতে কী হয়েছিল রে? মনে হল যেন ঘনার গলা পেলুম। ভাসুর ঠাকুর তড়বড় করে ওকে কী বলছিল?

ভয়ে পারুলের গলা শুকিয়ে গেল। এই মেয়েমানুষটাকে ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না। এর জন্যই ওর গোপাল ঠাকুরের কাছে যাওয়া বন্ধ। রাক্কুসিটা যখন জানতে পেরেছে তখন কথাটা সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হতে বেশি সময় লাগবে না। পারুল মিনমিন করে বলল, কই, কিছু হয়নি তো?

মেজগিন্নি খনখনে গলায় চিৎকার করে বলল, কিছু হয়নি বললেই কি মানতে হবে নাকি? নিজের কানে শুনেছি। তোর কাকা ঘনাকে বেরুতে দেখেছে তোদের বাড়ি থেকে। বল সব মিথ্যা!

পারুল ফ্যাকাসে মুখে বলল, সবই যখন জানো তখন আর জিজ্ঞাসা করছ কেন কাকিমা?

গাঁঘরের বেধবা হয়ে পরপুরুষের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে তোর লজ্জা করে না। তোর মতো মেয়েছেলের মুখ দেখাও পাপ। ওয়াক-থুঃ!

একদলা থুতু ছিটিয়ে মেজগিন্নি চলে গেল।

পারুল দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মতো। মাথার ওপর সূর্যদেব আগুনের হলকা ছড়াচ্ছেন। আজ একবিন্দু হাওয়া নেই কোথাও। শ্বাস নিলে আগুন উঠে আসে। অসহ্য দহনভারে ক্লান্ত পারুলের চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল। এক্ষুনি মন্দিরে গিয়ে গোপালকে বলতে ইচ্ছে করছিল, তুমি এত নিষ্ঠুর কেন গো ঠাকুর! আমি তো তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। অমন সুন্দর চোখদুটো জলে ভরে গেছে দেখেও দুটো নরম কথা বলিনি। তবুও কেন এরা আমায় দাগা দেয়? আমি কি সত্যিই একটা পাপ?



কিন্তু চিৎকার করা হলো না। মন্দিরে যাওয়া না। পারুলের মনে পড়ে গেল মুঠোয় ধরে রাখা কাগজের টুকরোটার কথা। ওকে ডিসপেন্সারিতে যেতে হবে। সাধুচরণের জন্য ওষুধ আনতে হবে।

গ্রামের পথ বড়ো স্নিগ্ধ। বড়ো ছায়াময়। সময়বিশেষে মানুষের ছায়া কম পড়তে পারে কিন্তু গাছের সে বালাই নেই। তার ছায়া কখনও ফুরোয় না। কিন্তু পারুলের আজ কারও ছায়ারই দরকার নেই। ও গ্রাম পঞ্চায়েতের ইট-বিছানো রাস্তা ছেড়ে রাসের মাঠে নামল। যুক্তিটা এই, রাস্তা ছেড়ে মাঠ দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হয়। কিন্তু আসল কথাটি অন্য। মানুষের মুখ দেখতে চায় না পারুল। নিজের মুখ কাউকে দেখাতেও চায় না। তাই এই শূন্যতার আড়াল। রাসের সময় এই মাঠে বড়ো মেলা বসে। বছরের অন্য সময় এমনি খাঁ খাঁ হয়ে পড়ে থাকে। পারুলের হাহাকার এই নিঃস্ব প্রান্তরের মতো আর কেউ বুঝতে পারবে না। রাসের মাঠ দিয়ে যেতে যেতে পারুল চাইলে ওর বুকের গভীরে মখমলের বাক্সে রাখা কান্নাকে আজ মুক্তি দিতে পারে। আকাশের দিকে আঙুল তুলে গোপালকে বলতে পারে, তুমি যদি আমার প্রতি সদয় হয়ে থাকো তা হলে তাকে বোলো আমাকে যেন কখনও ক্ষমা না করে। আমাকে যেন ঘেন্না করে। আর একটা সুন্দর মেয়ে দেখে তাকে যেন বিয়ে করে।

ডিসপেন্সারি ফাঁকাই ছিল। হারুর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে পারুল বাড়ি ফিরে দেখল মালতী দাওয়ায় বসে আছে। গম্ভীর মুখে কী যেন ভাবছে মেয়েটা। পারুল রাগ সামলাতে না পেরে বলল, কোথায় থাকিস তুই? দরকারের সময় পাওয়া যায় না।

মালতী বাচাল। তরলমতি। কিন্তু আজ ও বাচালতার ধারকাছ দিয়েও গেল না। বলল, মাথা ঠাণ্ডা কইরা বস এহানে। তরে দ্যাখতি না পাইয়া আমি ভেতরে যাইছিলাম। গিয়া দেহি সাধুকাকার জ্বর। গাডা পুইড়া যায় এমন তাপ। জ্বরের ঘোরে ভুলভাল কথা কইসে। আমি জিগাইলাম, কেমন আছ কাকা?

সাধুকাকা কইল, ঘনা এলি? আমি কইলাম, আমি মালতী। সাধুকাকা কইল, তুই মিছা কথা কইছস। আমার ওপর রাগ করছস, না?

পারুল প্রায় দৌড়ে ভেতরে গেল। মালতীর কথার ওর বিশ্বাস হয় না। ঘনশ্যামকে ও মনে মনে ভালোবাসে। কতবার ঠাট্টা করে বলেছে, কৃষ্ণের বাঁশি তো রাধিকের জন্যেই গো। মীরা আর কাইন্দাকাইটা কী করুম!

এবারও হয়তো ঘনশ্যামকে পারুলের কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য এসব বলছে।

সাধুচরণ চোখ বুজে শুয়ে ছিল। কোনও পরিবর্তন নেই। বুকের খাঁচাটা সেই আগের মতোই উঠছে নামছে—মালতীর কথা পরীক্ষা করার জন্য পারুল বলল, বাবা আমায় চিনতে পারছ? মানুষের গলা শুনে তাকে চেনার ক্ষমতা সাধুচরণের সত্যিই লোপ পেয়েছিল। এবারও বলল, ঘনা এলি? পারুল গলা তুলে বলল, না বাবা আমি পারুল। তোমার মেয়ে। সাধুচরণ জড়িয়ে-মড়িয়ে জবাব দিল, আমার ওপর রাগ করিসনি ঘনা। মেয়েটা আমার বোকা। বাঁধন চেনে না। জানে শুধু বুড়ো বাপের বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়াতে। পারুল বলতে চাইল, বাবা আমি তো তোমার জন্য—কিন্তু বলা হলো না। তার আগেই কান্নায় সব

এলোমেলো হয়ে গেল।

পারুলের কান্নার শব্দ শুনে মালতী দৌড়ে এল। ভালো করে দেখল সাধুচরণকে। না, ওই তো বুকটা ধুকপুক করছে। তার মানে আছে এখনও মানুষটা। সস্নেহে হাত রাখল পারুলের কাঁধে। বলল, এখন কাইন্নাকাটির সময় না। এখানকার কাজ সাইরা বাইরে চল। তর সাথে জরুরি কথা আছে।

সন্ধ্যে নামতে আর বেশি দেরি নেই। উঠোনের শিউলিগাছে পাখিরা কিচিরমিচির করছে। আর কিছুক্ষণ পর যে-যার বাসার দিকে পিঠটান দেবে। বাবাকে ওষুধ খাইয়ে পারুল দাওয়ায় এসে বসল। মালতী বলল, সাধুকাকা তো ঘনশ্যামরে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। তাইলে বিকারের সময় এমন ঘনা ঘনা করে ক্যান? কী হইসে আমায় হক্কল কথা খুইলা বল পারুল।

মালতীর কাছে পারুল কোনওদিনই কোনও কথা গোপন করে না। এখনও করল না। কাল রাতের সব কথা বলে গুম হয়ে বসে রইল। মালতী বলল, এর মানেডা কি বুঝছস?

কী মানে?

সাধুকাকার জ্বর সাধারণ জ্বর না। মনে আঘাত পাইসে। সেই থেইক্যা জ্বর। বাগদিপাড়ার হলু বাগদির কথা মনে নাই তর! তারও এমন জ্বর হইসিল।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে হলু বাগদির কথা পারুলের মনে ছিল না। মালতী মনে করিয়ে দিতে মনে পড়ল ঠিকই বলেছে মালতী। হলুর দশ বছরের ছেলে শঙ্করকে সাপে কেটেছিল। কথাটা শোনামাত্র হলুর তাড়স দিয়ে জ্বর। তারপর ডাক্তার-বদ্দি-হাকিম-কোবরেজ—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে কার পরামর্শে কে জানে, পাড়াইরই একটা দশ বছরের ছেলেকে হলুর ছেলে সাজিয়ে আনা হলো। সবাই বলল, এই দ্যাখ হলু, তোর ছেলে আবার ফিরে এসেছে। সেদিন থেকে ওই ছেলে হলুর বাড়িতেই থাকত। হলু ওর সঙ্গে কথা বলত। ওকে আদর করত। এইভাবে থাকতে থাকতে একদিন হলুর জ্বর ছেড়ে গেল। তারপর কীভাবে হলুকে সত্যি কথাটা বলা হয়েছিল পারুলের আজ আর মনে নেই। মালতীর হয়তো মনে থাকতে পারে।

মালতী বলল, এসব কথা যতীন ডাক্তার জানে?

না।

তর বলা উচিত ছিল। যাউক গিয়া—তরে একটা কথা কই, পারুল। ঘনশ্যাম একবার খাইড়াইলেই সাধুকাকার জ্বর সাইরা যামু।

পারুল সাপিনীর মতো ফোঁস করে উঠল, না। তাকে তুই কিছু বলবি না।

বলুম না ক্যান! যতীন ডাক্তারে সব কথা না কইয়া তুই একটা ভুল করছস। তারে কথাগুলান কইলে তিনিও ঘনশ্যামের কথা কইতেন।

পারুল গোঁ ছাড়ল না। ওর কেবলই ভয় ঘনশ্যামকে একবার ও ফেরাতে পেরেছে, দ্বিতীবার এলে আর পারবে না। ওই উদাস চাউনি গায়ে এসে পড়লে জীবন মরণ সব অবশ হয়ে যায়। মনে হয় মিছে এই ঘরদুয়ার। মিছে এই বাঁধা-না বাঁধার খেলাঘর। জীবন মানে বুঝি দিগন্ত ছুঁয়ে বয়ে চলা এক নদী। তাতে শুধু ভাসো আর ভাসাও। বাজো আর বাজাও। কিন্তু তাই বললে কী হয়। আজ পারুল আছে বলে সাধুচরণ ওষুধ পাচ্ছে, সেবা পাচ্ছে। না থাকলে কী হবে? সহসা পারুলের মনে পড়ল জ্বরের ঘোরে বলা সাধুচরণের কথাগুলো। ....মেয়েটা শুধু বুড়ো বাপের ওপর বসে দাড়ি ওপড়াতে পারে।..... পারুল এক ঝটকায় উড়িয়ে দিল কথাগুলো। বলুক বলুক বলুক। মানুষটা তো ওর বাবা। মালতীকে এসব বলে কোনও লাভ নেই। ও বুঝবে না। ও শুধু ভালোবাসা বোঝে। কর্তব্য বোঝে না। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে পারুল বলল, যতীন কাকা কী বলত না বলত আমার জানার দরকার নেই। তুই তাকে কিছু বলবি না। আর মানা করা সত্ত্বেও যদি বলিস আমি এ জন্মে তোর মুখ দেখব না।

কঠিন কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে মালতীর সময় লাগল। গোঁজ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুই আমার মাইয়াবেলার সই। তরে আমি খুউউব ভালোবাসি। তর যাতে ভালো হয় আমি সেইডাই করুম। তাতে যদি তুই এই পোড়ারমুখ না দেখিস, কী আর করুম বল। আঁচলটা চোখের ওপর একবার বুলিয়ে মালতী চলে গেল।

ঘনশ্যাম তাঁবুতে ফিরল সন্ধ্যে পার করে। আজ প্রায় সারাদিনই ও দামোদরের পাড়ে বসে থেকেছে। এ তার পুরনো খেলা। যখনই মন বেসুরে বাজে, তখনই ঘনশ্যাম দামোদরের সুরে সুর মিলিয়ে মনের বাঁশিটিকে উজিয়ে নেয়। কিন্তু আজ দামোদর পারল না। সূর্যাস্তের সময় আকাশে কনে দেখা আলো ফুটল, ঢেউয়ে ঢেউয়ে লেগে রইল গিরি মাটির রং, মাঝনদীতে নৌকাগুলো কোন সুদূরের ডাকে কে জানে—হারিয়ে গেল দিগন্ত রেখায়। কিন্তু বাঁশি বাজল না। পারুলের আঘাত ভোলাতে পারল না দামোদর।

অত বড়ো তাঁবুটা এখন প্রায় খালি। পুরুষ শিল্পীরা যে যার ঘরের ভেতর বোতল খুলে বসেছে। দলের মেয়েরাও কেউ কেউ নেশাভাং করে। আজ কোনও বায়না নেই। কালকের গান বাবুদের খুব ভালো লেগেছে বলে তারা আরেক দিনের বায়না দিয়েছেন। সেটি হবে আগামীকাল। বাড়তি একদিনের খরচ সব বাবুদের। সুতরাং কোনও চিন্তা নেই। তাঁবুতে বেশ একটা ঢিলেঢালা পরিবেশ।

বৃন্দাবন অধিকারীর এক পাত্তর চড়ানো হয়ে গেছে। তাঁবুর সামনে খোলা চত্বরে খাটিয়া পেতে বসে বৃন্দাবন দলের নীচের থাকা অভিনেত্রী বিমলার সঙ্গে গল্প করছিল। ঘনশ্যামকে দেখে বলল, কীরে ঘনা, বেড়ানো হলো?

হ্যাঁ।

ন'টার সময় খাবার আসবে। ঘুমিয়ে পড়িসনি যেন।

ঘনশ্যাম কিছু না বলে মাথা নাড়ল। বৃন্দাবনের সঙ্গে কথা বলতে ওর ভালো লাগে না। বিমলা মেয়েটাও তথৈবচ। শরীর

ছাড়া কিছু বোঝে না। তাই ও চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু বৃন্দাবন পিছু ডাকল, অ্যাই ঘনা! বিমলা তোকে নিয়ে কেমন ছড়া বানিয়েছে শুনে যা—শরীরটা আজ মারছে ঘাই, পেলেই তোকে চিবিয়ে খাই।

বিমলা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, ও মা কী মিথ্যুক! আমি কোথায় ছড়া বানালুম গো।

ঘনশ্যাম কোনও জবাব না দিয়ে চলে গেল। এখন ও একা থাকতে চায়। এসব ঘাই মারামারি ওর কাছে এখন অসহ্য।

তাঁবুর একধারে দরমা দিয়ে ঘেরা পরপর কয়েকটা ঘর। দরজাও দরমারই। তাতে শিকলের ব্যবস্থা। ওটি আটকে দিলে ভেতরে কী হচ্ছে কেউ জানতে পারবে না। ঘনশ্যামের ঘরটি একটু একটেরে। মাটিতে কম্বল বিছানো। তার ওপর চাদর পাতা। আপাতত এটাই রাজশয্যা। বাবুরা দলের ওস্তাদ বাঁশরিয়ার জন্য বাড়িতে ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খারাপ দেখায় বলে ও রাজি হয়নি।

ঘনশ্যাম শরীরটা টানটান করে শুয়ে পড়ল। কাল রাতে পারুলদের বাড়ি থেকে আসার পর থেকে ও কিছু খায়নি। ঘুমোয়নি। এমনকী ভোরবেলায় বাঁশি পর্যন্ত বাজায়নি। সব কেমন এলোমেলো। কেবল একটাই কথা মৌমাছির মতো বুকের ভেতর ভনভন করে। পারুল কেন ওকে ফিরিয়ে দিল? ও তো বলত, তুমি যেদিন বড়ো বাঁশরিয়া হবে আমি গোপাল ঠাকুরের পুজো দেব। সবাই তোমার খুব প্রশংসা করবে। খুব নাম হবে তোমার। সেদিন আমায় ভুলে যাবে না তো ঘনাদা?—ডুকরে উঠল ঘনশ্যাম। গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অভিমানে পাথর হয়ে গেল বুক। একদিন ওর জীবন থেকে সমুদ্দুর হারিয়ে গিয়েছিল, একদিন সাধুচরণ ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু ও ভেঙে পড়েনি। কারণ ও জানত পারুল আছে। পারুল থাকবে। পারুল তো ওর কাছে শুধু রক্তমাংসের নারী নয়। পারুল ওর ফেরার পৃথিবী। ওর ঘর, ওর ঘরনি। ওর দোসর। পারুলই যদি না থাকে তা হলে এত বড়ো জীবন নিয়ে ও কী করবে!

পরের দিনের আসরটিও বেশ জমে গেল। ঘনশ্যামের বাজনা বেশ ভালো হয়েছে। মেজবাবু ওর হাতে একটা পাঁচশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, তোর বাঁশি সোনার হোক ঘনা। কৃষ্ণের বৃন্দাবন থেকে মথুরা যাবার সময়—যে বাঁশি তুই বাজালি—আহা চোখে জল এসে যায় রে! মেজবাবুকে প্রণাম করে ঘনশ্যাম ধীর-মন্থর পায়ে ফিরে গেল তাঁবুতে। কাল সকালে এখান থেকে রওনা দেবে ওরা।

নিজের ঘরটিতে ফিরে ঘনশ্যাম দেখল মালতী বসে আছে। অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার মালতী! এত রাতে?

মালতী হেসে বলল, রাতেই তো অভিসার হয় গো কালাচাঁদ। দিনের বেলায় ননদির মুখনাড়া আছে, পাড়ার মানুষের অকথা-কুকথা আছে....কেমনে আসি কও দেহি।

ঘনশ্যাম মনে মনে বিরক্ত হলো। মশকরা করতে এখন ওর ভালো লাগছে না। কিন্তু কিছু বলল না। মালতীকে ও চেনে। ওর স্বভাব জানে। কিশোরীবেলা থেকেই ঘনশ্যামকে ভালোবাসে মালতী। অনেকবার বুঝিয়েছে ও। এ হয় না। হতে পারে না। মালতী এসব কথা শুনে হাসে, ঠাট্টা করে। আর যখন অসহ্য লাগে তখন বলে, আমারে এত বুঝ দাও ক্যান গো কালাচাঁদ। তোমার বুকের ভেতর যে শুধু পারুল আর পারুল হেই কথাডা আমি জানি। কিন্তু আমি যদি না-পাইয়াই সুখী হই, যদি দোর বন্ধ কইরা কাইন্দাই ভালো থাকি তাহলে তোমার কী! আমি তো তোমার কাছে থেকে কিছু চাই নাই।

আজ অবশ্য মালতী মশকরা করতে আসেনি। ঘনশ্যামকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, ঘাট হইসে গো কালাচাঁদ। এই দু'কান মলসি। আর ঠাট্টা করুম না। যে কথাডা কইতে আইসি সেইডাই কই।

অতঃপর মালতী পরশু রাতে পারুল ঘনশ্যামকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবার পর থেকে সাধুচরণের জ্বরবিকারের খবর দিল। তারপর হলু বাগদির উদাহরণ আরও একবার দিয়ে বলল, কাল সকালে তুমি একবার যাও কলাচাঁদ। সাধুকাকার লগে দুইডা কথা কও। দেখবা জ্বর ভালো হইয়া যাইব।

এতক্ষণ ঘনশ্যাম মালতীকে বাধা দেয়নি। মন দিয়ে সব কথা শুনেছে। এই প্রথম ও গম্ভীরভাবে বলল, তা হয় না মালতী। পারুল আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তারপর আমি আর যেতে পারব না।

মালতী হেসে বলল, তোমরা পুরুষরা মাইয়ামাইনষের মুখের কথাডাই শুধু শুনতে পাও। মনের কথাডা পাও না। মুখপুড়ির মনে যে অন্য কথা গো কালাচাঁদ।

কী কথা?

পারুল যদি বিহা কইরা তোমার লগে চইলা যায় তাইলে সাধুকাকারে দেখবা কেডা? বুড়ো মাইনষটারে আগলাইবে কেডা? বাপেরে ফেলতে পারেনি মুখপুড়ি তাই তোমায় ফিরায়ে দিসে।

এসব কথা পারুল তোমায় বলেছে?

হ গো। পারুলই কইসে।

ঘনশ্যাম কিছু বলল না। পাথরের মতো বসে রইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মালতী বলল, নিজেরে ছোট কইরো না কালাচাঁদ। একজন মাইনস যদি তোমার লগে দুইডা কথা কইয়া সুস্থ হয় তাহলে যাইতে আপত্তি কী! তুমি না পারুলরে ভালোবাসো। অরে বিহা করতি চাও। অ ভুল করতাসে দেইখাও তুমি অর মুখের কথা লইয়া অভিমান করবা? তোমার ক্ষমা এত ছোট ক্যান গো কালাচাঁদ? কীসের ভরসায় তোমার জন্য সারাজীবন কাইন্দব বল দেহি!

মালতীর চোখের পাতা ভিজে গেল। ঘনশ্যাম কিছু বুঝতে পারার আগেই ও উঠে দাঁড়াল। তারপর একবারও পিছন না ফিরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আর ঘনশ্যাম চেয়ে রইল খোলা দরজার দিকে। মালতী যতই বাচাল হোক, মিথ্যে কথা যে বলে না ও জানে। আর ওর সব কথা যদি সত্যিই হয় তাহলে—অস্থির হয়ে উঠল ঘনশ্যাম। পায়চারি

করতে লাগল ঘরময়। দূর থেকে ভেসে এল পারুলের কণ্ঠস্বর—কবে আর বড়ো হবে বলো দেখি ঘনাদা! তুমি আমাকে একটুও বোঝো না। পারুলের হাসির শব্দে ভরে গেল ছোট্ট ঘরখানা। ঘনশ্যাম বলল, হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারি না। তুমিও কি আমাকে বোঝো পারুল? বুঝলে কি আমায় ওই কথাগুলো বলতে পারতে?

কিছু বলল না পারুল। ঘনশ্যাম অপেক্ষা করল। যদি সে ফিরে আসে। পারুল ফিরল না। ঘনশ্যাম বলতে চাইল, যেখানে মর্যাদা নেই সেখানে আমি যাব না। কিন্তু বলতে পারল না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল মালতীর কথা। ওর চোখের হাসিভরা চাহনি থামিয়ে দিল ঘনশ্যামকে। মনে হলো, থাক। থেকে যাক। মালতী মিথ্যে কথা বলে না। যদি সত্যিই পারুলের মনে অন্য কথা থাকে।

রাত কেটে গেল অসহ্য টানাপড়েনে।

কোনও কোনও সকাল ঠিক সকালের মতো লাগে না। আজকের সকালটাও অনেকটা সেইরকম। আকাশ মেঘে মেঘে ভারী হয়ে আছে। বৃষ্টি পড়ছে মাঝে মাঝে। সূর্যদেব কোথায় মুখ লুকিয়ে বসে আছেন কেউ জানে না।

ঘনশ্যাম একটা বটগাছের নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। দূরে ম্যাটাডোরে দলের মালপত্র তোলা হচ্ছে। ছাতা মাথায় দিয়ে তদারকি করছে বৃন্দাবন। আজ ওদের এখান থেকে রওনা হবার দিন। কিন্তু ঘনশ্যাম যাবে না। একটু আগেই বলে দিয়েছে বৃন্দাবনকে। বৃন্দাবন আপত্তি করেনি। হেসে বলেছে, নিজের গাঁয়ে থাকবি এ আর বেশি কথা কী! দু'দিন চারদিন ইচ্ছে হয় থাক না। কিন্তু ফিরে আসিস বাবা। তুই না বাজালে আমাকে পথে বসতে হবে।

ম্যাটাডোরে মাল তোলা শেষ হলো। দলের কুশীলবদের জন্য অন্য গাড়ি। সবাইকে বসিয়ে বৃন্দাবন এল ঘনশ্যামের কাছে, চলি রে ঘনা। সাতদিন পর মাদুড়িয়ার বায়না আছে। ভুলে যাসনি যেন।

মেঘ ডাকছে খুব। দূরে বাজ পড়ল কোথাও। গুমগুম শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যামের কানে আছড়ে পড়ল মালতীর কথাগুলো, তোমার ক্ষমা এত ছোটো ক্যান গো কালাচাঁদ? কীসের ভরসায় তোমার জন্য সারা জীবন কাইন্দব বলো দেহি!

ঘনশ্যাম আর দাঁড়াল না। কীসের তাড়নায় বলা মুশকিল, উন্মত্তের মতো হাঁটতে লাগল বৃষ্টিতে ভেজা রাস্তা দিয়ে। যারা ওকে চেনে তারা ডাকল। ঘনশ্যাম শুনতে পেল না। যারা বাইরের লোক তারা ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ঘনশ্যাম ভ্রূক্ষেপও করল না। মালতীর কথাগুলো কানের মধ্যে নিয়ে ও পৌঁছে গেল গোপাল মন্দিরে। গোপাল ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বাঁশি বাজিয়ে নামডাক হয়েছে বলে কি বাঁশি আমার কাছে পারুলের থেকেও বড়ো হয়ে গেছে ঠাকুর? না হলে কেন পারছি না ক্ষমা করতে? আমার ক্ষমা কি সত্যিই খুব ছোটো হয়ে গেছে ঠাকুর।

গোপাল নিজে কোনও উত্তর দিলেন না। উত্তর এল নটবর দাসের গানে, তারে তুই চিনলি না রে মন / সে যে নিজে পুড়ে জ্বালায় আলো / যার বিহনে জগত কালো / থাকলি মজে কালোর সুখে / দেখলি না সেই আলোর বিচ্ছুরণ।

আনন্দে ঘনশ্যাম কেঁদে ফেলল। গিঁট খুলে দিয়েছেন গোপাল। ....সে যে নিজে পুড়ে জ্বালায় আলো / যার বিহনে জগত কালো। ....গোপালকে প্রণাম করে ঘনশ্যাম উঠে দাঁড়াল। তারপর টিনের তোরঙ্গটি সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল নটবরের ঘরের দিকে।

ঘনশ্যামকে দেখে অবাক হল না নটবর। মালতীর কাছে কাল সবই শুনেছে। ধীরেসুস্থে একতারাটি দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রেখে বলল, কী রে ঘনা তোর দল তো চলে গেছে শুনলুম, তুই যাসনি?

না মহন্তকাকা। আজকের দিনটা আমাকে থাকতে হবে।

কোনও জরুরি কাজ আছে বুঝি?

ভাবছি একবার সাধুকাকার কাছে যাব। শুনলুম খুব নাকি জ্বর।

আনন্দে ভরে গেল নটবরের মন। মালতীর কাছে সব শোনার পর গোপালের কাছে এই প্রার্থনাই করেছিল। ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনো দয়াময়। মেয়েটার সঙ্গে মিলিয়ে দাও। ছোটোবেলা থেকে দু'জনে অনেক কষ্ট করেছে। গোপাল তা হলে প্রার্থনা শুনেছেন। জয় হোক গোপালের। নটবর হেসে বলল, যা না। ঘুরে আয়। তুই গেলে পারুলও মনে বল পাবে। তা, কোথায় থাকবি কিছু ঠিক করেছিস?

মন্দিরে যদি থাকতে পাই তো খুব ভালো হয়।

সে আর কী এমন বেশি কথা। মালতী এখন ভাঁড়ারে আছে। ওকে বল সব ব্যবস্থা করে দেবে।

ঘনশ্যাম চলেই যাচ্ছিল। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলল, একটা কথা মহন্তকাকা। আপনাকে কোনওদিন পদকর্তাদের লেখা গান ছাড়া অন্য গান গাইতে শুনিনি। আজ হঠাৎ বাউলগান গাইলেন কেন?

নটবর হাসল, কেন গাইলুম জানি না রে! আমার নিজের ইচ্ছে বলে তো কিছুই নেই। ইচ্ছেও তার ইচ্ছেশক্তিও তার। হয়তো গোপালের শুনতে ইচ্ছে হয়েছিল। তাই আমাকে দিয়ে গাইয়ে নিলেন। আমি এখানে যন্ত্রমাত্র। তা, তোর বুঝি গান ভালো লাগেনি?

খুব ভালো লেগেছে মহন্তকাকা। আমার মনের সব গিঁট খুলে গেছে। এখন আমি সব সহ্য করতে পারব।

আকাশের থমথমে মুখ দেখে পারুলের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। বৃষ্টি যে খুব জোরে হচ্ছে তা নয়। কিন্তু হয়েই চলেছে, থামার কোনও নাম নেই। সেইসঙ্গে আছে ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া। পারুলের ভয় সাধুচরণকে নিয়ে। যদি একবার ঠাণ্ডা লাগে তা হলে আর রক্ষে থাকবে না।

যতীন ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। মাঝে মাঝে হুঁশ ফেরে এই যা! তখন সাধুচরণ আচ্ছন্নের মতো শুয়ে থাকে। ঘনশ্যামকে খোঁজে। বিড়বিড় করে বলে, ঘনা এলি? ফিরে আয় না বাবা। আমার মেয়েটা মোটে বাঁধতে জানে না। তুই ওকে



বাঁধন শেখা। একপাক—দুইপাক—আড়াই পাক—তারপর আলতো নরম একটা গিঁট। বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্যারুল শোনে। ওর চোখ দিয়ে জল পড়ে। কিন্তু মুখে কোনও শব্দ করে না। মাঝে মাঝে উদাস অবুঝ মন এই ঘরদুয়ার ফেলে দৌড়ে যায় ইস্কুলের মাঠে। আনাচকানাচে চোখ রেখে দেখার চেষ্টা করে ভেতরটা। খুব কি রাগ করেছে সে? খাওয়াদাওয়া করছে নাকি তাও ছেড়ে দিয়েছে অভিমানে। মৌরলার টক খেতে খুব ভালোবাসে। কালকেই তো এনেছিল শশীমাঝি, একদম তাজা মাছ মা'ঠান। নিয়ে ন্যান। ...দেখে পারুলের মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়েছিল সেই দৃশ্য। বাবু হয়ে বসে খাচ্ছে দশ বছরের ঘনশ্যাম। হাতের ভাত পুরোটা মুখ পর্যন্ত পৌঁছত না। ছড়িয়ে পড়ত থালায়। পার্বতীর ভালো লাগত এসব। পারুলের লাগে না। ও কী সৃষ্টিছাড়া খাওয়া! এখনও কি অমন করে খায়? পারুল থাকলে খাইয়ে দিত। একটাও ভাত নষ্ট হতো না। —আনাচকানাচের ভাবনায় মাঝে মাঝে এমনি করে তলিয়ে যায় পারুল। সাধুচরণের কাশির শব্দে সংবিৎ ফেরে। সাধুচরণ বিড়বিড় করে, বাঁধতে যখন শিখবি না তখন তুই মর, মর হতভাগী। অস্ফুট আর্তনাদ করে পারুল বলে, বাবা গো আশীর্বাদ করো তাই যেন হয়। তাতে তুমিও বাঁচো আর সেও বাঁচে।

ঠিকে ঝি বাটনা বেটে দিয়ে চলে গেল। পারুল বসল সাধুচরণের জন্য জিরে বাটা দিয়ে মাগুর মাছের ঝোল রাঁধতে। যতীন ডাক্তার বার বার করে বলেছে, সাধুদা ঝালমশলা দেওয়া খাবার খেতে ভালোবাসে। কিন্তু এই সময় একদম না। খেয়াল রাখবি বাবার পেটটা যেন ঠাণ্ডা থাকে। —তেল গরম হতেই মাছদুটো কড়াইতে ছেড়ে দিল পারুল। আজ শুধু গলা ভাত আর আলু-পটোল-মাগুর মাছের ঝোল। দু'দিন ভুগেই কেমন যেন হাড়-জিরজিরে রোগা হয়ে গেছে সাধুচরণ। ভাতের সঙ্গে ঘরে তৈরি ঘি খাওয়া চলবে কি না যতীন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। খুন্তি দিয়ে মাছদুটো নাড়তে নাড়তে এসব কথাই ভাবছিল পারুল। হঠাৎ সদর দরজা খোলার শব্দ শুনে ওর শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। সাধারণত এ সময় কেউ আসে না। আড়ত বন্ধ করে নীলাম্বর আসবে দুপুরবেলায়। তবে কি মালতী? পারুল গলা উঁচিয়ে হাঁক দিল, উঠোনে কে রে? মালতী নাকি?

কোনও সাড়াশব্দ নেই। পারুলের মনে হল এ নির্ঘাত মালতী। একমাত্র ওই এরকম নিঃশব্দে আসে। তারপর পিছন থেকে পারুলকে জড়িয়ে ধরে আহ্লাদ করে। তাই পারুল বেজার মুখে বলল, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না মালতি। সাড়া দিচ্ছিস না কেন?

এবার সাড়া পাওয়া গেল, মালতী নয় আমি ঘনশ্যাম।

কে?

বললাম তো, ঘনশ্যাম।

পারুলের বিশ্বাস হলো না। তাই আবার হয় নাকি! দুদিন আগেই তো মানুষটাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এত তাড়াতাড়ি রাগ পড়ে গেল! পারুল না সামলালে কোনওদিন পড়েছে? না না, এ হয় না। কিন্তু—ও তো নিজের কানেই শুনেছে। নাম বলল, ঘনশ্যাম। ওর গলা কি পারুল চেনে না? আশ্চর্য! পারুলের বুদ্ধি-বিবেচনা সব এলোমেলো হয়ে গেল। মনে হলো একবার গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু যাবে কীভাবে? কাঠের জ্বালে মাছ রান্না হয়। সব ফেলে রেখে এখন দেখতে গেলে মাছ পুড়ে-ঝুরে একশা হয়ে যাবে। —গোপাল ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি একটা কোনও রাস্তা বলে দাও। —দ্রুত হাতদুটো জড়ো করে কপালে ঠেকাল পারুল। বোধহয় কাজ হলো তাতে। কিন্তু খালি হাতে গরম কড়াইটা নামাতে গিয়ে কালশিরে পড়ল হাতে। মুখ বুজে যন্ত্রণাটুকু সহ্য করল ও। বাটির জলে হাত ডুবিয়ে আরাম পেল বটে কিন্তু তারপর হলো অন্য বিপত্তি। অন্যমনস্ক পারুল বাটির জল ফেলতে গিয়ে ঢেলে দিল উনুনের গোড়ায়। জ্বলন্ত কাঠগুলো তৎক্ষণাৎ ইস্তফা দিল কাজে। ধোঁয়া উঠল বিস্তর। জলে ভরে গেল পারুলের চোখ। ওর মনে হলো এইজন্যই সেদিন ও ঘনশ্যামকে অপমান করেছিল। যখনই আসবে মানুষটা এমনি করে ওকে বেসামাল করে দেবে। হাত ধরে নিয়ে যাবে এক আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবীতে। না, তা কিছুতেই হতে পারে না। আজ এমন শিক্ষা দেবে যা ওই মানুষটা জীবনেও ভুলতে পারবে না। উঠে দাঁড়াল পারুল। আঁচলটা কোমরে জড়াল। কোন কথার আঘাত করতে পারার ক্ষমতা কতটা যাচাই করল মনে মনে। কিন্তু হায় ঈশ্বর! ঘনশ্যামের রক্ত ঝরাতে পারে এমন কোনও কথাই ওর মনে পড়ল না। অন্তরের আলো থেকে যে আগুন ও জ্বেলেছিল তাতেও বোধকরি জল ঢেলে দিয়েছে কেউ। হতাশায় ক্ষোভে পারুল বিনা অস্ত্রেই এগিয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

ঘনশ্যাম অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পর নিজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত পারুল দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। অবাক হয়ে গেল ঘনশ্যাম। দুদিনে এ কী চেহারা হয়েছে পারুলের। বাবার জন্য দুশ্চিন্তায় ও বোধহয় খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, সাধুজ্যাঠা এখন কেমন আছে পারুল? মালতী বলছিল খুব নাকি জ্বর।

পারুল দাওয়ার খুঁটি ধরে নিস্তেজ স্বরে বলল, বাবা ভালো নেই ঘনাদা। শুধু তোমাকে খোঁজে। আমি তো কাউকে বাঁধতে পারি না। দেখো, তুমি যদি পারো।

ঘনশ্যাম কিছু বলল না। পারুলের পাশ দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

সাধুচরণ চোখ বুজে শুয়েছিল এখনও গায়ে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। ঘনশ্যাম বলল, জেগে আছ সাধুজ্যাঠা?

কথাগুলো দিগন্তপার থেকে ভেসে এল যেন। আজকাল সাধুচরণ এক আকাশ অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থাকে। একটা

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

জোনাকিরও সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই। মাঝে মাঝে শুধু দু' একটা ছায়ামূর্তি সাধুচরণের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, তোমার সময় তো হয়ে এলো সাধুচরণ। তুমি চোখ বুজলে পারুলের কী হবে ভেবে দেখেছ! ভয় পায় সাধুচরণ। অস্থির হয়ে ওঠে। চিৎকার করে বলে, পারুলের কী হবে আপনারাই বলে দ্যান ধর্মাবতার। ছায়ামূর্তিরা কোনও উত্তর দেয় না। ভাবলেশহীন ভঙ্গীতে দূরে দূরে চলে যায়। কিন্তু এইমাত্র যার গলা শুনল সাধুচরণ, সে কে? ভারী চেনা গলা। আগে কোথায় যেন শুনেছে সাধুচরণ। সে কি এই অন্ধকারের লোক, নাকি আলোর?

সাড়া না পেয়ে ঘনশ্যাম বলল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সাধুজ্যাঠা?

এবার অন্ধকার বুঝি ঝাপসা হলো খানিক। আধখোলা চোখে দেখার চেষ্টা করল সাধুচরণ। একটা পুরনো ছবি ফুটে উঠল। দশ বছরের এক বালক বসে আছে তার বাবার মৃতদেহের পাশে। চোখে একফোঁটা জল নেই। মৃত্যু কী সে তো জানে না। ক্রিয়াকর্ম শেষ হবার পর ছেলেটাকে নিজের বাড়িতে এনেছিল সাধুচরণ। —ছবি দেখতে দেখতে সাধুচরণের সব মনে পড়ে গেল। ও তো ঘনা, ঘনশ্যাম। না, আর কোনও ভুল নেই। বলল, ঘনা এলি!

হ্যাঁ সাধুজ্যাঠা। আমি ঘনা।

সাধুচরণের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, আমার মেয়েটা রাক্ষুসি হয়ে গেছে রে ঘনা। সব ছাড়খার করে দেবে, সব। তুই ওকে ক্ষমা করে দে। আমি মরে গেলে ও কোথায় যাবে বল?

ঘনশ্যাম বলল, কেঁদো না সাধুজ্যাঠা। এই তোমাকে কথা দিলাম, পারুলকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। যতই অপমান করুক আমি ওকে ধরে রাখব।

বাঁধন দিবি তো? সেই যেমন শিখিয়েছিলুম।

দোব সাধুজ্যাঠা।

বৃদ্ধের কম্পমান হাতদুটি কপালের কাছে উঠে এল, তোমার জয় হোক গোবিন্দ। এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব।

ঘনশ্যামের মনে হলো ছাদটা বুঝি হুড়মুড় করে মাথার ওপর ভেঙে পড়ল। মায়ের কথা ওর মনে পড়ে না। বাবার মুখটাও কেমন যেন ঝাপসা। থাকার মধ্যে আছে শুধু এই মানুষটা। সাধুচরণকে নিয়ে ঘনশ্যামের কত স্মৃতি। সেই স্মৃতি হয়তো সবসময় সুখের নয়। সাধুচরণের কাছ থেকে ও ছায়া যেমন পেয়েছে, ঠিক তেমনই নিঃশব্দে সহ্য করেছে অপমান। দামোদরকে প্রণাম করে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার দিনটির কথা ঘনশ্যাম আজও ভোলেনি। কিন্তু এই মনে রাখা কি অপমানের আগুনে সারাজীবন জ্বলেপুড়ে মরার জন্য? একলা রাতে চোখের জল ফেলার জন্য? সাধুচরণকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য? না। সাধুচরণ সেদিন অপমান করে ওকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে না দিলে ও কিছুতেই আজকের ঘনশ্যাম হয়ে গ্রামে ফিরতে পারত না। পারুলের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত না। যে অপমান শক্তি দেয় তাকে কি ভোলা যায়? ঘনশ্যাম অকৃতজ্ঞ নয়। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর প্রতিদিন ও গোপালকে বলত, সাধুজ্যাঠা আমাকে মন্দ দিয়ে মেরেছে ঠাকুর। আমি ভালো দিয়ে মারব। দোহাই তোমার সেই দিনটা যেন আসে। —গোপাল ওকে নিরাশ করেননি। দিন ফিরেছে। পারুলকে সাদা থানকাপড়ে ঢেকে দিয়ে সময় ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে সাধুচরণের অহংকার। সে এখন অন্য মানুষ। ক্ষমা সে শুধু করতে পারে তা নয়, নিজের ভুলের জন্য চাইতেও পারে। সত্যি এ বড়ো সুখের দিন। কিন্তু সেই সুখের দিন যদি এসেই চলে যায় তা হলে কী লাভ! কম্বলে ঢাকা সাধুচরণের পা দুটো ধরে ঘনশ্যাম বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর আনমনে বলল, তোমার ঋণের আসল আমি শোধ করতে পারব না সাধুজ্যাঠা। কিন্তু সুদটা তো দিতে দাও। সুদ না নিয়ে তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দোব না।

গোপালকে মনে মনে প্রণাম করে ঘনশ্যাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। হাতে সময়ও খুব কম।

রান্নাঘরে পারুল অপেক্ষা করছিল। ঘনশ্যাম সেখানে গিয়ে বলল, যতীন ডাক্তারের ভরসায় ফেলে রাখা উচিত হবে না পারুল, সদর হাসপাতাল থেকে বড়ো ডাক্তারকে নিয়ে আসতে হবে।

সকাল থেকে পারুলও এই কথা ভাবছে। কিন্তু সাধুচরণকে একলা রেখে ওর পক্ষে সদর হাসপাতালে যাওয়া অসম্ভব। ঘনশ্যাম আসাতে ওর বল-ভরসা দুইই বেড়েছে। তাই বলল, সে তুমি যা ভালো বোঝো—

যাবার জন্য পা বাড়িয়েও ঘনশ্যাম গেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, নিজের দিকে একটু নজর দাও পারুল। এই দু'দিন তোমার যা চেহারা হয়েছে তাতে এবার তো তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আমি ঠিক আছি। বাবাকে কেমন দেখলে?

ঘনশ্যাম ভালো দেখেনি। কিন্তু সে কথা পারুলকে বলা যায় না। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব করে ঘনশ্যাম বলল, ভালোই তো। মানুষটার ব্যারাম হয়েছে। সে তো আর সুস্থ লোকের মতো আচরণ করবে না। যাক, চলি।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে নামল ঘনশ্যাম। পারুল বলল, দুপুরে খাবে কোথায়?

মন্দিরে।

মন্দিরে! মন্দিরে কেন?

মন্দিরই তো ভালো। গোপালের প্রসাদ পাব এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।

হঠাৎই পারুলের মনে পড়ল পার্বতীর কথা। পার্বতী বলত, খিদে থাকলেও ঘনা লজ্জায় ভাত চাইতে পারে না। আমাকে ওর মুখ দেখে খিদে বুঝতে হয়। আমি যখন থাকব না তখন যে কী হবে! কেউ কি বুঝবে ওর পেট ভরল কিনা! —পার্বতীর মমতাময়ী রূপটি চোখের সামনে ভেসে ওঠা মাত্র পারুল অপ্রকৃতিস্থের মতো বলে উঠল, মন্দিরে খেলে পেট ভরবে?

ঘনশ্যাম হাসল, কেন ভরবে না! কত লোকেই তো খায়। আর তা ছাড়া উপায়ই-বা কী বলো। যেখানে খেলে পেট আর মন দুইই

ভরতো তার দরজা তো তুমি বন্ধ করে দিয়েছ।

চলে গেল ঘনশ্যাম।

সদর দরজা বন্ধ করার শব্দটা চাবুকের মতো পারুলের পিঠে এসে পড়ল। ও বলতে চেয়েছিল, দরজা যদি খুলে দিই, আসবে? এসে খেয়ে যাবে একমুঠো? —কিন্তু বলা হলো না। এই না বলতে পারার জন্য পারুলকে অনেকদিন বিবেকের কশাঘাত সহ্য করতে হবে। কাঁদতে হবে রাতের পর রাত। ক্ষমা চাইতে হবে গোপালের কাছে। অথচ ক্ষমা করবার প্রকৃত মালিক যে, সে এসবের কিছুই জানবে না।

কয়েকদিনের মধ্যেই সাধুচরণের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা গেল। বড়ো ডাক্তারবাবু গুণী লোক। ওর দেওয়া মিক্সচারের তিন দাগ খেতেই জ্বর উধাও। জ্বরের প্রকোপে সাধুচরণের চোখে যে ঘোলাটে ভাব এসেছিল, তাও কেটে গেছে। বরং ঘনশ্যাম আর পারুলকে পাশাপাশি দেখে সেই চোখ এখন ঝকঝক করছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় শরীরটা সেরে ওঠা মাত্র সাধুচরণ আবার সেই স্বপ্নটা দেখতে শুরু করেছে।

মালতী এল দুপুরবেলায়। এই ক'দিন সেও পারুলকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। সাধুচরণ সুস্থ হয়ে ওঠায় মালতীও খুব খুশি। রান্নাঘরে বন্ধুর সঙ্গে কিছুক্ষন খুনসুটি করে ও বলল, তরে আমি কইসিলাম না, এ হলো হলু বাগদির মতো ব্যাপার-স্যাপার। কালাচাঁদ একবার আইলেই সব ঠিক হইয়া যাইব। তুই কইসিলি কালাচাঁদেরে কিছু কইলে তুই আমার মুখ দেখবি না। এখন ঠিক কর আমার মুখ দেখবি না দেখবি না?

পারুল অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, আমায় মাফ করে দে মালতী। আমার ভুল হয়েছিল রে।

মাফ চাইয়া কী হইব! আসল কামটা কর দেহি।

আসল কাজ! কী আসল কাজ?

মালতী অবাক হয়ে বলল, এইডাও জানস না! কালাচাঁদেরে আঁচলের নীচে এবার বাঁইন্ধা ফেল রে মুখপুড়ি। তদের একলগে দেইখ্যা চক্ষু জুড়াই।

তোকে তো আমি সবই বলেছি মালতী। বুড়ো মানুষটাকে এখানে একলা রেখে আমি তাকে পেয়েও শান্তি পাব না।

তুই ভাবছস বিয়ের পর তোকে কালাচাঁদের লগে চইলা যাইতে হইব, তাই না?

তা তো হবেই। সব মেয়েকেই যেতে হয়।

মালতি সাদাসিধে মুখ করে বলল, অসুবিধা থাইকলে পর যাওনে কাম কী?

পারুল ভাবল মালতী ঠাট্টা করছে। রেগেমেগে বলল, সব ব্যাপারে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না মালতী।

মালতী হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, তুই একখান বলদ। বোঝলা। আস্ত একখান বলদ। সহজ কথা সহজ কইরা ভাবতে পারস না ক্যান? যাউক গিয়া। আমি এহন চইললাম গো রাধারানি। তুমি বইস্যা ভাবো।

মালতী চলে গেল। কিন্তু অনেক কাজ বাকি পড়ে থাকা সত্ত্বেও পারুল পিঁড়ি ছেড়ে উঠতে পারল না। মালতীর কথার বিন্দুবিসর্গ ওর মাথায় ঢোকেনি। কাজের প্রয়োজনে ঘনশ্যামকে এখন অন্য গ্রামে থাকতে হয়। বিয়ের পর পারুল যদি সেখানে নাই যেতে পারে তা হলে এমন বিয়ে করে লাভ কী।

সন্ধ্যেবেলায় বৃষ্টি নামল। এই সময় ঘনশ্যাম মন্দিরে থাকে। সন্ধ্যারতির পর গোপালকে বাজনা শোনায়। সাধুচরণ নিজের ঘরে বসে ঘনশ্যামের কথাই ভাবছিল। সাতদিনের ছুটিতে এখানে আছে ঘনশ্যাম। ছুটি ফুরোতে আর মোটে দু'দিন বাকি। তারপর চলে যাবে ঘনশ্যাম। সেইসঙ্গে শেষ হয়ে যাবে একটা সম্ভাবনা। কথাটা মনে পড়লেই সাধুচরণের বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। কিন্তু কী আর করা। সুস্থ হয়ে ওঠার পরও মেয়েকে বুঝিয়েছে সাধুচরণ। পারুল বোঝেনি। মেয়েটা বোঝে না। সেই এক গোঁ ধরে বসে থাকে। —তোমাকে কে দেখবে বাবা? —অসুখের আগের দিনগুলো একরকম ছিল। ইদানীং সাধুচরণ পারুলের কথাটা ফেলতে পারে না। কেবলই মনে হয় সত্যিই তো! বুড়োবয়েসে একজন আপনজন পাশে না থাকলে হয়? মৃত্যুর ভয় তার নেই। কিন্তু রোগযন্ত্রণার ভয়? নিজেরই বাড়িতে স্বজনহীন নির্বান্ধব অবস্থায় মরে পড়ে থাকবার ভয়? সেসবও তো ফেলনা নয়। দৃশ্যগুলো কল্পনা করে মনে মনে শিউরে ওঠে সাধুচরণ। মুহূর্তের জন্য মনে হয় কাজ নেই পারুলের বিয়ে দিয়ে। ও থাক, বাপের ঘরেই থাক। দেশের সব বিধবা মেয়েই কি বিয়ে করে? সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে এইসব যুক্তি সাজায় সাধুচরণ। যতক্ষণ না পারুলের থানকাপড়ের সাদা রং চোখে সয়ে আসে ততক্ষণ সাজাতে থাকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব ভেস্তে যায়। সারা জীবন আড়াই পাকের বাঁধন দেওয়া দুটো শক্ত হাত মশলার কুলো থেকে বেরিয়ে এসে ওর গলা টিপে ধরে। কী জোর লোকটার গায়ে! সাধুচরণের মাথাটা ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, বাঁধতে পারে না বলে মেয়েকে তো খুব কথা শোনাও! তুমি পারো বাঁধতে? পারলে নিজের সন্তানকে তার মাটি থেকে এরকম আলগা করে দিতে পারতে?

হাওয়ার ঝটাপটির শব্দে সাধুচরণের সংবিৎ ফিরল। বাইরে শুধু বৃষ্টি নয়, ঝড়ও হচ্ছে। ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে দেখল সাধুচরণ। ঘাড়টা এখন ব্যথায় টনটন করছে। যমদূতের মতো চেহারার লোকটা একটু আগেই এসেছিল যে। সাধুচরণের গলা টিপে দম একেবারে বের করে দিয়েছে। সাধুচরণের ভয় করছিল। যদি সে আবার আসে! খাট থেকে নেমে পা টিপে টিপে ও বাইরে গেল। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। তার মানে পারুল রান্নাঘরে আছে। নরম গলায় ডাকল সাধুচরণ, পারুল! অ পারুল! আমার কাছে একবার আসবি মা?

পারুল দৌড়ে এল, কী হয়েছে বাবা?

তোকে একটা কথা বলব বলে ডাকলুম। দ্যাখ মা, মানুষের মনের কোনও স্থৈরতা নেই। আজ ঘনার মন তোর দিকে আছে কিন্তু কালও যে থাকবে তার তো কোনও লেখাজোকা নেই।

মনকে কর্তব্যের হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া সব থেকে কঠিন কাজ। সেই কঠিন কাজ কঠিনতরো হয়ে ওঠে সাধুচরণের বাৎসল্যের বাড়াবাড়িতে। বাবার ওপর খুব অভিমান হয় পারুলের। ও কতবার ভেবেছে বলবে, ঘনাদা যখন তোমার এতই প্রিয় তা হলে পাঁচ বছর আগে ওকে গোরুছাগলের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলে কেন? যেই ওর টাকা হলো, নাম হলো অমনি ও ভালো হয়ে গেল তাই না বাবা! তুমি খুব স্বার্থপর। নিষ্ঠুর। —কিন্তু আজ অবধি বলতে পারেনি। আজও পারল না। ম্রিয়মাণ হেসে বলল, ঘনাদার মন যদি আমার দিকে না থাকে তুমি আর কী করবে। আমার কপাল তো তুমি বদলাতে পারবে না।

ঝড়বৃষ্টি থামার পর ঘনশ্যাম বেরোবার জন্য তৈরি হলো। এইসময় ও রোজ একবার সাধুচরণের বাড়িতে যায়। খোঁজখবর নেয়, জিনিসপত্তর বাড়ন্ত হলে দোকান থেকে কিনে আনে। তারপর ফিরে আসে গোপাল মন্দিরে। সাধুচরণ ওকে থাকার কথা বলেছিল। ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করেছে সাধুচরণকে। কিন্তু পারুলের অনুরোধ ফেলা ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি। দুপুরের খাওয়াটা ঘনশ্যামকে আজকাল ও বাড়িতেই সারতে হয়। রাতে অবশ্য মন্দিরের ভোগই খায়। ঘনশ্যাম খেতে ভালোবাসে বলে নটবর দাস বেশি করেই রেখে দেয়। তৃপ্তি করে খেয়ে শুয়ে পড়ে ঘনশ্যাম।

জামাকাপড় বদলে, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে, গতবার সোনাবেড়িয়ার মেলায় কেনা জুঁই ফুলের এসেন্স পাঞ্জাবিতে লাগিয়ে ঘনশ্যাম বেরোতে যাবে ঠিক এই সময় মালতী ঘরে ঢুকল। কৌতুক ভরা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ঘনশ্যামকে দেখে বলল, সাঁইঝবেলায় এমন সাইজা-গুইজা কই যাও গো কালাচাঁদ?

ঘনশ্যাম সতর্ক হলো। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে মালতী এক্ষুনি রসিকতার গঙ্গা বইয়ে দেবে। হেসে বলল, সাধুজ্যাঠার বাড়িতে যাব। রোজই এইসময় যাই। যদি কোনও জিনিসপত্তর লাগে কিনে দিয়ে আসি।

মালতী উদাস গলায় বলল, তাই কও! আমি ভাইবলাম, আবার বুঝি আমার কপাল পুড়ল।

প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য ঘনশ্যাম বলল, তা, তুমি এখন এখানে! তোমার তো এখন মন্দিরের হেঁশেলে থাকার কথা।

একডা খুব জরুরি কথা আছিল গ কালাচাঁদ। পারুলের কথা কিছু ভাবলা?

কী আর ভাবব! সাধুজ্যাঠাকে ছেড়ে পারুল কোথাও যাবে না। আর এই গ্রামে থাকার মতো আমার কোনও জায়গা নেই। তা হলে বিয়েটা হবে কী করে? ওসব কথা বাদ দাও মালতী।

মালতী ভেবেছিল ঘনশ্যাম অন্তত যুক্তিসঙ্গত ভাবে ভাবতে পারবে। তাই কিছুটা হতাশ হয়ে বলল, তোমরা দেহি যেমন দ্যাবা তেমনি দেবী! তোমার শরীলে এত সুর কিন্তু বুদ্ধি এত কম ক্যান? তুমি সাধুকাকার বাড়িতে থাইকতে পারো না? বুড়া মানুষডা আর ক'দিন। তারপর শুধু তুমি আর পারুল। ওই বাড়িতে থাইকাই তো



তুমি বড়ো হইলে। আমাদের পোড়ারমুখীকে দেইখা তোমার বাঁশি বাইজল। তা হলে এখন ওই বাড়িডার কথা তোমার মনে পড়ে না ক্যান?

ঘনশ্যাম চুপ করে রইল। সাধুচরণের বাড়িতে থাকার কথা ওর মাথায় আসেনি। এখন মালতী গিঁট খুলে দেবার পর ওর মনে হলো এর থেকে সহজ সমাধান আর কিছু হতেই পারে না। যে বাড়িতে একদিন পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ বালক আশ্রয় পেয়েছিল, সাধুচরণ আর পার্বতীর স্নেহছায়ায় নাগাল পেয়েছিল জীবনের এবং যে বাড়ির অপমান কালক্রমে হয়ে উঠেছিল তার বাঁশরিয়া হবার প্রেরণা—তাকে কি ভোলা যায়? নিভতে বসা আশার প্রদীপটি মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঘনশ্যামের মনে। কিন্তু সংশয় পুরোপুরি কাটল না। বলল, আমার কোনও আপত্তি নেই মালতী। কিন্তু পারুল কি রাজি হবে?

হইব গ গালাচাঁদ। কথাডা কইয়া তো দেখো। আর একান্তই যদি না হয়, আমার ঘরখানা আছে কীসের লগে?

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে বলল, আমার জন্য ঘরও ছাড়বে তুমি?

মালতী খিলখিল করে হেসে বলল, জীবন ছাইড়তে পারি, যৈবন ছাইড়তে পারি আর একখান ঘর ছাইড়তে পারুম না! এ তুমি কেমন কথা কও গ কালাচাঁদ?

ঘর ছেড়ে তুমি থাকবে কোথায় শুনি?

ক্যান, মহন্তকাকা তো কবে থাইকা কইসে। মন্দিরে চইলা আয় মালতী। তুই রাতে না থাইকলে তর ছেলের বড়ো কষ্ট হয়। আমার পোলা কেডা জানো তো কালাচাঁদ? গোপাল। আমি না বিহাইয়াই গোপালের মা। বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ল মালতী। তারপর হাসির আঘাতে চোখে আসা জল মুছে বলল, যাউক গিয়া। তুমি এবার রওনা দাও দেহি। জল এইবেলা থামসে। ফের শুরু হইলে আর যাইতে পারবা না।

ঘনশ্যাম আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মালতী বলতে দিল না। একরকম ঠেলেঠুলেই তাকে ঘর থেকে বের করে দিল। কিন্তু নিজে থেকে গেল ওই শূন্য ঘরে। নিজের মনে হাসল খানিক। জীবন নিয়ে কত রকমের ঠাট্টা ও করতে পারে, সে কথা ভেবে খুশিতে পাগল হলো। কিন্তু নদী যেমন বইতে বইতে সমুদ্রের নাগাল পাওয়া মাত্র সহসা অশান্ত হয়ে উঠে, ঠিক তেমনই ঘাটের উপর পড়ে থাকা ঘনশ্যামের বাঁশিটি নজরে পড়তেই ওর ঠাট্টাগুলো হঠাৎ কান্না হয়ে গেল। যে মেয়ে তামাশা না করে কথা বলে না, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। এ কান্না ও কোনওদিন কাউকে দেখাবে না। এমনকী ঘনশ্যামকেও না। ভালোবাসা ওর শক্তি। এই কান্না ওর অর্জন। জীবনের এই মহত্তম দান ভাঙিয়ে ও ভিক্ষে চাইতে পারবে না। হাত বাড়িয়ে ঘনশ্যামের বাঁশিটি তুলে নিল মালতী। বুকে জড়িয়ে আদর করল। চুমু খেল। যেন বাঁশি নিছক বাঁশি নয়, ঘনশ্যাম স্বয়ং। আদর শেষ হবার পর বাঁশির পায়ে প্রণাম করে বলল, আমি বড়ো স্বাইর্থপর গ কালাচাঁদ। যেই পারুল মুখপুড়ি বাঁইকা বইসল, আমার মন কইল এই তোর সুযোগ। যা গিয়ে গিঁট খুইলা দে। গিঁট কেমন কইরা খুইলতে হয় আমি তো জানি। দিলাম খুইলা। আমি তো শুধু এইটুকুই চাইসিলাম গ কালাচাঁদ। তুমি থাকো। গেরামে থাইকা যাও। আর আমি তোমারে দেহি। যখন ইচ্ছে দেহি। দেইখা চক্ষু জুড়াই। এ জীবনে নাই-বা পাইলাম তোমারে। নাই-বা হইল আমার ঘর। পরের জন্মে আমি পারুল হইব। আর পারুল মুখপুড়ি—বলতে বলতে হঠাৎই থেমে গেল মালতী। ওর মনে হলো পারুলকে মালতী হবার কথা বললে প্রিয় সখীকে অভিশাপ দেওয়া হয়। তাই নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, না কালাচাঁদ, আমাদের পরের জন্মে মালতী বলে কেউ থাইকব না। তুমি দেইখ্যা নিয়ো।



বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর সাধুচরণ দাওয়ায় বসে ঘনশ্যামের জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপ ধরে যায়। তুষের চাদরটা যে গায়ে জড়িয়ে বসবে, সে উপায়ও নেই। পারুল দেখতে পেলে এখনই ধরেবেঁধে ঘরে টেনে নিয়ে যাবে। ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। চার দেওয়ালের মধ্যে মেয়ের ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা গলা টিপে ধরে। তার চেয়ে এই ভালো। আজ তাকে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। দু'দিন পর ঘনশ্যাম গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। তখন কেঁদে ভাসালেও কূল মিলবে না। নিজেকে ক্রমাগত বোঝায় সাধুচরণ, দেখো বাপু তোমাকে আরও শক্ত হতে হবে। ঘনাকে পষ্টাপষ্টি জিগেস করতে হবে, তুই যদি পারুলকে ভালোবাসিস তো বিয়ে কর। পারুলের আপত্তিও আর শুনবে না সাধুচরণ। স্পষ্ট বলে দেবে, দরকার হলে মালতী আমার দেখাশোনা করবে। কিংবা নীলাম্বর থাকবে এ বাড়িতে। কিন্তু তোকে বিয়ে করতেই হবে।

জোলো হাওয়ায় বাইরে বসে আছ কেন সাধুজ্যাঠা? ঠাণ্ডা লেগে যাবে তো।

ঘনশ্যামের গলা পেয়ে সাধুচরণ চোখ খুলল। কী বলবে তা বারবার মকসো করে তার মনের জোর অনেকটাই ফিরে এসেছে। বলল, আর আমার ঠাণ্ডা লাগা! তোমরা যা আরম্ভ করেছ তাতে আমার ভালো থেকে লাভ কী?

মুহূর্তের জন্য থমকালো ঘনশ্যাম। ভাবল। ওর চোখের

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

সামনে মালতীর মুখ। তার হাসি। তার কথা, তুমি সাধুকাকার বাড়িতে থাইকতে পারো না। —কিন্তু পারুল কি রাজি হবে? ঘনশ্যামের মনে হলো ও তো শূন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। পারুল রাজি না হলেও ও শূন্যেই থেকে যাবে। নতুন করে হারাবার মতো ওর আর কিছু নেই। কিছু থাকবে না।

জলের দাগের মতো লেগে থাকা সংশয়গুলো মুছে ঘনশ্যাম বলল, বিয়ের পর আমি যদি এ বাড়িতে থেকে যাই একমাত্র তবেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু পারুল কি রাজি হবে?

সাধুচরণের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে মনে গোপালকে একটা পেন্নাম ঠুকে বলল, জয় গুরু! তুই ঠিক বলেছিস ঘনা। এটাই সবথেকে সহজ রাস্তা। জয় রাধামাধব। জয় শ্রীহরি।

কিন্তু জ্যাঠা পারুল কি রাজি হবে? উচ্ছ্বসিত সাধুচরণের রাশ টানতে ঘনশ্যাম আর একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করল।

কেন হবে না! তুই তো বাড়িরই ছেলে। বাড়িতেই থাকবি। দাঁড়া, ডাকছি ওকে। —পারুল। অ্যাই পারুল। এখানে একবার আয় দেখি—

দাওয়া থেকে রান্নাঘরের দূরত্ব সামান্যই। ঘনশ্যামের কথা পারুল শুনতে পেয়েছিল। সাধুচরণের ডাকটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল ও। কিন্তু ডাকলেই কি যাওয়া যায়? না, যায় না। প্রথমেই তো সাতরাজ্যের লজ্জা ধরে। এ তো আর ঘাটে যাওয়া নয়, ঘরে যাওয়া। নিজের ঘরে। যে ঘরে বসত করে পারুলের মনের মানুষ। সে এখনও এমন করে তাকিয়ে থাকে যে দেখে থানকাপড়ে মোড়া এই পাতাঝরা গাছের অঙ্গেও আগুন লেগে যায়। কিন্তু শুধু এইটুকুর জন্যেই কি সাধুচরণের ডাকে সাড়া না দিয়ে এই থমকে থাকা? না, তাও তো নয়। গোপাল যে সুখের দিনেও বিষাদের উৎসটিকে ভুলতে দেন না। মনে করিয়ে দেন সেই হতভাগীর কথা। পারুল উনুনের নিভু নিভু আঁচের দিকে চেয়ে থাকে। ওর মনে পড়ে সেই তামাশাপ্রিয় মুখ। সেই বেহায়া হাসি। সারাদিন আনকথার ফুলঝুরি। আর মাঝে মাঝে ডাকাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বলা, কাল রাইতে একডা স্বপ্ন দেখসি। তর বিয়া হইত্যাসে। কালাচাঁদ মাথায় টোপর পইরা তরে দেখতাসে। আর তুই পানপাতার আড়াল থেইকা তাকাইয়া আছস। তর চক্ষে কী শরম, কী শরম! দেইখা মইরা যাই আর কী! আমি কি করতাসিলাম জানস? কালাচাঁদেরে দেখতাসিলাম। মনে হইতেসিল দেখনে এত সুখ তো পাওনে কী কাম! কালাচাঁদ তর হোক রে মুখপুড়ি। আমার চাই না, যা।

খোলা উনুনে কী একটা পোকা ঝাঁপ দিতে যে আওয়াজটি হলো তাতে সংবিৎ ফিরল পারুলের। শান্ত ধীর পায়ে সে এসে দাঁড়াল দাওয়ায়।

সাধুচরণ বলল, এই যে পারুল, ঘনা কী বলল শুনেছিস?

শুনেছি।

তোর কোনও আপত্তি নেই তো?

না বাবা। আমার কোনও আপত্তি নেই। তোমরা যা ভালো বোঝো তাই করো।

হ্যাঁ মা। তাই করি। সাধুচরণ উঠে দাঁড়াল। তারপর কাউকে কিছু না বলে আচমকাই ভেতরে চলে গেল।

ঘনশ্যাম বলল, তুমি খুশি হয়েছ তো পারুল?

পারুল বলল, ও মা, এমন দিনে খুশি হব না? কী বলছ তুমি! তবে, যে তোমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছে তাকে বোলো, পারুল সারাজীবন তার কেনা হয়ে থাকবে।

সে কথা তো তুমিই তাকে বলতে পারো।

বুদ্ধি তো সে আমাকে দেয়নি। আমি কেন বলব?

ঠিক আছে বলব। এখন তবে যাই।

এসো।

ঘনশ্যাম চলে যাচ্ছিল। পারুল আবার ডাকে, শোনো, তার তো তোমাকে খুব দেখার সাধ। তা দূর থেকে দেখে লাভ কী! কাছে থেকেই যত ইচ্ছে দেখুক না। তাকে বোলো, পারুল বলেছে, তার আর একা থাকার দরকার নেই। সে যেন এ বাড়িতে এসেই থাকে।

এসব তুমি কী বলছ পারুল! তুমি পারবে ওকে মেনে নিতে?

পারুল হাসল, কেন পারব না! তোমার থেকে ওকে আমি ঢের ভালো চিনি। হতভাগীর বেহায়া হাসিটা না দেখলে আমার যে কিছু ভালো লাগে না। বোলো তাকে। বুঝিয়ে বোলো।

ঘনশ্যাম চলে গেল।

পারুল একা দাঁড়িয়ে রইল দাওয়ায়। আজকের রাতটি বেশ। মেঘ সরে যাবার পর আকাশে চমৎকার চাঁদ উঠেছে। ঝিরঝির ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সে হাওয়ায় ভেজা শিউলির সুবাস। দীর্ঘশ্বাস পড়ল পারুলের। বুকের কাছে চাপা কান্নার গুমোট। এমন আনন্দের দিনে এই কান্না কোথা থেকে আসে কে জানে। পারুল অনেক খুঁজল। কিন্তু জোড় মিলল না। অনেকটা সময় এভাবেই কেটে গেল। পারুলের মনে পড়ল রাত বাড়ছে। সাধুচরণের খাওয়ার সময় হয়েছে। রান্নাঘরে গিয়ে ভাত বাড়ল পারুল। তারপর বাবাকে ডাকতে গিয়ে দেখল সাধুচরণ পার্বতীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বিড়বিড় করে বলা সব কথা বোঝা যায় না। শুধু একটা স্পষ্ট, আমার ভুল হয়েছিল গো পার্বতী। মেয়ে আমার বাঁধতে জানে। ঘনাকে কেমন শক্ত করে বেঁধেছে বলো দেখি। আর হবে নাই-বা কেন! কার মেয়ে দেখতে হবে তো।

কথাগুলো শোনামাত্র পারুলের কান্নার উৎসটি স্পষ্ট হয়ে গেল। ও বলতে চাইল, আমার বাঁধন আমি নিজেই আলগা করে ফেলেছিলাম গো বাবা। তাতে গিঁট ছিল না। গিঁট বেঁধেছে মালতী। ওর বাঁধনে বাঁধা পড়েছি আমি আর ঘনাদা। —কিন্তু বলা হলো না। মেয়ে বাঁধতে জানে ভেবে মানুষটা আনন্দে বিভোর হয়ে আছে। থাক, আনন্দেই থাক।

পারুল বলল, ভাত বেড়েছি বাবা। খাবে চলো। □

With Best Compliments from :-

RAJKUMAR KARWA

Managing Director

SANAUTO ENGINEERS (INDIA) PVT. LTD.

Manufacturers of

ENGINEERING COMPONENTS

AEROSPACE, OIL & GAS, AUTOMOTIVE

789, Industrial Estate, Sector - 69

Faridabad - 121 004, Haryana

Tel. : 91 129-2241379 - 2240310

Website : www.sanauto.com

E-mail : info@sanauto.com



রাম সিংহ ঠাকুর

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক প্রহরী

বিজয় আঢ্য

বছরটা ১৯৬৪ কী ৬৫ হবে। সঙ্ঘের কাজের জন্য হোজাই থেকে শ্রীশিবচরণ কেজরিওয়াল যাবে বলে স্থির হয়েছিল। সেইমতো সে ঠাকুরজীর সঙ্গে শিলচরে চলেও গেল। সেদিন বিকেলের দিকে ঠাকুরজী সঙ্ঘের স্থানীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে শিবচরণের পরিচয়ও করিয়ে দিলেন। সঙ্ঘে যেমন হয় হাসি-গল্প, চা-মুড়ির সঙ্গে পরিচয় পর্বটাও হয়ে গেল। রাত তখন নটা-সাড়ে নটা হবে। শিবচরণ ঠাকুরজীর ঘরে ঢুকলো।

কী ব্যাপার শিবচরণ?

আমি কাল বাড়ি ফিরে যেতে চাই। এখানে থাকতে আমার ভালো লাগছে না।

শিবচরণের কথা শুনে ঠাকুরজী একেবারে হতবাক। মনে করা হয়েছিল শিবচরণ শিলচরে দু-আড়াই মাস থাকবে। কিন্তু একেবারে প্রথম দিনেই....

কিন্তু কেন? ঠাকুরজী জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর অনেকটা দ্বিধার সুরে শিবচরণ বলল, এখানে কী করে থাকবো? এখানকার সব লোকই তো খুব পড়াশোনা জানে। বেশিরভাগই তো বিএ, এমএ; কেউ-বা ডাক্তার, টিচার কিংবা অ্যাডভোকেট। এঁদের তুলনায় আমি তো একজন সাধারণ। এঁদেরকে দিয়ে কীভাবে আমি সঙ্ঘের কাজ করবো?

শিবচরণের কথা শুনে ঠাকুরজী একটু হাসলেন। বললেন, এতে তুমি এতো উদ্বিগ্ন বোধ করছো কেন? তোমার নিজের বিষয়ে তুমি তো মাস্টার। এইসব লোকেরা নিশ্চয়ই নিজের নিজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষ, কিন্তু সঙ্ঘের বিষয়ে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে তোমার যে ভাবনাচিন্তা, তা তো এদের নেই। এদের মধ্যে ক'জন লোক ঘরবাড়ি ছাড়বে আর তোমার মতো সমাজের কাজ করবে? ঠিক আছে, তুমি এখন বাড়ি যাও আর যদি তোমার মনে হয়, এটা ঠিক হয়নি, তখন তোমাকে আমি আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

শিবচরণ বাড়ি ফিরে এলো বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তার অনুভব হলো, ঠাকুরজীই ঠিক বলেছেন। সমাজের অনেক শিক্ষিত লোকই দেশের কথা ভাবা তো দূরে থাক, কোনও দেশাত্মবোধক গান জানেন না, এমনকী আমাদের জাতীয় সংগীত বা জাতীয় স্তোত্রও জানেন না। বস্তুত ঠাকুরজী—রাম সিং ঠাকুরজীর সান্নিধ্যে যিনি একবার এসেছেন, তিনি কখনও তাঁকে ভুলতে পারেননি। ঠাকুরজী যেন এক পরশপাথর, তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে অনেকেরই জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছে। তাঁর জীবনচর্যা, বাণী ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক স্বয়ংসেবকই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক ও কার্যকর্তা হিসাবে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং সমাজ ও জাতির সেবায় নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয় নাগপুর, কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতে কামরূপ-ই প্রধান কেন্দ্র। কামরূপের প্রবীণ সঙ্ঘ কার্যকর্তা নবকান্ত বরুয়া জানিয়েছেন, ঠাকুর রামসিংজীর অনুপ্রেরণায় ১৭ জন স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী ও দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর অনুপ্রেরণায় সঙ্ঘ আজ শুধু দেশব্যাপী নয়, বিশ্বের বহু দেশেই সক্রিয় এবং একইসঙ্গে সর্বস্পর্শীও। সেই ১৯২৫ সাল থেকে ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করার লক্ষ্যে সঙ্ঘ এমনভাবে ব্যক্তি নির্মাণের কাজ করে চলেছে যাতে সবসময়ে সমাজে সৎ, স্বাবলম্বী ও সমর্পিতপ্রাণ মানুষের অভাব না হয় এবং সমাজ ও জাতির সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে তারা সবসময় প্রস্তুত থাকেন।

শিক্ষাজীবন শেষ করে 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' ও 'বসুধৈব কুটম্বকম্'-এর লক্ষ্যে মানবজাতির সেবায় আত্মোৎসর্গ করে থাকেন। ভারত ও বিশ্বে সঙ্ঘ আজ নিজের একটা স্থান করে নিয়েছে এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

রাম সিং ঠাকুরের জন্ম ১৯১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। হিমাচল প্রদেশের (তৎকালীন পাঞ্জাব) হরিপুর জেলার জাহ্নবী নামে এক গ্রামে। বাবা ঠাকুর ভাগ সিং, মা শ্রীমতী নিহাতু দেবী। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি উচ্চ-শিক্ষার জন্য লাহোর এলেন। সালটা ১৯৩৭-৩৮ হবে। পাঞ্জাবে তখন সঙ্ঘের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। লাহোরে সঙ্ঘের শাখার একটা প্রভাবও আছে। তবে ছাত্রজীবনে হকি খেলতেই ভালবাসতেন। আর এই হকি খেলতে গিয়েই একটি চোখের দৃষ্টি তিনি হারিয়েছিলেন। হাটুতেও বেশ আঘাত পেয়েছিলেন। শাখাতে যাওয়ার ব্যাপারে তখন তেমন একটা উৎসাহ ছিল না। একদিন এক তরুণ স্বয়ংসেবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। সেই স্বয়ংসেবকটিই রামসিংজীকে শাখায় যেতে উৎসাহিত করলো। সেই তরুণ স্বয়ংসেবকটি হলেন বলরাজ মাধোক যিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি হয়েছিলেন। রামসিংজী নিজেই সে সময়কার স্মৃতিচারণ করেছেন। ''আমাদের কলেজের হকি টিমের খেলোয়াড় হিসেবে আমার একটা সুনাম ছিল। বলরাজও ভালো খেলতে পারতেন। কোনও সংগঠনের কাজ তখন তেমন ভালো লাগতো না। কলেজে পড়ার সময় কংগ্রেস কমিউনিস্ট আর রাজপুত সভার কাজকর্ম দেখেছি। এরা সবাই চাঁদা তুলে গোলমাল বাধায়। তাই বলরাজ যখন সঙ্ঘের কথা বলল, তখন উৎসাহ দেখাইনি। বরং বক্তৃতা, বিতর্ক, ইতিহাস চর্চা—এসবই ভালো লাগতো। কিন্তু বলরাজজী আমার পিছু ছাড়েননি।'' কিছুদিন শাখায় যাওয়ার পর রামসিংজীরও শাখায় যাওয়ার ইচ্ছাটা ক্রমেই বেশ বাড়তে লাগল। এরপর ১৯৪৫-তে মধ্যপ্রদেশের খণ্ডোয়াতে তিনি যখন সঙ্ঘের শিক্ষা বর্গে গেলেন (সেসময় সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গকে OTC বা অফিসার্স ট্রেনিং ক্যাম্প বলা হতো), সেখানে সঙ্ঘের শিক্ষায় এতটাই প্রভাবিত হলেন যে স্থির করলেন সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে স্বদেশ ও স্বরাষ্ট্রের জন্য আত্মোৎসর্গ করবেন।

১৯৪২ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ সি কলেজ থেকে ইতিহাস বিষয় নিয়ে এম. এ পাশ করলেন এবং তা স্বর্ণপদক নিয়ে। তাঁর ফলাফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ এতটাই মুগ্ধ হলেন যে তাকে তারা ওই কলেজেরই 'লেকচারার' পদের চাকরিতে যোগ দিতে বললেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি তো মন স্থিরই করে ফেলেছিলেন সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে আত্মোৎসর্গ করবেন। আর সেটাই তিনি করলেন। সারা দেশ জুড়ে তখন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন চলছে। দেশের জন্য কিছু করার একটা ভাবনা যুবসমাজে মধ্যে কম-বেশি জেগেছে। এরকম এক সময়ে তাঁর প্রচারক জীবনের যাত্রা শুরু হলো কাংড়া জেলা প্রচারক হিসাবে। তিনি একা নন, ওই সময় পাঞ্জাব থেকে ৫৮ জন স্বয়ংসেবকও প্রচারক হলেন। তাঁর গ্রুপে যে দশজন প্রচারক ছিলেন তার মধ্যে বলরাজ মধোক, ভাই মহাবীর, গঙ্গা বিষ্ণু প্রমুখ ছিলেন। সবাই কমপক্ষে দুবছর সময় দিয়েছিলেন। তাই বাড়ি ফিরে যাবেন বলে ভেবেছিলেন। মাধবরাওজী মূলে তখন পাঞ্জাবের দায়িত্বে। বাড়ি ফেরার কথা জানিয়ে তার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, কথাটা তাকে আগে বলেননি কেন? মাধবরাওজী তাকে লুধিয়ানাতে নিয়ে গেলেন। লুধিয়ানা শাখাতে মাধবরাওজীর এক বৌদ্ধিক ছিল। আর সেই বৌদ্ধিক শুনে ভাবনাচিন্তাটাও পালটে গেল। তাকে এবার অমৃতসর বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে যেসব হিন্দু, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু শ্রেণীর মানুষরা ভারতে চলে আসছিল, সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর পথনির্দেশে তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে অন্যান্য স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে তিনিও নেমে পড়েছিলেন। দেশভাগের পর লাহোরের প্রান্ত কার্যালয় তখন জলন্ধরে স্থানান্তরিত হয়েছে। জলন্ধর থেকেই তখন এই ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ চলছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে আসা লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

শ্রীগুরুজী এবার রামসিংজীকে কলকাতায় ডেকে পাঠালেন। সালটা ১৯৪৯। এ বছরেরই ১৪ জুন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উপর থেকে ভারত সরকার নিঃশর্তে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তাই সারা দেশ পরিভ্রমণের জন্য শ্রীগুরুজী একটি কর্মসূচি নিয়েছেন। সেইমতো কলকাতাতেও একটা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। অসম থেকে ওই বৈঠকে ১৮ জন কার্যকর্তা যোগ দিয়েছিলেন। সেই বৈঠকে শ্রীগুরুজী ঘোষণা করেন, কলকাতাকে কেন্দ্র করে পূর্বাঞ্চলের (বাঙ্গলা, অসম ও ওড়িশা) সংযোজক হিসেবে কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন শ্রী একনাথ রানাডে—পরবর্তীকালে কন্যাকুমারীতে সমুদ্রের উপর ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিমন্দির নির্মাণের কাজে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রান্ত প্রচারক হিসাবে শ্রী বাবুরাও পালধিকর যাবেন ওড়িশাতে আর শ্রী অমল কুমার বসু দেখবেন পশ্চিমবঙ্গের কাজ। শ্রী রাম সিং ঠাকুর যাবেন অসমে। রাম সিংজীর সঙ্গে যাবেন শ্রী গঙ্গারাওজী মণিপুরের জন্য আর শ্রী গণেশ দেবশর্মা যাবেন ত্রিপুরা। সেই ১৯৪৯ থেকে ১৯৭২ সঙ্ঘের কাজে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হওয়া পর্যন্ত মোট ২২ বছর রামসিংজী পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন।

রাম সিংজী যখন পূর্বাঞ্চলের দায়িত্ব নিয়ে গুয়াহাটিতে এলেন, তখন দেশভাগের ক্ষত দগদগ করছে। আর 'সঙ্ঘ গান্ধীজীকে হত্যা করেছে'—এরকম এক মিথ্যা অপপ্রচারের শিকার সাধারণ মানুষ। ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশ, বিভিন্ন

জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত আলাদা আলাদা অঞ্চল, দুশোরও বেশি বিভিন্ন ভাষা ও স্থানীয় কথ্য ভাষা, বন্য জন্তু ও জংলি দস্যুদের উপদ্রব—সব মিলিয়ে পূর্বাঞ্চলের পুরো পরিবেশটাই দুর্বিষহ। অসমে সঙ্ঘ কাজের তখন নিতান্ত শিশু অবস্থা। গুয়াহাটি প্রবাসী রাজস্থানের এক স্বয়ংসেবক কেশবদেব বাবরি অসমে সঙ্ঘের শাখা শুরু করার জন্য দিল্লির সঙ্ঘকার্যকর্তাদের কাছে এক চিঠি লিখেছিলেন। সময়টা দেশভাগের আগের বছর ১৯৪৬। এর কিছুদিন পর নাগপুরের দাদারাও পরমার্থ, শ্রীকৃষ্ণ পরাঞ্জপে আর মনোহর গুজ্জরকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি থেকে এসেছিলেন বসন্তরাও ওক । ২৮ অক্টোবর, ১৯৪৬-এ গুয়াহাটির ফ্যান্সিবাজারে অসমে সঙ্ঘের শাখা প্রথম শুরু হলো। এরপর সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে অসমের (পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চল) প্রথম প্রান্ত প্রচারক হিসেবে রামসিংজী এসেছিলেন। আর ঠিক তার পরের বছরই ১৯৫০-এ মহারাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন শ্রী মধুকররাও লিময়ে যিনি বহুবছর রামসিংজীর সহকারী হিসাবে অসমের সহ-প্রান্ত প্রচারক ছিলেন। সেই সময় অসমে অন্যান্য প্রচারকদের মধ্যে ছিলেন শ্রী মনোহর গুজ্জর, শ্রী বসন্ত ফড়নবীস, শ্রী মাধব মেহেঁদলে আর ত্রিপুরায় গণেশ দেবশর্মা। ত্রিপুরা, মণিপুর, অরুণাচল-সহ পুরো পূর্বাঞ্চল নিয়েই তখন সঙ্ঘের অসম প্রান্ত।

অসমে কাজ শুরু করার সময়েই রাম সিংজীকে বেশ কয়েকটি বাধার মুখোমুখি হতে হলো। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা কয়েক লক্ষ হিন্দু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের সমস্যা তো ছিলই, এরই সঙ্গে গোদের উপর বিষ ফোড়ার মতো জুড়লো ভূমিকম্প (১৫.০৮.১৯৫০) আর ব্রহ্মপুত্রের বন্যা। এই দুই প্রাকৃতিক বিপর্যয় কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল। রাম সিংজীর উদ্যোগে গঠিত হলো ভূকম্প পীড়িত সহায়তা সমিতি। ডিব্রুগড়ের কয়েকজন স্বয়ংসেবক যখন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হচ্ছিলেন, তখন দৈবদুর্বিপাকে নৌকা উলটে গেল। কোনও রকমে অন্যরা বাঁচলেও হনুমান সিংহানিয়া নামে একজন স্বয়ংসেবকের মৃত্যু হলো। ডিব্রুগড়ে হনুমান সিংহানিয়ার নামে এখন একটি বড়ো রাস্তা আছে। পাশাপাশি অন্ন, বস্ত্র, ওষুধ ও অর্থ সংগ্রহ করে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শরণার্থীদেরও সেবাকাজ চলছিল। এইরকম এক বিপর্যয়ের সময়ে শ্রীগুরুজী অসমের স্বয়ংসেবকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এটাই শ্রীগুরুজীর প্রথম অসম সফর।

এইসব ধাক্কা সামলিয়ে রামসিংজী এবার সঙ্ঘের শাখা বিস্তারে মন দিলেন। সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞার আগে যেসব স্বয়ংসেবকরা এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করলেন। এদের মধ্যে গুয়াহাটির কেশবদেব বাবরি, শঙ্করলাল শর্মা, প্রফুল্ল বোরা, ডিব্রুগড়ের শ্যামল বাগচী, শিলচরের কবীন্দ্র পুরকায়স্থ প্রমুখের কথা বলতে হয়। অসমের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে গুয়াহাটির প্রতিষ্ঠিত বরুয়া পরিবারের শ্রী কামাক্ষ্যা রাম বরুয়ার কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি মণিপুর আদালতের অবসরপ্রাপ্ত

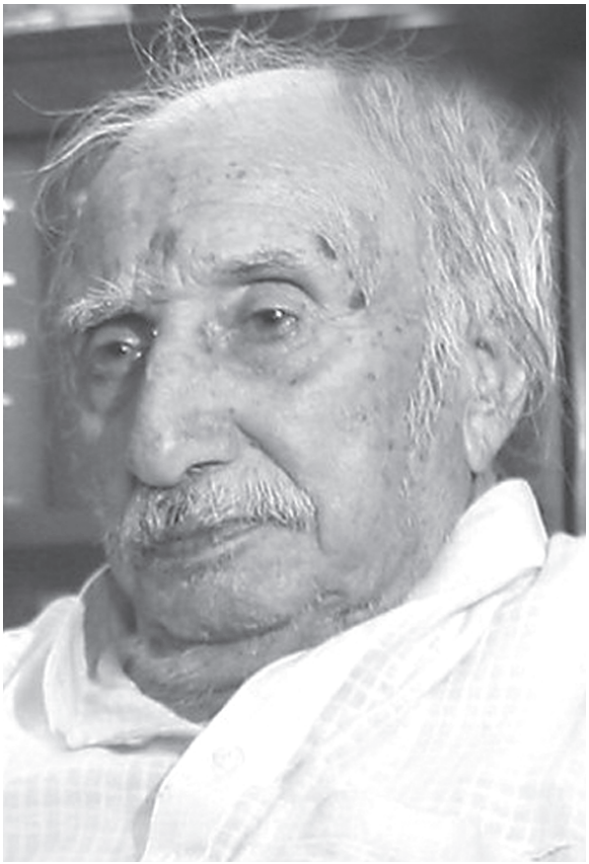

বলরাজ মাধোক

বিচারপতি ছিলেন। নিজের গাড়িতে রামসিংজীকে সঙ্গে নিয়ে প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক করেন। তখন অপপ্রচারের ফলে সঙ্ঘ গান্ধীজীকে হত্যা করেছে—এই ভ্রান্ত ধারণাটা এতটাই প্রচারিত ছিল যে একজন স্বয়ংসেবকের অভিভাবক মধুকরজীর (লিময়ে) মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেছিল—'I do not want to talk with you. You please go out'. ওই ভদ্রলোক পরে তার এক বন্ধুকে বলেছিলেন, 'যে সঙ্ঘের লোক গান্ধীজীকে হত্যা করেছে, তাদের একজন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে মনে হলো এখন আমার কী হবে?'

রামসিংজীর ব্যক্তিত্ব ছিল আকর্ষণীয়। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ, চোখে-মুখে একটা গোলাপি লালচে আভা। দূর থেকে দেখলে তাকে একজন সেনা অফিসার মনে হতো। কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর। সারাটা দিনই ছিল তার কর্মব্যস্ততায় ভরা। ভোর তিনটেয় উঠতেন। নিজের শরীরচর্চা সেরে যেতেন প্রভাত শাখায়। শাখার পর স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও জলযোগ, নতুন সম্পর্ক ও চিঠি লেখা এবং এরই অবসরে পড়াশোনা। এত ব্যস্ততার মধ্যেও ছোটো ছোটো কাজগুলোও তিনি যত্নের সঙ্গে করতেন। ঘরের বিছানা বা অন্যান্য জিনিসগুলো থাকতো পরিপাটি করে সাজানো।

অসমে পৌঁছাবার মাস তিনেকের মধ্যে গুয়াহাটি শহরে

পানবাজার, উজানবাজার টোকোবাড়ির মতো কয়েকটি এলাকায় শাখা হয়ে গিয়েছিল শুধু নয় শিলং, শিলচর, ডিব্রুগড়, তেজপুর প্রভৃতি শহরেও সঙ্ঘের কাজ বিস্তার লাভ করেছিল। রামসিংজী সংগঠনের বিস্তারের জন্য নিরন্তর পরিভ্রমণ করতেন। পূর্বে গুয়াহাটি থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরের ডিব্রুগড় আর পশ্চিমে ধুবড়ী থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরের মেঘালয় পর্যন্ত একটা মোটর সাইকেল চেপে বছরের পর বছর সংগঠনের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। মানুষের হৃদয় জয় করার জন্য তিনি 'Man to man contact and heart to heart talk'-এ বিশ্বাস করতেন।

অসমীয় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও তিনি সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। যেমন শ্রীকমলাক্ষ্য রাম বড়ুয়া, পণ্ডিত তীর্থনাথ শর্মা, সুরেন্দ্রনাথ শর্মা প্রমুখ। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাঁর এই সম্পর্ক। প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও অসমে সঙ্ঘের কজের সহায়ক একটা ভিত্তি র্নিমাণই ছিল তার লক্ষ্য। পরবর্তীকালে তাদেরই কেউ কেউ সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিদ্যাভারতীর মতো সংগঠনের গুরুদায়িত্ব সামলেছেন।

একবার মধুকরজীকে সঙ্গে নিয়ে রামসিংজী নওগাঁ থেকে গুয়াহাটি ফিরছিলেন। আর এই ফেরার পথেই মোটর সাইকেলটা এক দুর্ঘটনার শিকার হলো। এতে রামসিংজী বেশ গুরুতরভাবেই আহত হলেন। তার পায়ে দু'জায়গায় আঘাত বেশ বড়সড়। কোনও রকমে একটা ট্রাকে চেপে তাঁরা গুয়াহাটিতে পৌঁছালেন। হাসপাতালে ভর্তি হলেন। পায়ে অপারেশন হবে। কিন্তু শেষসময় হাসপাতালে anaesthetic drugs ছিল না। বিস্ময়ের বিষয় হলো, রামসিংজী তার ব্যাগ থেকে একটা বই বের করলেন এবং সার্জেন্টকে অপারেশন শুরু করার অনুরোধ জানালেন। ২০ মিনিট পর যখন অপারেশন শেষ হলো তখন তিনি বই থেকে চোখ সরালেন। তাঁর এই সহ্য শক্তি ও একাগ্রতা দেখে ডাক্তারবাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

এইসময় গোহত্যা নিরোধ সমিতির মাধ্যমে গোহত্যা বন্ধের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সঙ্ঘ এই গোরক্ষা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল। অসমেও এই আন্দোলনের সমর্থনে জনসভা, শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে জনসম্পর্ক ও সই সংগ্রহের অভিযানও চলছিল। গুয়াহাটিতে গোহত্যা বন্ধের সমর্থনে যে বিশাল শোভাযাত্রা হয়েছিল তাতে নাগা পাহাড় থেকেও এসে মানুষেরা যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় ওই সমকালে ১৯৫৬তে শ্রীগুরুজীর ৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনসম্পর্ক ও 'শ্রদ্ধানিধি' অর্থাৎ অর্থসংগ্রহের কার্যক্রমও চলছিল। আর ওই বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নওগাঁতে অসম প্রান্তের প্রথম তিনদিনের শিবির হলো। শ্রীগুরুজী ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। শিবিরের জন্য সেনাকর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুরানো তাঁবু নিলামে কিনেছিলেন। আর নিজে সামনে থেকে দাঁড়িয়ে তাঁবু কীভাবে খাটাতে হয় তা স্বয়ংসেবকদের শিখিয়েছিলেন। কামাখ্যা পাহাড়ে দৌড়ে ওঠা, ব্রহ্মপুত্র নদী সাঁতরে পার হওয়া, প্রয়োজনে লাঠি হাতে নিয়ে দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করা—তিনি নিজে করে স্বয়ংসেবকদেরও শেখাতেন। সেসময় সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে যোগ দেওয়ার জন্য অসমের স্বয়ংসেবকদের বাঙ্গলা বা বিহারে যেতে হতো। তখন ব্রহ্মপুত্র ও ফরাক্কায় গঙ্গানদীর উপর সেতু ছিল না। তাই স্টিমারে করেই নদী পারাপার করতে হতো। তখন মাঝেমধ্যেই সমাজ বিরোধীরা হামলা করতো। রামসিংজীকে বেশ কয়েকবার এইসব দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করতে হয়েছে।

অসমে অসমীয়ভাষী ও বঙ্গভাষী হিন্দুদের মধ্যে ঐতিহাসিক কারণে ভাষা নিয়ে বিরোধ ছিল। ১৯৬০ সালে অসম সরকার অসমীয় ভাষাকে রাজ্য ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে আইন পাশ করে। অসমের বঙ্গভাষীরা এই আইনের বিরোধিতা করবে এটা স্বাভাবিকই ছিল। সভা, মিছিল, ধরনা, সত্যাগ্রহ তো ছিলই, কোনও কোনও স্থানে এই আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠছিল। শিলচরে বাংলাভাষা রক্ষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত হলেন। সেই সময় সঙ্ঘের কাজ যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা ছিল না। সঙ্ঘের কাছে তখন শুধু একটা মোটর সাইকেল। রামসিংজী সেই মোটর সাইকেলকে বাহন করে পুরো প্রদেশেই পরিভ্রমণ করলেন। অসমীয় ও বঙ্গভাষী হিন্দুদের মধ্যে যাতে সৌহার্দ্য বজায় থাকে তার জন্য স্বয়ংসেবকদের আহ্বান জানালেন। অসমকে মুসলিমবহুল প্রদেশে পরিণত করার জন্যই যে এই বিভেদমূলক ষড়যন্ত্র তা সমাজকে বোঝাবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করলেন। শেষ পর্যন্ত অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বঙ্গভাষাকে রাজ্য ভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে এই ভাষা আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

২০ অক্টোবর, ১৯৬২ রেডিয়োতে চীন ভারত আক্রমণ করেছে— এই খবর ঘোষণা হতেই একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হলো। সেসময় অরুণাচলের তাওয়াং, বোমডিলা পেরিয়ে অসমের তেজপুরের কাছে ফুটহিলস পর্যন্ত চীনা সেনা পৌঁছে গেছিল। অরুণাচল, ভুটান, তেজপুর থেকে শত শত মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে অসমের ভিতরের দিকে চলে আসছিল। তেজপুর শহর প্রায় জনশূন্য। মধুকরজীকে সঙ্গে নিয়ে রামসিংজী অসমের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সাহসের সঙ্গে নিজেদের স্থানেই সবাইকে থাকবার জন্য বললেন। তেজপুরে কানুরাম ডেকা নামে এক স্বয়ংসেবক স্থানীয় যুবকদের আহ্বান করে নিজেদের ক্ষেত্র রক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

রামসিংজী নিজেও যেমন সাহসী ছিলেন, অন্যরাও তেমন সাহসী হোক---এটা তিনি চাইতেন। একদিন রাতে এক স্বয়ংসেবককে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসার জন্য বললে সে ইতস্তত করতে লাগল। রামসিংজী স্বয়ংসেবকটির মনের ভাব বুঝে তাকে একটা দা দিয়ে বললেন, যদি কেউ রাস্তায় তোমাকে মারতে আসে তবে এই দা দিয়েই তাকে কেটে ফেলবে। শাখাতেও আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের খেলা খেলিয়ে স্বয়ংসেবকদের সংঘর্ষ

করার ক্ষমতা বাড়াতেন।

কোনও এক কার্যক্রমে ঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য একজন স্বয়ংসেবককে কামাখ্যা পাহাড় থেকে দৌড়ে নীচে আসতে বলেছিলেন। স্বয়ংসেবকটি তার হাটুর ব্যথার কথা জানালে রামসিংজী শাখার ঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ার কথাটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। খুব রাগ হলেও স্বয়ংসেবকটি দৌড়েই নীচে নেমে এলেন। শাখা থেকে তাড়াতাড়ি কার্যালয়ে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাতের বেলায় তিনি দেখলেন রামসিংজী তার হাটুতে হলুদের প্রলেপ দিয়ে সেক দিচ্ছেন। সংস্কৃতে এক সুভাষিতে বলা হয়েছে 'বজ্রদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি'। রামসিংজী যেন এই সুভাষিতের জাগ্রত প্রতিরূপ।



গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী

সঙ্ঘের কার্যকর্তার সব বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা উচিত, এটা তিনি মনে করতেন। সঙ্ঘের একজন জেলাস্তরের প্রচারক গণিতের বিদ্যার্থী হয়েও হিসাব কীভাবে রাখতে হয় তা জানতেন না। নওগাঁর বিভাগ প্রচারক মধুকর লিময়ে তখন পারিবারিক কোনও কাজে মুম্বাই গিয়েছেন। তাই তৎকালীন নওগাঁ জেলা প্রচারকের উপর বিভাগের গুরুদক্ষিণার হিসাব রাখার দায়িত্ব পড়েছে। একদিন রামসিংজী এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে হিসাবের দুটি খাতা এনে তিনি সামনে রাখলেন। এ অনেকটা কাউকে ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার মতো ব্যাপার হলো। তাই রামসিংজী একটু হাসলেন। আর হিসাব কীভাবে রাখতে হয় তা বুঝিয়ে দিলেন।

অসমে আসার পর রামসিংজীকে অনেক বাধাবিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ১৯৫২-তে শ্রীগুরুজী অসম পরিভ্রমণে আসবেন। কমিউনিস্টরা তখন কালো পতাকা দেখানোর পরিকল্পনা করেছিল। আর সেটা জেনেই তিনি গণবেশধারী ১৫/২০ জন স্বয়ংসেবককে গুয়াহাটি বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এইসব দেখে সেখানে কমিউনিস্টরা কালো পতাকা নিয়ে বিরোধিতা করতে সাহস করেনি। ডিব্রুগড়েও সমাজবাদী পার্টি শ্রীগুরুজীর কার্যক্রমে বিরোধিতা করবে ভেবেছিল। রামসিংজী অন্য কার্যকর্তাদের সঙ্গে পুলিশকেও সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, বিক্ষোভকারীরা যতক্ষণ কার্যক্রম স্থানের বাইরে থাকবে, ততক্ষণ কিছুই করা হবে না। কিন্তু সভাস্থলের সীমার ভেতরে ঢুকলেই স্বয়ংসেবকরা লাঠি চালাবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা হয়নি, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে সঙ্ঘ বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে একজন শ্রোতা হিসাবে রামসিংজীও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী এক বক্তা তাঁর বিষয়টি বলতে গিয়ে বললেন—Hindu Rashtra is a bogus concept. Who says this India is Hindu Rashtra? রামসিংজী সভাপতির অনুমতি নিয়ে বক্তার ওই দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, তিনি নিজে ইতিহাসের ছাত্র এবং সেইসঙ্গে অনেক উদাহরণ দিয়ে ভারতবর্ষ যে হিন্দুরাষ্ট্র তা প্রতিপন্ন করলেন। পরের দিন অসমীয় ভাষার দুজন সাহিত্যিক গুয়াহাটি কার্যালয়ে এসে রামসিংজীর প্রশংসা করে গেলেন।

১৯৫৬ সালে অসমের এক বিশিষ্ট লেখক অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকে লিখেছিলেন যে সঙ্ঘ গান্ধীজীকে হত্যা করেছে। নাথুরাম গডসে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। এটা দেখে রামসিংজী গুয়াহাটির বিশিষ্ট উকিল শ্রীজয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ওই পাঠ্যপুস্তকের লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রকের কাছে এই মিথ্যা তথ্য দেওয়ার জন্য ওই উকিলের চিঠি গেল এবং বলা হলো যে তারা যেন এই মিথ্যা তথ্য প্রকাশের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করে পুস্তকে প্রকাশিত তথ্যের সংশোধন করেন। কিছুদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে চিঠি চালাচালি চলল। কিন্তু লেখক ক্ষমা চাইতে রাজি হলেন না। শেষপর্যন্ত তাদের এক সপ্তাহ সময় দিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে বলা হলো, অন্যথা বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাওয়া হবে জানানো হলো। উকিলের এই হুমকি পেয়ে লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রক ক্ষমা চেয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন বলেও জানালেন। পরবর্তীকালে এইসব পত্রগুলিকে নিয়ে 'Truth Triumphs' নামে এক পুস্তিকা শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত হয়েছিল।

সত্যি কথা বলতে কী, অসমে সঙ্ঘের কাজের প্রতিষ্ঠা রামসিংজীর হাত ধরেই হয়েছিল। ১৫ থেকে ২৫ বছরের এমন কিছু যুবকদের তিনি বেছেছিলেন, যারা পরে অসমে সঙ্ঘের কাজের রক্ষা ও বিস্তারে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। গুয়াহাটির কটন কলেজের ছাত্র গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী ওই কলেজেরই ছাত্রাবাসে থাকতেন। বাল্যকাল থেকেই স্বয়ংসেবক। 'পহেলে দর্শনধারী' বলে যে কথাটা চালু আছে, দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ লালচে আভার গাত্রবর্ণের মানুষটিকে প্রথম দেখেই গৌরীশঙ্কর অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। ছাত্রাবাসে মাঝে মাঝে রামসিংজী তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তিনি এসে আস্তে দরজায় টোকা মারতেন। দরজা খুললে তিনি যখন দেখতেন সে পড়াশোনা করছে কিংবা সূর্যনমস্কার করছে তখন তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। সে ভেবে পেত না এরকম স্তরের একজন মানুষ কেন একজন সামান্য স্বয়ংসেবকের সঙ্গে

দেখা করতে আসেন। গৌরীশঙ্করদা জানিয়েছেন, পরে অনুভব করেছি, মাঝপথে কেউ যাতে আদর্শচ্যুত না হয়ে পড়ে, তারজন্যই তার এই নিরন্তর সম্পর্ক।

''কখনও কখনও তিনি গৌরীশঙ্করদা ও তার কলেজের বন্ধুদের গুয়াহাটি শহরের সামান্য দূরে ডাকতেন। সেখানে তাদেরই বয়সি সব ছাত্র ও কয়েকজন কার্যকর্তাও আসতেন। কোনও কার্যক্রমের জন্য জায়গাটা পরিষ্কার করতে ঘণ্টা কয়েক সময় বেশ উৎসাহ আর আনন্দের সঙ্গেই কেটে যেত। আসলে এই ধরনের কার্যক্রম ছিল স্বয়ংসেবক নির্মাণের একটা অঙ্গ।

গরমের ছুটির সময় মাঝে মাঝে উঝানবাজারে সঙ্ঘের কার্যালয় 'ধীরেশ্বর কুটির'-এ গিয়ে রাত্রিবাস করতাম, সকালে উঠে দেখতাম তার ঘর পরিষ্কার, স্নান ও শরীরচর্চা সারা হয়ে গেছে, শাখায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ঘটনা হলো সবার শোওয়ার পর তিনি শুতে যেতেন এবং সবার আগে উঠতেন। সারাদিন তিনি কোনও না কোনও কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কখনও লেকচার বা উপদেশ দিতেন না যে এটা করা উচিত। 'আপনি আচরি' নীতি মেনেই তিনি স্বয়ংসেবকদের মোড় ঘুরিয়ে দিতেন।

১৯৬৯-তে গুয়াহাটিতে সঙ্ঘের এক শিবিরের জন্য প্রস্তুতি চলছে। একদিন রাতে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে শিবিরের প্রস্তুতিতে হাত লাগাতে গেলাম। গিয়ে অবাক! দেখি রামসিংজী কয়েকজন প্রবীণ প্রচারককে সঙ্গে নিয়ে প্যান্ডেল তৈরির জন্য গর্ত করছেন। কোনও সন্দেহ নেই, তিনি অনুশাসনের ব্যাপারে বেশ কঠোর ছিলেন। কেউ অনুশাসন ভঙ্গ করলে তিনি সহ্য করতেন না। যখন তিনি কাজ করতেন, তখন তিনি 'হার্ড টাস্কমাস্টার' (Hard taskmaster)। অথচ অন্যসময়ে বেশ সহজ সরল, সামাজিক ও এক নিপাট ভদ্রলোক।"

শুধু দেশব্যাপী নয়, সঙ্ঘের কাজ সর্বস্পর্শী হোক—এই লক্ষ্য নিয়ে ১৯৫০ সালের পর সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে সংগঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। ভারতীয় জনসঙ্ঘের কাজ শুরু হলেও অসমে তা শুরু হয়েছে কয়েকবছর পর। যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া না গেলে কাজ শুরু করা ঠিক হবে না বলে মনে করতেন। ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৬৩ সালে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও নানাজী দেশমুখ অসমে এসেছিলেন। রামসিংজীর সঙ্গে আলোচনার পরই অসমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজের জন্য নাগপুর থেকে ভালচন্দ্র দেশপাণ্ডে ও দেবদাস আপ্তে এসেছিলেন। রামসিংজীর দূরদৃষ্টি যে কত সুদূর প্রসারী ছিল বর্তমান (১৯২১) অসমের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হবে।

প্রায় একই সময়ে (১৯৬৪) অসমে গুয়াহাটির প্রাগজ্যোতিষপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত তীর্থনাথ শর্মার সভাপতিত্বে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজ শুরু হয়। রামসিংজীর যোজনা মতো কয়েকজন পূর্ণকালীন কার্যকর্তাও পরিষদের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালে শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতে পরিষদের উদ্যোগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে অসমের সত্রাধিকারীরা ছাড়াও সকল গোষ্ঠী ও জনজাতির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। রামসিংজীর কার্যকালেই অসমে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, বিদ্যাভারতী, কল্যাণ আশ্রম, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল, সংস্কার ভারতী, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, ইতিহাস সংকলন সমিতি-র কাজ শুরু হয়েছিল। অসমীয় ভাষায় সাপ্তাহিক 'আলোক' পত্রিকা শুরু হয় ১৯৬০-এ। অসমকে যে দ্বিতীয় কাশ্মীর তৈরির ষড়যন্ত্র হচ্ছে, অসম-সহ দেশবাসীকে 'আলোক' নিরন্তর সচেতন করে এসেছে। বস্তুত জাতীয় স্বার্থের সব বিষয় নিয়েই আলোক ছিল বরাবর সোচ্চার, ঠিক যেমন পশ্চিমবঙ্গে স্বস্তিকা পত্রিকা নিরন্তর করে চলেছে।

রামসিংজীর সাংগঠনিক দক্ষতার পাশাপাশি তার ইতিহাস চেতনাও ছিল আকষর্ণের আর এক বিন্দু। তিনি যে ইতিহাসের ছাত্র এটা সবাই জানতেন। তিনি শুধু ইতিহাসের বিষয়ে তাত্ত্বিক ছিলেন না, যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানকার বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন। যদিও তিনি ইতিহাস বিষয়ে খুব বেশি কিছু লেখেননি, কিন্তু তাঁর ভাষণ শুনলে বোঝা যেত ইতিহাস বিষয়ে তার পড়াশোনা কত গভীর। 'Partition of the country has given a new kind of threat to our national integrity and sovereignty' বিষয়ে তা তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ তাঁর ইতিহাস বোধে সাক্ষ্য।

'হঁস কে লিয়ে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান' যে নিছক একটা স্লোগান নয়, পরিকল্পিতভাবে ভারতে যে পূর্বপাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটছে, তা তারই বাস্তবায়ন। তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের 'সেন্সাস কমিশনার অফ অসম'-এর রিপোর্ট তুলে ধরেছিলেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রকৃত ইতিহাস জানতেও তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। অসমের ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে সুযোগ পেলেই তিনি ঘুরে এসেছেন। মুসলমান আক্রমণকারী বক্তিয়ার খিলজির কবরস্থান তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে ও বাঙ্গলা জয় করে বক্তিয়ার যখন তিব্বত ও চীন এবং সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকাকে ইসলামীকরণের লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছিল, তখনই উত্তর গুয়াহাটিতে রাজা পৃথুর কাছে বাধা পায় এবং পরাজিত ও নিহত হয়। অসমের অনেকেই এই বিষয়টা তেমনভাবে জানেন না। গুয়াহাটির পানবাজারের কাছে তিনি সেই স্থানটি নির্দেশ করেছিলেন যেখানে লাচিৎ বরফুকন তাঁর সেনাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। এভাবেই তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান ও পুনরায় অনুসন্ধান করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

অনেক সময় তিনি এমন সব ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করতেন যা ব্রিটিশদের লেখা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তিনি বলতেন যে গেরিলা যুদ্ধ প্রথম অসমেই ঘটেছিল। ইসলাম ১৭



রাম সিংহ ঠাকুরের স্মরণসভা।

বার যুদ্ধ করেও অসমে প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু একবার জয়লাভ করে তৎকালীন অহমের রাজধানী (Gargaon)-তে পৌঁছানোর পথ প্রশস্ত করেছিল। সরাইঘাটের যুদ্ধে মোগল সেনা পরাজিত হয়েছিল আর একারণে ভুটান, নেপাল, তিব্বতে ও চীনে ইসলাম প্রবেশ করতে পারেনি। একমাত্র অসমেই প্রত্যেক লোকই যুদ্ধের সময়ে এক একজন সৈনিক হয়ে যেত। তাদের পদবিগুলিই যথা, পাইক, গাট, বোরা, শইকিয়া, হাজারিকা তার প্রমাণ। প্রতিটি পদবিই সেনার এক একটি এককের প্রতীক।

রামসিংজীর কাছে ইতিহাস, বিশেষত স্থানীয় ইতিহাস ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস লেখার জন্য তিনি অনেক যুবককেই উদ্বুদ্ধ করেছেন। কলকাতায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ (MAKAIAS)-এর বর্তমান চেয়ারম্যান ড. সুজিত কুমার ঘোষ নিজেই জানিয়েছেন ১৯৭০ সালে রামসিংজীই তাকে প্রথম উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস (Ethnographic History) নিয়ে গবেষণা করতে বলেছিলেন। দক্ষিণ অসম নিয়ে গবেষণা করার সময় তিনি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "If you forget history, history will forget you." এই ছিল তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী।

রামসিংজী যে একজন ইতিহাসের ছাত্র তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজে ইতিহাস লেখেননি। বরং তাঁর শৈশব থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যা করে গিয়েছেন, সেটাই ইতিহাসে লেখা থাকবে। অন্যভাবে বলতে গেলে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

সঙ্ঘের প্রচারক জীবনে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোনও স্থান নেই। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মতোই প্রচারকের জীবন। বাঁশীর মতোই নিজের বংশ-পরিচয়াদি বিস্মৃত হয়ে সবরকমের কষ্ট সহ্য করে সঙ্ঘের ইচ্ছাকেই ইচ্ছা বলে স্বীকার করে নেওয়া। দীর্ঘ ২২ বছর অসমে থাকার পর ১৯৭১ সালে তাকে পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত করা হয়। দেওয়া হলো অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার (ABISY) দায়িত্ব। প্রথমে দিল্লির প্রান্ত প্রচারক, পরে সঙ্ঘের উত্তর ক্ষেত্রের সহ-ক্ষেত্র প্রচারক এবং ১৯৮৪ সালে ইতিহাস সংকলন যোজনার কাজের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হলো। এতদিন যে কাজটা কোনও পদাধিকারী না হয়েই করছিলেন। ১৯৯১ সালে সেই ইতিহাস সংকলন যোজনার সভাপতির দায়িত্ব তাকে দেওয়া হলো। অবশ্য স্বাস্থ্যের কারণে তিনি বেশিদিন এই দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। ২০০২ সালে এই দায়িত্ব থেকে তিনি মুক্ত হন। তবে ইতিহাস চর্চা তাঁর থেমে থাকেনি।

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ইতিহাস পুনর্লিখন হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হিমাচল প্রদেশের নেরি(হমীরপুর)-তে ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন। ইতিহাস সংকলনের কাজেই তিনি

এরপর কয়েকবার অসমে এসেছেন। যেখানে যেখানে গিয়েছেন, পুরানো স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন। এই বয়সেও কারও সাহায্য না নিয়ে নিজের কাজ নিজেই করতে পারতেন। এমনকী দাঁড়িয়ে ঘণ্টাভর ভাষণও দিতেন। একবার এক অনুষ্ঠানে তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে সঞ্চালক একটু বেশি সময় নেওয়াতে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, এত বিস্তৃত করে বলার কিছু নেই। নিজের পরিচয় শুধু 'স্বয়ংসেবক' হিসাবেই দিতে তিনি বেশি পছন্দ করেন। রামসিংজীকে প্রথম দেখি ১৯৬৫-তে, বর্ধমানে সঙ্ঘের দ্বিতীয়বর্ষ শিক্ষা গ্রহণের সময়। এরপর দেখি আশির দশকের প্রথম দিকে শ্রীরামপুরে। তখন হুগলী জেলা প্রচারকের দায়িত্বে ছিলাম। আর শেষ দেখি, প্রায় ওই সমসময়ে, ব্যাঙ্গালুরুর কাছে চেন্নেনহল্লীতে অখিল ভারতীয় জেলা ও তদূর্ধ্ব প্রচারকদের এক বৈঠকে।

এই বয়সেও তিনি কতটা সক্রিয় ছিলেন তার একটা ঘটনা বলি। একজন কার্যকর্তার মুখেই ঘটনাটা শুনেছি। তাঁর জবানিতেই ঘটনাটা বলছি। যেমন তাঁর ডায়াবেটিস, আর্থরাইটিস তো ছিলই, এজন্য চলতেও কষ্ট হতো। কয়েকদিন আগে অমৃতসর পরিভ্রমণ করে দিল্লির কেশব কুঞ্জের কার্যালয়ে ফিরেছেন। ওই সময় চিকনগুনিয়া রোগটার প্রকোপ বাড় ছিল। রামসিংজীও চিকনগুনিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সারা শরীরেই তার ব্যথা। কেশব কুঞ্জের চিকিৎসক ডাঃ যোগেন্দ্র সিংহ তাঁকে দেখতে এলেন, তখন তিনি তার শরীরের ব্যথার কথাও জানালেন। ব্যথা কখনও ডান হাতে, কখনও বা বাঁ হাতে, কখনও পায়ে কখনও-বা পিঠে। আর এজন্য রাতে ঘুমও হচ্ছে না। এরকম সময় তাঁর সঙ্গে বেশি কথা বলা ঠিক হবে না বলে মনে হলো। এমন সময় ইতিহাস সংকলন যোজনার একজন কার্যকর্তা তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সামান্য কথাবার্তার পর তিনি তাকে তার টিকিটের কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, ২১ বা ২২ অক্টোবরের টিকিট করিয়ে দাও। রামসিংজীর কথা শুনে চমকে গেলাম। বললাম, এখন কোথায় যাবেন? এখন বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া আর কোথাও যাবেন না। আরে ভাই তখন ঠিক হয়ে যাবে। রামসিংহজীর জবাব।

যাবেন কোথায়?

সরসঙ্ঘচালকজী আসবেন না? চার বছর আগে হমীরপুরের কাছে নেরিতে ৫০ 'কনাল' জমি নেওয়া হয়েছে, ওখানে একটা ইতিহাস সংকলন যোজনার উদ্যোগে গবেষণাগার হবে। ২৭ অক্টোবর সরসঙ্ঘচালকজীর মাধ্যমে তা লোকার্পণ হবে। সেইসঙ্গে তিনদিনের একটা জাতীয় আলোচনা সভাও। এসবের প্রস্তুতি কতটা কী হচ্ছে তা দেখতে হবে। এই জন্যই যাচ্ছি।

তার কথা শুনে চুপ করে থাকা ছাড়া আর তো কোনও উপায় ছিল না। যিনি একটু আগে নিজের শরীরের কষ্টের কথা বলছিলেন, ইতিহাস গবেষণা সংস্থার কথা উঠতেই তার সব কষ্টের কথা ভুলে গেলেন।

পঁচানব্বই বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয় (৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০)। মৃত্যুর দু'বছর আগে, সম্ভবত ২০০৮-এ বর্তমানে প্রয়াত গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী দিল্লিতে ঝাণ্ডেওয়ালায় সঙ্ঘের কার্যালয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। গৌরীদা অসমের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রের সহ-ক্ষেত্র প্রচারক ছিলেন। রামসিংজীর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ তার মতো খুব কম স্বয়ংসেবকেরই হয়েছিল। ওই বয়সেও রামসিংজীর স্মরণ শক্তি দেখে গৌরীদা সত্যিই বিস্মৃত হয়েছিলেন। রামসিংজী শুধু তার বা তাদের পরিবারের কথা নয়, যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন এমন সব স্বয়ংসেবকেরও খোঁজখবর নিয়েছিলেন। ওই সময়ে কত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে স্বয়ংসেবকদের কাজ করতে হয়েছিল কথাপ্রসঙ্গে সেসব কথাও বলেছিলেন। বস্তুত যারাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাদের কাছে তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস। শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে হয় এমনই তাঁর ব্যক্তিত্ব। ইতিহাস চেতনা প্রখর হলেও তিনি কিন্তু ইতিহাস নিয়ে খুব একটা কিছু লেখেননি। বরং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যা কাজ করে গেছেন তা নিয়েই ইতিহাস লেখা হতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে তিনিই ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি পালটা প্রশ্ন করতেন—আর কার ভবিষ্যৎ আছে? পাকিস্তান শেষ হয়ে যাবে, ইসলাম ও খ্রিস্টানদের তৈরি সংকটও কেটে যাবে, পরিস্থিতি সেই দিকেই এগুচ্ছে। আমি হয়তো দেখে যেতে পারবো না, কিন্তু তোমরা দেখবে এই বিশ্বের পরিবর্তনে সঙ্ঘ কেমন বড়ো ভূমিকা পালন করে চলেছে। সঙ্ঘের কাজ গঠনাত্মক, সৃষ্টিশীল, তাই তার মহত্ত্ব নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত হবে। আমার বিশ্বাস, সঙ্ঘ যেভাবে সব বাধা অতিক্রম করে এসেছে, শেষ পর্যন্ত সেভাবেই সম্ভাব্য সকল প্রতিকূলতাকে পরাস্ত করে নতুন ভারত নির্মাণের পথ প্রশস্ত করবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। Ram Sing Thakur & North East India—Edited by Sujit Kumar Ghosh, Chairman, MAKAIAS.

২। শশীকান্ত চৌথাইওয়ালে, প্রাক্তন ক্ষেত্র প্রচারক, উত্তর পূর্ব ক্ষেত্র

৩। অধ্যাপক শঙ্করচন্দ্র দাস

৪। গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী, প্রাক্তন ক্ষেত্র প্রচারক, উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্র

৫। শঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শিলচর মহিলা কলেজ, দক্ষিণ অসম প্রান্ত কার্যবাহ।

৬। মানিক দাস, প্রাক্তন প্রান্ত প্রচারক, অসম

৭। পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য

৮। ড. জগদীশ গণচৌধুরী (স্বস্তিকা, ২০.০৯.২০১০, পৃষ্ঠা ৪)

৯। পাঞ্চজন্য (হিন্দি সাপ্তাহিক) দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা (২২.১০.২০০৬)

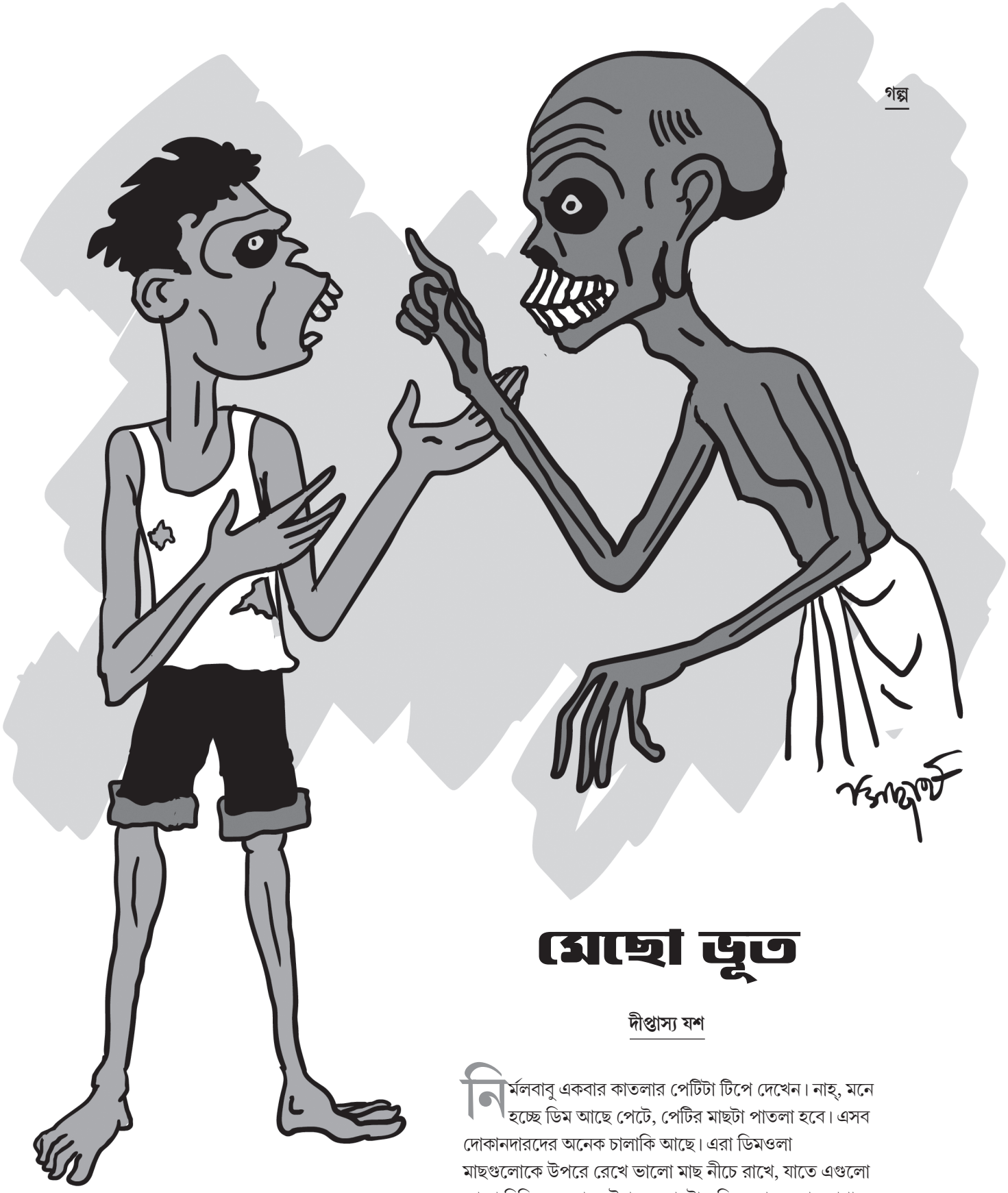

মেছো ভূত

দীপ্তাস্য যশ

নির্মলবাবু একবার কাতলার পেটিটা টিপে দেখেন। নাহ্, মনে হচ্ছে ডিম আছে পেটে, পেটির মাছটা পাতলা হবে। এসব দোকানদারদের অনেক চালাকি আছে। এরা ডিমওলা মাছগুলোকে উপরে রেখে ভালো মাছ নীচে রাখে, যাতে এগুলো আগে বিক্রি হয়ে যায়। উপরের মাছটা সরিয়ে তার তলায় রাখা মাছের পেটের কাছটা টিপে দেখেন নির্মলবাবু।

বাবু আর কতো টেপাটিপি করবেন। আজ অবধি কখনও কি আমার দেওয়া মাছ খারাপ হয়েছে? একবারে চোখ বুজে নিয়ে যান।

ভোলার কথায় কান দেন না নির্মলবাবু। ভোলা ওরকম অনেক কিছুই বলে। সব দেখে নিতে হবে। কাল পয়লা বৈশাখ। আজ একটু জমিয়ে বাজার করতে না পারলে মনে সুখ হবে না। হাজার দুয়েক টাকা মাস খরচার টাকার থেকে আলাদা করে রেখে দিয়েছিলেন আগেই, যাতে আজকের দিনে মন খুলে বাজার করতে পারেন।

একটা পছন্দসই কাতলা। ভোলাকে দিয়ে ওজন করতে বলেন। প্রায় দুই কিলো ওজন। ঠিক আছে চলবে। মাথাটা দিয়ে মুগের ডাল হবে। আর পেটির মাছ এক পিস করে ভাজা খাবেন তিনজন। বাকি পরে ঝোল করা যাবে।

কাতলা হয়ে গেলে এবার চিংড়ির দিকে দেখেন। কুচো, বাগদা দুই রকমই আছে। একবার ভাবেন কুচো চিংড়ি খানিক নেবেন, চিচিঙ্গের তরকারি করা যেতে পারে। কিন্তু এতোরকম মাছের সঙ্গে আবার চিচিঙ্গে একটু বেশি হয়ে যাবে নাকি। শুক্তো তো হবেই। নাকি বাগদাই নেবেন।

''বাগদা কতো করে বেচছিস রে?'' ঝুড়িতে কলাপাতার উপরে রাখা চিংড়িগুলো থেকে বেছে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করেন।

''ষাট টাকা শ'', বলে ভোলা নিজেই মাছ বেছে দিতে শুরু করে।

''এতোগুলো না, এতোগুলো না। এতো কে খাবে। বাড়িতে তো খালি আমি, তোর বউদি আর ছেলে। ছটা তোল, তাহলেই হবে।''

''এই নিন পুরো পাঁচশো করে দিলাম। কাল বছরের প্রথম দিন একটু ভালো করেই খাওয়া দাওয়া করুন। না হয় পঞ্চান্ন করেই দেবেন। নিন, আর না না করবেন না'', বলে ভোলা চিংড়িগুলো বাছতে শুরু করে আর কাতলাটা পাশের হেল্পারকে দেয় আঁশ ছাড়াতে।

চিংড়ি আর কাতলার সঙ্গে খানিকটা তপসে মাছ নিয়ে যখন ব্যাগে ঢুকিয়ে পার্স থেকে টাকা বার করে ভোলাকে দাম মেটাচ্ছেন তখনই লোকদুটোকে দেখতে পেলেন। হাঁটু অবধি ধুতি পরা, খালি গা লোকটা একটু বয়স্ক মতো আর তারপাশে প্যান্টের উপরে স্যান্ডো গেঞ্জি পরা একটু অল্পবয়সি একটা ছেলে। দুজনেই এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। কে জানে কেন। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে একেবারেই গরিব। রোজ বোধহয় ভালো করে খেতেও পায় না। তাই হয়তো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। মাছের ব্যাগটা ডান হাত থেকে বাঁহাতে নিয়ে ভোলার দিকে হাতটা বাড়ান ফেরত টাকাটা নেওয়ার জন্য।

''এই আরও কুড়ি টাকা দে'', বলে ওঠেন নির্মলবাবু।

''আর না বাবু, একটুও লাভ থাকবে না তাহলে।''

''অনেক লাভ আছে তোর। আর কুড়ি টাকা ফেরা। কাল পয়লা বৈশাখের দিন না হয় একটা ঠাণ্ডাই খাওয়ালি।''

''সে বলুন না, এখানেই আনিয়ে দিচ্ছি'', বলে ভোলা।

''না থাক, তুই কুড়ি টাকা দে। বাড়ি যাই এবার। নটা বেজে গেল।''

ভোলার কাছ থেকে ফেরত টাকা নিয়ে হাঁটা দেন নির্মলবাবু। অনেকদিন পরে আজ বেশ খানিকটা ভালো মাছ কিনতে পেরে মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে। সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা প্যাকেট নেভিকাট কিনে নেন। পয়লা বৈশাখের দিনটাতে একটু শখ-আহ্লাদ করতে ইচ্ছা হয়। বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায় যাবেন কাল। পকেটে প্যাকেট থাকলে কাউকে অফার করা যায়। তাতে আড্ডাটা জমে ভালো।

সিগারেটের ফেরত টাকা থেকে একটা এক টাকার কয়েন বার করে দোকানিকে বলেন একটা দেশলাই দিতে। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দেশলাই জ্বেলে ধরান। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে রিক্সাস্ট্যান্ডের দিকে একবার দেখেন।

একটাও রিকশা নেই। সেই হাটতেই হবে। ভেবেছিলেন একটা রিকশা নেবেন। কী আর করা। অগত্যা হাঁটাই শুরু করা যাক। হেঁটে মিনিট পনেরো লাগবে বাড়ি পৌঁছাতে। সিগারেটটা শেষ করে ফেলে দিয়ে হাঁটাই শুরু করলেন।

গার্লস স্কুলের পাশ দিয়ে সপ্তরথী সঙ্ঘ ক্লাবের মাঠ পার করে ঠিক যখন পুকুরপাড়ে এসেছেন নির্মলবাবু, তখনই লোডশেডিং হলো।

উফ্, এই গরমে বাড়ি ফিরে যে একটু ফ্যানের হাওয়ায় বসবেন তারও উপায় নেই, মনে মনে ভাবেন নির্মলবাবু।

পুকুরপাড়ের পর থেকে তার বাড়ি পর্যন্ত পাঁচশো মিটার রাস্তা একেবারেই শুনশান। রাত সাড়ে নটায় মফস্সলের ছোট পাড়া একেবারেই চুপচাপ। তার উপর আঁশশ্যাওড়া গাছটার জন্য অন্ধকারটা আরও ঘন হয়ে আছে বলেই যেন আরও নিস্তব্ধ লাগছে চারপাশটা। আর সেই জন্যই বোধহয় ফিসফিসিয়ে বলা কথাগুলো তার কানে এলো। শুনলেন কে যেন বলছে, ''পয়লা বৈশাখে আবার কাতলা আর চিংড়ি কে খায়। বাঙালরা ভিটে মাটি ছেড়েছে বলে কি নিজেদের আদব কায়দাও ভুলে যাবে। পয়লা বৈশাখে ইলিশ খাবে না একটু?''

কথাগুলো শুনে একটু থমকে দাঁড়ান নির্মলবাবু। একবার পেছন ঘুরে দেখেন। কিন্তু কেউ তো নেই। তাহলে কি ভুল শুনলেন। কিন্তু এরকম ভুল? কে জানে বাবা। আবার হাঁটা শুরু করেন। কিন্তু এক পা ফেলতেই পরের কথাটা শুনতে পেলেন।

''কিন্তু চিংড়িগুলো একেবারে তাজা। মালাইকারি করলে জমে যাবে।''

এবার ঠাহর করার চেষ্টা করেন কোন



দিক থেকে কথাগুলো এলো। কিন্তু অন্ধকারে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। বুকপকেট থেকে মোবাইলটা বার করে মোবাইলের টর্চ জ্বালালেন। আর তখনই লোক দুটোকে দেখতে পেলেন। আঁশশ্যাওড়া গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার ঠিক দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার চিনতে ভুল হয় না। বাজারে এই লোক দুটোই এক দৃষ্টিতে তার মাছ কেনা লক্ষ্য করছিল। দেখেই বোঝা যায় একেবারেই গরিব। পোশাক আশাকের মলিন দশা মোবাইলের টর্চের আলোতেই বোঝা যাচ্ছে। বুড়ো লোকটার মুখের চামড়া কুঁচকে মুখ জুড়ে বলিরেখা তৈরি করেছে। মনে হয় আগে কোনো জুট মিলে কাজ করত। এখন জুট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর রোজগারপাতি কিছু নেই। কিন্তু লোকগুলোর মতলবটা কী? সেই বাজার থেকে তার পেছন নিয়েছে কেন?

ছিনতাইবাজ নাকি? কিন্তু ছিনতাইবাজ ছিনতাই না করে মাছ নিয়ে আলোচনা করছে!

এখান থেকে বাড়ি দুশো মিটার দূরে আর। এখন নাহলেও একসময় নিয়মিত ব্যায়াম করতেন, দৌড়াতেন। দরকারে এক দৌড় দিতে পারবেন ছিনতাইবাজগুলোর থেকে বাঁচতে। এসব ভেবেই তিনি একটু গলাটা উচিয়েই লোক দুটোকে জিজ্ঞেস করেন, ''এই তোমরা কে ? আমার পিছু নিয়েছ কেন?''

লোকদুটো একবার একে অপরের দিকে তাকায়। তারপর বুড়ো মতো লোকটা কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলে, ''আজ্ঞে কাল বৈশাখের দিনে একটু ইলিশ নিলেন না।''

''আমি কী নেব তাতে তোমার কী হে? তোমার মতলবটা কী?''

এবার পাশের অল্পবয়সি ছেলেটা একটু এগিয়ে এসে বলে, ''কিছু মনে করবেন না। খুড়ো আসলে মাছের খুব সমঝদার। আর আপনাকে দেখে খুড়োর মনে হয়েছে আপনিও মাছের খুব সমঝদার। তাই খুড়ো আশা করেছিল

আপনি কাতলার পাশের কাঁচা ইলিশগুলোই কিনবেন। একেবারে গঙ্গা থেকে তোলা তাজা ইলিশ ছিল কিনা।”

“তা আমি যা-ই কিনি তাতে তোমার খুড়োর কী?”, খেকিয়ে বলে ওঠেন নির্মলবাবু।

“ওটাই তো। আমিও খুড়োকে তা-ই বলি। ইলিশ আবার একটা মাছ নাকি। খালি কাঁটা আর কাঁটা।”

“তোমাদের মতলবটা কী একটু খোলসা করে বলো তো বাপু। ইলিশ আর কাতলা নিয়ে এতো মাথাব্যথা কীসের। এখন কি মাছও ছিনতাই হচ্ছে নাকি?”

“ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন বাবু। আসলে কী জানেন সারা জীবনটা তো মাছ নিয়েই কেটেছে। তাই মাছ দেখলেই আর স্থির থাকতে পারি না”, এবার কথা বলে বুড়ো মতো লোকটা।

“হুম্। তা মাছ এতো আগ্রহ যে আমার পেছন পেছন বাজার থেকে এই অবধি চলে এলে?”

“আমি না। এই যে এই ছোঁড়াটা। ঘটি তো। চিংড়ি দেখলে আর নিজেকে সামলাতে পারে না।”

“হুম, তা আমি চিংড়ি কিনি কী ইলিশ তাতে তোমাদের কী?” অল্পবয়সি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন নির্মলবাবু।

“শুঁকেও তো অর্ধেক খাওয়া হয় বলুন”, বলে একগাল হাসি দেয়।

একটা হুম আওয়াজ করেন নির্মলবাবু। একটু মায়াও হয় লোক দুটোর দিকে দেখে। কে জানে কতোদিন হয়তো মাছ-মাংস খায়নি। রিকশা ভাড়াটা আজ বেঁচে গেছে। পকেট থেকে কুড়ি টাকা বার করে লোক দুটোর দিকে এগিয়ে বলেন, “এটা রাখো।”

“আজ্ঞে বাবু টাকা নিয়ে আমরা কী করব। আমাদের ওই গন্ধ শুঁকেই তৃপ্তি। বাবু ইলিশ দুটো নিলে পারতেন। একদম কাঁচা ইলিশ। ভালো তেল হতো”, বলে বুড়ো মতো লোকটা।

“ইলিশ বাড়িতে কেউ খেতে চায় না। বলে বড্ড কাঁটা।”

“এই একই কথা আমিও বলি। ইলিশ আবার একটা মাছ হলো বলুন? খালি কাঁটা আর কাঁটা। কাঁটা বাছতে বাছতেই দিন পার। খাওয়ার কোনো আরাম নেই”, বলে অল্পবয়সি ছেলেটা।

“তুই থাম। তুই সব জানিস। চিংড়ি আবার কোনো মাছ নাকি? চিংড়ি তো জলের পোকা।”

“ছাড়ো ছাড়ো। ইলিশ আবার একটা মাছ হলো? কাঁটা বাছতে বাছতেই অস্থির। কাতলার মাথাটা দিয়ে বাবু ভালো করে মুগের ডাল করবেন। একটু কিশমিশ দিয়ে দেবেন ডালে। আর পেঁয়াজ ফোড়ন দেবেন না যেন। তাহলে স্বাদ নষ্ট”, বলে অল্প বয়সি ছেলেটা।

“সে তোর মতো যারা ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যায় তারা আর ইলিশ মাছ কী খাবে, তারা তো ওই পোকামাকড়ই খাবে। সর্ষেবাটা দিয়ে হালকা করে ঝাল। আহা, এখনও জিভে জল চলে আসছে”, বলে বুড়ো মতো লোকটা একটা চকাস করে আওয়াজ করে টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে।

“তোমাদের বাঙালদের তো রান্না মানে খালি এক খাবলা লঙ্কা ফেলে দেওয়া রান্নায়। চিংড়ির মালাইকারি খেয়েছ? নারকেল কুড়িয়ে তাকে বেটে দুধ বার করে নিয়ে সেই দুধে সেদ্ধ হবে। একটু সামান্য ঝাল আর সামান্য মিষ্টি। আহা, মায়ের রান্নার সোওয়াদ এখনও ভুলিনি”, একটু গলা তুলেই কথাগুলো বলে ওঠে অল্পবয়সি ছেলেটা।

“ছাড় ছাড় তোদের রান্না মানে তো খালি খাবলা খাবলা চিনি। কচুরশাক দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা খেয়েছিস কখনও? জানিস কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খেলে তার সোওয়াদ কেমন হয়?”

কী করবেন ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে নির্মলবাবু খানিকটা যেন কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতেই বলেন, “আসলে ছেলেটা ছোট তো। ও কাঁটা বেছে খেতে পারে না। এর আগে একদিন ইলিশ খেতে গিয়ে কাঁটা লাগিয়ে গলায় একসা কাণ্ড। আরেকটু বড় হোক, তখন ইলিশ খাওয়াব”।

“বাঙালবাড়ির খোকাকে ইলিশ খাওয়াতে শেখাতে হবে না। নিজেই খেতে শিখে যাবে”, বলে বুড়ো মতো লোকটা।

“আর না শিখলেই-বা কী যায় আসে। আরও এতো মাছ আছে। সেসব খাবে। কাতলাটা বাবু বেশ পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে কষা করে করবেন বাবু। দেখবেন দারুণ লাগবে।”

“ওহ্, কী বুদ্ধি ছেলের। পয়লা বৈশাখের দিন পেঁয়াজ রসুন দিয়ে মাছ কষিয়ে খাবে বামুনের বাড়িতে। ওই কাতলা দই আর পোস্ত দিয়ে করতে হবে। দই ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে, আর পোস্ত ভারী শিলে একেবারে মিহি করে বাটতে হবে। একদম মোলায়েম। মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে। আর চিংড়িটা যখন নিয়েই ফেলেছেন তখন বরং ওটা দিয়ে ভালো করে ভর্তা বানিয়ে দিতে বলবেন বউমাকে। বেশ লঙ্কা দিয়ে মেখে। দেখবেন মুখ ছেড়ে যাবে একেবার খেলে। আর হ্যাঁ দুটোতেই একদম টমেটো দেবেন না কিন্তু।” বলে বুড়োটা।

“এখন ভারী শিল কোথায় পাওয়া যাবে শুনি? আর এদিকে বলছ বউমাকে ওদিকে ভারী শিলে পোস্ত বাটতে বলছ। কী লোক তুমি! তার থেকে বাবু গরম পড়েছে। লম্বা লম্বা করে আলু কেটে ডাঁটা দিয়ে হালকা ঝোল করবেন। টমেটো দেবেন”, বলে অল্পবয়সি ছেলেটা।

নির্মলবাবু দেখেন আবার দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগার উপক্রম। তিনি তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, “আহা তোমরা দুজনে ঝগড়া করো না। এই নাও এই

টাকাটা রাখো। কাল মিষ্টি কিনে খেও", বলে দশ টাকার নোট দুটো আবার বাড়িয়ে ধরেন।

"না না বাবু আমরা আর টাকা নিয়ে কী করব। আপনি যান। বাড়িতে বউমা চিন্তা করছে। অনেক দেরি হলো আমাদের জন্য আপনার। আমরাও আসি", বলে বুড়ো মতো লোকটা।

"আহা, আমি দিচ্ছি তো ভালোবেসে, রাখো", বলে টাকাটা বাড়িয়ে ধরতে যান আর মোবাইলের টর্চটা নিভে যায়। চার্জ শেষ নাকি? মোবাইলের টর্চটা আবার জ্বালান, কিন্তু কাউকে আর দেখতে পান না। চলে গেল লোক দুটো? বোঝাই গেল না তো। রাস্তার দিকে টর্চের আলোটা ফেলেন। অল্প আলোতে যতোটা দেখা যায় তার মধ্যে দুজনের কাউকেই দেখতে পান না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করেন নির্মলবাবু লোকদুটো কোথায় গেল। এই সময়েই কারেন্টটাও চলে এলো। রাস্তার ভেপার লাইটটা জ্বলে ওঠে। সেই আলোতেও লোকদুটোকে দেখতে পান না। হাতের মাছের ব্যাগটার দিকে একবার দেখেন। তারপর ব্যাগটা হাত পালটে নিয়ে আবার বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করেন। ভারী মজার লোক দুটো তো, মনে মনে ভাবেন নির্মলবাবু। এরকম লোক আগে কখনও দেখেননি।

।। দুই।।

"আচ্ছা খুড়ো তোমার এখনও ওপারের কথা খুব মনে পড়ে বলো?" পঞ্চারামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে ইন্দ্র।

"আমার ঘরটার কথা খুব মনে পড়ে রে। আহা, যখন সন্ধ্যেবেলায় মাঠের উপর দিয়ে শনশন হাওয়া বইত তখন দাওয়াতে বসে যে আরামটা পেতাম সেই আরাম আর কিছুতেই পাই না কখনও।"

"আর যখন নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বেরোতে, সেসব কথা মনে পড়ে না?"

"আমি তো নৌকা নিয়ে মাছ ধরতাম না। আমার চিংড়ির ঘের ছিল। এই বড়ো বড়ো বাগদা চাষ করতাম", ডান হাতটা বাঁহাতের কবজির কাছে রেখে মাপ বোঝাতে চায় পঞ্চারাম।

"বোঝো, চিংড়ি চাষ করতে, এদিকে চিংড়ির উপরে তোমার এতো রাগ?"

"না না চিংড়ির উপরে রাগ হবে কেন? চিংড়ির কতো রকম রান্না যে তোর বউদি করতে পারত কোনো ইয়ত্তা নেই তার।"

"কী কী রান্না করত বউদি?"

"সে অনেক রকম। ভর্তা তো করতই। কচু দিয়ে ঝোল, গরমে পটোল দিয়ে ঝোল। তাপর ধর তোর শুধু ভাজা করে তো প্রায়ই খেতাম।"

"বউদির হাতের রান্না খুব ভালো ছিল তাই না খুড়ো?"

"তা ছিল বটে। একটা শুধু আলু দিয়ে কষা কষা করে চিংড়ির ঝোল বানাত। শীতকালে ওই দিয়েই আমি দুবেলা এক থালা করে ভাত খেয়ে নিতে পারতুম।"

"আমার মাও খুব ভালো রাঁধত জানো। শুক্তো করত, আহা যেন অমৃত। আমরা তো খুব গরিব ছিলাম। তাই মাছ মাংস বিশেষ হতো না। নিরামিষই হতো আমাদের বেশিরভাগ দিন। মা একটা আলু, কুমড়ো, ঝিঙে দিয়ে তরকারি করত। কাঁচা আমের টক ডাল খেলে পেট আর মন দুইই ঠাণ্ডা হয়ে যেত।"

"একবার জানিস তখন সবে আমাদের বিয়ে হয়েছে। তোর বউদি তখনও এতো ভালো চিংড়ি রাঁধতে শেখেনি। মালাইকারিতে টমেটো দিয়ে দিয়েছিল। সেই নিয়ে কথা কাটাকাটি। সেই থেকে শেষে কথা বন্ধ। তোর বউদি বাপের বাড়ি গিয়ে বসে রইল। আমিও তখন জোয়ান লোক। ভাবলাম বউ গেলে আবারও বউ পাব, কিন্তু মাথা ঝোঁকাব না। আমিও জেদ করে রইলাম। থাক বাপের বাড়িতেই।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী এক মাস পরে শ্বশুরবাবা এসে ধরেবেঁধে নিয়ে গেলেন, জামাই ষষ্ঠীতে। সেখানে গিয়ে তোর বউদির হাতে রাঁধা চিংড়ির মালাইকারি খেয়ে আমার সব রাগ জল হয়ে গেল। তারপর আর কখনও আমাদের ঝগড়া হয়নি।"

"আচ্ছা হ্যাংলা লোক বটে তুমি খুড়ো।"

"না রে খাওয়ার জন্য নয়। আসলে সেদিন বুঝেছিলাম একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে কতোটা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলে তার জন্য অতো ভালো করে রাঁধতে পারে। ভালোবাসাই আসল বুঝলি।"

"তাহলে খুড়ো তোমার এখন চিংড়ির উপরে এত রাগ কেন?"

"চিংড়ির জন্যই তো আমার প্রাণটা গেল বল। ওই জন্যই তো ওরা আমাকে মারল। ওদের তো সব চাই।"

"হ্যাঁ।

আচ্ছা ইন্দ্র আমাকে একটা কথা বলত। আমরা তো না হয় পাকিস্তানে থাকতাম। কিন্তু তোর এরকম কেন হলো?"

"পাকিস্তান কী গো খুড়ো। বাংলাদেশ বলো।"

"দূর, বাংলাদেশ তো ওদের জন্য। আমরা পাকিস্তানেই থাকতাম। কিন্তু তোরা তো ইন্ডিয়ার, তাহলে তোর সঙ্গে এরকম হলো কেন?"

"আসলে কী জানো খুড়ো, আমাদের জন্য কাঁদলে ওপার বলো, এপার বলো টাকা পাওয়া যায় না তো, তাই আমাদের জন্য কেউ কাঁদেও না। আর তাই আমাদের মরে যাওয়াটাই ভবিতব্য"।

"তা বলে তুই ওদের চাঁদা দিতে পারলি না বলে তোকে পিটিয়ে মেরে

ফেলল আর কেউ কিছু বললও না?”

“কে বলবে বলো। কয়েক জন একটু বলেছিল। কিন্তু ওরা বলল তারা নাকি দাঙ্গা বাধাতে এসব বলছে। আসলে কিছুই হয়নি, সব মিথ্যা। আর আমিও ধীরে ধীরে মিথ্যা হয়ে গেলাম। খালি আমার মা এখনও মিথ্যা বলে ভাবতে পারে না। তাই এখনও রোজ আমার জন্য চোখের জল ফেলে।”

“সেই সবই মিথ্যা। খালি একমাত্র সত্যি তো ওরাই বলে যাচ্ছে রোজ পাঁচবেলা। ওরা যদি দোষও করে তাও কিছু বলা যাবে না। বললেই বলবে ইন্ডিয়ার স্পাই, নাস্তিক, আরও কতো কিছু।”

“আচ্ছা খুড়ো তোমরাও দেশভাগের সময় চলে আসোনি কেন?”

“আসব বললেই কী আসা যায় রে। সাত পুরুষের ভিটে মাটি, জমি জিরেত ছেড়ে কী আসা যায় বল?”

“তা যায় না। আমিও দেখো না, এখনও রোজ একবার করে বাড়ির দিক দিয়ে ঘুরে আসি। ভূত হলেই কি আর সব ভুলে যাওয়া যায় বলো?”

“না সে যায় না।”

“আচ্ছা খুড়ো তোমার তো ওখানে যাওয়াও হয় না। তোমার তো ভিসা লাগবে?”

“দূর ভূতের আবার ভিসা কী রে। আমার ওসব লাগে না। তবে ওদিকে আর যাইও না। ওখানে তো আমার কিছুই আর নেই রে।”

“কেন তোমার বউদিকে দেখতে ইচ্ছা করে না?”

পঞ্চা কথাটা শুনে খানিক চুপ হয়ে যায়। একবার কানের পাশটা চুলকায়। তারপর ডাল থেকে নামতে নামতে বলে, “সে তো এখন এপারেই আছে। শিয়ালদা ইস্টিশানের কাছে একটা ভাতের হোটেলে রান্না করে।”

“তাহলে তো সে হোটেল একদিন দেখে আসতে হচ্ছে গো খুড়ো। বউদির হাতের রান্না মানে তো দারুণ ব্যাপার গো।”

“দূর হোটেলে কী আর বাড়ির রান্না হয় রে। তখন রাঁধত আমার জন্য আর এখন রাঁধে পেটের জন্য। ছেলে-মেয়েগুলোকে মানুষ করার জন্য। মানুষের মনটা যে কাজে না মেশে সে কাজ ভালো হয় না রে।”

“জানো খুড়ো খুব খারাপ লাগে যখন দেখি মাকে এই বয়সে পেটের ভাতের জন্য লোকের দয়ার উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে। এমনকী বিধবাভাতাটুকুও পেতে গেলে তার জন্যও দুশো টাকা ঘুষ চায় পঞ্চায়েতের লোকেরা।”

“কী আর করবি বল, ওই আমাদের ভবিতব্য।”

“কেন ভবিতব্য হবে কেন খুড়ো? আমরা কি জবাব দিতে পারি না? ওদের কি এতোই ক্ষমতা নাকি?” একটু রাগ রাগ গলাতেই বলে ইন্দ্র।

“কথা পালটা দিতে পারব নাকি পারব না তার নয় রে। ওই যে বললি আমাদের জন্য কাঁদলে টাকা পাওয়া যায় না তাই আমাদের হয়ে কাঁদার কেউ নেই। ওটাই কারণ। ওরা আমাদের মারলে যারা চোখ ফিরিয়ে থাকবে, আমরা পালটা দিলেই তারা এমন চিলচিৎকার জুড়বে যে মনে হবে আমরাই দোষী, আর ওরা শান্তির দূত।”

“তাহলে কি এভাবেই আমাদের মেনে নিতে হবে খুড়ো? আমার মা কি কোনদিনই বিচার পাবে না?”

“কী করবি বল। খালি ভগবানকে একটাই কথা বলি রোজ, যেন আমি নেই বলে আমার পরিবার না খেয়ে না মরে।”

“তুমি কেমন ভূত গো খুড়ো, ভূত হয়ে ভগবানের নাম নিচ্ছ?” বলে হাসতে থাকে ইন্দ্র।

হাসতে হাসতে ইন্দ্র এবার বলে, “আচ্ছা খুড়ো ছোটবেলায় মায়ের কাছে গল্প শুনতাম ভূতেরা নাকি নানা গুপ্তধনের সন্ধান জানতে পারে। আমরাও তো একটু খুঁজে দেখতে পারি গো এদিক ওদিক। ওই যে পোড়োবাড়িটা, আমার ধারণা ওখানে খুঁজলে কিছু পাওয়া যাবে। চলো না কাল একবার। কিছু পেলে বউদি তখন নিজের হোটেল দিতে পারবে। আর আমার বুড়ি মাটাকেও কিছু দিতে পারব। মাকেও তাহলে আর এই বয়সে লোকের দয়ায় বেঁচে থাকতে হবে না।”

“ওসব গল্প কথা রে। আসলে ভূতের কিছুই থাকে না, খালি ভবিষ্যৎ দেখার চোখ ছাড়া। আর সেই চোখ দিয়েই একটা গুপ্তধনের সন্ধান আমি পেয়েছি।”

“কী খুড়ো?”

“দেখ এই যে আজ তুই আমি মরে গেলেও কেউ আমাদের জন্য কাঁদে না, কারণ আমাদের জন্য কাঁদলে তাদের পেটে ভাত জোটে না বলে। উলটে কেউ কাঁদলেও বলে মিথ্যা। এই দিন পালটাচ্ছে বুঝলি। এখন আর মানুষ ওদের কথা বিশ্বাস করছে না। মানুষ এখন সব নিজে নিজে দেখছে, জানছে, বুঝছে। মানুষ এখন বিচার চাইছে। আমি বুঝতে পারছি দিন পালটাচ্ছে।”

“পালটাচ্ছে বলছ? কোথায় আমি তো কিছু দেখছি না। আমি তো দেখছি সব সেই আগের মতোই রয়ে গেল এবারেও। ওপারেও, এপারেও। তোমারা দুর্গাপুজো করতে পারো না আর আমরা সরস্বতী পুজো। কোথায় আর কী পালটাচ্ছে।”

“আমার বয়সটা তো কম হলো না রে। একটু আমার কথার উপর ভরসা রাখ। দিন পালটাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়িই পালটাচ্ছে। একদিন সবের বিচার হবেই।”

“বলছ খুড়ো। আমার মায়ের আশা পূর্ণ হবে? ওই যারা আমি মহরমের চাঁদা দিতে পারিনি বলে আমায় পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল তারা শাস্তি পাবে?”

“পাবে রে পাবে। আর কেউ না দিক ভগবান ঠিকই শাস্তি দেবেন। দেখছিস না



ওরা এখন নিজেরাই নিজেদের কাটছে, মারছে, পুড়িয়ে মারছে। আরও হবে এসব।"

"কিন্তু সে আঁচ তো আমাদের গায়েও লাগবে খুড়ো। আবারও আমার মায়ের মতো অন্য কোনো মায়ের কোল খালি হবে।"

"আঁচ তো লাগবেই। সোনাকে আগুনে পোড়ালে পরে তবেই না সোনা জ্বলজ্বল করে। নাহলে আর সোনা আর তামার মধ্যে তফাত কী বল। আমাদের মনে অনেক বছর ধরে কুশিক্ষার ফলে অনেক ময়লা জমেছিল সেসব আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। লোহাকে যেমন আগুনে পুড়িয়ে ইস্পাত করা হয় আর সেই ইস্পাতের ফলা থেকে হয় তলোয়ার, তেমনই আমাদের মন থেকেও সব ময়লা পুড়ে গিয়ে ঠিক তলোয়ারের মতোই ধারালো হয়ে উঠবে। ধৈর্য রাখতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে তলোয়ারের শান ঠিক হবে না।"

"বলছ খুড়ো?"

"হ্যাঁরে হ্যাঁ। বলছি।"

"আমরা কিছু করতে পারি না খুড়ো?"

"আমরা তো ভূত। আমরা ভূতের গল্প রেখে যেতে পারি। সেই গল্প দেখেই তো মানুষ সব চিনবে, জানবে, বুঝবে, তলোয়ারের সঠিক ব্যবহার শিখবে। সেই দেখেই তো মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করবে। নিজের সন্তানদের রক্ষা করতে শিখবে। বুঝতে পারবে জমি কখনও কারুর বাপের হয় না। জমি হয় দাপের। নিজের ভিটে, মাটি সব রক্ষা করতে শিখবে।"

"কিন্তু খুড়ো ওরা যে বলে আমাদের নাকি গল্প বলা উচিত নয়। ওতে নাকি অশান্তি হয়?"

"মিথ্যা অজুহাতে কি আর গল্প তৈরি হওয়া আটকানো যায় রে। কিছুদিন হয়তো মানুষের চোখ ফিরিয়ে রাখা যায়, কিন্তু তারপরে একদিন গল্পটা লেখা হয়েই যায়। সেদিন সবাই সব জানতে পারে আর বুঝতেও পারে।"

"কিন্তু খুড়ো সেরকম অশান্তি হলে তো আমাদের মতোও আরও অনেকে মরবে?"

"আগুন লাগলে তুই কী করতে পারিস বল? এক আগুন দেখে তুই পাশ ফিরে শুতে পারিস। তাহলে একদিন তোর ঘরেও আগুন লাগবে। কিন্তু আগুন লাগলে তুই যদি জল ঢালিস, তাহলে আগুন ছড়াবে না। কিন্তু যে আগুন লাগায় তার তো তুই জল ঢাললে মনে হবেই যে কেন জল ঢালা হচ্ছে। কাজেই তার তো রাগ হবেই। কিন্তু তা বলে কি আর তুই জল ঢালবি না?"

"তা ঠিক বলেছ খুড়ো। তোমার গল্প, আমার গল্প এগুলোই আসলে আমাদের সন্ধানে থাকা গুপ্তধন। এই গল্পই

আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে যেতে হবে।”

“একদম। উত্তরাধিকার বজায় রাখতে গেলে তো পুরনো গল্প জানতেই হবে। দেখতিস না আমাদের দিদিমা ঠাকুমারা আমাদের পরিবারের পুরনো গল্প শোনাত। ও তো আসলে ওই উত্তরাধিকার দিয়ে যাওয়া।”

“সেই খুড়ো, তোমার আমার তো আর অতো তেল নেই, তেলের টাকাও নেই। তাই আমরা মাছের তেলেই মাছ ভেজে লোককে তেল দিতেও পারব না। তাই যারা তেলে চুপচুপে হয়ে ওদের জন্য কাঁদতে রেডি থাকে সবসময়ে সে কিছু হোক আর না হোক তারা আমাদের জন্য কাঁদল কী কাঁদল না সে ভেবে আমাদের কোনো লাভ নেই। আমাদের খালি এই গল্পগুলো রেখে যেতে হবে। তাহলে একদিন মানুষ ঠিকই আমাদের গল্প শুনবে।”

“এইবার বুঝেছিস। চল তোর বউদির হোটেল বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে এলো। ওদিকে যাওয়া যাক। এতোটা রাস্তা রোজ একা যায়, চিন্তা হয় আমার।”

“চিন্তা নেই খুড়ো। তুমি আর আমি আছি তো। কেউ বউদির সাথে ঝামেলা করতে এলে দেব ঘাড় মটকে।”

“দূর, ওসব ঘাড়টাড় মটকানোর কাজ মামদো ভূতেদের। আমরা হলাম মেছো ভূত। আমাদের মাছের গন্ধ শুকেই সুখ আর নিজেদের গল্প বলে সুখ। চ, আর বকবক করিস না। একটু পা চালিয়ে চল। তুই বুড়ো মানুষদের মতো আস্তে আস্তে হাঁটিস।”

“যাচ্ছি গো যাচ্ছি। চিন্তা নেই, বউদির হোটেল বন্ধ হওয়ার আগেই পৌঁছে যাব।”

পঞ্চারাম আর ইন্দ্র লম্বা লম্বা পা ফেলে হোটেলের দিকে হাঁটতে থাকে। নির্মলবাবুর বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইন্দ্র রান্নাঘরের জানলা দিয়ে হাতটা লম্বা করে খপ করে কাতলার ভাজা পেটি এক পিস তুলে নিয়ে মুখে চালান করে দেয়। তাই দেখে পঞ্চা হেসে ফেলে।

ঘটনা—১। ৫ই মার্চ ২০০৩-এ বাংলাদেশের যুগান্তর কাগজে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যাচ্ছে সোমবার গভীর রাতে আশাশুনী উপজেলার বাইনতলা গ্রামের চিংড়ি ঘেড় ব্যবসায়ী পঞ্চারাম সানা (৪৫) বাড়ি ঘেরাও করে তার বুকে লোহার শিক ঢুকিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে নিষিদ্ধ সংগঠন দক্ষিণবাংলা ছিন্নমূল কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল)-এর ক্যাডাররা।

এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়, দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে কয়েকদিন আগে পঞ্চারাম সানাকে চিঠি পাঠায় ছিন্নমূল কমিউনিস্ট পার্টির তরুণ গ্রুপের ক্যাডাররা। চাঁদার দাবির ঘটনাটি প্রচার হওয়ার দিন ঘটনার রাতে ৩০/৩৫ জন চরমপন্থী সংগঠনের ক্যাডার পঞ্চারামের বাড়ি ঘেরাও করে এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে বীরদর্পে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

তথ্যসূত্র—শ্বেতপত্র, ১৪৭১

ঘটনা—২। ২০১৬ সালের ৫ নভেম্বর বীরভূমের মল্লারপুরের ইন্দ্রজিৎ দত্তের কাছে বিশাল অংকের টাকা দাবি করা হয় মহরমের চাঁদা হিসাবে। ইন্দ্রজিৎ দত্ত সেই টাকা দিতে অসমর্থ হলে চাঁদা আদায়কারীরা ইন্দ্রজিৎ দত্তকে মারধোর করে। এরপর চিকিৎসার জন্য ইন্দ্রজিৎকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু ডাক্তারদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। □







সপরিবারে জীবনানন্দ।

জীবনানন্দ আবহমান

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের প্রবল বিজ্ঞাপনের দাপটের যুগে সুগন্ধির বিজ্ঞাপনের প্রাবল্য টিভি খুললেই নজরে পড়বে। এমন একটি কয়েক সেকেন্ডের ঘটনাবহুল দৃশ্যে যেখানে সবকিছু ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে উত্তাল সমুদ্রের কিনারায় এক যুবক একটি লোহার দণ্ড আঁকড়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে। পরিস্থিতি শান্ত হতেই গোটা ঘটনার সাক্ষী এক সুন্দরী তাকে বলছে, সব কিছুই তো ঝড়ে উড়ে গেল, রয়ে গেল শুধু তোমার সুগন্ধির আবেশ। উভয়ের মধ্যে একটি লাজুক দৃষ্টি বিনিময় হয়। বিষয়টা ১০/১২ সেকেন্ডের বেশি নয়। কিন্তু ছেলেটির ছড়িয়ে দেওয়া সৌরভ দীর্ঘস্থায়ী হয়। হয়তো-বা কালজয়ী, কারণ তা নতুন নারীটির সঙ্গে একটি সম্পর্ক সৃষ্টির ইঙ্গিতও দেয়।

১৬ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে এক আকস্মিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত (২২.১০.৫৪) কবি জীবনানন্দেরও একটি নির্দিষ্ট সৌরভ চিহ্ন ছিল যা পাঠকের সঙ্গে এক চিরস্থায়ী বন্ধনপথ তৈরি করে। এখানে তাঁর কাব্যকৃতি, কবি প্রতিভার স্ফূরণ বা কাব্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় ব্যঞ্জনা এগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ উদ্দেশ্য নয় এবং তার যথার্থতা যে সন্দেহাতীত হবে তেমন দাবি করাও উচিত হবে না। কিন্তু একটা বিষয়—সব ধরনের সংবেদনশীল মানুষই অনুভব করবেন বিশেষ করে বাংলা কবিতার প্রতি যাদের কিছু আগ্রহ এখনও রয়ে গেছে সেখানে মহীরূহ রবীন্দ্রনাথের পরেই জীবনানন্দের অবস্থানটি কিছুটা অজ্ঞাতসারেই যেন নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। একটা সময় আমাদের ছাত্রাবস্থায় রাবীন্দ্রিক কথাটা খুবই চালু ছিল। তরুণ কেন, অনেক প্রবীণদের কথাবার্তার ঢং বাহ্যিক আচার আচরণের মধ্যে দিয়ে সেই প্রকাশকে নির্দিষ্টভাবে এক কথায় চিহ্নিত করতে রাবীন্দ্রিক শব্দটি ব্যবহার করা হতো।

বিশেষ করে অসংখ্য কবি সাহিত্যিকের ভাষার চলনের উৎস নিশ্চিত করতে বিশ্বকবির কাব্য বা গদ্যরীতি উভয়কেই স্মরণে আনা হতো। সেটি কিছু দোষের ছিল না। অত বড়ো এক জ্যোতিষ্কের প্রভা যে পরিব্যাপ্ত বিকিরণ ছড়াবে সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা এই রাবীন্দ্রিক রীতির বা সর্বব্যাপী প্রভাবের বাইরে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যদি কারো প্রভাব, উপমা বা শব্দ প্রয়োগের রীতিকে অনুসৃত হতে দেখে থাকি তা কবি জীবনানন্দ দাশগুপ্তের। হ্যাঁ, এখানে একটু বলার আছে। অধুনা বাংলাদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভাময় বরিশাল শহরে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১৩০৫ সালের ৬ই ফাল্গুন (১৮.২.৯৯) জীবনানন্দের জন্ম হয়। তাঁর পিতা আত্মসমাহিত সত্যানন্দ দাশ ছিলেন ব্রাহ্ম। তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনও



ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যেই হতো। সে সময়ের ব্রাহ্ম পরিবারভুক্তদের মধ্যে ইংরেজি তথা সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ছিল সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে। জীবনানন্দের মা স্বাভাবকবি কুসুম কুমারী দাশ তখনকার দিনে বেথুন স্কুলে পড়তেন। তাঁরা জাতিভেদ মানতেন না।

ব্রাহ্ম হওয়ার পর সর্বানন্দ বললেন যে দাশগুপ্ত বলতে বৈদ্য জাতিকেই বোঝায়। এই সর্বানন্দ ছিলেন জীবনানন্দের পিতামহ। তিনিই প্রথম পদবি থেকে পদবির অর্ধাংশ গুপ্তকে লুপ্ত করার ব্যবস্থা করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও বৈদ্য ছিলেন। তাঁর ক্ষেত্রেও একই নিদান প্রয়োগ হয়েছিল। দেশবন্ধু বলেছিলেন যাঁরা দাশগুপ্ত তাঁরা পদবিটির বানান দাসের বদলে দাশ লিখলে

ভালো। তিনি নিজেও তাই করতেন। দেশবন্ধুর ওপর জীবনানন্দের বরাবরই একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে ১৯২৫ সালে কবি 'দেশবন্ধু প্রয়াণে' কবিতাটি বঙ্গবাণীতে প্রকাশ করেন। তবে দেশবন্ধুর পরামর্শ মতো সমস্ত বৈদ্য সমাজ পদবি হালকা করেননি যেমন তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ইনি দাশগুপ্তই লিখতেন।

জীবনানন্দ তাঁর উন্মেষ জীবনের লেখালেখিতে দাশগুপ্ত লিখলেও তাঁর ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'-এ তিনি দেশবন্ধু নির্দেশিত জীবনানন্দ দাশ নামই ব্যবহার করেন। বিষয়টা বিশদে নাড়াচাড়া করার কারণ সকলেই জানেন যে, সেই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও ব্রাহ্ম দু'টির মধ্যে বেশ আড়াআড়ি প্রভেদ তৈরি হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার থেকে সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্র কিশোর থেকে সুকুমার রায়— এমন বহু বাঙ্গালি দিকপাল পথপ্রদর্শকই ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত। তবে জীবনানন্দের বিসর্জিত পদবির পর কেউ তাঁর নাম জীবনানন্দ দাস লিখলে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হতেন। তা তিনি অন্তরঙ্গ মহলে অনেকসময় তাঁর মতো করে ব্যক্ত করে গেছেন। —'দেখুন না অনেক সাহিত্যিকই আমার নামটা ঠিক করে লিখতে পারেন না। পদবির বানানটা তাঁরা প্রায়ই ভুল করেন।' তিনি যে ভেতরে ভেতরে সচেতন হয়ে উঠছেন যাতে তাঁকে চিনতে না ভুল হয় তা 'ঝরাপালক'-এর পঙ্‌ক্তিতেই ধরা পড়ল। তিনি রবীন্দ্র প্রভাবকে কাটিয়ে বেরোবার কথা খোলাখুলি ঘোষণা করলেন। তবে সেটি যে খুব পরিণত হয়েছিল তা পণ্ডিতরা বলেননি। কেমন ছিল তা— ''কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—আমি বহে আনি; একদিন শুনেছ যে সুর—ফুরায়েছে—পুরানো তা—কোনো এক নতুন কিছুর আছে প্রয়োজন, তাই আমি আসিয়াছি—আমার মতন আর নাই কেউ। ....আমার পায়ের শব্দ শোনো, নতুন এ— আর সব হারানো পুরানো।" এই কবিতা ঝরাপালকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হলো ১৯২৮ সালে। অনেকটাই শিশুর নতুন কিছু করার বা তরুণের তীব্র আবেগে সমৃদ্ধ কবিতাটি। বইটির তৎকালীন বিনিময় মূল্য ছিল ১ টাকা।

জীবনানন্দ যে প্রারম্ভিক পরিচয়সূচক কবিতা দিয়ে তাঁর আবির্ভাব সূচিত করলেন তা কবিতা হিসেবে হয়তো নান্দনিকতার সংজ্ঞায় উৎকৃষ্ট নাও হতে পারে কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে তাঁকে যে নির্জনতার বা অন্ধকারের কবি বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার কোনো লক্ষণ কি এখানে ছিল? নিশ্চিতভাবে ছিল না। অবশ্যই তাঁর ভবিষ্যৎ কাব্যরীতি এর পর বহু নতুন বাঁক নেয়।

পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু তঁকে নির্জনতার কবি আখ্যা দেন। বুদ্ধদেব কিন্তু বরাবর জীবনানন্দের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন। তবু জীবনানন্দ তাঁর নির্জনতার তকমার বিরোধিতায় যুক্তি সাজিয়েছিলেন, ''এরকম নির্জন কবি নির্জন কবি বলে বুদ্ধদেব আমার সম্বন্ধে লিজেন্ড খাড়া করেছেন। এখন তো শুধু নির্জনতার কবি বললেই ছেলে বুড়ো সকলে জীবনানন্দকেই বুঝবেন। এটা আমার সম্পর্কে খাটে, সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।"

তৎকালীন রাজনৈতিক মতবাদের আলোকে মার্কামারা কোটারিভুক্ত বাস্তববাদী সমাজতান্ত্রিক কবি জীবনানন্দ ছিলেন না তবে বাস্তব জীবনকে পরিহার করে তাঁর চেতনা পরিস্ফুট হয়েছে এমন কথাও কেউ বলবেন না। তিনি দু' দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী। দেখেছেন দেশভাগ, মন্বন্তর। নিশ্চিতভাবে তাঁর মধ্যে ধূমায়িত হয়েছে হতাশা এবং মানুষের নৈতিক অবনমনের বেদনা। তিনি লিখেছেন, ''চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে নিতে গিয়ে তবু মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল, দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক কেবলই আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়। এ ছাড়া নির্মল কোনো জননীতি নেই। .... ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলই ভেঙে গিয়ে তারই পিপাসায় গড়ে ওঠে। এ ছাড়া অমল কোনো রাজনীতি পেতে হলে তবে উজ্বল সময় স্রোতে চলে যেতে হয়।" (নাস্তিক)

এ যেন দুরদৃষ্টি দিয়ে অনাগত কালের পদধ্বনি শোনা। এমনটাই কি ঘটে চলেছে না আমাদের জীবদ্দশায়? ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার উল্লাস!

এই ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার দুর্মর প্রসারমানতা তাকে অনেক সময় বৃহত্তর মানব সমাজের কথা ভেবে চূড়ান্ত হতাশ করেছে। তিনি সাময়িকভাবে যন্ত্রণা এড়াতে অন্তরাল বেছে নিয়েছেন। কেননা তিনিও তো সেই বৃহত্তর মানব সমাজেরই অঙ্গ। হতাশ জীবনানন্দের কলম নিস্তেজ ''গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত আমাকে জাগাতে চাও কে'ন?" জীবনানন্দের সুহৃদসম অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু বলছেন, ''সমাজ মানুষকে ঠকাচ্ছে, যে মানুষ নিজের রক্তজল করে সমাজকে সুশ্রীতায় আঁকতে চাইছে, গড়তে চাইছে, সেই সমাজের দ্বারাই মানুষ প্রতারিত—তাই সে বিষণ্ণ বিরক্তির মধ্যে একাকিত্বের খোলস পরে কাটাতে চায়।"

প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচকের 'খোলস' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনানন্দ বিশ্লেষণে তিনি প্রাঞ্জল করেছেন যে এই সমাজের বৈসাদৃশ্য ও লালসার অগ্রগতিই সাময়িকভাবে জীবনানন্দকে পশ্চাৎমুখী করেছে। কিন্তু সেটিই চূড়ান্ত নয় কবি 'অমল রাজনীতির' আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাস করেন। তিনি 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে আরও পরিণত দৃপ্ত ঘোষণা করেন ''অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে, বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস, এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়। এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব, আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।" ''অন্ধকারের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত" এ বাক্য অন্তিম ধরে জীবানানন্দ অন্ধকারের কবি কখনই হতে পারেন না। কেননা এর পরই তিনি লিখেছেন অন্ধকার অর্থাৎ তার সমার্থক শব্দ তিমির সেই তিমির হননের গান, ''তিমির হননে তবু অগ্রসর হয়ে আমরা কি তিমির বিলাসী; আমরা তো তিমির বিনাশী হতে চাই। আমরা তো তিমির বিনাশী" এই তো অনন্ত আশার পরিব্রাজক

সার্থকনামা জীবনানন্দ। আমরা এবার ফ্ল্যাশব্যাকে একটু কবির বাল্যে ফিরে যাব যাতে তাঁর ব্যক্তিগত নির্মাণ পর্বের কিছু আভাস পাওয়া যায় যার উদ্ভাস পরবর্তী কালপর্বে তাঁর কাব্যকৃতিতে ছড়িয়ে পড়বে।

জীবনানন্দ ও তাঁর ভ্রাতা অশোকানন্দ যিনি দাদার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন তাঁর উল্লেখিত জীবনানন্দের লেখায় পাওয়া যায়, '' তাঁদের পিতা বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের উপাসক ছিলেন, আচার্য ছিলেন, বক্তা ছিলেন.... কাজেই ব্রাহ্ম সমাজের উপাসক বক্তৃতা ও অন্তরঙ্গ ব্যাপারে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসটা দিতে চেষ্টা করে গেছেন..... যেমন সাহিত্য পলিটিক্স-এ, তেমনি ধর্মের ব্যাপারেও পূর্ব ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে কোনো পরবর্তী যুগই আধুনিক সরসতা দাবি করতে পারে না। বর্তমানের বৈশিষ্ট্যও ইতিহাস সত্তাকে মর্যাদা দেয়।" জীবনানন্দের তীব্র ইতিহাস চেতনা ও ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আজীবন আকর্ষণের ভুরি ভুরি নিদর্শন তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। একটি এমন—আমরা সচরাচর যেমন বলি চাঁদের আলো তেমনি তারার আলোও তো বলে থাকি। আর যাই হোক তারার বা নক্ষত্রের অন্ধকার কি বলি? জীবনানন্দ তাঁর বইয়ের নাম দিলেন 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮)। অর্থহীন কথাবার্তা! দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় অভিধা অর্জনের ক্ষেত্রে এমন সব আপাত এলোমেলো শব্দচয়ন পর্যাপ্ত সহায়তা করেছিল। অথচ একটু ভারতীয় প্রাচীন বেদ, উপনিষদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করলে কী তাৎপর্যময়ই না হয়ে উঠবে তিনটি শব্দ। জীবনানন্দ সাতটি তারা অর্থে আমাদের বাল্যকালে পঠিত সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রসঙ্গেই ইঙ্গিত করেছেন। উত্তর আকাশে লাঙ্গলাকারে অবস্থিত সাতটি নক্ষত্র। ভারতীয় জ্যোতিষীরা প্রাচীন ভারতের সাতজন বিশিষ্ট ঋষির নামানুসারে এগুলির নামকরণ করেছেন। এঁরা হলেন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। প্রাচীন ভারতের এই সাতজন ঋষির নামাঙ্কিত তারাগুলি ভারতের মাথার উপর উত্তর আকাশ পথে আমাদের অনাদিকাল থেকে আলো দিয়ে আসছে অর্থাৎ আমরা ভারতীয়রা এই বিশিষ্ট ঋষিদের জীবনকথা ও কর্মের কথা থেকে দীর্ঘদিন ধরে জ্ঞানলাভ করে আসছি।

আরও পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে নামকরণের। কবিতাগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা হলেও তা ছিল বিক্ষুব্ধ সময়। ১৯৪৮ সালে ছাপার দু আড়াই বছর আগে শেষ হয়েছে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের মারণ হুংকার। বাঙ্গালাদেশের ওপর দিয়ে ১৩৫০-এর মহামন্বন্তর পার হয়েছে তার মৃত্যুলীলা দেখিয়ে। আর ১৯৪৬-এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার বিভীষিকা জীবনানন্দের কবিমানসে দুরপনেয় অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের ঘটনাগুলি তাঁকে চরম হতাশ করে।

তিনি অনুভব করলেন তাঁর সংবেদনশীল কবিমনে যে আমরা ভারতীয়রা এতদিন সপ্তঋষির কাছ থেকে যে আলোক প্রজ্ঞায় ঋদ্ধ হচ্ছিলাম তা আজ অবসৃত। জ্ঞানের আলো আর আমাদের মধ্যে নেই। আলোর অনুভূতির স্থান অধিকার করেছে তারই সহোদরা ঘোর অন্ধকার (জীবনানন্দ নগ্ন নির্জন হাতে লিখেছেন আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার)। তাই বইয়ের নামকরণ করলেন গভীর বেদনায় সাতটি তারার তিমির। কী প্রগাঢ় অর্থবহ! কী অব্যর্থ প্রমাণ রেখে গেলেন জীবনানন্দ ভারতীয় ইতিহাস চেতনার।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েন ছাড়িয়ে সেই স্বাধীনতার ঊষাকালে একজন ভারতীয় হিসেবে সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারকামী— জীবনানন্দ বইটি উৎসর্গ করেছিলেন বন্ধু অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে (পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)।

আবার ফিরে যাব পিতা সম্পর্কে জীবনানন্দের অভিনিবেশে যার সুদুরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল তাঁর ভবিষ্যৎ কাব্য চর্চায়। ''.... শেষকথা বলতে হয় এই ভারতীয় দর্শন ও ভারতবর্ষের উপনিষদই তাঁর জীবনের (পিতার) সবচেয়ে আকর্ষণের জিনিস ছিল। একমাত্র উপনিষদের আঙ্গিক ও আন্তরিক সত্যের, সৌন্দর্যের, শান্তির সম্পর্কে তিনি কোনো দিন কোনো দ্বিতীয় প্রশ্ন করেননি। প্রায় রোজ শেষ রাতে বিশেষত হেমন্ত ও শীতকালে উপনিষদের শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে তিনি আমাদের অপরূপ সূর্যচেতনার প্রভাতে নিয়ে আসতেন..."

যে ভাষায় জীবনানন্দ তাঁর পিতার প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগুলির ওপর বিশেষ করে আলোকময় সূর্যের আবাহনের বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যেই কি সুপ্ত নেই জীবনানন্দের ভারতীয় প্রজ্ঞা ও মননের ওপর গভীর বিশ্বাস? তিনিই তো মুখে মুখে চলা একটি অসাধারণ পঙ্‌ক্তি দিয়ে মানুষকে বিশ্বাসে স্থিত হতে বলে গেছেন ''শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়"। প্রচারবিমুখ সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার তাঁর অসাধারণ উপন্যাস 'অন্তর্জলিযাত্রা'য় বলেছিলেন ''এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ন্যায় হিম নীলাভ ক্রমে আলো আসিতেছে"—অর্থাৎ সূর্যোদয়। জীবনানন্দও ছিলেন তেমনি এক সূর্য প্রেমিক কবি।

অন্ধকার নয়, চির আলোকপিয়াসী কবি আবার সূর্যবন্দনায় আপ্লুত হয়ে যাচ্ছেন, ''সুচেতনা এই পথে আলো জ্বেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে, সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ, এই বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল প্রায় ততদুর ভাল মানব সমাজ...." সূর্যের বিচ্ছুরণ ও মানুষের প্রতি যুগপৎ বিশ্বাসে ভরে উঠছে জীবনানন্দের হৃদয়। পরে নগ্ন নির্জন হাত কবিতায় সূর্যের বিচ্ছুরিত স্বেদ (ঘাম) লিখে তিনি এক অপরূপ মানুষী উপমায় তাঁকে মণ্ডিত করেছিলেন। শুধু এই সূর্য উপাসনা ও উপনিষদের মগ্ন পাঠ শোনাই নয়, জীবনানন্দ লিখছেন, ''আমার জীবনে সে শিক্ষা যদি ব্যবহারিকভাবে ফলপ্রসূ না হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের কোনো দোষ নেই, যদি মনোলোকে কিছু সার্থক হয়ে থাকে তা হলে এদেরই প্রশস্ত দানের ফল। নানা নামি কলেজের বড়ো বড়ো অধ্যাপকদের কাছে পড়েছি বটে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি সম্পর্কে

অনেক খবর জুগিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু বোধির অভাবে সে খবর পরীক্ষার খাতায় পর্যবসিত হয়ে ডিগ্রি দান করে অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে। জীবনের যা কিছু কাণ্ডজ্ঞান, মর্মজ্ঞান, রসাস্বাদ—যা কিছু লোক সমাজে এষণাশক্তি কিংবা নির্জনে ভাবনা প্রতিভা যা কিছু mother wit... এঁদের কাছ থেকেই লাভ করার সুযোগ হয়েছিল আমার।'' নিজের জীবনভাষ্যে এমন অকপটে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারকে জীবনের ধ্রুবতারা মানতে আর বিশেষ কাউকে দেখা যায় না। তিনি তো বলেই দিলেন এষণা শক্তি আর নির্জন ভাবনার কথা। এ দু'টিই তো কবি জীবনানন্দের সৃষ্টির কেন্দ্রীয় চরিত্র কিংবা চালিকাশক্তি।

১৯১৫ সালে বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল (অশ্বিনীকুমার দত্তের পিতার নামের) থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে সেরা ছাত্রদের পীঠস্থান প্রেসিডেন্সি কলেজে তথা কলকাতায় এলেন। স্কুল জীবন থেকেই তিনি ছিলেন প্রবল পুস্তকানুরাগী। বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করার পুরস্কার-অর্থ তিনি বই কেনায় খরচ করতেন। বাবার ছিল বেদ উপনিষদ ছাড়াও ইংরেজি কাব্য ও সাহিত্যের বিশাল সংগ্রহ। জীবনানন্দ তার বৃহৎ অংশই আত্মস্থ করে কলকাতায় আসেন, সেই সময়কার কথা স্মরণ করে ভাই অশোকানন্দ বলছেন, ''দাদা তখন থেকেই বহু কবিতা লিখতেন কিন্তু রাখতেন না। সে সব কিছুই আর পাওয়া যায় না তবে তাঁর (অশোকানন্দ) কিশোর বয়সের সময়কার দাদার লেখা দু'টি পঙ্‌ক্তি স্মৃতিতে রয়ে গেছে, ''এল বৃষ্টি বুঝি এল পায়রাগুলো উড়ে যায় কার্নিসের দিকে এলোমেলো''। লক্ষণীয়, জীবনানন্দ সেই কিশোর বয়সেই অনায়াসে লেখায় ইংরাজি শব্দ ঢুকিয়ে দিলেন। পরিণত বয়সের তাঁর ৭টি কাব্যগ্রন্থের অজস্র কবিতাতেই ইংরেজি, ফার্সি, উর্দু নিতান্ত গ্রামীণ সব শব্দের অনায়াস প্রবেশ রয়েছে।

''এ পাড়ার বড়ো মেজো... ও পাড়ার দুলে বোয়েদের ডাক শাঁখে উড়ে আসত.... (শাঁখ বাজিয়ে ডাকার গ্রামীণ রীতি) এই দুলে বোয়েদের অর্থ একমাত্র গ্রাম বাঙলার প্রচলিত ঘরোয়া ভাষা জানা বাঙালিরই বোধগম্য।

আবার ইংরেজির অব্যর্থ প্রয়োগ এমন—

''শস্যের ভিতরে রৌদ্রে পৃথিবীর সকালবেলায়—
কোনো এক কবি বসে আছে,
অথবা সে কারাগারে ক্যাম্পে অন্ধকারে।''

এরপর প্রতিভাবান জীবনানন্দ বিএ, এম এ দু'টিই সসম্মানে পাশ করলেন।

পরবর্তীতে ব্রাহ্ম পরিচালকমণ্ডলীর সিটি কলেজে অধ্যপনায় যোগ দিলেন। ১৯২২ থেকে ২৮ অবধি ছিলেন এখানে। এই সময়কালে কল্লোল যুগও সমাসন্ন। কবিতা পত্রিকায় জীবনানন্দের বহু কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল। কিন্তু স্বভাব লাজুক ও প্রচারবিমুখ কবি কোনোরকমে কবিতাটি অফিসে দিয়েই গা ঢাকা দিতেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'জীবনানন্দ' মরণোত্তর সংখ্যায় লিখেছিলেন, ''এক টুকরো নীলিমার মতো একটি কবিতা উড়ে এসে পড়ল কল্লোলে। লেখক জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ঠিকানা বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিট।'' কল্লোল আপিস তখন ১০/২ পটুয়াটোলা লেনে। অবশ্য হ্যারিসন রোডের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিঙেও তিনি ভাইকে নিয়ে থেকেছেন। বোন সুচরিতা দাস লিখছেন, ''বেচু চ্যাটার্জীর একখানা ঘরে দুই ভাইয়ের দিন কাটে। একজন অধ্যাপক আর একজন Msc-র ছাত্র। রান্না করতেন মেজদা। অধ্যাপনার পরে দাদার বাকি সময় চলে যায় লেখায়। কখনো বরিশাল থেকে মা এসে উপস্থিত। মার স্নেহে ভাঙা হাটে চাঁদের আলো ঝলমল করে। ''এখনও ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছে বিধান সরণীর ডান দিকে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিটের পথ নির্দেশ দেখলে মনে সেই জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনা জন্মায়।

যাই হোক ১৯২৮ সাল নাগাদ তাঁর কর্মক্ষেত্রে একটি বড়ো ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। তখনকার সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্ম হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—শুচিবায়ুগ্রস্ত। জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটিতে পরিব্যাপ্ত যৌনতা রয়েছে এই অভিযোগে তিনি তাঁকে বরখাস্ত করেন। কবিতার অংশ বিশেষ এরকম—

'' চারিপাশে বনের বিস্ময় চৈত্রের বাতাস জোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন, ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে, ...পুরুষ হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার; তাহারা পেতেছে টের আসিতেছে তার দিকে। আজ এই বিস্ময়ের রাতে তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে....'' এই প্রেমের ইঙ্গিতকেই শরীরী যৌনতার তকমা দেওয়া হয়।

কিন্তু এই বিষয়টি সম্পূর্ণ বিতর্কিত। কবিতাটির প্রকাশকাল বাস্তবে জীবনানন্দের বরখাস্ত হওয়ার অনেক পরে ১৯৩২ সালের 'পরিচয়' পত্রিকায়। আসলে সেই সময়ে কলেজের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হওয়ায় কয়েকজন জুনিয়ার অধ্যাপককে ছাঁটাই করতে হয়—বলেছেন জীবনানন্দের পরবর্তী সময়ের হাওড়া গার্লস কলেজের সহকর্মী অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষ।

বাস্তবে তখনকার অধ্যাপক জীবন আজকের মতো খেয়ালখুশির ছিল না যে মাঝে মধ্যে কলেজে গিয়ে প্রায় অনিচ্ছুক Liberal arts-এর পড়ুয়াদের দু' একটা বাণী দিয়ে রাজনীতি বা অন্য NGO চালাতে চলে গেলাম যা আখেরে কাজে আসবে।

এই সময় নিবিষ্ট মনে অধ্যাপনা ছাড়াও তাঁর কবিতার বিচ্ছুরণ শুরু হয়েছে। তখন থেকেই তিনি অসূয়াসম্পন্ন নিন্দার দ্বারা নির্যাতিত, বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। এর মূলে ছিল তৎকালীন বহুল প্রচারিত সজনীকান্ত দাসের মোরগ মার্কা 'শনিবারের চিঠি'। তাঁর কাজই ছিল নিয়মিত জীবনানন্দকে বিদীর্ণ করা। কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছিলেন বিশ্বকবির কাছ থেকে। তিনি (রবীন্দ্রনাথ) একবার জীবনানন্দকে লিখেছিলেন, 'তোমার কবিত্ব শক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে।'' ব্যাস, এইতো সমর্থন জুটে গেল।

রবীন্দ্রনাথ ভাষা নিয়ে টোকা দিয়েছেন, সজনীকান্ত লং শট মারতে শুরু করলেন।

নিরন্তর এক নিয়মমাফিক আক্রমণের যে ঢেউ উঠে আসছিল এবার তজ্জনিত হতাশা থেকে কবি নিজেই তাঁর গভীর কাব্য চেতনায় বিষয়টির মূলে গিয়ে কষাঘাত করলেন। তাঁর সেরা আয়ুধ কবিতা দিয়েই হলো আক্রমণ—

''বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভনিতা,
...বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর
অক্ষর অধ্যাপক, দাঁত নেই চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে আর হাজার দেড়েক পাওয়া
যায় মৃত সব কবিদের মাংস, কৃমি খুঁটি; (সমারূঢ়)

বাংলা সাহিত্যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পূর্ণ বৈধভাবে খেলার নিয়ম মেনে এমন শিল্পীসুলভ ক্ষুরধার ছুরির ফলায় বিদ্ধ করার উদাহরণ আর দ্বিতীয় নেই।

আর দেহপটের মতো কালপট সনেও যে সকলি হারায় বিশেষ করে প্রতিভার বিকিরণ যদি বিধ্বংসী হয়। জীবনানন্দ আপনগতিতে বাংলা কবিতার কোষাগার ঋদ্ধ করে তখন চলে গেছেন। আত্মসমর্পণ আর নিজের বোধের (জীবনানন্দের ভাষায়) খামতি বুঝতে পেরেছেন সজনীকান্ত।

নতমস্তকে লিখছেন, ''রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য সাহিত্যের তিনি ছিলেন (জীবনানন্দ) অন্যতম গৌরব, তিনি অকপটে সুদৃঢ়তম নিষ্ঠার সহিত কাব্য সরস্বতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন.....তাঁহার সাধনায় কিছুমাত্র ফাঁকি ছিল না। তিনি ভঙ্গি ও ভানসর্বস্ব কবি ছিলেন না। তাঁহার অবচেতন মনে কবিতার যে প্রবাহ অহরহ বহিয়া চলিত লেখনীমুখে সজ্ঞান সমতলে তাহার ছন্দবদ্ধ প্রকাশ দিতে প্রয়াস করিতেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তাঁহার বক্তব্যের চাবিকাঠি খুঁজিয়া পাইয়া আনন্দলাভ করিতেন, যাঁহারা তাহা পাইতেন না তাঁহারাই বিমুখ হইতেন (মনে হয় এদের মধ্যে তিনি নিজেও ছিলেন)।....বর্তমান পৃথিবীতে এই উদার হৃদয় প্রসন্ন প্রেমিক কবিকে পদে পদে আমাদের মনে পড়িবে' (শনিবারের চিঠি কার্তিক ১৩৬১)। এটি ছিল জীবনানন্দের প্রথম মরণোত্তর সংখ্যা। সত্যিকারের প্রতিভার বিপরীতে স্বার্থসঙ্কুল বিরোধিতার দীনতাকে হার মানতেই হয়। সজনীকান্তের কাগজ বিক্রি হওয়ার একটা ব্যবসায়িক দিক ছিল যেখানে sensationalism-এর প্রয়োজন পড়ত বই কী।

১৯২৮ সালে যখন কলেজের চাকরি খুইয়ে কবি বেকার হলেন তখনও তিনি অকৃতদার। এখানেও তিনি নজির সৃষ্টি করলেন। ১৯২৯ সালে খুলনার বাগেরহাট কলেজে একটা অধ্যাপনার কাজ পেলেন। কিন্তু মাস তিনেক পরেই তিনি এটা ছেড়ে দেন, কলেজ তাঁর পছন্দ হয়নি। ফিরে গেলেন বরিশালের বাড়িতে। বিয়ে করে ফেললেন তৎকালীন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হওয়া লাবণ্য গুপ্তকে। এনার বাবা অর্থাৎ জীবনানন্দের শ্বশুর রোহিণী গুপ্ত অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় লাবণ্য দেবী থাকতেন জ্যাঠামশাই ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারক অমৃত গুপ্তের কাছে। ব্রাহ্ম স্ত্রীরা বাড়িতে সিঁদুর না পরলেও লাবণ্য দেবী সিঁদুর পরতেন। এ নিয়ে জীবনানন্দ থাকতেন সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। এই ধরনের বিষয় তাঁর কাব্যমগ্ন মনের প্রবাহে কোনও রেখাপাতই করত না। তবে একটা জিনিস লক্ষণীয় তৎকালীন সমাজে বিশেষ করে ব্রাহ্ম গোষ্ঠীভুক্তদের মধ্যে ভদ্রবংশ ও শিক্ষার একটা আলাদা গৌরব ছিল। জীবনানন্দ ১৯৩০ সালে বৈশাখ মাসে বিয়ের পরও দীর্ঘ ৫


বুদ্ধদেব বসু


বিষ্ণু দে

বছর বেকার ছিলেন। এ নিয়ে কেউ চিন্তিত ছিল না। প্রথমত, ঘন সন্নিবদ্ধ একান্নবর্তী পরিবারের বাঁধন। জীবনানন্দের বাবা তখনও শিক্ষকতা করেন আর ভাই অশোকানন্দও Msc পাশ করে দিল্লিতে ভালো চাকরি করছেন। জীবনানন্দের বিয়ের আগে তিনি দিল্লির রামযশ কলেজেও কবির একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। বিয়ের পর জীবনানন্দ আর চাকরিতে ফিরে যাননি। জীবনানন্দ ছিলেন সর্বার্থেই ঘরকুনো। শুনলে অনেকেই অবাক হবেন অশোকানন্দ বলছেন, ''ওই সময় দাদা আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে একটা ব্যবসা করেছিলেন। তা সহ্য না হবারই কথা।'' কিছুদিন পরে ভাইকে টাকা ফেরত দিয়ে বলেন, ব্যবসা তুলে দিলাম তবে কিছু লাভ করতে পেরেছি।'' ভাবা যায়! তবে এর পর আর এমন ঝুঁকি নেননি। ১৯৩৫ সালে বরিশালের বিখ্যাত ব্রজমোহন কলেজে তিনি ইংরেজির অধ্যাপকের চাকরি পান। এর আগেই তাঁর কন্যা মঞ্জুশ্রীর জন্ম হয়েছে।

এই কলেজেরই জীবনানন্দের এক ছাত্র লিখেছেন, ''শ্যাম

রঙের স্বাস্থ্যবান পুরুষ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, পাম্প-সু। কাঁধে পাট করে রাখা চাদর হাতে একটি কী দু'টি বই। মুখ তাঁর সর্বদা গম্ভীর তবে চোখে আশ্চর্য চাঞ্চল্য ও তীক্ষ্ণতা।" তিনি চার দিক অবলোকন করে আত্মস্থ করার চেষ্টা করে যেতেন। আর তাঁর পোশাক তো আজীবনই তাই। কলকাতার শ্রেষ্ঠ কলেজ থেকে বহু সাহেব অধ্যাপকের অধীনে বিশেষ করে ইংরেজি নিয়ে পড়েও তিনি তাঁর অনেক সতীর্থের মতো (বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেরা উদাহরণ) আধাসাহেব হয়ে বেরোতে পারেননি। অশোকানন্দ লিখছেন, '' ১৯৫০ সালে তিনি পুনরায় দিল্লিতে বদলি হয়ে যান। তবে তখন আবার দাদা কর্মহীন থাকায় সেখানকার একটা Military Training College -এ তাঁর জন্য ইংরেজি শিক্ষকের কাজ ঠিক করেছিলাম। দাদা তখন অভাবে থাকা সত্ত্বেও বললেন কলেজের শিক্ষকদের কোট, প্যান্ট, নেকটাই তিনি কিছুতেই পরবেন না। ''ও সাহেবি পোশাক পরা আমার দ্বারা হবে না। আমার চাকরির দরকার থাকলেও নেব না।" এই ছিলেন জীবনানন্দ। তিনি বাঙলা ছাড়বেন না আর বাঙ্গালিয়ানা তো তার রক্তের অন্তর্লীন স্রোত, স্থায়ী প্রতীক চিহ্ন।

তবে, ব্রজমোহন কলেজে জীবনানন্দের আবাল্য প্রিয় জন্মস্থান বরিশালের মোহময় নৈসর্গিক প্রাচুর্যের মধ্যে ১৯৩৫ থেকে ৪৬ পর্যন্ত ব্যয়িত ১১টি বছরই জীবনানন্দের অন্যপ্রসঙ্গে লেখা ''জীবন যে কাটিয়াছে বাঙলায় চারিদিকে বাঙালির ভিড় বহুদিন কীর্তন ভাসান গান, রূপকথা যাত্রা, পাঁচালির নরম নিবিড় ছন্দে..... যারা আমারে দিয়েছে তৃপ্তি।" বাস্তবিকই জীবনানন্দের কল্পনাপ্রবণ মানসপটে এই সময়টি ছিল শান্তি কল্যাণের। তাঁর কলমে উঠে আসতে থাকে জীবনের সেরা কবিতাপুঞ্জ—মৃত্যুর আগে, কুড়ি বছর পর, তুমুল জনপ্রিয় ও মুখে মুখে ফেরা বনলতা সেন, হাওয়ার রাত, নগ্ন নির্জন হাতের মতো বাংলা কাব্য জগৎকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলা কবিতাগুলি। এই সময়ই প্রকাশিত হয় ধূসর পাণ্ডুলিপি ও বনলতা সেন। একই সঙ্গে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী কিছু কবি, লেখক, বন্ধুবান্ধবও হয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে তো তিনি 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গও করেছিলেন। ৩৫ থেকে ১৯৪৬ এই সময় তিনি প্রায়শই কলকাতায় আসতেন ভাইয়ের বাসায়। জ্যোৎস্না ও নক্ষত্রখচিত রাতে কলকাতার পথে পথে শুরু হতো তাঁর প্রিয় নিশীথ অভিসার। সেই নৈশ নিরীক্ষণেরই সদা উচ্চারিত ফসল, ''কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।" যা হয়তো একটু বদলে সাগরপারের লন্ডন হতে চায়। সেই ৪০/৪২ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতায় মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাদের আনাগোনা ছিল। ছিল ভাড়াটে সৈন্যদেরও ভিড়। ''ফিরিঙ্গি যুবক কটি চলে যায় ছিমছাম থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে, হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে। নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো। তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক, বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।" জীবনানন্দের কল্পনার কক্ষপথ অনায়াসে দেশ মহাদেশ অতিক্রম করে এক কৃষ্ণাঙ্গ বনবাসীর দৃষ্টি দিয়ে কলকাতার মানুষের যান্ত্রিক জীবনের এক আপাত অস্বস্তিকর পর্যবেক্ষণ কাব্যায়িত করলেন।

কিন্তু চার চারটি কবিতার বই ছাপা হয়ে বেরোলেও জীবনানন্দ কারু বাসনার (শিল্পী হওয়ার দীর্ঘ লালিত যে কল্পনালোক) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা তখনও নিতান্তই মরীচিকা। জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে। এর ৬ মাসের মধ্যেই তিনি মারা যান। এই বইটির তুমুল সাফল্য পর পর নতুন সংস্করণ ও বাংলা ভাষার রবীন্দ্র উত্তর যুগের অবিসংবাদিত প্রধান কবি হওয়ার বিরল সম্মান কারুবাসনার চরিতার্থতা তাঁর অনুভূতি গোচর হলো না। এটি সমগ্র বাঙ্গালি জাতির দুর্ভাগ্য।

কিন্তু দেশভাগের পর যে জীবনানন্দ আবার বেকার হয়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় ফিরলেন সেই ১৯৪৬ সালে, তাঁর মনে তখন গভীর দোলাচল। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে এক চিঠিতে লিখছেন, 'আমি খুব সম্ভবত জাত সাহিত্য প্রেমিক। যে আবহাওয়ায় ছিলাম তাতে উত্তরকালে ভালো সাহিত্যরসিক হয়েই মুক্তিলাভ করা যায় না কিছু সৃষ্টি করারও সাধ হয়.....।" অর্থাৎ এই সময়কাল অবধি তিনি কবি প্রসিদ্ধি পাননি। অর্জন করতে পারেননি কোনো সাংসারিক নিরাপত্তা। এই সময় এই স্থির ও সংবেদনশীল মানুষটির জীবনে দেখা দিল নতুন উৎপাত। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলছেন, ''একদিন আমি যখন জীবনানন্দের বাড়ির নিকটেই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই পথে হঠাৎ জীবনানন্দের সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই তিনি আমাকে বললেন—আপনার পরিচিত কোন গুন্ডা আছে? দিতে পারবেন?" জীবনানন্দের কণ্ঠে এমন কথা বাঙ্গলি ভাবতে পারে? সহৃদয় জীবনানন্দ সেসময় তাঁর তিনটি ঘরের মধ্যে একটি এক অসহায় মেয়ের অনুরোধে তাকে ভাড়া দেন। কিন্তু অচিরেই দেখেন তিনি আদৌ অসহায় নন। নিত্য সন্ধ্যার পর তার ঘরে লোকজন, গান বাজনার হল্লা চলছে। কল্পনাবিলাসী, সৃষ্টিশীল মানুষটির এটিই ছিল কফিনের শেষ পেরেক। তিনি বহু রাত ঘুমতে পারতেন না। অস্থির হয়ে নিজের সাহিত্যিক অবস্থান খুঁজে পেতে গদ্য লেখা শুরু করলেন। একটু তা নজর না করলে মাল্যবান, সুতীর্থ, কারুবাসনা প্রভৃতির লেখক এবং তাঁর গদ্য অজানা থেকে যাবে। আসলে জীবনানন্দের সে সময় বা তাঁর মৃত্যুর কিছু পরেও যত লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তার বহুগুন ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছিল। জীবনানন্দ বিশারদ ভূমেন্দ্র গুহ তার বৃহৎ অংশ দেশ পত্রিকার সহযোগিতায় বহু পরে ছাপান। ''জীবদ্দশায় জীবনানন্দ আক্ষেপ করছেন, কারু বাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ই শিল্পসৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা.....কারুকর্মী এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে..... কিন্তু তবুও শিল্পীর জীবনের নিদারুণ ভবিতব্যতার পথ থেকে সংসারের যক্ষের শান্তিনিকেতনে পালিয়ে যেতে চায়নি,

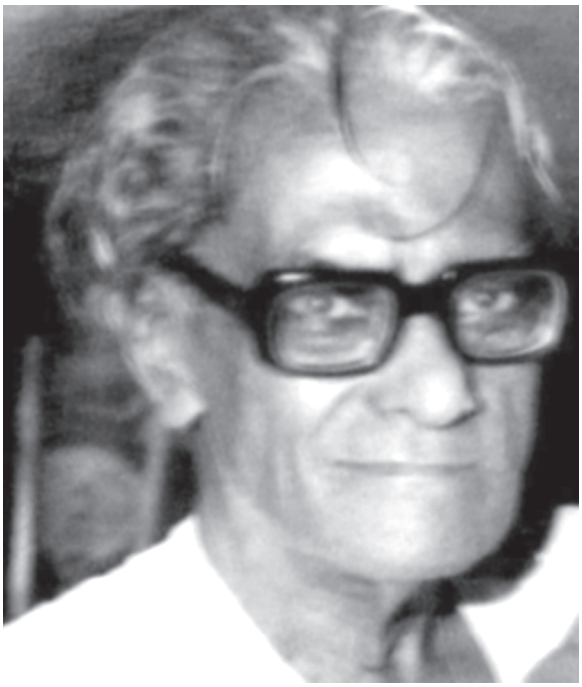

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

কেউ যেতে পারেনি..... (কারুবাসনা) মাত্র কটি পঙতিতেই জীবনানন্দ তাঁর সৃষ্টিকর্মের চরিত্র চিত্রন করেছিলেন। তিনি যে অর্থগৃধ্নু কোনো বাজারের কবি নন তাও পরিস্ফুট হলো।

তাঁর বিলাস উপন্যাসের অতি ক্ষুদ্রাংশ উদ্ধৃত করা হলো শুধু কারুবাসনা নয়, জীবনানন্দের উপন্যাসিক হবারও যে বাসনা ছিল তার একটু trailer রেখে যেতেই — ''পৌষের রাত প্রায় তিনটে হবে। কলকাতায় এবার শীত পড়েছে খুব। শান্তিশেখর যে ঘরটায় থাকে সেখানে দিনের বেলায় খুব কম রোদ পড়ে বলেই রাতে খুব প্রখরভাবে ঠাণ্ডা। কুঁকড়ে-সুকড়ে নিজের অজ্ঞাতসারে অবোধভাবে ছেঁড়া লেপ জড়িয়ে শুয়ে আছে সে। বাইরে কোথাও জল ঝরার শব্দ, কারো বিরাট চৌবাচ্চা ভরছে হয়তো—হয়তো রসাতলবাহী পাইপের জলধারা রাতের নিস্তব্ধতায় মানুষের আধোঘুমের কাছে ছলছলিয়ে চলকে ছলছলিয়ে কোথার থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন....।''

এই নিরবচ্ছিন্ন শব্দটির মাধ্যমেই জীবনানন্দ তাঁর কবি চরিত্রের লক্ষণ কালচেতনার বোধকে ছুঁয়ে নিজের কাব্যবৃত্তেই ফিরে গেলেন। তাঁর গদ্য নিয়ে বিশদ আলোচনা তাই নিষ্প্রোয়জন।

তিনি জীবনানন্দ যিনি অবলীলায় পাঠককে টেনে নিতে পারেন ইতিহাসের প্রাচীন অন্ধকার থেকে আলোর জগতে। ''সমস্ত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল আকাশে, এক তিল ফাঁক ছিল না; পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভেতর দেখেছি আমি অন্ধকার রাতে প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা। জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানির ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ।'' এ এক আশ্চর্য মায়ামেদুর জগৎ যেখানে আজকের বাঙ্গলার রাত ফিরে পায় সুদূর অতীতের বেবিলনের রানিকে। জীবনানন্দের দ্যুতিময় প্রতিভায় দেখে ফেলে প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির ভেজা চোখ।

আচ্ছা কেউ কি সত্যিই দেখেছে তেমন চোখ? এটিই জীবনানন্দের কাল থেকে কালাতীতের অভিযাত্রা। ইতিমধ্যে জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে বিভাগীয় প্রধানের চাকরি পান যা আমৃত্যু বজায় ছিল। তবে, বিশ্বের যে কোনো শ্রেষ্ঠ প্রতীক উপমা, রূপকল্প সমৃদ্ধ কবিতার সঙ্গে উল্লেখিত 'হাওয়ার রাত' কবিতাটি তাঁর অন্যান্য বহু কবিতার মতোই সমকক্ষতার অনায়াস দাবি করতে পারে। অবশ্য দীর্ঘকাল কল্পলোকচারী থাকলেন না জীবনানন্দ। তাঁকে যে ফিরতেই হবে তাঁর 'রূপসী বাঙলায়' যার দীর্ঘকালীন কুহকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছেন দার্শনিক কবি।

''সোনার স্বপ্নের সাধ কবে আর ঝরে
আমি চলে যাব ব'লে—চালতা ফুল কি আর ভিজিবে
না শিশিরের জলে.....চারিদিকে শান্ত বাতি-ভিজে গন্ধ
মৃদু কলরব, খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল—
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।''

নশ্বর থেকে অবিনশ্বরের আবিষ্কারে তাঁর মনোজগৎ এখন আলোকময়।

(চির আরাধ্য) বোধির সন্ধান হয়তো জীবনানন্দ পেয়ে গেছেন।

মাথার ভিতর স্বপ্ন নয়, প্রেম নয়, কোনো এক বোধ কাজ করে—(বোধ, ধূসর পাণ্ডুলিপি)।

অপার্থিব এক সত্য অনুভব তখন তাঁর চেতনায় দৃশ্যমান

পরের উচ্চারণটি করলেন প্রায় মন্ত্রদ্রষ্টার মতো —''....ইতিহাস

অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়, তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে; মানুষের মন জানে জীবনের মানে সকলের ভালো করে জীবনযাপন.....'' (এই সব দিনরাত্রি)।

কী শান্ত, স্নিগ্ধ, জীবনপ্রেমিক আবহমান বাঙ্গালিই না ছিলেন জীবনানন্দ।

উৎস—

১। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা–ভারবি
২। জীবনানন্দ—গোপালকৃষ্ণ রায়
৩। একটি নক্ষত্র আসে—অম্বুজ বসু
৪। সূর্যতৃষ্ণা—সম্পাদনা সঞ্জয় মাজি
৫। কবি জীবনানন্দ—শুদ্ধসত্ত্ব বসু
৬। হাওড়া গার্লস কলেজ উজ্বল উদ্ধার ও অন্যান্য।

दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर मंगलमय शुभ कामनाये
विश्व स्तर के पी. टी. एफ. ई. इन्सुलेटेड वायर,
केबल व नलिका, के निर्माता।

इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प लें कि हम भारत राष्ट्र
को सशक्त, संगठित और सक्षम बनाने में सहयोग करें।

गर्ग एसोसिएट्स
प्राइवेट लिमिटेड

M/s. Garg Associates Private Limited

Regd. Office : D-6, Meerut Road Industrial Area - 3
Ghaziabad - 201 003 (U.P.) INDIA

e-mail : sales@gargasso.com

Phone : 0120-2712128/2712039

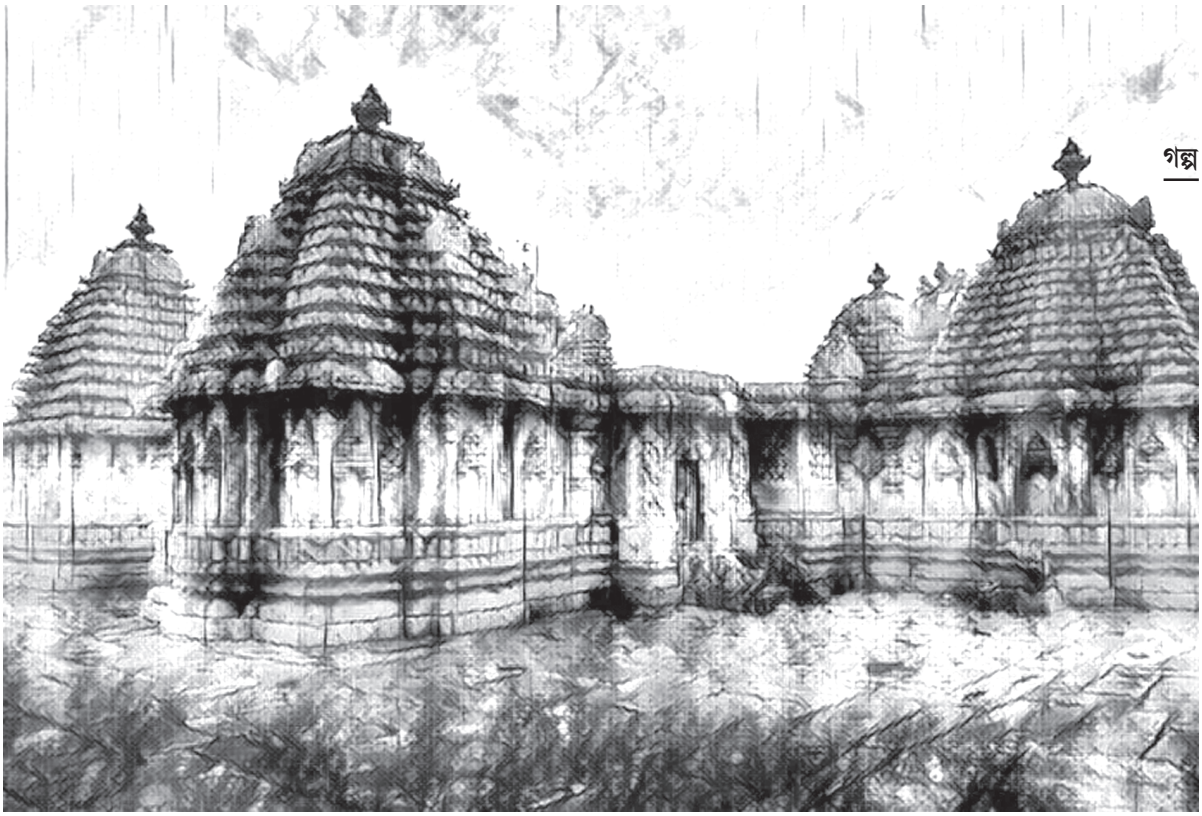

রক্তাক্ত লক্ষ্মণাবতী

গোপাল চক্রবর্তী

চিরশান্তির দেশ ভারতবর্ষ। মুসলমান আক্রমণের ফলে পশ্চিম ভারত সাময়িক অশান্ত হলেও পূর্বভারতে তার প্রভাব খুব একটা পড়েনি। সনাতন ধর্মের বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্যের মধ্যে কোথাও কোথাও বিরোধ থাকলেও সমাজকে তা সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। গৌড়বঙ্গে সে এক সুখের দিন। তখন সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব। রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর ঐশ্বর্যের শেষ নেই। অশীতিপর বল্লাল সেন রানি রামদেবীকে নিয়ে কয়েক বছর আগে বানপ্রস্থে গমন করেছেন। লক্ষ্মণ সেন যখন সিংহাসনে বসেন তখন তিনিও ষাট বছরের পরিণত প্রৌঢ়। পিতামহ বিজয় সেনের আমলেই তিনি গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপের রণক্ষেত্রে শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করেছিলেন। প্রৌঢ় হলেও এখনো রাজার শৌর্য-বীর্যের অভাব নেই। রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ধনভাণ্ডার উপচে পড়ছে। প্রজাদেরও গোয়ালভরা গোরু, গোলা ভরা ধান আর পুকুর ভরা মাছ। সারা দেশে এক অনির্বচনীয় শান্তি বিরাজ করছে। কবি শরণ, উমাপতিধর, গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব, পবনদূত রচয়িতা ধোয়ী রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলংকৃত করছেন। পিতা বল্লাল সেনের অসমাপ্ত 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের সমাপ্তির কাজে রাজা ব্যাপৃত। কলিঙ্গ থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত সুবিস্তৃত রাজ্যে সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান। লক্ষ্মণসেন দোর্দণ্ড প্রতাপে গাহরবালদেরও পরাজিত করেছিলেন। তবে গাহরবাল শক্তির অবক্ষয় মুসলমান আক্রমণকারীদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধহীন করেছিল। শক্তিধর গাহরবালরা ছিল বিদেশি আক্রমণকারীদের কাছে প্রতিরোধ প্রাচীর স্বরূপ।

তরাইনের ২য় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে মোহম্মদ ঘোরি দিল্লি দখল করল কিন্তু নিজে সিংহাসনে না বসে ক্রীতদাস এবং জামাতা কুতুবুদ্দিনকে সিংহাসনে বসিয়ে আফগানিস্তানে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। ভারতের ঐশ্বর্য আর সম্পদের লোভে বহু আফগান ভাড়াটে সৈন্য আর লুটেরার দল তখন দিল্লির আশেপাশে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাঠ তখনকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। যদিও গৌড়বঙ্গ তার প্রভাব থেকে মুক্ত।

গৌড়বঙ্গের মানুষ তখন যাত্রা, পাঁচালি আর বারোমাসে তেরো পার্বণে ব্যস্ত। এর মধ্যেই একটি সংবাদ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে অত্যন্ত বিচলিত করল। দিল্লির বাদশাহ্ কুতুবুদ্দিনের এক সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন-মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজি ওদন্তপুর বৌদ্ধমঠ আক্রমণ করে সেখানকার সমস্ত আবাসিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, সযত্নে রক্ষিত অমূল্য গ্রন্থরাজি ভস্মীভূত করেছে, অবাধে লুঠপাট করেছে। স্থানীয় অন্যান্য

মঠমন্দির গুলিও তার হিংস্র সেনাদের হাতে ধ্বংস হয়েছে। অসংখ্য মঠ বা বিহারের জন্য এই স্থানের নামই হয়েছিল বিহার। প্রসিদ্ধ কাশ্মীরি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচার্য শাক্যশ্রীভদ্র এই সময়ে পরিব্রাজকরূপে এই অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। ওদন্তপুর ও বিক্রমাশীলা বিহার তখন ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি নিজেও তুর্কিদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিলেন জগদ্দল বিহারে গিয়ে। এই সময় তুর্কি, আরব ধর্ম প্রচারকরা বাঙ্গলায় দলে দলে আসছে। তাদের বলা হতো দরবেশ আউলিয়া। তারা অনেকেই হঠযোগী ছিল, তাৎক্ষণিক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে স্থানীয় মানুষের মনে তারা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। তাদের অনেকেই কিছু কিছু স্থানীয় ভাষাও শিখে ফেলেছিল। তাদের ভবিষ্যদ্‌বাণীও অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। এদের অনেকে আবার কখনো কখনো হিন্দু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশেও ঘুরতো।

এই সময়ে বিচলিত রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় এলো এক ভিন্‌দেশি দৈবজ্ঞ, ভবিষ্যদ্‌বক্তা হিসাবে তার খ্যাতি চতুর্দিকে। রাজা তাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের পর মহার্ঘ আসনে উপবেশন করালেন। এই জ্যোতিষী রাজাকে রায় লখমনিয়া বলে সম্বোধন করল। বোঝা গেল না সে কোন দেশের বা কোন ধর্মের লোক। তাৎক্ষণিক কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে সেই দৈবজ্ঞ রাজা ও সভাসদ্‌দের বিমোহিত করে ফেলেছিল। এবার তার ঝোলা থেকে বেরুল কিছু দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা পুঁথি। কিছু দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করার পর সেই দৈবজ্ঞ ঘোষণা করল—অতি শীঘ্র কোনো যবন লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করবে। তার মুখমণ্ডল দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত, হস্ত হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বিত, সে যবন অপরাজেয়। আগন্তুকের কথায় ইতিপূর্বে সম্মোহিত রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রীমণ্ডলী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্যোতিষীরা রাজাকে পরামর্শ দিলেন অপরাজেয় তুর্কি যবনকে বাধা দিয়ে কাজ নেই। দেশ পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত।

অনুসন্ধান করে জানা গেল এই তুর্কি যবন আক্রমণকারীর আকৃতি হুবহু জ্যোতিষী বর্ণিত ব্যক্তির সাথে মিলে যাচ্ছে। রাজা লক্ষ্মণ সেন মন্ত্রী ও জ্যোতিষীবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। প্রয়োজনে প্রতিরোধের দৃঢ়সংকল্প নিয়ে তিনি লক্ষ্মণাবতীর প্রাসাদে অবস্থান করলেন। অনুগত সৈন্যদের সদাসতর্ক এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন। এদিকে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও বণিকরা পূর্ববঙ্গ, অসম ও অন্যান্য স্থানে পালিয়ে গেলেন। যাঁরা লক্ষ্মণাবতীতে থেকে গেলেন তাঁরাও সর্বদা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। বেশ কিছুদিন কেটে গেল, মানুষের আতঙ্কও ক্রমে কমতে শুরু করল। সেদিনও রাজা গঙ্গাতীরের উদ্যানে পায়চারি করলেন, স্নান সেরে মন্দিরে গিয়ে জপ করলেন, সামান্য প্রাতরাশ গ্রহণ করে রাজসভায় এলেন। যথারীতি সভা শেষ করলেন।

রাজা তখন মধ্যাহ্নভোজনে রত। এই সময় কয়েকজন যবন কয়েকটি তেজি আরবি অশ্ব নিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত। সেই সময় আরব বণিকেরা তেজি আরবি অশ্ব বিক্রির জন্য রাজা, মন্ত্রী এবং উচ্চ পদাধিকারী ধনাঢ্য ব্যক্তিদের দ্বারে উপস্থিত হতো। এইসব বণিকদের আগমনে কোনো বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল না। তাই এই বণিকদেরও কেউ গতিরোধ করল না। বিনা বাধায় তারা লক্ষ্মণাবতীর রাজপ্রাসাদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলো। প্রাসাদের রক্ষীদের মনেও কোনো সন্দেহ হলো না, কারণ ইতিপূর্বে বহু যবন অশ্ববিক্রেতা এভাবে এসেছে। তেজি আরবি অশ্বের প্রতি রায় লখমনিয়ার দুর্বলতার কথা বিদেশি অশ্ববিক্রেতারা জানে। প্রাসাদরক্ষীরা তখন অশ্বগুলির আকৃতি প্রকৃতি দেখতে ব্যস্ত। মোট উনিশটি অশ্ব উনিশজন বিক্রেতা। হঠাৎ সর্দারের নির্দেশে অশ্ব-বিক্রেতারা লম্বা জোব্বার ভিতর থেকে তলোয়ার বের করে প্রাসাদরক্ষীদের শিরচ্ছেদ করতে শুরু করল। এই অতর্কিত আক্রমণে রক্ষীরা প্রতিরোধের অবকাশ পেল না। প্রচণ্ড আর্তনাদ ও কোলাহলে প্রাসাদ প্রকম্পিত হলো। অবশিষ্ট রক্ষী এবং রাজ কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে এসে দেখল জ্যোতিষী বর্ণিত সেই দীর্ঘ শ্মশ্রু ও আজানুলম্বিতবাহু যবন তার আঠারোজন অনুচর নিয়ে প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। আর অপ্রস্তুত রক্ষীরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। সংবাদ গেল ভোজনরত রাজার কাছে। আহার অসমাপ্ত রেখে ছুটে এলেন রাজা। প্রতি আক্রমণের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সৈন্যরা কোথায়? কেউ তখন স্নানে রত, কেউ-বা আহারে, কেউ হয়তো আহারের পর বিশ্রাম নিচ্ছে। বলিষ্ঠ হাতে তলোয়ার ধরলেন প্রৌঢ় রাজা। দৃঢ়পদে এগিয়ে গেলেন শত্রুসংহারে, কিন্তু ততক্ষণে অবশিষ্ঠ যবন বাহিনী প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। লক্ষ্মণাবতীর সেনারা তখনও সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি, যারা অস্ত্র ধারণ কতে পেরেছিল তারাও বহু সংখ্যক যবন সেনার ক্ষিপ্র আক্রমণে বিধ্বস্ত। মাত্র কতিপয় সেনা নিয়ে প্রবল যুদ্ধ করতে রাজা লক্ষ্মণ সেন যবন সেনাদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে গেলেন। তখন রাজার অনুগত সেনারা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে দিতে রাজাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অনন্যোপায় রাজা লক্ষ্মণ সেন নগ্নপদে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে পরিবারবর্গ সহ চলে গেলেন গঙ্গার ঘাটে। সেখানে রাজকীয় বজরা বাঁধা, রাজা সপরিবারে বজরায় উঠে বজরা ছাড়তে আদেশ দিলেন। মাঝি মল্লারা হতবাক্। রাজা আদেশ দিলেন— পূর্ব দিকে চালাও।

ইতিহাস বলছে সময়টি খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের শেষ পাদ।

এই অশ্ববিক্রেতারা আসলে দিল্লির যবন শাসক কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি ইখ্‌তিয়া উদ্দিন মুহম্মদ বিন্ বখতিয়া খলজি ও তার অনুগত সেনা। কিছুদিন আগে সে বিহার আক্রমণ ও ধ্বংস করেছে।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন্-খতিয়ার খল্‌জি এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাগ্যান্বেষী তুর্ক্ জাতীয় যুদ্ধব্যবসায়ী। দিল্লির সুলতান তাকে



বিহার ও বঙ্গদেশ জয়ের জন্য আদেশ করেনি। বখতিয়ার স্বেচ্ছায় বিহার বাঙ্গলায় ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছিল। গাহড়ওয়াল সামন্তরাজাদের পরাভূত করে বখতিয়ার বিহার অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় লুঠতরাজ আরম্ভ করে দিল। ধনসম্পত্তির লোভে প্রচুর খল্‌জি ও তুর্কি দস্যু তার সঙ্গে যোগদান করল। তাদের নিয়ে তৈরি হল বিরাট সেনাদল। যে সেনাদলের কোনও আদর্শ ছিল না, কিন্তু বিক্রম ছিল। বাঙ্গলা রাজমহল, তেলিয়াগড় সীমান্তে যে প্রহরা ছিল না তা নয় কিন্তু বখ্‌তিয়ার তার বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করল ঝাড়খণ্ডের দুর্ভেদ্য অরণ্য অতিক্রম করে। সে পথে পাহারা রাখার প্রয়োজনবোধ করেনি লক্ষ্মণাবতীর রক্ষকরা। উৎসাহের আতিশয্যে বখতিয়ার এত দ্রুত অশ্ব চালনা করেছিল যে মাত্র আঠারোজন অশ্বারোহী তাকে অনুসরণ করতে পেরেছিল। আর তারাই অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে তাণ্ডব চালায়। মূলবাহিনী পৌঁছাবার পর শুরু হয় ভয়াবহ হত্যালীলা আর অবাধ লুঠ-তরাজ। লক্ষ্মণাবতীর মাটি রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেল। বাঙ্গলার সে এক ভয়ংকর দুর্দিন। রাজা নেই, রক্ষক নেই, আইনের শাসন নেই, ধর্ম রক্ষার উপায় নেই, সম্পদ রক্ষার ক্ষমতা নেই। সবচেয়ে কঠিন ছিল তুর্কি দস্যুদের হাত থেকে নারীর সম্মান রক্ষা। লক্ষ্মণাবতী ছেড়ে দলে দলে লোক পালাতে শুরু করল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে। রায় লখমনিয়ার (লক্ষ্মণ সেনের) প্রাসাদ ও নগর অধিকারের পর বখ্‌তিয়ার কয়েকদিন ধরে নদীয়া বিধ্বস্ত করে গৌড় লখ্‌নৌতিতে (লক্ষ্মণাবতী) নিজ শাসন কেন্দ্র স্থাপন করল। শুরু হল বাঙ্গলায় তুর্কি শাসন।

* * * * * * *

অনেকের দৃষ্টিতে রাজা লক্ষ্মণ সেন ভীরু, কাপুরুষ। সত্যিই কি তাই? দেখা যাক্ ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় কী বলেছেন—

''চারিদিকে যখন এই আতঙ্ক ও পরাজয় মনোবৃত্তির আচ্ছন্নতা, তখন বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনের নিজের আচরণ সত্যই প্রশংসনীয় এবং যথার্থ রাজকীয় মর্যাদাবোধের পরিচায়ক। শত্রু অগ্রসরমান জানিয়া এবং উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গের পরামর্শে বিচলিত হইয়া তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করেন নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে ও কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। তারপর যখন প্রায় সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, পায়ের নীচ হইতে মাটি খসিয়া পড়িল, শত্রুসৈন্য অতর্কিতে এবং অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে রাজ প্রাসাদ আক্রমণ ও অধিকার করিল, তখন তাঁহার পলায়ন ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। লক্ষ্মণ সেন কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি হতভাগ্য। সমাজ ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে, ইতিহাসচক্রের জটিল ও অমোঘ আবর্তনে বাঙ্গলার ইতিহাস শতাব্দীকাল ধরিয়া যে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল লক্ষ্মণ সেন তাহার শেষ অধ্যায় মাত্র। তাঁহার ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য ও অন্যান্য গুণাবলী তাঁহাকে কিংবা বঙ্গদেশকে সেই পরিণতির হাত হইতে বাঁচাইতে পারে নাই, পারা সম্ভব ছিল না।''

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস আমরা জানতে পারি না, যেটুকু জানি তাও পক্ষপাত দুষ্ট। নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের মধ্যেও কিছু কিছু সত্য মাঝে মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এবার দেখি ঐতিহাসিক মিন হাজ-উস্-সিরাজ কী বলেছেন লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে—

''রায় লখমনিয়া মহৎ রাজা ছিলেন। হিন্দুস্থানে তাঁহার মতো সম্মানিত রাজা আর কেহ ছিল না। তাঁহার হাত কাহারও উপর কোনও অত্যাচার অবিচারে অগ্রসর হইত না। তিনি সহস্র কড়ির কমে কাহাকেও কিছু দান করিতেন না।''

লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করে লক্ষ্মণ সেন নৌপথে চলে গেলেন পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলে। সেখানে রাজধানী স্থাপন করে আরও কয়েক বছর রাজত্ব করার পর তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অবসান হল বাঙ্গলার এক গৌরবময় রাজনৈতিক ইতিহাসের। যদিও তাঁর বংশধরেরা আরও অনেক বছর সেন বংশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। ▯

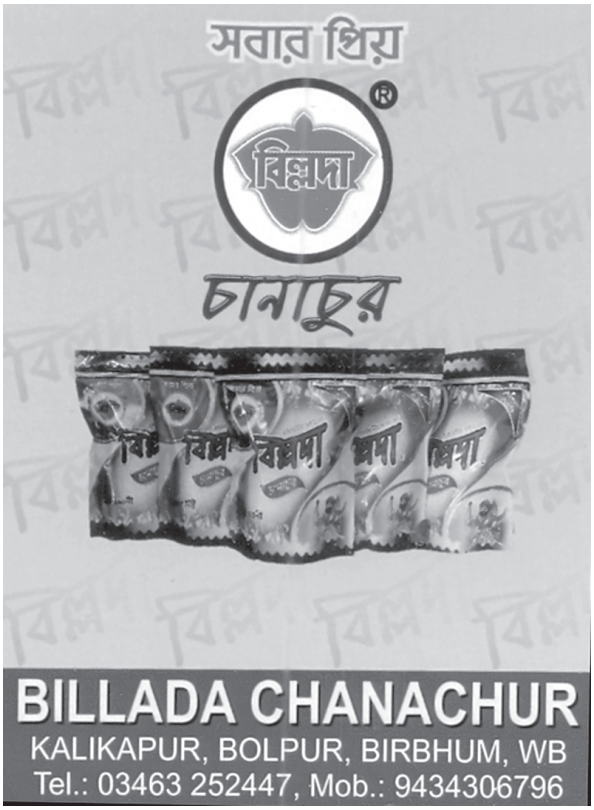

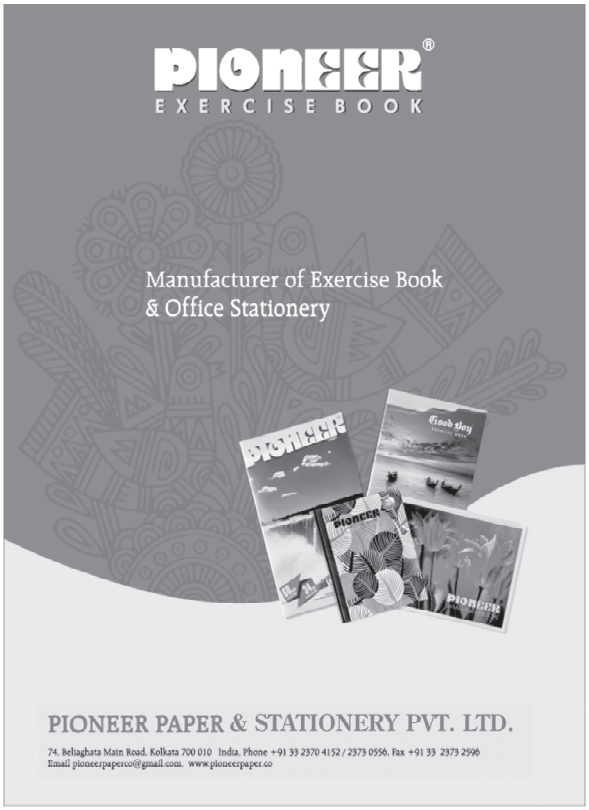

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫



মহাভারতের সমাজ

ড: জয়ন্ত কুশারী

"One who writes for another in secret" —এই হলো একজন Secretary বা সচিবের সংজ্ঞা। তবে আজ এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই একজন সচিব। কাজের জগতে এখন তিনি আড়েবহরে অনেকটা বেড়ে গেছেন। Secretary শব্দটি কিন্তু ল্যাটিন শব্দ 'Secretarious' থেকে এসেছে।

কিন্তু না, ইউরোপ, এশিয়া কিংবা বহির্ভারতের কোনো দেশ সচিবের সংজ্ঞা বিষয়ে মন্তব্যটি করেনি। ভাবতে ভালো লাগে মহাভারতের কালে প্রথম বক্তব্যটির প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক পরে ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করে। সালতামামি-র বিচারে মহাভারতের আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বা ২৯০০ অব্দে। এটির স্বীকৃতি লাভ করে বহু পরে।

গণেশ ঠাকুরই হলেন বিশ্বের প্রথম Secretary বা সচিব। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হলেন তাঁর নিয়োগকর্তা। রীতিমতো Interview দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করে গণেশ কাজটি পান। উভয়ের মধ্যে চুক্তি সাপেক্ষে Service Rule মেনে মহাভারত গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন ব্যাখ্যাতা ব্যাসদেব এবং লিপিকার ভগবান গণেশ। পরবর্তী কালে এই গ্রন্থটি বিশ্বের স্বীকৃত চারটি মহাকাব্যের অন্তর্গত। আর যার ভাষা হলো সংস্কৃত।

গণেশ বলেছিলেন, ঋষিবর, আপনার এই গ্রন্থটি আমি লিখব গোপনে। তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে। তবে গোপনীয়তা রক্ষা করা যেন যথাযথ ভাবে হয়। নাওয়া-খাওয়া-শোওয়ার সময় বাদ দিলে আমার লেখনী ক্ষণমাত্র থামবে না। ব্যাস ভাবলেন, আমার রচনাতে আট হাজার আটশো এমন কূটশ্লোক আছে, যার অর্থ কেবল আমি আর আমার পুত্র শুকদেব বুঝতে পারে, সঞ্জয় পারেন কিনা সন্দেহ। তাই গণেশকে বললেন, আমি যা বলে যাব আপনি তার অর্থ না বুঝে লিখতে পারবেন না। গণেশ বললেন, তাই হবে। গণেশ সর্বজ্ঞ হলেও কূটশ্লোক লেখার সময় তাঁকে ভাবতে হতো, সেই অবসরে ব্যাস অন্য বহু শ্লোক রচনা করতেন।

উপাখ্যান সমেত এই মহাভারতে লক্ষ শ্লোক আছে। উপাখ্যান ভাগ বর্জন করে ব্যাস চব্বিশ হাজার শ্লোকে এক সংহিতা রচনা করেছেন। পণ্ডিতগণের মতে তাই প্রকৃত মহাভারত। তাছাড়া ব্যাস দেড়শো শ্লোকে সমস্ত পর্বের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে দিয়েছেন। ব্যাস পূর্বে নিজের পুত্র

শুকদেবকে এই গ্রন্থ পড়িয়ে তারপর অন্যান্য শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন। তিনি ষাট লক্ষ শ্লোকে আর একটি মহাভারত সংহিতা রচনা করেছিলেন। তার ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনেরো লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, চৌদ্দ লক্ষ শ্লোক গর্ন্ধব লোকে আর বাকি এক লক্ষ শ্লোক বিশিষ্ট মহাভারতটি মনুষ্যলোকে প্রচলিত আছে। এত কিছুর লিপিকার কিন্তু সেই একজনই—সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি হলেন শ্রী গণেশ। এই অমিত শক্তিধর লিপিকার আজও বিশ্বের বিস্ময়। কেননা, আজকের অত্যাধুনিক যন্ত্রনির্ভর প্রযুক্তিসম্বল মুদ্রণ ব্যবস্থা স্বল্প সময়ে এই অসাধ্য সাধন করতে পারবে কিনা আমরা অন্তত জানা নেই। জানি না, ভাবীকাল এর উত্তর দিতে পারবে কিনা। পৃথিবীকে সর্বকালের সর্বলোকের সর্বজ্ঞকে উপহার দিল মহাভারত।

মহাভারতের কালে চতুর্বর্ণের মানুষই বাস করত। তাঁরা হলেন— (১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য ও (৪) শূদ্র। গুণ ও কর্ম অনুযায়ী এই বর্ণ বিভাগ। চারবর্ণের পরিবারভুক্ত মানুষেরাই সমাজের সদস্য বলে বিবেচিত হতো। কেননা সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। আবার অনেকগুলি সমাজের সমবায়ে একটি বৃহৎ অঞ্চল। ধীরে ধীরে এইভাবে দেশ। আর অনেকগুলি দেশ নিয়ে এই পৃথিবী। আবার চতুরাশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বাণপ্রস্থ- সন্ন্যাস বলবৎ ছিল এই সময়।

শিক্ষা ছিল মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। (১) শাস্ত্র (২) শস্ত্র। শিক্ষা—কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দ-জ্যোতিষ। গৌতমের ন্যায়, পিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, কণাদের বৈশেষিক। বেদ-স্মৃতি -পুরাণ-তন্ত্র-সাহিত্য—চৌষট্টি কলা বিদ্যা। এছাড়াও ছিল নানান বৃত্তিমুখী শিক্ষা। এই বৃত্তিমুখী শিক্ষার উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান। পারিবারিক পেশাকেও গুরুত্ব দেওয়া হত এই সময়ে। পেশাগত শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল তৎকালীন সমাজে। Medicine ও Surgery চিকিৎসার দুটি বিভাগই অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান এই দুটি শাখায় বিশ্বের নজর কেড়েছিল মহাভারতের কালের ভারত। নৃত্য, গীত, নাটক, অঙ্কন প্রভৃতি গান্ধর্ব বিদ্যা এই সময় চরমোৎকর্ষতা লাভ করেছিল।

ধনুর্বিদ্যা ছাড়াও শস্ত্রবিদ্যায় গদা, মুষ্টি, তরোয়াল, বর্শা—যুদ্ধচালনার অনুপুঙ্খ বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হতো এই সময়ে। Preg-Card-এর মাধ্যমেই অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে Pregnancy Test করা হত যার ফল জানতে অন্তত মিনিট দুয়েক সময় লাগে। প্রসুতির মূত্রের ঘ্রাণের মাধ্যমে মিনিট খানেকের মধ্যে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে দিতেন তিনি বন্ধ্যা অথবা সন্তান প্রসবিনী কিনা। এমন সন্ধান পাই, মহাভারতের বিরাট পর্বের নবম অধ্যায়ের ১৪ নম্বর শ্লোকে। সহদেবের সঙ্গে বিরাট রাজার পরিচয় প্রসঙ্গে মাদ্রীপুত্রের (এখানে তাঁর নাম তন্ত্রিপাল) এই গুণপনার বিষয়টি জানতে পারি—

''ঋষভানপি জানামি রাজন্ পূজিত লক্ষণান্।
যেষাং মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে।।''

এই সময়ের পূর্তকর্মেও যে চমৎকারিত্ব আমরা দেখতে পাই তা এ যুগেও বিস্ময়ের অবকাশ রাখে। দানবকুলের বিশ্বকর্মা ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে যে সভাগার যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়েছিলেন তা এককথায় অনির্বচনীয়। দৈর্ঘ্যে দশ হাজার, প্রস্থে দশ হাজার হাত পরিমিত এই সভাস্থান ছিল সর্বঋতুর উপযুক্ত। ময় এমন দিব্য মণিময় সভা নির্মাণ করলেন যার দীপ্তিতে সূর্যের প্রভাও পরাস্ত হলো। এই বিশাল সভা নবোদিত মেঘের ন্যায় আকাশ ব্যাপ্ত করে রইল। তার প্রাচীর, তোরণ ও রত্নময় অভ্যন্তর বহুবিধ দ্রব্যে ও চিত্রে সজ্জিত। কিঙ্কর নামে আট হাজার আকাশচারী মহাকায়, মহাবল রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। ময়দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন তার



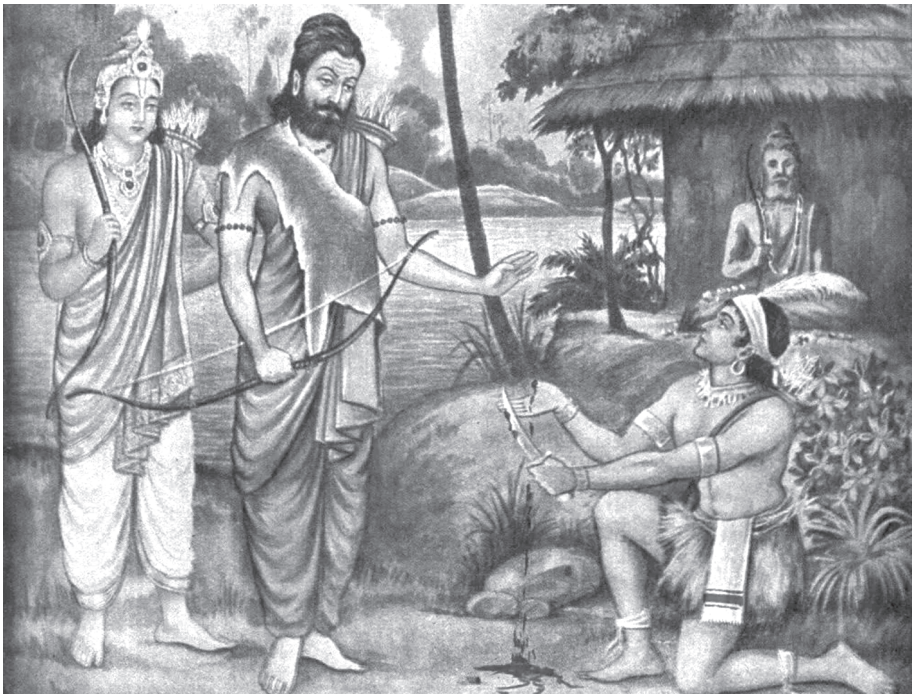

সোপান স্ফটিক নির্মিত। জল অতি নির্মল।

এখন আসা যাক্, তদানীন্তন সমাজে শাসন ব্যবস্থা কীভাবে সাজানো হয়েছিল। ত্রিস্তরীয় শাসনব্যবস্থা বলবৎ ছিল এই সময়। সেগুলি যথাক্রমে ১) তাত্ত্বিক, (২) প্রশাসনিক, (৩) প্রান্তিক। তাত্ত্বিকের দুটি স্তর—(১) নীতি প্রণয়ন ও (২) বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার। নীতি প্রণয়নের ২টি স্তর। (১) প্রায়োগিক ও (২) শৈক্ষিক। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারের ২টি স্তর। (১) প্রায়োগিক (২) শৈক্ষিক। প্রশাসনিকের ৩টি স্তর। (১) আইনশৃঙ্খলা (২) কর ব্যবস্থা, (৩) পরিষেবা। কর ব্যবস্থার দুটি স্তর (১) প্রত্যক্ষ (২) পরোক্ষ। পরিষেবার চারটি স্তর। (১) শিক্ষা, (২) স্বাস্থ্য, (৩) পূর্ত, (৪) ত্রাণ। প্রান্তিক ২টি স্তর। (১) সম্পদ সংগ্রহ (২) তৃণমূল স্তর। সম্পদ সংগ্রহের ৩টি স্তর। (১) খনিজ, (২) কৃষিজ, (৩) প্রাকৃতিক।

আইন-শৃঙ্খলা বা Law & Order-এর বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হতো। আজকাল Good governance কথাটি খুবই প্রচলিত, যার অর্থ হলো সুশাসন। শাসনের দুটি দিক। একটি তাত্ত্বিক দিক, অপর দিকে তত্ত্বের রূপায়ণ। স্বাভাবিক ভাবেই এখানে তত্ত্বের রূপায়ণ যারা করবেন অর্থাৎ Executor-দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে কল্যাণমুখী তত্ত্বের অভাব নেই। আসল অভাব লোককল্যাণে নিবেদিত দক্ষ রূপকার (Skilled executor)-এর। তার সঙ্গে একইভাবে এসে যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science & Technology)-র কথা। এর সঠিক প্রয়োগে একদিকে যেমন উদ্যোগের তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী উভয় ফল পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই উদ্যোগের পিছনে ন্যূনতম খরচ, শ্রম ও সময় (Minimisation of cost, labour & time) লাগে। তাই এগুলির প্রয়োগ করা হতো যেমন শিক্ষা-পাঠ্যসূচিতে ঠিক তেমনই ঔদ্যোগিক বা বাস্তবিক ক্রিয়াকলাপে।

প্রশাসনিক দিকটা পুরোটাই কেন্দ্রীয় স্তরে সামলাতেন রাজবংশীয়রা। প্রশাসনিক গতি যাতে মুখ থুবড়ে না পড়ে এবং গতি যাতে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয় এজন্য কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। কারণ, কর হলো প্রশাসনের কাছে অক্সিজেনের মতো। তবে প্রজাবর্গ যাতে করভারে পীড়িত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বার্ষিক আয়ের এক ষষ্ঠাংশ আয়কর হিসাবে ধার্য করা হতো। এছাড়াও সম্পত্তি (স্থাবর-অস্থাবর) করও নেওয়া হতো। সেটি অত্যন্ত নগণ্য। আর দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের থেকে কোনোপ্রকার কর নেওয়া হতো না। অঙ্গরাজ্য, করদরাজ্যদের কাছ থেকে কর নেওয়া হতো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুইভাবেই। সম্পদ সংগ্রহও ছিল একটি রুটিন মাফিক কাজের আওতায়। পরিবর্তে ছিল যোজনা বরাদ্দ। প্রয়োজন অনুসারে তা বরাদ্দ করা হতো। আর ছিল পরিষেবা দান। এই তালিকায় ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত ও ত্রাণ। এই ব্যাপারে প্রশাসন ছিল অত্যন্ত উদার। অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনুদান দেওয়া হতো। প্রশাসকের আরেকটি আয়ের পথ ছিল পরদেশ আক্রমণ এবং পরাজিত দেশের ধন-সম্পত্তি ছিল আয়ের অন্যতম উৎস। প্রশাসন ও পরিষেবাকে একেবারে তৃণমূল স্তরে দেওয়ার জন্য প্রান্তিক শাসনও বলবৎ ছিল। একনজরে তা একবার দেখে নেওয়া যাক। বলা হচ্ছে—

''গ্রাম্যসাধিপতিঃ কার্য্যে দশগ্রাম্যাস্তথা পরঃ।
দ্বিগুণায়াঃ শতস্যৈকং সহস্রস্য চ কারয়েৎ।।
যানি গ্রাম্যাণি ভোজ্যানি গ্রামিকস্তান্যুপাশ্নিয়াৎ।
দশপস্তেন ভর্ত্তব্যস্তেনাপিদ্বিগুণাধিপঃ।।

অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি ছিলেন। তাঁর ওপরে দশ গ্রামের এক অধিপতি। তাঁর ওপরে বিশ গ্রামের একজন অধিপতি। এইভাবে শত গ্রামের এবং সহস্র গ্রামের এক একজন অধিপতি থাকতেন। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ অধিকারে

উৎপন্ন খাদ্যের উপযুক্ত অংশ পেতেন। রাজা নানাবিধ কর আদায় করতেন, কিন্তু করভারে প্রজাদের অবসন্ন করতেন না।

প্রজাদের ধনসম্পত্তি রক্ষাকে মহারাজ যুধিষ্ঠির কত গুরুত্ব দিতেন সেবিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, ''নৃশংস নীচাশয় লোকে আমাদের গোধন হরণ করেছে। যে রাজা শস্যাদির ষষ্ঠ ভাগ কর নেন অথচ প্রজাদের রক্ষা করেন না তাঁকে লোকে পাপাচারী বলে। ব্রাহ্মণের ধন চোরে নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিকার করুন।'' অর্জুন ব্রাহ্মণদের আশ্বাস দিয়ে অস্ত্র আনতে গেলেন। কিন্তু যে গৃহে অস্ত্র ছিল সেই গৃহেই তখন দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বাস করছিলেন। অর্জুন সমস্যায় পড়ে ভাবলেন, যদি ব্রাহ্মণের ধনরক্ষা না করি তবে রাজা যুধিষ্ঠিরের মহা অধর্ম হবে, আর যদি নিয়মভঙ্গ করে তাঁর ঘরে যাই তবে আমাকে বনবাসে যেতে হবে। যাই হোক, আমি ধর্ম পালন করব। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ঘরে গেলেন এবং তাঁর সম্মতিক্রমে ধনুর্বাণ নিয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে এসে বললেন, শীঘ্র চলুন। চোরেরা দূরে যাওয়ার আগেই তাদের ধরতে হবে। অর্জুন রথারোহণে যাত্রা করে চোরদের শাস্তি দিয়ে গোধন উদ্ধার করে ব্রাহ্মণদের দিলেন এবং ফিরে এসে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমি নিয়মভঙ্গ করেছি। আজ্ঞা দিন, প্রায়শ্চিত্তের জন্য বনে যাব। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি আমার ঘরে এসেছিলে সেজন্য আমি অসন্তুষ্ট হইনি। জ্যেষ্ঠের ঘরে কনিষ্ঠ এলে দোষ হয় না। তার বিপরীত হলেই দোষ হয়। অর্জুন বললেন, আপনাদের মুখেই শুনেছি—ধর্মাচরণে ছল করবে না। আমি আয়ুধ (অস্ত্র) স্পর্শ করে বলছি, সত্য থেকে বিচলিত হব না। তারপর অর্জুন বারো বছরের জন্য বনে গেলেন।

রাজার চার প্রকার মিত্র ছিল। (১) সমার্থ। অর্থাৎ যাঁর স্বার্থ রাজার স্বার্থের সমান। (২) ভজমান অর্থাৎ অনুগত। (৩) সহজ অর্থাৎ আত্মীয়। (৪) কৃত্রিম অর্থাৎ অর্থ দ্বারা বশীভূত। এছাড়া রাজার পঞ্চম মিত্র হলেন ধর্মাত্মা অর্থাৎ তিনি যে পক্ষে ধর্ম দেখেন সেই পক্ষেরই সহায় হন। সংশয় স্থলে নিরপেক্ষ থাকেন। বিজয় লাভের জন্য রাজা ধর্ম ও অধর্ম দুইই অবলম্বন করতেন। আর চার প্রকার মিত্রের মধ্যে ভজমান ও সহজই শ্রেষ্ঠ। অপর দুজন আশঙ্কার পাত্র। একই কাজের জন্য দু-তিনজনকে মন্ত্রী করা হতো না। কারণ, তাঁরা পরস্পরকে সইতে পারতেন না।

কোনো রাজকর্মচারী যদি রাজধন চুরি করে, তবে যে লোক তা জানাবে তাকে রাজা রক্ষা করতেন। নইলে চোর রাজকর্মচারীকে মেরে ফেলত। যিনি লজ্জাশীল, ইন্দ্রিয় জয়ী, সত্যবাদী, সরল ও উচিতবক্তা, এমন লোকই ছিল সভাসদ হওয়ার যোগ্য। সদ্‌বংশজাত, বুদ্ধিমান, রূপবান, চতুর ও অনুরক্ত লোককে পরিজন নিযুক্ত করা হতো। অপরাধীকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেওয়া হত। ধনীর অর্থাৎ সবলের অপরাধে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড আর দরিদ্রকে কেবল কারাদণ্ড দেওয়া হতো, তাদের অপরাধের নিরিখে। দুর্বৃত্তগণকে প্রহার করে দমন করা হতো, আর সজ্জনকে মিষ্টবাক্যে এবং উপহার দিয়ে পালন করা হতো। রাজা সকলেরই বিশ্বাসভাজন ছিলেন কিন্তু নিজে কাউকেই বিশ্বাস করতেন না, এমনকী নিজের সন্তানকেও নয়।

যদি শত্রুর আক্রমণের ভয় উপস্থিত হয় তবে রাজা সেই ভয়ের বিষয় প্রজাদের জানিয়ে বলতেন, তোমাদের রক্ষার জন্য আমি ধন প্রার্থনা করছি। ভয় দূর হলে সেই ধন ফিরিয়ে দেব। তারাও রাজি হতো। কারণ, শত্রু যদি ধন কেড়ে নেয় তাহলে তা আর ফিরে পাওয়ার আশা থাকবে না।

ক্ষত্রিয় রাজা বর্মহীন বিপক্ষকে আক্রমণ করতেন না। তিনি শঠ যোদ্ধার সঙ্গে শঠতার দ্বারা, ধার্মিক যোদ্ধার সঙ্গে ধর্মানুসারে যুদ্ধ করতেন। নিরস্ত্র বা বাহনচ্যুত শত্রুকে হত্যা করা অন্যায় বলে গণ্য হতো। নিয়ম লঙ্ঘন করলে যোদ্ধা নিন্দাভাজন হতেন। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। রাত্রিকালে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে রাত্রিতেও যুদ্ধ হতো। ধ্বজদণ্ড রথের ভিতর থেকে উঠত। রথী আহত হলে ধ্বজদণ্ড ধরে নিজেকে সামলাতেন। অর্জুন ও কর্ণের রথ শব্দহীন বলে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধকালে রাজা

With Best Compliments from :-

Banwarilal Associates Pvt. Ltd.

B-17, Ashok Nagar
Ghaziabad
Uttar Pradesh
Pin - 201001

বলতেন, ''আমার লোকেরা বিপক্ষ সৈন্য বধ করছে তা আমার প্রিয়কার্য নয়। আহা, সকলেই বাঁচতে চায়।''

দেশ শাসনে রাজাদের শৈথিল্য না থাকলেও সমাজের বিশিষ্ট জনেরা এবং বিজ্ঞজনেরা যা পরামর্শ দিতেন তার বাস্তাবায়ন করতে তাঁদের কুণ্ঠাবোধ করতে দেখা যায়নি। এমন একটি ঘটনার উল্লেখ সভাপর্বে রয়েছে। একদিন দেবর্ষি নারদ, পারিজাত, রৈবত, সুমুখ ও সৌম্য এলেন যুধিষ্ঠিরের রাজসভায়। রাজকীয় অভ্যর্থনার পর নারদ প্রশ্নচ্ছলে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, বীর, বুদ্ধিমান, পবিত্রস্বভাব, সদ্‌বংশজাত ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করবে। পররাষ্ট্র জয় করে যে ধন-রত্ন পাওয়া যাবে তার ভাগ প্রধান যোদ্ধাদের যোগ্যতা অনুসারে দেবে। সৈন্যগণকে যথাকলে খাদ্য ও বেতন দেবে। তোমার যা আয় তার অর্ধেক বা একতৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশে নিজের ব্যয় নির্বাহ করবে। গণক অর্থাৎ Accountant ও লেখক অর্থাৎ করণিক (Clerk) ও নিরীক্ষক অর্থাৎ Auditor প্রত্যহ পূর্বাহ্নে তোমাকে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেবে। লোভী, চোর, বিদ্বেষী আর অল্পবয়স্ক লোককে কাজের ভার দেবে না। তোমার দেশে যেন বড়ো বড়ো জলপূর্ণ তড়াগ অর্থাৎ পুষ্করিণী থাকে, যাতে কৃষিকাজ কেবল বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল না হয়। কৃষকদের যেন বীজ ও খাদ্যের অভাব না হয়। তারা যেন অল্প সুদে ঋণ পায়। নারীরা যেন যথাযোগ্য সম্মান পায়। মিষ্ট বাক্যে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। কিন্তু গোপনীয় বিষয় তাদের বলবে না। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ হলে বিচারকরা যেন উৎকোচ বা ঘুষ নিয়ে অন্যায় বিচার না করেন। অন্ধ-মূক-পঙ্গু ও ভিক্ষুদের পিতার ন্যায় পালন করবে।
নিদ্রা-আলস্য-ভয়-ক্রোধ- মৃদুতা ও দীর্ঘসূত্রিতা এই ছয় দোষ পরিহার করবে।

চার প্রকার বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতের কালে। স্বভাব-চরিত্র, বিদ্যা-কুল ও কার্য দেখে গুণবান পাত্রে কন্যাদানকে 'ব্রাহ্মবিবাহ'। বর-কন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় বিবাহকে 'গান্ধর্ববিবাহ'। ধন দিয়ে কন্যা ক্রয় করে বিবাহকে 'আসুরবিবাহ' এবং আত্মীয়বর্গকে হত্যা করে কান্নায় ভেঙে পড়া কন্যার বিবাহকে 'রাক্ষসবিবাহ' বলা হয়। কন্যা ও পুত্রের সমান অধিকার ছিল পৈতৃক সম্পত্তিতে। অপুত্রক ব্যক্তির দৌহিত্র পুত্রের সমান অধিকারী হতেন। বংশরক্ষা তথা দেশরক্ষার তাগিদে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন বৈধ ছিল। বংশরক্ষা হলো বড়ো বালাই। আবার যেখানে দেশের ভাবী শাসনকর্তার বিষয়টিও একই সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তখন 'ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন' নামক অতি স্পর্শকাতর বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে হাজির হতো মহাভারতের কালে। তবে এই হাজির হওয়া কিন্তু ধারাবাহিক ছিল না। বিক্ষিপ্ত এই ঘটনাটি ঘটত কালে-ভদ্রে, ক্বচিৎ বা কদাচিৎ। মূলত রাজপরিবারের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। রাজতন্ত্রে এই প্রথা ছিল স্বীকৃত। কারণ, রাজপ্রতিনিধি দিয়ে রাজ্যপাট বেশিদিন চালানো সম্ভব নয়। তাই এই প্রথার প্রচলন আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে আবশ্যিক ছিল তৎকালীন সমাজে।

এখন আসা যাক, মহাভারতের কালে খাদ্যাভ্যাসের কথায়। শতাংশের হিসেবে নিরামিষাশীর সংখ্যাটা ছিল বেশি। তবে অঞ্চল ভেদে আমিষাশীর পাল্লাটাও ভারী ছিল। আনাজের তালিকায় ছিল রাঙালু, কুমড়ো, চালকুমড়ো, লাউ, বেগুন, পটোল, মুলো, শিম ইত্যাদি। শাকের তালিকায় পাওয়া যায় শুসনি, কলমি, পুঁই, হেলেঞ্চা, কুলেখাড়া, ব্রাহ্মী, নিম ইত্যাদি। কলা, বেল, তাল, কুল, নারিকেল, সুপারি, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বাতাবি, বেদানা ইত্যাদি ছিল ফলের তালিকায়। মশলার তালিকায় ছিল—সাদা সরষে, তিল, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, হলুদ, পিপুল ইত্যাদি। দানা শস্যের তালিকায় ছিল—মুগ, মাষ, যব, গম, ধান, তিল, ছোলা, মটর, বরবটি বীজ প্রভৃতি।

ভাত খাওয়ার প্রচলন ছিল। তবে তা গম ও গমজাত (আটা) খাবার খাওয়া মানুষের তুলনায় কম। মূলত তিল থেকে তেল প্রস্তুত হতো। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত আর যা কিছু হয় তা সবকিছুই খেত সেই সময়ের মানুষেরা। মাছের তালিকায় ছিল—রুই, মাগুর, বোয়াল, শোল, পাঁকাল, পুঁটি আর যা কিছু সামুদ্রিক মাছ। মাংসের তালিকায় ছিল ছাগল, হরিণ, মোষ, কচ্ছপ। এছাড়াও ছিল শিকার করা বনের নানারকম পাখির মাংস। তবে আগুনে ঝলসানো মাংস খাওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে এ যুগে। দ্রৌপদী ছিলেন অত্যন্ত বড়ো মাপের রাঁধুনি। বনবাস কালে সূর্যদেব তাঁকে স্থালী (আজকের ভাষায় প্রেসার কুকার) দিয়েছিলেন, যেটি অল্পসময়ে অল্প আঁচে সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করত। তবে কুন্তীও এ বিষয়ে পিছিয়ে ছিলেন না।

এ সময়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো 'শূদ্র জাগরণ'। শুধু বাক্ স্বাধীনতা নয়, শূদ্র দেশ শাসনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করল। একেবারে নিয়ামকের ভূমিকায় Damage controller হিসাবে বারে বারে মহাত্মা বিদুরের অবতীর্ণ হওয়া সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার এই কালেই দেখতে পাই যুগপৎ কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, ভীষ্ম ও বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, দ্রৌপদীর দৃঢ়তা, ব্যাসদেবের মাহত্ম্য। পাণ্ডবগণের বিবাদের আয়তন বৃহৎ হতে পারে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, কিন্তু বিবাদের স্বরূপ বা প্রকৃতি প্রায় একইরকম থাকে সর্বত্র। সেই স্বার্থপরতা, সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তা, সেই লোভ, সেই ক্ষমতালিপ্সা। এ থেকে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, রাজা-প্রজা এমনকী নিকটবর্তী দুটি রাজ্যেরও মুক্তি নেই। পরোক্ষভাবে দূরবর্তী রাজ্যেরও প্রভাব থাকতে পারে। সমস্যার মূলে রয়েছে একক মানবচরিত্রের নৈতিক মান, মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার। সমস্যা মাত্রই তার দুটি আকার আছে। একটি সূক্ষ্ম



াকার, অপরটি বৃহদাকার। সমস্যার মূলে থাকে সূক্ষ্ম আকারটি। আর তার যৌথ বা সম্মিলিত রূপটি আকার ও আয়তনে অতিবৃহৎ, কিন্তু তার কেন্দ্রবিন্দুতে বীজাকারে সূক্ষ্ম রূপটি বর্তমান থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাজের সমস্যার প্রাণস্পন্দনটি অনুভব করতেন। এই অনুভূতি থেকে আদর্শ সমাজ গঠনে তাঁর মনোনিবেশ। যা মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত গীতার এক থেকে আঠারো অধ্যায়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি আদর্শ সমাজগঠনের জন্য নিদান দিলেন—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।

অর্থাৎ তোমরা দেবগণের সংবর্ধনা কর আর দেবগণও তাঁদের কর্তব্য দ্বারা তোমাদের মানোন্নয়ন করুন। এইভাবে পরস্পরের সংবর্ধনার দ্বারা তোমরা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। ভগবান এখানে 'দেবান্' অর্থাৎ, 'দেব' শব্দটি উপলক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এটি গুণবাচক শব্দ, জাতিবাচক নয়। এই পদটির দ্বারা মানুষ, দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীদেরই বুঝতে হবে।

মহাভারতে বলা হচ্ছে—

তৃণাসনভূমিরুদকং মদুরবাক্যঞ্চদেয়ম।
গৃহমাগতস্যাতিথের্সৎকার এষ এব সনাতনঃ।।

অর্থাৎ, তৃণাসন, ভূমি, জল, মধুরবাক্য অতিথি দেখলে ব্যাজার অর্থাৎ বিরক্ত না হয়ে এই চার বস্তুর মাধ্যমে অতিথি আপ্যায়ন করতে হবে। আর্তকে সেবা, শ্রান্তকে আসন, ক্ষুধিতকে আহার আর তৃষিতকে জল দান—গৃহস্থের এই আচরণই পরম ধর্ম। এই প্রবাদে নির্দিষ্ট আচরণবিধিকে ভর করে আড়েবহরে বেড়ে উঠেছিল মহাভারতের কাল। সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান ছিল পরিবার। একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে তাই পরিবার ধরেই এগোত সমাজগঠনের কাজ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আবার সমাজ গঠনের একক হলো মানুষ। মানবচরিত্র গঠিত হলে সমাজ গঠনের কাজটি ত্বরান্বিত হয়। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের চরিত্রকে গড়ে তোলে। মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটায়। তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে মূল্যবোধ ও আত্মবিশ্বাস। এইগুলি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মনে গেঁথে দিতে পারলেই সকল সমস্যা তুলোর পাহাড়ের মতো উড়ে যাবে। তখন ব্যক্তি জীবনে স্বার্থপরতার আকর্ষণ উপেক্ষা করে পারিবারিক ও সামজ জীবনের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার প্রেরণা লাভ করবে। আর এইভাবে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে একটি জীবন থেকে আরো আরো বহু জীবনে। এই পথে গড়ে উঠবে সুন্দর মানুষের একটি সুন্দরতর সমাজ। ক্ষুধাহীন, দারিদ্র্যহীন, শোষণহীন মহাভারতীয় সমাজগঠন ছিল সেকালের শাসকবর্গের আকাঙ্ক্ষা।

তথ্যসূত্র ঃ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত মহাভারত, সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, কলকাতা। ◻

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES
PRIVATE LIMITED
(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY
(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

With Best Compliments from :



C. S. SALES (INDIA) PVT. LTD.

18, Amratala Street, 1st Floor
Kolkata - 700 001



উপন্যাস

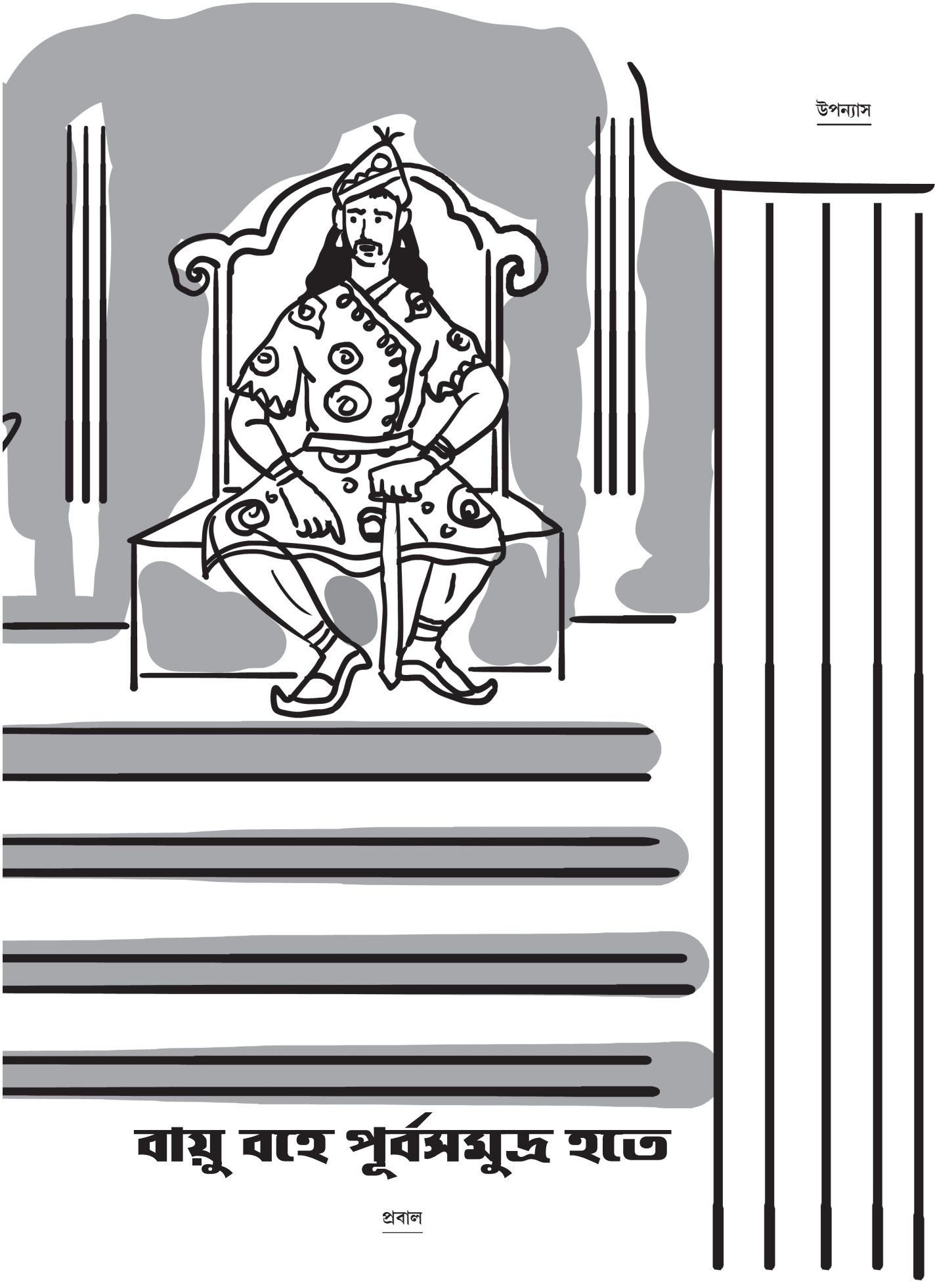

বায়ু বহে পূর্বসমুদ্র হতে

প্রবাল

ভারতবর্ষের কল্পনা যখন আমরা করি, তখন একটা মানচিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অনেক সময়েই

আমরা উপলব্ধি করি না, সেই মানচিত্রটা কিন্তু অসম্পূর্ণ। কেন? কখনো ভেবে দেখেছেন কি, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মন্দির ওঙ্কারভাট কিন্তু রয়েছে ওই মানচিত্রের বাইরে। প্রাম্বানান মন্দির কমপ্লেক্সে ঢুকে অনেকেই পথ হারিয়ে ফেলে, এত মন্দির সেখানে। কম্বোডিয়ার সিয়েম রিপ, থাইল্যান্ডের চিয়াং রাই—এগুলি সবই ভারতীয় সভ্যতার স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও বেঁচে আছে। মা ভারতীর পূর্ববাহুর কথা আমরা ভুলতে বসেছি। ভুলতে বসেছি ভারতীয় সভ্যতায় তার অবদানের কথা। আমরা হয়তো জানি না, আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে সেখানকার বর্তমান ঘটনাবলীতে।

মায়ের পূর্ববাহু সেই পুণ্য ভূখণ্ডের প্রাচীন নাম সুন্দভুমি। এই সুন্দভুমির প্রবল প্রতাপশালী সাম্রাজ্য ছিল মাজাপাহিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাগরের বুকে ছড়িয়ে থাকা যবদ্বীপ (জাভা), বালীদ্বীপ (বালী), কালীমন্থন (কালিমান্তান বা বোর্নিও)-সহ প্রায় তিনহাজার ছোটো বড়ো দ্বীপ মাজাপাহিত পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল একসময়। সেই সাম্রাজ্যের রাজসভায় আজ আমাদের যবনিকা উত্তোলন হলো। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগের কথা।



হাজার রকম যুক্তি দিয়ে সম্রাটকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন গুরু শব্দপালন। রাজগুরুর বয়স কত, কেউ তা জানে না। এই সাম্রাজ্যের পত্তন থেকে তিনি আছেন। সম্রাটের পর সম্রাট মারা যান, রাজগুরুর বয়স কিন্তু বাড়ে না। তন্ত্রসিদ্ধ গুরুকে সাম্রাজ্যের সবাই সমীহ করে চলে। তাঁর কথার অবাধ্য হবার কথা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারে না। কিন্তু আজ তাঁর কোনো কথাই সম্রাট শুনছেন না। মাজাপাহিত সম্রাট পঞ্চম ব্রবিজয়ের একটাই কথা। শুধু উত্তরাপথই তো নয়, সমগ্র বিশ্বই তো আজ মাথা নত করেছে এই নবীন ধর্মের সামনে। না, এই সিদ্ধান্তটার সঙ্গে আবেগের কোনো সম্বন্ধ নেই। শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য ইসলাম গ্রহণ করার ফলে তারা পশ্চিমের ইসলামি রাজশক্তিগুলোর অঢেল সহায়তা পাচ্ছে। তাদের নৌবহর আজ অপ্রতিরোধ্য। আগে আমরা বিপদে পড়লে চোল ও পল্লব সম্রাটরা এগিয়ে আসতো সহায়তার হাত বাড়িয়ে। তারাও তো আজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা নাকি এতটাই ব্যস্ত যে আমাদের সহায়তা করতে তারা অপারগ। শুনছি নাকি সেই মুলুকে প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই সময় নিজের ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকার একটাই ফল, মাজাপাহিত সাম্রাজ্যের ধ্বংস। তারচেয়ে বরং আমি ইসলাম গ্রহণ করি, তাহলে শ্রীবিজয়দের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে পশ্চিমের ইসলামি রাজশক্তিগুলো নিরপেক্ষ থাকবে।

দীর্ঘ এক প্রহর বাকবিতণ্ডার পর শেষে ধৈর্য হারিয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন গুরু শব্দপালন। রাগে লাল তাঁর চোখ দেখে শিউরে উঠলেন সম্রাট। নিজের দীর্ঘ শিখা এক ঝটকায় বেণীমুক্ত করে সম্রাটের দিকে আঙুল উঠিয়ে বললেন গুরু, ‘‘আপনার এই সিদ্ধান্তের ফল কী, সেটাও জেনে রাখুন সম্রাট। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার বংশধরেরা, আপনার প্রজারা শাপগ্রস্ত হবে। নির্বাণের দ্বার চিরকালের জন্য তাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। যবদ্বীপ তার অপৌরুষেয় সংস্কৃতি ভুলে পাশ্চাত্যের নকল করবে, ভিনদেশি সংস্কৃতির দাসে পরিণত হবে। না, এমন দুঃস্বপ্নের যবদ্বীপে আমি থাকতে পারব না। বন্ধুবর কৌণ্ডিন্যকে আমি কথা দিয়েছিলাম, সুখে দুঃখে আমি এই অঞ্চলের মানুষদের পাশে থাকব। সে কথা আমি রেখেছি। মহাবলী গজ-মদ যেদিন সমগ্র সুন্দভূমিকে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্যপাশে বেঁধে দিয়েছিলেন, সেদিনও আমি তাঁর পাশে ছিলাম। কিন্তু আপন পূর্বজদের অপৌরুষেয় ধর্ম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ আপনি কুলত্যাগী হলেন, সঙ্গে আমাকে আমার সেই অঙ্গীকার থেকে মুক্ত করে দিলেন। আমি এখন ফিরে যাব আমার জন্মভূমিতে। আগামী পাঁচশো বছর আপনি যা পারেন করে নিন। পারলে সংস্কৃতির সব চিহ্ন মুছে দিন দেশবাসীর মন থেকে। পাঁচশো বছর পরে আমি আবার ফিরে আসব। সেদিন ফিরে এসে যদি আমি দেখি, এই সাম্রাজ্যের একটি মানুষও তার পূর্বজের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে আছে, তবে সেই মানুষটির জন্যই আমি এই দেশকে আবার ধর্মারাজ্যে পরিণত করব।’’

এই বলে এক ঝটকায় নিজের কাঁধের ঝোলা সম্রাটের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিলেন গুরু। রাজগুরুর জন্য রাজসভায় স্থান সবচেয়ে উঁচুতে। সেই উঁচু সোপানশ্রেণী থেকে লাফিয়ে নামলেন। হাজার থামের সারি ক’লহমায় পার হয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন। অগণিত নগরবাসী সেখানে জড়ো হয়েছে, সম্রাটের ধর্মত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা শুনে। রাজগুরুর বেণীমুক্ত শিখা দেখে চমকে উঠল সবাই। বেণীমুক্ত শিখার পরিণাম কী, সেটা কারোর তো অজানা নয়। আকাশ বিদারী স্বরে তাদের উদ্দেশে বললেন গুরু শব্দপালন,

‘‘হে যবদ্বীপবাসীগণ, মনে রেখো আমাকে। আমি চললাম। পাঁচশো বছর পর আমি যেদিন ফিরে আসবো, মেরুপর্বত সেদিন আগুন বমি করবে। ফুটন্ত লাভার বন্যায় ঢেকে যাবে

দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ, গন্ধকের কটু গন্ধে দম বন্ধ হবে সবার। পরালোকের অধিশ্বরী মা মাতঙ্গীর চেলা আমি। যেদিন আমি ফিরে আসব, আমার সঙ্গে নিয়ে আসব শত শত ডাকিনী যোগিনী প্রেতিনী। দেশ জুড়ে ভাঙা দেবালয় সব নতুন করে জেগে উঠবে সেদিন। তখনও যাদের চৈতন্য ফিরবে না, যারা মূর্খ সম্রাটের ওই নবীন ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকবে, ধরে ধরে তাদের মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে প্রেতিনিরা। সেদিন এই দেশের সিংহাসনে আমি এমন কাউকে বসাবো, যে যবদ্বীপের সংস্কৃতিকে বোঝে। দেশের রাজধানী সেদিন স্থানান্তরিত হবে কালীমন্থন দ্বীপে, নুস-অন্তরায়। সম্রাট গজ-মদ যেখানে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেখানে। এই মূর্খ সম্রাটের পাপের শেষ হবে সেদিন।"

এই বলে নিমেষের মধ্যে ভিড়ে মিশে গেলেন রাজগুরু।

গুরুর ফেলে যাওয়া কাপড়ের ঝোলাটা হাতে তুলে নিলেন সম্রাট। ঝোলা থেকে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। কাঁপা হাতে ঝোলার মুখ খুললেন। ঝোলার মধ্যে রয়েছে মুণ্ডহীন একটা শকুনের দেহ।

যক্ষযন্ত্র!

"তোমরা হাঁ করে দেখছ কী!" সভাসদদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন সম্রাট, "গুরু এই যক্ষযন্ত্রের মধ্যে তাঁর অভিশাপকে প্রোথিত করে দিয়ে গেছেন। গুরুকে খুঁজে বার করো! শকুনটার মাথা কোথায়, খুঁজে বার করো! নাহলে গুরুর অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে!"

গুরুকে কিন্তু আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

সম্রাটের বাকি জীবনটা কেটে গেল যক্ষযন্ত্রর খোঁজে। তাঁর জেহাদের জয়যাত্রায় ছারখার হয়ে গেল সুমাত্রা, যবদ্বীপ, কালীমন্থন, মহার্লিকা। অধিকাংশ নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করল। যারা জেদ ধরে সনাতন ধর্ম আঁকড়ে রইল, তারা পিছু হটতে হটতে বালীদ্বীপে গিয়ে শেষ প্রতিরোধ গড়ে তুলল। সম্রাটের নবধর্মের উৎসাহে ছারখার হয়ে গেল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি। যক্ষযন্ত্র শকুনের মাথা কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না।

সম্রাটের মৃত্যু হলো শিকড়হীন বিভ্রান্ত ভগ্নমনোরথ অসুখী এক মানুষ হিসেবে। সাম্রাজ্যের শ্রী ততদিনে তলানিতে ঠেকেছে, অনেকগুলো দ্বীপ হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, কর আদায় ঠেকেছে তলানিতে। দিকে দিকে বিদ্রোহ। কিন্তু নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ যেমন করে দপ্ করে জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমন করেই মৃত্যুর ঠিক আগে সম্রাটের চোখ যেন জ্বলে উঠল নতুন এক জিঘাংসায়। মৃত্যু যখন সন্নিকটে, সম্রাটের আদেশে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর প্রিয় লাউ পর্বতে। সেখানে মৃত্যুশয্যায় তাঁর পাশ থেকে সবাইকে সরিয়ে দিলেন তিনি, রইল শুধু জেহাদ-যাত্রায় তাঁর সহচর পাঁচ ধর্মান্ধ সর্দার। তাদেরকে দিয়ে সম্রাট এক গোপন প্রতিজ্ঞা করালেন। সর্দাররাও সম্রাটকে কথা দিল, যে কোনো মূল্যে তারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে। যদি তারা ব্যর্থ হয়, তবে তাদের বংশধরেরা সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।



সামনে বীর চট্টলার সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী। ব্রহ্মসাগরের ঢেউ অনবরত ধাক্কা মারছে পাথরের গায়ে। দূরে অথই জলের মাঝে একটা সিঁদুরের বিন্দুর মতো জেগে আছে নয়ঞ্জট দ্বীপ। আজ থেকে এগারো হাজার বছর আগে অনেকটা বড়ো ছিল দ্বীপটা। এখন বেশিরভাগটাই তলিয়ে গেছে জলের নীচে। একটা সরু গিরিপথ চলে গেছে উঁচু পাহাড়ের এদিক থেকে ওদিকে, যোগসূত্র রচনা করেছে মা ভারতীর পূর্ব ও পশ্চিম বাহুর। এই পথ ধরেই একদিন হরিহর এসেছিলেন সুন্দভূমিতে। এই গিরিপথ ধরেই বাসুকীর নেতৃত্বে বিশাল সুন্দসেনা গিয়েছিল ব্রহ্মভূমিতে, মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেবসেনার পক্ষ নিতে।

চোখ ঝাপসা হয়ে এল গুরু শব্দপালনের। কোথায় সেই হরিহর, কোথায় বাসুকী, কোথায় মা দুর্গা আর তাঁর দশ

With Best Compliments From-

S. K.
KAMANI

মহাবিদ্যা। বিধর্মীদের মূঢ় অন্ধ ঝড়ে আঁধার হয়ে আছে পৃথিবী। সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেল! কেউ কী করে মনে রাখবে, এই গিরিপথে, ওই সিঁদুরের টিপের মতো দ্বীপটাতে কোন সে ঘটনা ঘটেছিল, আজ থেকে এগারো হাজার বছর আগে?

পৌরাণিক কাহিনির মূল আখ্যায়িকার পাশাপাশি ছোটো ছোটো গল্প থাকে। তাদের ভূমিকা কোনো অংশে গৌণ নয় মূল আখ্যায়িকার থেকে। অনেক সুতো দিয়ে তৈরি হয় মনোহারী উত্তরীয়। সুতোর দিকে নজর পড়ে না কারোর। কিন্তু একটা সুতো টান দিয়ে বার করে নিলে পুরো কাপড়টাই হয়ে পড়ে বেকার।



মহিষাসুরের জয়যাত্রায় ভারতের অপৌরুষেয় সংস্কৃতি তখন কোণঠাসা। এটা সেই সময়ের কথা।

ছাই-ছাই নীল আকাশ, ভেজা-ভেজা তার গা, মায়া ভরা। তার নীচে উঁচুনীচু আঁকাবাঁকা পাহাড়ের পর পাহাড় ছোটো, বড়ো, মাঝারি— নানান আয়তনের ও আকৃতির পাহাড় চূড়া।

হিমালয়ের মতোই উঁচু পাহাড়ের সারি, ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা। আর তা হবে নাই-বা কেন। এ তো হিমালয়েরই পূর্বী বাহুর একটা ছন্নছাড়া অংশ, ব্রহ্মা ও সুন্দভূমির মাঝখানে পথ ভুলে ঢুকে পড়েছে। তবে এখানকার গাছগুলো উত্তর হিমালয় থেকে অনেকটাই ভিন্ন। লক্ষ লক্ষ ফুল ফুটে আছে আনাচে কানাচে, যেন মণিমাণিক্য খচিত একটা সবুজ গালিচা। ঝিরিঝিরি ঝরনা পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে পড়ছে। তাদের অভিঘাত সুরের মূর্ছনা তুলছে। পথের ধারে গভীর খাদ। বাতাসে দারুচিনির সুগন্ধ। সরলগাছের ঘন জঙ্গল, ফাঁকে ফাঁকে আম-জাম-কাঁঠাল গাছের দেদার ভিড়। জায়গায় জায়গায় বাঁশবন, কলাবন। ডোবা, জলাজমি। দুপুরবেলা উনুনে বসানো চাটুর মতো তেতে ওঠে পথ, সন্ধ্যেবেলা সেই পথ ধুয়ে দেয় পূর্ণচন্দ্রের ঠাণ্ডা সাদা জ্যোৎস্নার রুপালি লহর, যেন মহাজাগতিক কোনো শিশুর হাসি-কান্নার দেয়ালা।

মেঘ-কুয়াশার দল এখানকার চিরস্থায়ী বাসিন্দা, যখন তখন উড়ে এসে কোনো না কোনো পাহাড়কে ঝাপসা করে দেয়। তারা যখন শরীরের ওপর দিয়ে আলতো হাত বুলিয়ে দেয়, আরামে চোখ বুজে আসে। পথের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। তার সঙ্গে কাপড় চোপড় ভিজে যায় সব। রুদ্রর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। পরনের বাঘছাল ভিজলেই-বা কী, আর না ভিজলেই-বা কী! কিন্তু হরির পরনে তো আর বাঘছাল নেই! সুতিবস্ত্র ভিজে একশা। বেশ কয়েকবার পথচলা থামিয়ে কাপড় বদলানোর উদ্যোগ নিয়েছিল, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যে নামছে। বাতাস বইছে শনশন করে। দূর থেকে ক্ষীণ ধূপের গন্ধ ভেসে আসছে। সরলগাছে আগুন ধরেছে বুঝি কোথাও। আগুনে পুড়লে সরলগাছের ডাল থেকে ধূপের মতোই সুগন্ধ বেরোয়। পাকদণ্ডী ধরে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল হরিহর দু'জনে।

''যে সমাজে কোনো বিরোধ বাধলেই সক্কলে অস্ত্র হাতে পথে নেমে পড়ে মারপিট করতে,'' বলছিল হরি, ''তাকে কি তুমি সভ্য সমাজ বলবে? সভ্য সমাজের ভিত্তিই হলো, সমাজের একটা অংশের হাতেই শুধু অস্ত্রধারণের অধিকার থাকবে, শাসনের ভার থাকবে। বাকিরা শাসন মেনে চলবে। তাই না? সেই জন্যই বিষ্ণুর নিদান, সমাজকে চারভাগে বিভক্ত করতে হবে। কিছু লোক বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষাদান করবে, কিছু লোক শস্ত্র ধারণ করে শাসনব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা সামলাবে। কিছু লোক সামলাবে অর্থতন্ত্র। বাকিরা উৎপাদন, চাষাবাদ, নান্দনিকতা, কারুকলা ইত্যাদি, বাকি সব আসল কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। কেউ কারোর কাজে মাথা গলাবে না। এর মাধ্যমেই এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থিত সমাজ তৈরি করা যাবে। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড়ো সুবিধে হলো, সমাজের সবাই নিজ নিজ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে। কেউ কারোর মুখাপেক্ষী থাকবে না। কেউ কখনো বেকার থাকবে না। কালক্রমে সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রয়োজন ফুরোবে, বৈষম্যহীন সমাজ তৈরি হবে।''

''তারপর কী হবে?'' শ্লেষের স্বরে বলল রুদ্র, ''চাষির ছেলে চাষি হবে, আর অন্য কেউ অস্ত্র হাতে বংশ পরম্পরায় সেই চাষির ওপর উৎপীড়ন চালাবে?''

''তা কেন হবে?'' মাথা নেড়ে বলল হরি, ''এই প্রথা তো আর বংশানুক্রমিক হবে না। প্রত্যেক বিদ্যার্থী গুরুকুলে থাকতেই ঠিক করবে, কোন পেশায় সে যেতে চায়। চাষির ছেলে চাইলে যোদ্ধা হতেই পারবে। কে আটকাবে তাকে?''

''বাস্তবে তা হবে না,'' দুঃখের স্বরে বলল রুদ্র, ''যোদ্ধা চাইবে তার ছেলে যোদ্ধা হোক। ছোটোবেলা থেকেই তার রুচি সেইভাবে তৈরি হবে। চাষির ছেলে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে কী করে? বিত্তবান ব্যবসায়ী তার ছেলেকে অর্থ দিয়ে সহায়তা করবে না বলতে চাও? সেই ছেলে ব্যবসায়ে অন্যদের থেকে বেশি সফল হবে, এ তো অনস্বীকার্য।''

''সবাই যদি ধর্মপথে চলে,'' বলল হরি, ''তাহলে এমন অঘটন ঘটবে না।''

''মানলাম্'' বলল হরি, ''তোমরা বিষ্ণুরা দেশশুদ্ধু মানুষকে এমনভাবে সুশিক্ষিত করে তুললে যে, কেউ নিজের সন্তানকে অযথা প্রভাবিত করবে না, সাহায্য করবে না। কিন্তু তারপর? এই হিমালয়, এই সাগরের ওপারের লোকজন? তাদের ধর্মবোধ

জাগাবে কীভাবে? বহু বর্বর উপজাতি ছড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে। জম্বুদ্বীপের সমৃদ্ধির কথা তারা জানে না, এমনটা নয়। তারা যদি লোভে পড়ে একজোট হয়ে ভারত আক্রমণ করে? কোটি কোটি বর্বর উপজাতি যদি হিমালয় পেরিয়ে এই দেশটাকে আক্রমণ করে, তোমার ওই যোদ্ধা সম্প্রদায়ের হাতে গোনা গুটিকয় লড়াকু সামলতে পারবে, সেই আক্রমণকে? তখন পেশা নির্বিশেষে সবাইকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে। কিন্তু তুমি যে পদ্ধতি তৈরি করতে চাইছ, তাতে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ওই যোদ্ধা সম্প্রদায় ছাড়া বাকি সবাই অস্ত্রচর্চা ভুলে যাবে। ফলত বর্বরদের অধিকারে চলে যাবে আমাদের মাতৃভূমি। বিলুপ্ত হবে আমাদের অপৌরুষেয় সংস্কৃতি। তাই বলছি, যেটা করার চেষ্টা করছ, সেটা সম্বন্ধে আরও ভালো করে ভেবে দেখো।”

জঙ্গলের রং ঘন হয়ে আসছে। পশ্চিম আকাশে এখনো খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে, বাকি আকাশ কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। হু হু করে হাওয়া বইছে, গাছগুলো বিরক্তিতে মাথা নাড়ছে পাগলের মতো। ঝড় এল বলে। কোনো লোকালয় নেই আশেপাশে? কোনো পার্বত্য গুহা? যেখানে আজ রাতটার মতো আশ্রয় নেওয়া যায়?



কালো আকাশ আলো করে সাদা আলো ঝলকে উঠল। সেই আলোয় ঝাপসা দেখা গেল, জঙ্গল পাতলা হয়ে এসেছে। জঙ্গলের ওপারে পাহাড়ের ঢালের নীচে মস্ত এক তেপান্তরের মাঠ। লাল ধুলোর ঝড় উঠেছে সেখানে। লাল মেঘের আড়ালে দেখা যাচ্ছে, মাঠের প্রান্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক জনবসতি।

কানদুটো ক্ষণিকের জন্য বধির হয়ে গেল বজ্রপাতের শব্দে। তুমুল আর্তনাদ করে কয়েকটা গাছ ভেঙে পড়ল। প্রাণপণে মাঠের দিকে দৌড়ল হরি ও রুদ্র।

ধুলোয় অন্ধকার মাঠ। ঘূর্ণির মতো পাক খেতে খেতে লাল ধুলোর স্রোত উঠছে আকাশপানে। মাঠ পেরিয়ে গ্রামের মধ্যে যখন পৌঁছল ওরা, ধুলোয় সারা শরীর রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। ঠিক তখনি একটা দুর্গন্ধ নাকে ভেসে এল। এ কেমন গ্রাম? ভাঙা কুটিরের সারি, জনমানব নেই কোনোখানে। বাড়িগুলোর শ্যাওলাধরা সাদা দেওয়াল যেন দগদগে ঘা, দেখে গা গুলিয়ে ওঠে। ভাঙাচোরা ছাদ, যেন কেউ মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলে রেখে

With Best Compliments from -

Ganpati Laminators
&
Packagers Pvt. Ltd.

Mfg. of HDPE and PP Woven Bags and Fabric

With Best Compliments From :

Dr. Sawar Dhanania

Master in Mech. Engineering (Gold Medalist) Jadavpur University, Kolkata

PhD IIT, Kharagpur, W. B.

Chairman

Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry

Govt. of India

Email : sdhanania@gmail.com

Mob. : 9331741971

গেছে। এ যেন অনেককালের প্রাচীন এক অভিশপ্ত ভাগাড়, সভ্যতার হত্যাপুরী।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। সামনে যে বাড়িটা পেল, তারই মধ্যে আশ্রয় নিল ওরা। বাড়িটার একাংশ ভেঙে পড়েছে, অন্য দিকটা কোনোক্রমে খাড়া থেকে নিজের অস্তিত্বরক্ষা করছে। তার মধ্যে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। ভাঙা চাল দিয়ে অঝোরধারে জল ঝরছে। ঘরটার কোণে কিছুটা শুকনো জায়গা দেখে সেখানে বসল ওরা। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। রুদ্রর কোনো পরোয়া নেই তাতে। কটিবন্ধ থেকে গাঁজার কল্কে বার করে আগুন ধরিয়ে জোরসে এক টান মারল। দুর্গন্ধে নাড়ি ঠেলে অন্নপ্রাশনের ভাত যেন উঠে এল। নাকে কাপড় চাপা দিয়ে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে এল হরি।

ঝমঝম ঝমঝম একটানা বৃষ্টির শব্দ, তারই মাঝে হঠাৎ হঠাৎ করে চ্যাঁ চ্যাঁ আর্তনাদ। সাপে ব্যাং ধরছে। পোড়ো হলেও নিতান্ত মন্দ নয় বাড়িটা। এককালে সম্পন্ন কোনো গৃহস্থের বাড়ি ছিল বোধহয়। আগে অনেকগুলো ঘর ছিল, এখন তারমধ্যে মাত্র তিন-চারখানা আস্ত রয়েছে। ঘুপচি, ছোটো ঘরগুলো। ওপরে চামচিকে আর বাদুড়ের বাসা, নীচে ইঁদুর আর সাপখোপের। এঘর ওঘর ঘুরে দেখছে হরি, এমন সময় মনে হলো, খুব কাছেই কেউ যেন কেশে উঠল। কাশল, তারপরেই নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে সেই কাশির শব্দ আটকে দিল। কোনো মানুষের বাস আছে নাকি, এই পোড়োবাড়িতে? কিন্তু থাকেই যদি, সে মানুষ লুকিয়ে আছে কেন? কোথায় লুকিয়ে আছে?

খক্ক! খক্ক! তক্ষক ডাকছে কোথাও। পাশের ঘরটায় ঢুকল হরি। ঘরের অর্ধেকটা চাল ভেঙে পড়েছে, বোধহয় সম্প্রতি। সেই জঞ্জাল ডাঁই করে রাখা আছে একধারে। ঘরের যে অংশটা ছাদের কৃপাধন্য, সেটা সাফসুতরো করে রেখেছে কেউ। খড়ের গাদার ওপর বিছানা পাতা। জনহীন এই গ্রামে মানুষের বসবাসের চিহ্ন পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল হরি। কিন্তু যোদ্ধার স্বভাবজাত সতর্কতা মনের মধ্যে বলে উঠল, সাবধান!

হঠাৎ মাথা ঝনঝনিয়ে উঠল, চোখে আঁধার ঘনিয়ে এল। হরির অচেতন দেহটা এলিয়ে পড়ল মাটিতে।



কল্কেতে টান মারার সঙ্গেই মাথার মধ্যে যেন সহস্র সূর্যের বিস্ফোরণ হলো। দম আটকে এল, যেন মৃত্যু নেমে এল। যাবতীয় চেতনা অবলুপ্ত হলো এক লহমায়। পরমুহূর্তেই সেই লুপ্ত চেতনা অসীম হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। ছিল শূন্য হলো এক। মন জুড়ে নেমে এল অনন্ত শান্তি। এই সময় অবধারিত ভাবেই একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। শিবপন্থার অনুসারী হিসেবে ওকে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হয়েছিল, সে বহুকাল আগের কথা। কিন্তু আজও যখনি গঞ্জিকার কল্কেয় টান মারে রুদ্র, সেই অনুভূতিটা ফিরে আসে প্রত্যেকবার।

একমাস ধরে উপবাস, শুধু বিশেষ কিছু গাছগাছড়ার রস জুটত। শরীর দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকল। তারপর একদিন ওকে বরফের বিছানায় শুইয়ে দিল, বরফের চাদরে ঢেকে দিল দেহ। তীব্র কাঁপুনি ধরল শরীরে। কাঁপুনি বাড়তে বাড়তে হঠাৎ দম আটকে গেল। মাথার মধ্যে আলোর বিস্ফোরণ হলো। অসংখ্য জন্মের স্মৃতি, বংশাণুতে লুকিয়ে থাকা প্রতিটি পূর্বজের যাবতীয় স্মৃতি জলপ্রপাতের মতো আছড়ে পড়ল মানসপটে। আদিযোগী শঙ্করের স্মৃতি, প্রতিটি শিবপ্রমথের স্মৃতি। মুখের মিছিল। রক্তের নদী। অসুররা তো এবারই প্রথম এল, এমনটা নয়। ওরা অতীতেও এসেছে, ভবিষ্যতেও আসবে। ওদের শুধু মুখ বদলায়, তাই চেনা যায় না। লক্ষ বছরের সভ্যতার যাত্রা, সংঘর্ষ, উত্থান-পতন সব ছায়াচিত্রর মতো ভেসে এল মনে। শরীর জুড়ে নবীন শক্তির বান ডাকল। প্রবল এক ধাক্কার সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস আবার চালু হলো। নবজন্ম হলো শব হয়ে।

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles, Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

আমি শিব। আমি একাকী, স্বয়ম্ভু, সর্বহারা। এ ব্রহ্মাণ্ড অলীক আমার কাছে। যন্ত্রণা নিতান্তই কল্পনাবিলাস। আমার কাছে পরিবার, সম্পর্ক সব মিথ্যে। ব্যক্তির দুঃখে নয়, আমার চোখে জল আসে শুধু সমাজের দুঃখে। নৈতিকতা আমার হাত-পা বেঁধে রাখতে পারে না। সমাজের আইনকানুন আমার জন্য নয়। আমার জন্য কিছুই অসম্ভব নয়। আমি অন্ধকারে পথ চলি, যাতে সমাজ আলোকময় হয়। যেখানে বিচারের বাণী নীরবে কাঁদে, আমি সেখানে প্রতিকারের ঝঞ্ঝা হয়ে পৌঁছই। আমি বাঁচি সমাজের জন্য, মরি সমাজের জন্য। আমি শিব। আমি বিশৃঙ্খলাকে জীবনে বরণ করে নিয়েছি। প্রলয়কে স্থান দিয়েছি আমার আত্মায়। আমি সাক্ষাৎ প্রলয়। আমি শিব। শ্মশানে থাকি,ছাই মাখি, আমি সাক্ষাৎ মৃত্যু। অমি অনন্ত শূন্য। আমি শিব।

ক্ষীণ আর্তনাদ, তার সঙ্গে ধপ করে গুরুভার কোনো বস্তুর পতনের শব্দে সংবিৎ ফিরল রুদ্রর। কী হলো? হরি? হরি কোথায় গেল?



এটা কোন জায়গা? আগের বাড়িটা তো নয়। এটা একটা অন্য বাড়ি। মধ্যিখানে মস্ত বড়ো চাতাল, তার ধার ধরে সারবন্দি ঘর।

জ্ঞান ফিরছে কিছুক্ষণ আগেই, যদিও সেটা বুঝতে দেয়নি হরি। চোখদুটো অর্ধেক বুজে নিশ্চল থেকে বোঝার চেষ্টা করছিল, আশেপাশের পরিস্থিতিটা কী। দেখল, একটা বাঁশের থামের সঙ্গে ওর হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। চাঁদের আলো এসে পড়েছে ভাঙা চালার ফাঁক দিয়ে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে, ওর চারপাশে জনা পঞ্চাশেক লোকের ভিড়। তাদের কঙ্কালসার দেহ, কোটরাগত চোখে ফ্যাকাশে সম্মোহিতের দৃষ্টি, যেন মরা মাছের চোখ। বিড়বিড় করে নিজেদের মধ্যে কী জানি পরামর্শ করছে। কারোর হাতে তরোয়াল, কারোর হাতে ছুরি, কারোর-বা তির-ধনুক সবকটা লোকই সশস্ত্র। সবারই শরীরে লম্বা আলখাল্লা ময়লা, শতছিন্ন। এরা কারা?

ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল একটা নেতাগোছের লোক, সবার চেয়ে লম্বা। লোকটার মাথায় মোষের শিরস্ত্রাণ। অসুর? ব্রহ্মার এত গভীরে অসুররা ঢুকে পড়েছে!

এক বালতি বরফ-ঠাণ্ডা জল হরির মুখের ওপর এসে পড়ল।

''কে তুই?'' হুংকার দিল নেতাগোছের লোকটা, ''এখানে কী করছিস?''

''আমি পথিক'', দুর্বল স্বরে বলল হরি, ''সুন্দভূমিতে চলেছি চাকরির সন্ধানে।''

''মাথায় ময়ূরের পালক''? বলল সেই নেতা, ''হাতে পদ্মচিহ্নিত গদা, আর বলছিস চাকরিপ্রার্থী? মিথ্যে কথা! তুই বিষ্ণুর লোক!''

''আমি সত্যি কথা বলছি'', দুর্বল অথচ স্থির স্বরে বলল হরি, ''বিশ্বাস করো!''

''বুঝেছি'', বলল সেই নেতা, ''শুধু কথায় কাজ হবে না।''

কোমর থেকে ছুরি বার করে এনে একটান মারল লোকটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। তীব্র যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল হরি।

''কী, এবার বলবি, কে তুই?'' হেঁকে বলল অসুর দলপতি।

''নতুন করে কিছু বলার নেই আমার,'' দাঁতে দাঁত চেপে বলল হরি।

''ঠিক আছে'', মাথা নেড়ে বলল অসুর, ''তাহলে একটা একটা করে তোর আঙুলগুলো কেটে নিই?''

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল হরি। চরম যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য তৈরি করল মনটাকে।

ঠিক এই সময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল এক পাশের দেওয়াল। সে দেওয়াল ভেদ করে জমাট অন্ধকারের মতো কী একটা যেন ছিটকে গিয়ে পড়ল গিয়ে সোজা অসুর দলপতির ঘাড়ের ওপর। বোবা আর্তনাদের সঙ্গে দলপতি ভূমিশয্যা নিল। হরি দেখল, ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্র। চোখ রক্তজবার মতো লাল, শরীরে পেশীর ঢেউ খেলছে, চোখমুখে পাশবিক হিংস্রতা।

সাঁই করে একটি তির উড়ে এল রুদ্রর দিকে। চোখের পলক পড়ার আগেই সেটাকে খপ করে ধরে ফেলল রুদ্র। তিরটা হরির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—

''বাঁধন কেটে পালাও। শিগগির।''

তিরের ফলা দিয়ে বাঁধন কাটতে কাটতে হরি দেখল, বাকি অসুররা সবাই খোলা শস্ত্র হাতে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে রুদ্রর দিকে।

হুংকারের সঙ্গে উঁচু একটা লাফ দিয়ে রুদ্র ছাদের কড়িবরগা ধরে ফেলল। মারল এক টান। একঝাঁক বাদুড় উড়ে গেল আর্তনাদ করে। মড়মড় শব্দ করে কড়িবরগা শুদ্ধ গোটা ছাদটাই ভেঙে পড়ল। অসুর দলবল চাপা পড়ল তার নীচে। খেপা ষাঁড়ের মতো এক লাফে রুদ্র গিয়ে পড়ল সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর। শুরু হলো প্রলয়নৃত্য। থরথর করে কাঁপতে লাগল মাটি। রুদ্রর পায়ের নীচে চূর্ণবিচূর্ণ হলো শত্রুদের মাথা। যে কেউই সেই ধ্বংস্তূপ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করল, পদাঘাতে তাকে চিরঘুমে পাঠিয়ে দিল রুদ্র। এক এক করে ভেঙে পড়ল বাড়িটার সবকটা দেওয়াল, পুরো বাড়িটাই। গলগল করে রক্তের স্রোত বয়ে গেল ভাঙা কড়িবরগার ফাঁক দিয়ে।

অসুরদের দলবলের চিরসমাধি রচিত হলো ধ্বংসস্তূপের নীচে।

দূর থেকে সবকিছু দেখছিল হরি। ধ্বংসস্তূপের ওপর রুদ্রর তাণ্ডবনৃত্য যেন আর থামছেই না! শেষমেশ এগিয়ে এসে বলল,''অনেক হয়েছে, এবার চলো। এখন থেকে পালাই, জঙ্গলের পথ ধরি।''

''না'', রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মাথা নেড়ে বলল রুদ্র, ''এখানে এদের যত জাতভাই আছে, তাদের সবাইকে শেষ করে তবে অন্য কাজ।''

''এই অঞ্চলে এদের কত অনুগামী আছে'', বলল হরি, ''সেটা কে জানে? দীর্ঘ সময়ের জন্য লড়াইতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ওদিকের কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। বহু বছরের প্রচেষ্টার পর একটা সুযোগ এসেছে, মাথা গরম করে সেটা থেকে লক্ষভ্রষ্ট হলে চলবে না।''

''এতগুলো অসুর'', ভ্রূকুঁচকে বলল রুদ্র, ''ব্রহ্মার এই জনবিরল দুর্গম এলাকায় কোথা থেকে এসে জুটল?''

জবাবে হরি শুধু হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো।

''নাঃ'', মাথা নেড়ে কপালের ঘাম মুছে বলল রুদ্র, ''ব্রহ্মাকে অবহেলা করার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আমরা!''



দিগন্ত জুড়ে ঘন সবুজ বনানীর ফাঁকে ফাঁকে সোনালি গম্বুজের মতো মন্দিরচূড়া। কবোষ্ণ বাতাসে ফুলের সুগন্ধ, প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

ইরাবতী ও ছাও ফ্রায়া—দুই মহাবলী নদীর পলিবিধৌত সমতলভূমি সবুজে সবুজ, কচি ধানক্ষেতে ভরা। আজ সেখানে বহু গুণীজনের সমাবেশ হয়েছে। হরি-হরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল ফলেছে শেষ পর্যন্ত। সুন্দভূমির সামাজিক সংগঠনগুলি এক মহাসম্মেলনের ডাক দিয়েছে। নেতৃস্থানীয় সবাই জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। তাই আজ যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু মাথা আর মাথা।

বিশাল এক প্রান্তর, রেশমের মতো মসৃণ ঘাসে ঢাকা। তাকে ঘিরে রেখেছে কয়েক সহস্র মন্দির। রং তাদের সাদা, মাথায় সোনালি মুকুট। মন্দিরের ফাঁকে ফাঁকে নীল সরোবর, অনেক পদ্মফুল ফুটেছে তাদের সলাজ বুকে। মন্দির ঘেরা বিশাল সেই প্রান্তরে আজ জড়ো হয়েছে সবাই। তাদের কেন্দ্রে বসে আছে হরি ও রুদ্র।

''এই ইরাবতী যতটা আপনাদের'', বলছিল হরি, ''ততটা আমাদেরও। একই কথা ভারতের অপৌরুষেয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও খাটে। জন্মমুহূর্তে নবজাতক মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আরেকটি গর্ভে স্থান পায়। সে গর্ভ দেশজ সংস্কৃতির গর্ভ। অনাদিকাল থেকে তিলে তিলে গড়ে ওঠা সেই সংস্কৃতি আপনাদের ও আমাদের এক ও অভিন্ন। আমাদের সবার মা সেই সংস্কৃতিকে রক্ষা কবার দায়িত্ব আজ আমাদের সঙ্গে আপনাদেরও ওপর ন্যস্ত হয়েছে। সে আহ্বানে সাড়া দেবেন না আপনারা? নিজের মা-কে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন না?''

হরির ভাষণ শেষ হলো। হরি দেখল, সবার চোখে জল।

কয়েক পল অখণ্ড নীরবতার পর চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল বাসুকী, সুন্দভূমির বৃহত্তম সামাজিক সংগঠনের নেতা।

''এলেনই যখন শেষপর্যন্ত'', বলল বাসুকী, ''এত দেরি করলেন কেন? কেন আমাদের ভুলে গিয়েছিলেন? ভারতবর্ষের এই পূর্ববাহু যে ভারতের অঙ্গ, সেটা তো আপনারাও ভুলে গিয়েছিলেন, তাই না?''

বাসুকীর দিকে এই প্রথম তাকিয়ে দেখল রুদ্র।

মাথায় ধাতুর তৈরি সর্পলাঞ্ছিত শিরস্ত্রাণ। উচ্চহনু, পটোলচেরা চোখ। মোমে তা দেওয়া সরু গোঁফ। লম্বা চুল বেণীর শাসনে বাঁধা। সেই বেণীর অন্তভাগ গলার চারপাশে জড়ানো, যেন অজগরের আলিঙ্গনে শিকার। মুখমণ্ডলে সুদৃঢ় কাঠিন্যের সঙ্গে সারল্যের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

মনে হলো, এ কোনো সাধারণ মানব পারে না।

''ভাই'', বলল রুদ্র, ''আপনাদের এ ক্ষোভ যুক্তিসঙ্গত। হরি আপনাদের ব্যাখ্যা করেছে, কেন এ ঘটনা ঘটেছিল। ভারতের দুই বাহুর মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখে ব্রহ্মা। যেদিন ব্রহ্মা সে দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল, সেদিন ঘটেছিল এই দুর্ঘটনা। এটা ইচ্ছাকৃত নয়। তবু আজ কোনো অজুহাত দেবো না। আজ নতুন করে আমাদের সম্পর্ককে গড়ে তোলার সময় এসেছে। আপনারা কি হাত বাড়াবেন না? এখনো অভিমান করে দূরে সরে থাকবেন?''

''না, দূরে সরে থাকতে আমরা চাই না,'' বলল বাসুকী, ''কিন্তু এটা বুঝে নিন, যে আমাদের যোগসূত্র, সেই হলো আমাদের পুনর্মিলনের পথে প্রধান বাধা। গত এক বছরে ব্রহ্মাহৃদিরা বারবার আমাদের ভূমিতে আক্রমণ চালিয়েছে। ইরাবতী পার হয়ে এসে আমাদের ফসল, আমাদের খনিজ লুঠ করে নিয়ে গেছে। ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছে আমাদের পার্বত্য জনজাতিদের।''

''ধর্মান্তর!'' অবাক হলো রুদ্র।

''হ্যাঁ, ধর্মান্তর। ব্রহ্মাহৃদিরা আজকাল মাতৃ-উপাসনা ত্যাগ করে আসু-উপাসনা ধরেছে। তারা চেষ্টা করছে, সুন্দভূমির জনজাতিদের একে একে অসুর বানাতে। আপনারা জানেন, আমাদের অর্থনীতি বহুলাংশে গঙ্গানগর ও কাঞ্চীপুরমের সঙ্গে সমুদ্রবাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। সেই সমুদ্রবাণিজ্য শেষ হয়ে যাচ্ছে অসুর ব্রহ্মাহৃদিদের অত্যাচারে। এরা এত নৃশংস...''



An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD.

AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | AN ISO 9002 COMPANY HINDAL ALUMINIUM LIMITED | NALCO Aluminium Sheet Coil | ALOM Aluminium Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA

Phone : 4050 3400

E-mail : info@alloyindia.com **Website :** www.alloyindia.com

''অসুর ব্রহ্মাহৃদি?'' অবাক হলো রুদ্র।

''শুধু কী তাই? আমার তো এমন একটা ধারণা হচ্ছে যে, আপনাদের ওদিকটাতে সবাই অসুর হয়ে গেছে। আপনাদের মতো দু'একজন শুধু রয়ে গেছে প্রকৃতিপূজক।

''এ ধারণা আপনার ভুল। আমাদের সম্পর্কে, এমনকী ব্রহ্মা সম্পর্কেও। অধিকাংশ ব্রহ্মাহৃদি আজও মাতৃউপাসক।''

''তাহলে যেসব ব্রহ্মাহৃদিরা নয়ঞ্জট দ্বীপে ঘাঁটি গেড়ে ব্রহ্মাসাগর ও ইরাবতীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক লুঠতরাজ চালাচ্ছে, তারা কারা?

''নয়ঞ্জট দ্বীপে ব্রহ্মাহৃদি রাজার শাসন চলে না'', বলল হরি, ''সেখানে রাজত্ব বিদ্রোহী অসুরদের। আমার কথা বিশ্বাস করুন। ওই দ্বীপের অধিবাসীরা যা করছে, তার ওপর ব্রহ্মাহৃদিদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।''

''আপনারা বলছেন, তাই মানলাম সে কথা'', বলল বাসুকী, ''আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু ওই দ্বীপের অসুরদের শয়েস্তা না করতে পারলে তো আর চলছে না। ধরে নিন, আপনাদের কথা মেনে আমরা আমাদের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে চললাম। পথে ওই বিদ্রোহীরা অন্তর্ঘাত চালাবে। আমাদের সৈন্যক্ষয় ঘটাবে। যতক্ষণ সে সম্ভাবনা রয়েছে, আমরা আগামী যুদ্ধে যোগ দিই কী করে?''

''নিশ্চিন্ত থাকুন'', বলল হরি, ''আপনার দুঃশ্চিন্তার নিরাকরণ করা আজ থেকে আমাদের প্রথমিক কর্তব্য।''

কথার ফাঁকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। শীতল নয়, কবোষ্ণ বৃষ্টি। শরীর জুড়িয়ে দেয় আরামে। ঢং করে ঘণ্টা বাজলো কোথাও। খাবার ঘণ্টা। সবাই এক এক করে সভা ছেড়ে উঠে পড়ল, মাঠের অন্য প্রান্তে গিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে পঙ্‌ক্তিভোজনে বসে পড়ল। বাসুকী হরিহরদের যত্ন করে আসন বিছিয়ে বসতে দিল, নিজে পরিবেশন করে খাওয়ালো। কলাপাতার ওপর এসে পড়ল মাড়শুদ্ধ ভাত, লালচে রঙের। সঙ্গে একহাতা কালচে রঙের কী যেন বস্তু, ভীষণ আঁশটে গন্ধ তাতে।

''আমাদের খাবার খেতে অসুবিধা হবে না তো আপনাদের?'' বলল বাসুকী।

''বল কী হে!'' হেসে উঠল রুদ্র, ''আমি শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়াই, আমার কাছে রান্না করা যে কোনো খাবারই অমৃত সমান!''

''আর আপনার?'' হরিকে প্রশ্ন করল বাসুকী।

''মিথ্যে বলব না'', হেসে বলল হরি, ''আমার জন্ম জম্বুদ্বীপের সুদূর দক্ষিণে। সেখানে অধিকাংশ লোকই নিরামিষাশী। কয়েক বছর আগেও এসব উগ্রগন্ধী খাবার খাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু ব্রহ্মায় ক'বছর যাতায়াত করে এধরনের খাবারের সঙ্গে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই যে কালো জিনিসটা, এরকম একটা খাবার ব্রহ্মায় প্রচলিত আছে। সেটাকে ওরা বলে শুঁটকি। বলব কী, সেই শুঁটকি আজকাল আমার অতি প্রিয় খাদ্য।''

''আমরা এটাকে বলি ঙাপ্পি'', বলল বাসুকী, ''ব্রহ্মার সঙ্গে আমাদের খাদ্যাভাসের অনেক মিল।''

''ব্রহ্মার সঙ্গে কিন্তু পশ্চিম ভারতের খাদ্যাভ্যাসেরও অনেক মিল রয়েছে'', বলল রুদ্র।

''দ্যাখো, সেদিন ব্রহ্মায় না এলে'', বলল হরি, ''আজ এই এত সুস্বাদু খাবারটি হয়তো আমি না খেয়ে ফেলে দিতাম। তুমি দুঃখ পেতে তাতে। আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার আগেই তাতে চিড় ধরে যেত। ব্রহ্মা হলো ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তের সেতুবন্ধ। তাই ব্রহ্মা শক্তিশালী না হলে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই রয়ে যাবে।''

মাথা নীচু করে রইল বাসুকী। কিছু বলল না।



ব্রহ্মা থেকে অনেক দূরে ইরাবতীর পাড়ে বসে হরিহর ভাবতেও পারেননি, ঠিক সেই সময় ব্রহ্মায় কী ঘটছে। দেশের মাটি নিরাশ করেনি হরিহরকে। ফিরতি পথে ব্রহ্মায় এসে অবাক হলেন হরিহর। ব্রহ্মার রাজত্বে ইতিমধ্যে অনেক পালাবদল হয়েছে। দুর্বল ভোগী সম্রাট অমিতবলকে সরিয়ে মহিষ সিংহাসনে বসেছিল কিছুদিনের জন্য। তাকে যুদ্ধে হারিয়ে ব্রহ্মাকে পাপমুক্ত করেছেন আদ্যাশক্তি দুর্গা ও তাঁর দশ মহাবিদ্যার বাহিনী। সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, মহিষ অপরাজেয় নয়। অসুরদের যুদ্ধে হারানো সম্ভব।

মহিষ এখনো শক্তিশালী। ব্রহ্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে সে মধ্যভারতের মালভূমিতে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। বিরাট তার সেনাবাহিনী। তার নেতৃত্বে অসুরদের ভরসা এখনো অটুট।



রাত এখন অনেক। মৌন নয়, মুখর রাত। সমুদ্রের শোঁ শোঁ, ঝিঁঝিপোকাদের ঝিঁঝিঁ, ব্যাঙেদের গ্যাঙোর গ্যাঙোর—সবে মিলে ঐকতান বাদ্য বাজিয়ে চলেছে।

প্রদীপের আলোয় একটা সমরশাস্ত্রের পুঁথির পাতা উলটে পালটে দেখছিল দুর্গা। বইটাতে লিখছে, সম্মুখ সমরে শত্রুকে একমাত্র তখনই আক্রমণ করতে হয়, যখন তোমার শক্তি শত্রুর

থেকে অনেকগুণে বেশি। যদি তোমার ও শত্রুর শক্তি তুল্যমূল্য হয়, তাহলে সাময়িক সন্ধি বা অচলাবস্থাই কাম্য। আর যদি তোমার শক্তি শত্রুর শক্তির অর্ধেক বা তার চেয়েও কম হয়, তাহলে পলায়ন শ্রেয়। দুর্গা মনে মনে ভাবছিল, এ সবই হলো সম্মুখ নিয়ম। এর বাইরে বিরাট একটা শাস্ত্র রয়েছে, সেটা হলো গুপ্ত সমরের নিয়মাবলী। সেই নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে, এমন বই দুর্লভ। হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এরকম একটা বই লেখা প্রয়োজন। কিন্তু কে লিখবে? আমি লিখতে পারি। আচ্ছা, কূটযুদ্ধে কী কী করণীয়? গুপ্তযুদ্ধ ও কূটযুদ্ধের তফাত ঠিক কোন জায়গাটায়? এইসব সাতপাঁচ ভাবছিল দুর্গা, এমন সময় দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল। দেখল, গুরুকুলের একজন বিদ্যার্থী দাঁড়িয়ে আছে, নাম ঊষা।

''দুর্গা'', বলল ঊষা, ''কয়েকটি মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।''

''এত রাত্রে?'' অবাক হলো দুর্গা।

''বলল, খুব জরুরি দরকার!'' অসহায়ের ভঙ্গিতে বলল ঊষা, ''কী করব? কাল সকালে আসতে বলব?''

''না'', বলল দুর্গা, ''চলো, দেখা করে আসি।''

ব্রঙ্গার যুদ্ধের পর থেকেই প্রতিদিন একটি দুটি করে মেয়ে দুর্গার সঙ্গে দেখা করতে আসে। কেউ আসে নিজের সমস্যার কথা বলতে, দুর্গার উপদেশ চাইতে। কেউ-বা আবার আসে চামুণ্ডা বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা নিয়ে। এরাও হয়তো সেরকমই কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে।

আশ্রমের যে কুটিরে এখন দুর্গার আবাস, সেটা থেকে আশ্রমের সীমানাজ্ঞাপক বাঁশের বেড়া বেশি দূরে নয়। কুটির থেকে বেরিয়ে দুর্গা দেখল, বেড়ার ওপারে পাঁচটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দুর্গা এগিয়ে গেল। ঊষা গেল ওর পেছন। ওদের আসতে দেখে দুটি মেয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

''এত রাতে কী দরকার বোন?'' দুর্গা বলল।

হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে খপ্ করে ঊষার চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। মাটিতে আছড়ে পড়ল ঊষা। ভয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। মেয়েটা উষার চুলের মুঠি ধরে ওকে বালির ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল, সমুদ্রের দিকে। অন্যজন তার হাতের বর্শা দিয়ে আঘাত হানল দুর্গার ওপর। আজন্মলালিত অভ্যাসের গুণে দুর্গা খপ করে ধরে ফেলল বর্শার অগ্রভাগ। জোরে টান মারল বর্শা ধরে। মেয়েটি এক পা পিছু হটল। বর্শার অগ্রভাগ খুলে রয়ে গেল দুর্গার হাতে। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লিকলিকে সরু একটা তরোয়াল। পলক ফেলার আগেই সেই তরোয়াল ছোবল মারল দুর্গার বুকে। পাশ ফিরে সেই আক্রমণ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল দুর্গা। তরোয়াল গেঁথে গেল বাম কাঁধে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল দুর্গা। হ্যাঁচকা টানে তরোয়ালটা বার করতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল না, চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটির ওপর। পড়তে পড়তে দেখল, একটা মুগুর ওর চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

দুর্গা দেখল, যেন জাদুমন্ত্রবলে জনাপঞ্চাশেক ঘাতক আবির্ভূত হয়েছে সেখানে। তাদের মধ্যে পাঁচজন ওকে ঘিরে ফেলেছে। বাকিরা উদ্যত বর্শা হাতে প্রতীক্ষা করছে।

যে মেয়েটা ঊষার চুলের মুঠি ধরেছিল, সে কোমরের খাপ থেকে তরোয়াল খুলল। সেই সুযোগ ঊষা চকিতে একমুঠো বালি তুলে নিল মাটি থেকে, ছুঁড়ে দিল মেয়েটার চোখ লক্ষ্য করে। আচমকা আক্রমণে চোখে আঁধার দেখল মেয়েটি, ঊষার চুল ছেড়ে দিয়ে চোখ কচলাতে লাগল। সেই সুযোগে মেয়েটার হাত থেকে তরোয়াল ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দিল ঊষা দুর্গার দিকে।

''দুর্গা-আ-আ-আ-আ-আ!'' চিৎকার করে উঠল ঊষা। চমকে উঠল দুর্গাকে ঘিরে ধরা আক্রমণকারীরা।

''তাড়াতাড়ি'', বলল একজন, ''শেষ কর ওটাকে!''

গলার স্বরে বুঝতে পারল দুর্গা, মেয়ে নয়, ছেলে। সম্ভবত এরা সবাই ছেলে। মেয়েদের ছদ্মবেশে এসেছে। ঊষাকে আচমকা খোলা তলোয়ার হাতে দৌড়ে আসতে দেখে আক্রমণকারীদের ক্ষণিক চিত্তবিক্ষেপ ঘটে গিয়েছিল। সেই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে দুর্গা মাটিতে গড়িয়ে ডিগবাজি খেয়ে শত্রুব্যূহের বাইরে চলে এল। কাঁধের যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বর্শা হাতে পাঁচজন এগিয়ে এল দুর্গার দিকে।

একটা লোক খুব কাছে চলে এসেছিল, লোকটা বর্শা চালাল দুর্গার পেট লক্ষ্য করে। দুর্গা ছোট্ট একটা লাফ দিল, যেন উড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বর্শাটার ওপর, বর্শার ওপর ভর দিয়েই আরেকটা লাফ দিল।

ডান পায়ের একটা আঘাত, কান চেপে ধরে লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বাকি তিনজন ওর দিকে এগিয়ে আসতেই দুর্গা মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটাকে কোমর ধরে তুলে ধরল। তিনজনে একসঙ্গে বর্শা চালাল, সেগুলো সবই গেঁথে গেল লোকটার গায়ে। লোকটাকে অন্যদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার ছোট্ট একটা লাফ, দুর্গা যেন বাতাসে ভর করে লোকগুলো ওপর এসে পড়ল, বাঁ পায়ের একটা আঘাতে আরেকটা লোক লুটিয়ে পড়ল। এবার অদ্ভুত কায়দায় সম্পূর্ণরূপে বাঁ পায়ে ভর করে ডান পা দিয়ে অন্য লোকগুলোর ওপর মুহুর্মুহু ছোবল মেরে চলল, যতক্ষণ না সবাই ভূমিশয্যা নেয়।

চারজন খতম। পঞ্চমজন এগিয়ে এল ওর দিকে।

লোকটা বর্শা বাগিয়ে দুর্গাকে আঘাত করার চেষ্টা করল। একটু পাশে সরে গিয়ে আঘাতটা এড়িয়ে দুর্গা বর্শটা চেপে

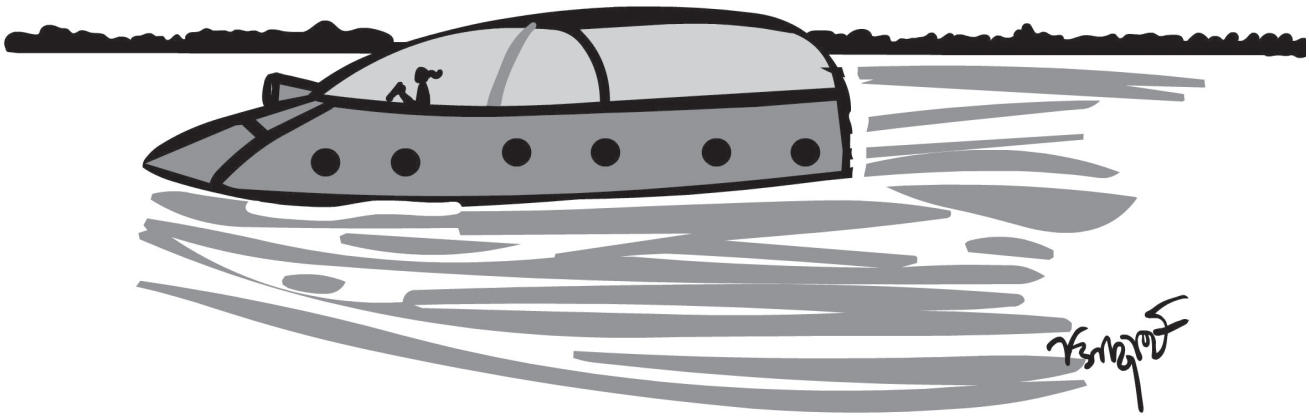

ধরল, এক ধাক্কায় বর্শার পেছনটা লোকটার বুকে পাঁজরের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দিল। অস্ফুট শব্দ করে লোকটা মাটিতে উপুড় হয়ে বসে পড়ল। মুখ লাল, দম আটকে আসছে। দুর্গা আবার ডান পাটা তুলল, বাঁদিক থেকে অর্ধগোলাকারে ঘুরিয়ে সজোরে নামিয়ে আনল লোকটার ওপরে। ফটাস-থপ! বোবা একটা শব্দ হলো। ব্রহ্মতালু ফেটে গেল লোকটার।

বেগতিক দেখে এবার দলের বাকিরাও লড়াইয়ে যোগ দিল। দুর্বোধ্য ভাষায় রণহুংকার দিয়ে দৌড়ে এল দুর্গার দিকে। না, খালি হাতে বিনা প্রস্তুতিতে চল্লিশ-পঞ্চাশজনের সঙ্গে একা লড়া সম্ভব নয়। তবে আয়ুধকলার শাস্ত্রে একটা কথা বলেছে, একসঙ্গে পঞ্চাশজন কখনো আক্রমণ করতে পারে না, পঞ্চাশজনের মধ্যে পালা করে দু'জন আসল আক্রমণটা করে, বাকিরা শুধু ঘিরে থাকে। তাই দম ধরে রাখতে পারলে দু'জনের সঙ্গে লড়া আর পঞ্চাশজনের সঙ্গে লড়া একই ব্যাপার। সেই কথা ভরসা করে দুর্গা ঝাঁপ দিল অগ্নিকুণ্ডে।

মুহুর্মুহু হস্তপদের সঞ্চালনে একজন একজন করে গুপ্তঘাতক ভূমিশয্যা নিতে থাকল। এত দ্রুত স্থান বলদ করতে লাগল দুর্গা, যে ওকে দেখতে পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এমন সময় উমমমমমহ্ গর্জনে কেঁপে উঠল মাটি। চমকে ফিরে তাকাল আক্রমণকারীরা। দেখল, আশ্রমের পেছনের জঙ্গলে তোলপাড় তুলে আবির্ভূত হয়েছে দুর্গার বাহন। দৌড়ে এদিকে আসছে।

চিঙ্কাকে দেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ঘাতকরা। অধিকাংশই দৌড় দিল জলের দিকে। দু'একজন শুধু সাহস করে দাঁড়িয়ে রইল। তাদেরই মধ্যে একজন বর্শা উঁচিয়ে চিঙ্কার দিকে ছুঁড়তে গেল। লোকটার মাথায় প্রচণ্ড জোরে কিল মারল দুর্গা। বর্শা হাত থেকে খসে পড়ল, মুখ থুবড়ে লোকটা পড়ল মাটিতে। দুর্গা ওর বাঁ পাটা তুলল, ডানদিক থেকে অর্ধগোলাকারে ঘুরিয়ে সজোরে নামিয়ে আনল লোকটার মেরুদণ্ডের মাঝ বরাবর। মট্ করে একটা শব্দ হলো। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল লোকটা। তারপর ধীরে ধীরে হাত পা শিথিল হয়ে গেল।

এরপর পুরো লড়াইটাই হলো একতরফা। চিঙ্কা এক এক করে প্রতিটি ঘাতককে হত্যা করল। এমনকী যারা জলের দিকে পালিয়েছিল, তাদের প্রত্যেককেও তাড়া করে ধরে ফেলল। প্রতিটি অসুরের মুণ্ডু ধড় থেকে কামড়ে আলাদা করে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দিল। তারপর লম্বা একটা শ্বাস নিল চিঙ্কা, নিজের সামনের পায়ের থাবা দুটো কয়েকবার চাটল। তারপর রক্তস্নাতা দুর্গার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, ওর পায়ে মাথা ঘষল।

''কোথায় গেছিলি তুই'', কাঁধের ক্ষতস্থান হাত দিয়ে চেপে ধরে মৃদু ধমক দিল দুর্গা, ''আর একটু দেরি করলেই আমাকে আর দেখতে পেতিস না।''

ততক্ষণে গোলমালের শব্দে পুরো আশ্রম জেগে উঠেছে। সবাই বেরিয়ে এসেছে নিজের নিজের কুটির ছেড়ে। মৃতদেহের পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়ে এলেন কপিলমুনি।

''দুর্গা...'' অসংলগ্ন স্বরে বললেন কপিলমুনি, ''তোমাকে খুন করতে মহিষ...গুপ্তঘাতক...এই সম্ভাবনাটার কথা আমার...ছি ছি, বড়ো ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু...এতগুলো অসুর ঘাতক, রাজসৈন্যদের নজর এড়িয়ে এখানে এল কী করে?''

উত্তরে দুর্গা সমুদ্রের দিকে ইশারা করল। কপিলমুনি দেখলেন, সেখানে অগভীর জলে প্রায় অদৃশ্য হয়ে ঢেউয়ের তালে নাচছে কয়েকটা ছিপনৌকোর ছায়া।

''তার মানে'', বললেন কপিলমুনি, ''খুব কাছেই ওদের একটা ঘাঁটি আছে। সম্ভবত এই সুন্দরী জঙ্গলের কোনো দ্বীপে। যে ঘাঁটির খবর ব্রঙ্গার সেনারা এখনো পায়নি।''

কাতরানোর মৃদু শব্দ শুনে চমকে উঠল দুর্গা। দেখল,

মৃতদেহের পাঁজা ঠেলে কেউ হাত বাড়ানোর চেষ্টা করছে। দৌড়ে গেল দুর্গা। টান মেরে মৃতদেহগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দেখল, রক্তে মাখামাখি ঊষা পড়ে আছে মাটিতে। চোখের দৃষ্টি নিভে এসেছে। অসংখ্য ক্ষতস্থান দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। পেটের একপাশ থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে।

''বৈদ্যকে খবর দাও'', চিৎকার করে উঠলেন কপিলমুনি, ''তাড়াতাড়ি!''



দুর্গার পথ সরল ছিল না। পেছনে গুপ্তশত্রু রেখে সামনে কি আক্রমণ শানানো যায়? বাসুকী ঠিকই বলেছিল। নয়ঞ্জটের একটা ব্যবস্থা না করে মহিষের বাহিনীর মোকাবিলা করা ছিল আত্মহত্যার শামিল। তাই দশ মহাবিদ্যার আবার ডাক পড়ল।

কালো কাদার মতোই নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না, শব্দ শুনে আন্দাজে দিক ঠিক করতে হয়। অবশ্য ঠিক করার মতো কিছু নেই। নদীর এই স্রোত সোজা নিয়ে গিয়ে ফেলবে নয়ঞ্জট দ্বীপে। শুধু স্রোতে ভেসে চললেই চলবে। ভেসে যেতে যেতে ভৈরবী ভাবছিল দুর্গার বলে দেওয়া কথাগুলো।

ব্রঙ্গার পূর্ব সীমান্ত জুড়ে রয়েছে দুর্গম এক পর্বতশ্রেণী, পূর্বী হিমালয়ের একটা বাহু এদিকেই এসে পড়েছে। সেই পর্বতশ্রেণী যেখানে সাগরে মিশেছে, সেখানে ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় জঙ্গলে ঘেরা বদ্বীপ নয়ঞ্জট। এ এমন এক জায়গা, যেখানে ব্রঙ্গার সেনাবাহিনী ঢুকতে ভয় পায়। গত ক'মাসে বহু ব্রঙ্গাহৃদি গুপ্তচর নিখোঁজ হয়েছে, নয়ঞ্জট দ্বীপের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে এসে। শোনা যাচ্ছে, অসুর দলপতি সজহঙ্গর নেতৃত্বে অসুরদের একটা গোষ্ঠী এখানে ঘাঁটি গেড়েছে। গঙ্গানগর থেকে বিতাড়িত হয়ে অলতুবাসীদের অধিকাংশই সেখানে জড়ো হয়েছে। এখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করছে সুন্দভূমিতে। অসুরদের আক্রমণকে ব্রঙ্গাহৃদিদের আক্রমণ বলে ভুল করছেন সুন্দভূমির রাজারা। তাঁরা ভাবছেন, ব্রঙ্গার নতুন রাজা দিব্যবল সুন্দভূমিতে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। মহিষাসুরের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধে সুন্দভূমির সাহায্য পাওয়ার একমাত্র পথ, নয়ঞ্জট দ্বীপকে মুক্ত করা। অসুর সজহঙ্গকে নিকেশ করা।

স্তব্ধ প্রকৃতি, যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। বাতাস স্থির। নদীর কলকল, সাগরের শোঁশোঁ, এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। নেই কোনো রাতচরা পাখির ডাক, নেই জঙ্গলের চেনা শব্দগুলো। বড্ড অস্বস্তিকর। হঠাৎ একটা বাঁদরের চাপা আপত্তি সতর্ক করে দিল ভৈরবীকে। আশেপাশের কোনো একটা গাছে বাঁদরদের বাসস্থানের আশেপাশে এমন কেউ রয়েছে, যাকে বাঁদররা পছন্দ করছে না। প্যাঁচা? সাপ? ভৈরবী শুনতে পেল, সামনে অনতিদূরে গাছের পাতায় সামান্য খসখস। এতই ক্ষীণ, তা শোনা না যাওয়ারই মতো। তবু এই গুমোট রাতে বেমানান সে শব্দ।

নিঃশব্দে নৌকো থেকে জলে নেমে পড়ল ভৈরবী। ইশারায় বাকি দু'জন আরোহীকেও নেমে পড়তে বলল। তারপর নৌকোটিকে উলটে দিয়ে তার নীচে ঢুকে পড়ল ওরা তিনজন। মাথায় নৌকোর আড়াল, কাদা ঠেলে ঠেলে স্রোতের অভিমুখে এগিয়ে চলল ওরা। কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল। হঠাৎ নৌকোর কাঠের ওপর লাগাতার ঠা-ঠা-ঠা-ঠা শব্দ শুরু হলো। যেন পাথর বৃষ্টি হচ্ছে। থরথর করে কাঁপতে লাগল নৌকোর কাঠের পাটাতন। কয়েক মুহূর্ত চলল সেই অদ্ভুত ঘটনা। তারপর যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমন করেই শেষ হয়ে গেল সে শব্দ। অন্ধকারে হাতড়ে অনুভব করল ভৈরবী, শরশয্যার মতো বাণবিদ্ধ হয়েছে নৌকোটা।

মনে মনে হাসল ভৈরবী। ''গাছের ওপর বসে আছে অসুর সৈন্যরা'', ফিসফিস করে বলল, ''অন্ধকারে কিছু দেখতে পায় না, কিন্তু নৌকোর গায়ে নদীর স্রোতের সড়সড় শব্দ শুনলেই তির চালিয়ে দেয়।''

''শব্দভেদী বাণ?'' অবাক হয়ে বলল ষোড়শী, ''শুনেছি একমাত্র ব্রঙ্গাহৃদি তিরন্দাজরাই এই বিদ্যা জানে! অসুররা এই বিদ্যা আয়ত্ত করল কীভাবে?''

''এই তিরন্দাজরা সম্ভবত ধর্মান্তরিত ব্রঙ্গাহৃদি'', বলল ভৈরবী, ''একজন মনুসন্তান ধর্মান্তরিত হলে শুধু একজন বন্ধু কমে তাই না, সঙ্গে সঙ্গে একজন শত্রুও বাড়ে!''

''নৌকোর নীচে না থেকে ওপরে থাকলে'', দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ছিন্নমস্তা, ''এতক্ষণে আমাদের প্রাণহীন শরীরগুলো এই নদীর স্রোতে ভেসে চলে যেত সাগরের পানে!''

''জোর বাঁচা বেঁচেছি!'' খুশির স্বরে বলল ষোড়শী।

''সাবধান'', ষোড়শীর খুশি গোড়ায় মিইয়ে দিয়ে বলল ভৈরবী, ''এই জলে থিকথিক করছে হাঙ্গর আর কুমির। আমরা জলে আছি, সেটা টের পেলে নিঃশব্দে পা কেটে নিয়ে পালাবো। শব্দ না করে, জলে বিন্দুমাত্র ঢেউ না তুলে, পা টিপে টিপে এগিয়ে চলো।''

পায়ের নীচে থকথকে কাদা, গলা পর্যন্ত ঠাণ্ডা জল। সেই একইভাবে নৌকোর আড়াল নিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। বেশ অনেকটা সময় জল ঠেলে এগোনোর পর পায়ের তলায় শক্ত পাথুরে মাটি অনুভব করল। কানে এল জলের গর্জন। সামনে খাড়াই পাড় থেকে জলধারা জলপ্রপাত হয়ে সশব্দে ঝাঁপিয়ে

পড়ছে সমুদ্রের বুকে। নৌকোটিকে এক ধাক্কায় স্রোতের দিকে ঠেলে দিল ভৈরবী। হুড়মুড় শব্দ করে নৌকো বয়ে গেল মোহনার দিকে। বেশ খানিকক্ষণ পরে, যখন নিশ্চিত হলো নৌকো দেখে কেউ অনুসন্ধান করতে আসেনি, তখন ওরা জলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল।

নয়ঞ্জট দ্বীপটা ত্রিভুজাকৃতি। উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম তিনদিকে নদী আর জলাজমি। দক্ষিণদিকে জলপ্রপাত, সমুদ্রে মিশেছে। চারদিকেই খাড়াই প্রাচীরের মতো পাড়।

''ঠিক যেন কুমিরের মাথা!'' অস্ফুটস্বরে বলল যোড়শী, ''সমুদ্রের দিকে মুখ করে ওত পেতে বসে আছে।''

জল ঠেলে পাড়ের দিকে এগোচ্ছিল ছিন্নমস্তা, ওর হাত টেনে ধরল ভৈরবী। ইশারা করল দক্ষিণে জলপ্রপাতের দিকে। খাড়াই পাহাড়, পাথুরে গা, এবড়ো খেবড়ো। শ্যাওলার পুরু আস্তরণ তার গায়ে। জায়গায় জায়গায় বট অশ্বত্থর ঝুরি নেমেছে। সেই ঝুরি ধরে পাথরের গা বেয়ে জলপ্রপাতের ধারে পৌঁছে গেল ওরা। দেখল, জলপ্রপাতের আড়ালে রয়েছে এক গুহামুখ।

''কুমিরের মাথার মতো শুধু নয়,'' বলল ছিন্নমস্তা, ''হাঁ করা কুমিরের মাথার মতো দ্বীপটা।''

''আর সেই কুমিরের মুখের মধ্যে ঢুকছি আমরা!'' বলল যোড়শী, গলার স্বরে চাপা ভয়।

''এই গুহাটার কথা তুমি জানতে?'' প্রশ্ন ছিন্নমস্তার।

''হুঁ'', গম্ভীর স্বরে বলল ভৈরবী, ''ব্রহ্মার হাতে গোনা কয়েকজন গুপ্তচর বাদে কেউই এই গুহাটার খবর রাখে না। অসুররাও সম্ভবত এখনো এটার সন্ধান পায়নি।''

''কিন্তু এই গুহার মধ্যে দিয়ে কেন?'' প্রশ্ন যোড়শীর?

''অন্যদিক দিয়ে গেলে কি ক্ষতি হতো? দেখছ না, কী ঘুরঘুট্টে অন্ধকার গুহাটা! আর কী বিশ্রী গন্ধ, ম্যাগো! ওয়াক্!''

''তুমি বড্ড বাজে কথা বলো'', বিরক্ত হয়ে বলল ভৈরবী, ''দ্বীপের পাড় ধরে কড়া পাহারা রয়েছে। খাড়াই পাড়, চড়তে গেলে ওপর থেকেই আমাদের চাঁদমারি বানিয়ে দেবে। এই গুহাটা একটা লম্বা সুড়ঙ্গের মতো, এটা ধরে চললে আমরা সোজা গিয়ে পৌঁছব জঙ্গলের মধ্যে, পাড়ের পাহারাদারের নজর এড়িয়ে।''

গুহার মেঝে আবহমানকাল ধরে জলে ভিজে পিছল, পুরু শ্যাওলার আস্তরণে ঢাকা। বাতাস দমবন্ধ করা, ভ্যাপসা গন্ধ তাতে। ছাদ থেকে লম্বা লম্বা বটের ঝুরির মতো পাথরের স্তর ঝুলছে। শ্যাওলা ধরা দেওয়াল। পিঠের পুঁটুলি থেকে মশাল বের করে আগুন জ্বাললো ভৈরবী। সেই আলোতে পথ দেখে পাতাল-গুহার সুড়ঙ্গপথে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল ওরা। যত ওরা সুড়ঙ্গের গভীরের দিকে এগিয়ে চলল, তত ক্ষীণ হয়ে এল জলপ্রপাতের গর্জন। শেষমেশ শুধু অখণ্ড নীরবতা। কিছুটা পথ চলার পর নাকে এল বিশ্রী এক গন্ধ। সে গন্ধ আসতেই তড়িঘড়ি ভৈরবী মশাল নিভিয়ে দিল।

সুড়ঙ্গের দেওয়াল হাতড়ে আরও খানিকটা এগোতে পথের ধারে পড়ল এক মহা-জলা। সবুজ স্বপ্রভ শ্যাওলার আস্তরণ গুহার দেওয়াল জুড়ে। প্যাচপ্যাচে পঙ্কিল জলে থিকথিক করছে সেই একই স্বপ্রভ শ্যাওলা। তার ভূতুড়ে আলোয় দেখা যাচ্ছে গুহার অভ্যন্তর। পচা গন্ধ জলে। সেই জলার পাঁকের মাঝে বিস্তর হুটোপুটি চলছে। একদল কুমির উদ্দাম জলক্রীড়ায় মত্ত। কাদায় পোঁতা অসংখ্য কুমিরের ডিম।

সন্তর্পণে জায়গাটা পার হয়ে এল ওরা। সেখান থেকে সুড়ঙ্গ ওপরদিকে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই নাকে এল টাটকা বাতাসের সুগন্ধ। কানে ভেসে এল নদীর কুলুকুলু, সাগরের গর্জন। গুহার মুখ খুলেছে।

টক-সুঁদরির ঘন লতাপাতার জটাজালের মধ্যে। সেই ঝোপের জাল কেটে বেরিয়ে ওরা দেখল, চারিদিকে ঘন জঙ্গল। মশালের আগুন নিভিয়ে গুহার মুখ সাবধানে ঢেকে দিল। তারপর আবার ওরা হাঁটতে শুরু করল, দ্বীপের মধ্যভাগ অভিমুখে।

অস্পষ্ট হয়ে এল সাগরের সিংহনাদ, নদীর উচ্ছল কুলুকুলু। নিথর নিঃস্তব্ধ বনপথ। শুকনো পাতা বিছানো কাদামাটির ওপর ওদের তিনজনের পায়ে চলার মৃদু শব্দ, সে তো প্রায় শোনাই যায় না। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ভৈরবী।

''কী হলো?'' চমকে উঠল যোড়শী। উত্তরে ভৈরবীর গলা থেকে জাপা এক গর্জন বেরিয়ে এল—''গর্‌র্‌র্‌র্‌র্!''

''গর্‌র্‌র্‌র্‌র্!'' একইরকম গর্জন ভেসে এল অন্ধকারের মধ্যে থেকে।

আঁধারের বুক চিরে বেরিয়ে এল কৃষ্ণকায় এক অবয়ব। তারাদের ক্ষীণ আলোকেও তার গায়ের ডোরাকাটা দাগ ও তার হাঁড়ির মতো মুখের জন্য তাকে চিনতে অসুবিধে হলো না যোড়শীর। কেঁপে উঠল ও। বাঘ!

কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাতের স্পর্শে বাধা দিল ভৈরবী। তারপর এগিয়ে গেল বাঘটার দিকে। বাঘটাও এগিয়ে এল ওর দিকে। ভৈরবী হাঁটু গেড়ে বসল বাঘটার সামনে। মৃদু গর্‌র্‌র্ আওয়াজ বেরোল বাঘের গলা থেকে, প্রত্যুত্তর দিল ভৈরবী। মনে হলো, যেন ভৈরবীর সঙ্গে কথোপকথন চলছে বাঘটার। তারপরই যোড়শী ও ছিন্নমস্তা অবাক হয়ে দেখল, বাঘটা মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, ভৈরবী পরম স্নেহে ভয়ংকর সেই জন্তুর পেটে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ গড়াগড়ি খাওয়ার পর বাঘটা ধুলো ঝেড়ে উঠে এক লাফে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হলো।

''আর একটু হলেই বাঘের পেটে যাচ্ছিলাম আমরা'', কাঁপা গলায় বলল যোড়শী।

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees



160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,

Kolkata-700 007 (s) 2272-5487

Mob : 9331105467

ORIENT MOVIETONE CORPORATION LIMITED

CIN : L92142WB1946PLC013138

A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

Regd. office :

9A, Esplanade East, Kolkata - 700 069

Phone : 2210-8763, 2248-3613

Fax : 033-2243-0751

E-mail : info@mkgroupindia.biz

''সত্যি করে বলো তো'', প্রশ্ন ছিন্নমস্তার, ''কী করে তুমি জংলি বাঘেদের এরকম বেড়ালছানার মতো বানিয়ে দাও?''

মুচকি হাসল ভৈরবী, উত্তর দিল না। অন্ধকারে ওর হাসি দেখা গেল না।

প্রায় অর্ধক্রোশ পথ চলার পর গোলমালের ক্ষীণ শব্দ কানে এল। পূর্বদিগন্তে লাল আভা। ভোর হয়ে এল নাকি? কিন্তু রাত পোহাতে তো এখনো অনেক সময় বাকি! থমকে দাঁড়াল ওরা। আপদমস্তক ঘন কাদা মেখে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সন্তর্পণে আবার হাঁটা দিল।

দ্বীপের মধ্যভাগে পৌঁছে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল ওরা তিনজনেই। সেখানে জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নেই। অসংখ্য মশালের আলো দিবালোকের বিভ্রম তৈরি করেছে। বহু শ্রমিক কাজ করছে সেখানে। গোল করে পরিখা কাটা হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ কাটা হয়েছে, এক-তৃতীয়াংশ বাকি। ঘোলা জল জমে সেই পরিখা এখন প্রায় অর্ধেক ভর্তি।

লক্ষ লক্ষ বাঁশ ডাঁই করে রাখা আছে একধারে। সেই বাঁশ দিয়ে বিশাল এক দুর্গ তৈরি হচ্ছে পরিখার ঠিক মাঝখানে। বাঁশের তৈরি গোলাকৃতি দ্বিতল কাঠামো, হাজার লোকের বাসস্থান হতে পারে সেখানে এমনটাই বড়ো। চার কোণায় চারটি গম্বুজ, যেখান থেকে পারিপার্শ্বিকের ওপর নজর রাখা যায়। দেখে মনে হচ্ছে, মূল কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। এখন তার চারপাশে আরও বাঁশ লাগিয়ে কাঠামোকে শক্ত ও দুর্ভেদ্য করে তোলা হচ্ছে। শ্রমিকদের মধ্যে একজন বেশ হাঁকডাক করে তত্ত্বাবধান করছে, লোকজনদের কাছ থেকে কাজ আদায় করছে। বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া। পরনে আলখাল্লা, সাজপোশাকে বাড়াবাড়ি আতিশয্য। থুতনির ওপর চাপদাড়ি, মাথায় মোষের মুকুট।

''ওই লোকটাই সজহঙ্গ,'' বলল ভৈরবী, ''ওদের নেতা। ওটাকে মারতে হবে, সেটাই আসল কাজ। তার সঙ্গে সম্ভব হলে বেশ কিছু লোকক্ষয় ঘটাতে হবে এদের। যাতে ব্রঙ্গার সেনাবাহিনী এসে দ্বীপের দখল নিতে পারে।''

ব্রঙ্গা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বে বাঁশ সহজলভ্য। বাঁশ ও দড়ি দিয়ে তৈরি কাঠামো এই অঞ্চলের সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু বাঁশের তৈরি দুর্গ এই প্রথম দেখল ওরা।

''এরা কী বোকা!'' অস্ফুটস্বরে বলল যোড়শী, ''বাঁশের কেল্লায় আগুন লাগিয়ে দিলেই তো কেল্লা পুড়ে ঝামা হয়ে যাবে। সেটা কি ভেবে দেখেনি এরা?''

''এতো বড়ো দুর্গ বানাতে লক্ষ লক্ষ ইঁট লাগবে,'' মাথা নেড়ে বলল ভৈরবী, ''এই নির্জন দ্বীপে এত ইঁট বানাতে গেলে সমগ্র ব্রঙ্গায় খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যেত। উলটোদিকে, এই অঞ্চলে জংলি বাঁশ সর্বত্র গজায়। সেই বাঁশ কেটে এনে রোদে শুকিয়ে ফেললেই কাঠামো তৈরির উপযোগী হয়ে যায়। রোদে শুকনো পাকা বাঁশে সহজে আগুন ধরে না। এরা বোকা নয়। পরিস্থিতি অনুসারে ঠিক কাজটাই এরা করেছে।''

''আমাদের এখন ভাবতে হবে'', ছিন্নমস্তার গলায় প্রত্যয়ী সুর, ''কীভাবে এই বাঁশের কেল্লা ভেদ করা যায়!''

''আর ভাবতে হবে, কীভাবে ওই শিংওলা প্যাংলা লোকটা, মানে ওই সজহঙ্গ ব্যাটাকে মারা যায়। বাব্বাঃ, কী সাজগোজের বাহার! লোকটার দাড়ি ধরে নুড়ো জ্বেলে দিতে হবে, এই আমি বলে দিচ্ছি।'' বলল যোড়শী।

''মোটে মা রান্ধে না'', বিড়বিড় করে বলল ভৈরবী, ''তত্ত আর পান্তা!''

''কী?'' প্রশ্ন করল যোড়শী, ''কী বললে?''

''কিছু না,'' বলল ভৈরবী, ''চলো!''

ঢং করে ঘণ্টা বাজল। যারা কাজ করছিল, তারা কাজ ছেড়ে অন্যদিকে জড়ো হলো। আরেকদল লোক এসে কাজে যোগ দিল। যাদের কাজ শেষ হলো, তারা পঙ্‌ক্তিবদ্ধ হয়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরল, উত্তরের দিকে।

''তাড়াতাড়ি!'' বলল ভৈরবী, ''ওই লোকগুলোর পিছু নিতে হবে!'' এই বলে নিকটবর্তী গাছে চড়তে শুরু করল। ইশারায় সঙ্গীদের পিছু নিতে বলল। ছিন্নমস্তা দ্বিরুক্তি না করে ক্ষিপ্রগতিতে গাছে চড়তে শুরু করল। কিন্তু যোড়শী অনড়।

''কী হলো?'' ফিসফিস করে বলল ভৈরবী, ''তাড়াতাড়ি করো!''

''আমি গাছে চড়তে জানি না!'' ঘাড় গোঁজ করে বলল যোড়শী।

''গাছে চড়তে জান না!'' ক্রুদ্ধস্বরে বলল ভৈরবী, ''এখানে তবে কী করতে এসেছ? চড়ুইভাতি?''

''তোমরা যাও'', আহত কণ্ঠে বলল যোড়শী, ''আমি এখানেই থাকছি।''

''সেটা হয় না!'' এই বলে ভৈরবী ''উমমমহঃ'' চাপা এক হুংকার দিল। পরমুহূর্তেই ছায়ান্ধকার ভেদ করে আগের দেখা সেই বাঘটা আবির্ভূত হলো।

''ওটার পিঠে চড়ে বসো!'' আদেশের ঢঙে বলল ভৈরবী।

''বাঘের পিঠে!'' কাঁদোকাঁদো গলায় বলল যোড়শী।

''চুপ!'' চাপা হুংকার দিয়ে বলে উঠল ভৈরবী, ''আর একটাও কথা নয়! যা বলছি করো!''

থরথর কাঁপতে কাঁপতে চোখ বুজে বাঘের পিঠে চড়ে বসল যোড়শী। আঁকড়ে ধরল বাঘের গলা।

গাছের ওপর দিয়ে চলল ভৈরবী ও চিন্নমস্তা, নীচে জঙ্গলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বাঘের পিঠে যোড়শী। পঙ্‌ক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের পিছু ধাওয়া করে ওরা পৌঁছল জঙ্গল আর বালির পাড় ঘেরা ছোট্ট এক সরোবরের ধারে। শ্রমিকরা সেখানে হাতমুখ ধুয়ে জল খেল, তারপর গোল হয়ে বসে কোমরের পুঁটুলি খুলে

খাবার বার করে খেতে বসল। দূর থেকে নজর রাখল ওরা তিনজন। বিশ্রাম শেষে শ্রমিকরা সরোবর ছেড়ে ফিরে গেল উলটো পায়ে। গাছ থেকে টুপ্ করে নেমে পড়ল ভৈরবী ও ছিন্নমস্তা। তাই দেখে জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল বাঘ, ষোড়শীকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এক লাপে উধাও হয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

''পানীয় জলের কুণ্ড'', বলল ভৈরবী, ''এস, একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। অন্য দলটা নিশ্চয়ই এক্ষুনি আসছে না এখানে।'

সরোবরের বালির পাড়ে বসে ওরা জল খেল, খাবার খেল। বিশ্রাম নিল। আরাম করে, অনেকটা সময় নিয়ে। ধকল তো কম যায়নি।

''অবাক কাণ্ড!'' বলল ছিন্নমস্তা, ''চারিদিকে লোনা জল, মাঝখানে এই মিষ্টি জলের সরোবর এল কী করে?''

''এই অঞ্চলের সব অধিবাসীই জানে এই কায়দাটা,'' বলল ভৈরবী, ''বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়লে মাটির গর্ভ থেকে পানীয় জল বেরিয়ে আসে। বালির স্তর ছাঁকনির কাজ করে।''

''এবার বলো'', বলল ষোড়শী, ''কী করা যায় এখন।''

''বাঁশের দুর্গে আগুন লাগাতে হবে'', বলল ছিন্নমস্তা, ''আগুন নেভানো নিয়ে যখন ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সেই অসতর্ক মুহূর্তে আক্রমণ করে সজহঙ্গকে মেরে ফেলতে হবে।''

''কিন্তু দুর্গে আগুন ধরাবে কী করে?'' বলল, ষোড়শী, ''তুমিই তো বললে, পাকা বাঁশে আগুন লাগানো কঠিন।''

''যদি না...,'' বলল ভৈরবী।

''যদি না....কী?'' বলল ষোড়শী।

''যদি না দুর্গের গা ধরে বিস্ফোরক ছড়িয়ে দেওয়া যায়,'' বলল ভৈরবী।

''কে সেটা করবে?'' বলল ষোড়শী, ''সবার দৃষ্টি এড়িয়ে দুর্গে পৌঁছনো সেখানে বিস্ফোরক ছড়িয়ে দেওয়া, তারপর সেটায় আগুন লাগানো, এ তো অসম্ভব। আত্মহত্যার শামিল!''

''আমি করব কাজটা'', বলল ছিন্নমস্তা।

''চেষ্টা করলেও যে পারবে'', বলল ভৈরবী, ''এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া, তোমাদের কারোর প্রাণেরই ঝুঁকি আমি নিতে পারব না। দুর্গাকে কথা দিয়ে এসেছি, অক্ষত দেহে ফিরব আমরা তিনজনেই।''

''তাহলে কি...'' বলতে গিয়েছিল ছিন্নমস্তা, হাত তুলে ওকে চুপ করিয়ে দিল ভৈরবী।

''কিছু লোকজন এদিকে আসছে'', বলল ভৈরবী, ''শিগগির লুকিয়ে পড়ো।''

গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা তিনজন। দেখল, পূর্বদিগন্তে আলো ফুটছে। ভোর হচ্ছে।

আরেকদল শ্রমিক এল, সরোবরের ধারে বসে জলযোগ সারল, ফেরত গেল। এই দলটার মধ্যে একটা লোক একটু পিছিয়ে পড়েছিল। খোঁড়াচ্ছিল লোকটা ধুঁকছিল। অসুস্থ? নাকি আহত? ওরা যেন শুনতে পেল, লোকটা কান্নাভেজা স্বরে বলছে, ''মা, মাগো, আর পারছি না মা!''

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ষোড়শী।

'কী হলো? চমকে উঠল ভৈরবী।''

''দাঁড়াও, আসছি!'' এই বলে লোকটার দিকে দৌড়ল ষোড়শী। কাছাকাছি পৌঁছতেই তড়িৎগতিতে নিজের ডান হাত লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিল। আস্তিনের ভেতর থেকে একগাছা দড়ি বেরিয়ে এসে জড়িয়ে গেল লোকটার পায়ে। লোকটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। টুঁ-শব্দটি করার সময় দিল না লোকটাকে, এক ঝটকায় ষোড়শী ওকে টেনে নিয়ে গেল গাছের আড়ালে।

''কে তুমি...'' বলতে গিয়ে ষোড়শীর দিকে তাকাল লোকটা। চোখে চোখ পড়তেই বিহ্বল হয়ে গেল। শিথিল হয়ে গেল লোকটার হাত-পা।

''মা, তুই এসেছিস্'' ঢুলু ঢুলু চোখ, সম্মোহনের ঘোরে বলল লোকটা, ''এখন আমি শান্তিতে মরতে পারি।''

''মরতে হবে না'', বলল ষোড়শী, ''শুধু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দে তো বাছা!''

''মা!'' বলল লোকটা, ''এককালে এই দ্বীপের সবাই ছিল মাতৃ-উপাসক ব্রহ্মাহৃদি। আমিও। তারপর এল ওই লোকটা— সজহঙ্গ! সঙ্গে ওর দলবল। সবকটা গুন্ডা বদমাইশ। আমরা সহজ সরল বনের মানুষ, আমরা কি আর শহুরে গুন্ডাদের সঙ্গে লড়তে পারি? শুরু হলো অসুরদের একতরফা গুন্ডামি। দ্বীপের মাঝে বাঁশের কেল্লা বানিয়ে বসল। যখন তখন ব্রহ্মাহৃদি ঘর থেকে মেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে যেত, আমাদের কষ্ট করে ধরা মাছ লুঠ করে নিয়ে যেত। আমরা কিছুই করতে পারতাম না। আমাদের মোড়ল কতবার দরবার করেছে রাজা অমিতবলের কাছে। সে রাজা তো এই দ্বীপটাকে নিজের দায়িত্ব বলেই মনে করতেন না। নিত্যদিনের নিপীড়ন থেকে পরিত্রাণ পেতে বাধ্য হয়ে আমরা সবাই একে একে অসুরদের ধর্ম গ্রহণ করলাম। এখন বুঝেছি, ভুল করেছিলাম। জাতও গেল, পেটও ভরল না। তিনটে ছেলে ছিল আমার, দুটো মেয়ে। ছেলেগুলোকে মহিষাসুরের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে পাঠাল সজহঙ্গ। গঙ্গানগরের যুদ্ধে মারা গেল সবাই। দুধের ছেলে মা, বড়টার সবে পনেরো বছর বয়স হয়েছিল। তাদের লাশও দেখতে পাইনি আমি। মেয়েদুটোকে কেল্লায় কাজ করতে নিয়ে গিয়েছিল সজহঙ্গর লোকজন। পরে ওদের লাশ পাওয়া গেল নদীর কাদায়। দেহগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছিল নরপশুগুলো। দুঃখে, অসুখে আর অপুষ্টিতে মারা গেল আমার বউটা। একা আমিই শুধু মৃত্যুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে আছি। কেন, জানি না। কেন যে আমার মরণ হয় না, কে জানে।''

একসঙ্গে অনেক কথা বলে হাঁপাতে লাগল লোকটা।

''বাঁশের কেল্লা যদি আগেই তৈরি হয়ে থাকে'', বলল ছিন্নমস্তা, ''তবে এখন এতসব কর্মকাণ্ড—এসব কী হচ্ছে?''

''কেল্লাটাকে আরও বড়ো করা হচ্ছে'', বলল লয়, ''চারপাশে পরিখা কেটে আরও দুর্ভেদ্য করে তোলা হচ্ছে।''

''কেন?'' প্রশ্ন ছিন্নমস্তার।

''জানি না'', মাথা নেড়ে বলল লয়, ''তবে শুনেছি সজহঙ্গ সন্দেহ করছে, সুন্দভূমি থেকে বাসুকীর সেনা এদিকে আক্রমণ চালাতে পারে। সম্ভবত তাই এত প্রস্তুতি।''

''এই দ্বীপে ক'টা পানীয় জলের সরোবর আছে?'' ষোড়শী প্রশ্ন করল।

''দুটো'', বলল লোকটা ''বড়ো সরোবর জঙ্গলের মধ্যে, সাধারণ লোকেদের জন্য। ছোটো সরোবর কেল্লার মধ্যে, সজহঙ্গ ও তার দলবলের জন্য।''

লোকটার চোখের সামনে হাত নিয়ে গিয়ে তুড়ি দিল ষোড়শী। ধীরে ধীরে সম্মোহনের ঘোর থেকে উঠে এল লোকটা। ওদের তিনজনকে দেখে ভয়ে শিউরে উঠল। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

''মা, তোরা নিশ্চয়ই মহামায়ার অংশ। তোরা এসেছিস্ তার মানে আমার সময় ফুরিয়েছে। মাতৃ-উপাসনা ত্যাগ করার শাস্তি দিতে এসেছিস আমাকে। তাই না মা? মেরে ফেল আমাকে, যত তাড়াতাড়ি পারিস মেরে ফেল।''

''নাম কী তোর, বাছা?'' নরম গলায় বলল ষোড়শী।

''লয়'', বলল লোকটা।

''না, আমরা তোকে মারতে আসিনি'', বলল ষোড়শী, ''ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, এসব অসুররা বলে। এটা আমাদের শিক্ষা নয়।''

''তবে?'' অবাক লয় বলল, ''কে তোমরা? এখানে কী করছ? তোমরা কি নতুন রাজার লোক?''

''না, আমরা কোনো রাজার লোক নই'', শান্ত স্বরে বলল ভৈরবী, ''আমরা সাধারণ ব্রহ্মাহৃদি নাগরিক। আমরা ঠিক করেছি, সঙ্গের দলবলকে মেরে নয়ঞ্জটকে পাপমুক্ত করব।''

''করবে তোমরা, সত্যিই করবে?'' উৎসাহে জ্বলে উঠল লয়।

''করব'', বলল ষোড়শী, ''এখন তুমি বলো, আমাদের সাহায্য করবে কী না।''

''নিশ্চয়ই করব'', বলল লয়, ''এই প্রাণটাও হেলায় হারাতে রাজি আছি, যদি তাতে ওই পাপী সজহঙ্গ মরে!''

''তাহলে আগামীকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করো। তোমাকে একটা কাজ দেব। আগামীকাল, জঙ্গল যেখানে শেষ হয়ে দুর্গের এলাকা শুরু হয়েছে, সেখানে এই পথের ধারে। ঠিক রাত্রির প্রথম প্রহরে। আর একটা কথা। আগামী একদিন ওই বড়ো সরোবরের জল মুখেও তুলবে না। আলাদা করে তুলে রাখা জল খাবে। মনে থাকবে তো?''



একদিন পরের কথা।

এক্ষুনি শেয়ালের দল রাত্রির প্রথম প্রহর ঘোষণা করেছে। জঙ্গলের সীমান্তে, যেখান থেকে বাঁশের দুর্গ পরিষ্কার দেখা যায়, সেখানে এসে দাঁড়াল ওরা তিনজন। লয় সেখানেই প্রতীক্ষা করছিল ওদের জন্য। লয়ের কোমরে ষোড়শী বেঁধে দিল একটা কাপড়ের থলি।

''এখান থেকে সোজা নাক-বরাবর কেল্লা পর্যন্ত হেঁটে যাবে,'' বলল ষোড়শী, ''তারপর কেল্লার দেওয়াল ধরে বাইরে ভেতরে ঘুরে বেড়াবে ক্রমাগত। এর মাঝে কোথাও দাঁড়াবে না। অর্ধ দণ্ড অতিক্রম হলে আমি গুনে গুনে চারবার পেঁচার ডাক ডাকব। সেই ডাক শুনতে পেলে জানবে, তোমার কাজ শেষ হয়েছে। থলিটা কোমর থেকে খুলে ফেলে দিয়ে সোজা হাঁটা দেবে জলপ্রপাতের দিকে। সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।''

কথামতো লয় রওনা দিল কেল্লার দিকে। কেউ খেয়াল করল না, ওর কোমরের থলির ছিদ্র থেকে কালচে বালির মতো গুঁড়ো কিছু একটা নিরন্তর বেরিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ছে। আজ কেন কে জানে, কাজের জায়গায় লোকজন খুব কম। দূর থেকে শোনা গেল, সজহঙ্গ তার অনুচরদের ওপর চোটপাট করছে, শ্রমিকরা আজ কাজে আসেনি কেন, সেজন্য। অনুচরদের ব্যাখ্যা, সবার নাকি একসঙ্গে পেট খারাপ হয়েছে।

সবার একসঙ্গে পেট খারাপ! বড়ো সরোবরের জল কি দূষিত হয়ে গেল নাকি? লোনা ধরে গেছে? নাকি কোনো বাঘ তার আধ-খাওয়া শিকার ফেলে গেছে জলের মধ্যে, সেই মাংস পচে বিষাক্ত হয়ে গেছে জল?

''আজই লোকজন নিয়ে গিয়ে সরোবরটাকে বুজিয়ে দিবি,'' অনুচরদের বলল সজহঙ্গ, ''আর নতুন একটা সরোবর খুঁড়বি ওর থেকে কিছুটা দূরে।''

দূরে নিকষ কালো আকাশের বুকে একটা উল্কা হঠাৎ করেই যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। হাউইয়ের মতো আকাশপানে উড়ে গিয়ে কোন সে আঁধারে বেমালুম মিলিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চকমকি মতো আগুনের একটা রেখা ওর পায়ের কাছ থেকে বেরিয়ে মাটির ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়ে গিয়ে সোজা পৌঁছল বাঁশের কেল্লায়। দাউদাউ আগুন ধরে গেল কেল্লার সর্বত্র।

ভয়ে বিহ্বল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে পরিখার অগভীর কাদাজলে গিয়ে দাঁড়াল সজহঙ্গ। ''শিগগিরি বালতি নিয়ে আয়, আগুন নেভা!'' পরিখা থেকেই হুংকার দিল। পাঁচজন প্রহরী অস্ত্রশস্ত্র ফেলে বালতি আনতে দৌড়ল। তারা কাছে আসতেই নিজের পরশু নির্ভুল লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিল ভৈরবী। খপ্, খপ্, খপ্, খপ্ খপ্! উড়ন্ত পরশুর আঘাতে এক এক করে পাঁচটা মুণ্ডহীন দেহ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সজহঙ্গকে আরও বিমূঢ় করে দিয়ে অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা তিনজন।

ষোড়শী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী।

এই মেয়েগুলো...দুর্গার দলবল নাকি? এরা এখানে কোত্থেকে এল? ভয়ে শিউরে উঠল সজহঙ্গ। সঙ্গীদের ডেকে বলল, ''এই, তোরা এদিকে আয়! কুড়িজন মিলে আমাকে ঘিরে থাক! বাকিরা সবাই মিলে ওই মেয়েগুলোকে আক্রমণ কর!''

অসুর সেনাদের ব্যস্তসমস্ত দৌড়াদৌড়ির দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে ছিন্নমস্তা সোজা এগিয়ে চলল পরিখার দিকে। সেখানে ভীত বিমূঢ় সজহঙ্গকে পাহারা দিচ্ছিল ভীষণ-দর্শন একদল অসুর। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এল ওর দিকে। ছিন্নমস্তা ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে ওর হাতের কাটারি বাঁ কাঁধের ওপর তুলল। তীক্ষ্ণ হুংকারের সঙ্গে ওর অস্ত্রও নেমে এল, অসুরের মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গড়িয়ে পড়ল পরিখার জলে। বাকি অসুররা প্রথমে একে একে, তারপর একসঙ্গে আক্রমণ করল ছিন্নমস্তাকে। কিন্তু ছিন্নমস্তা যেন এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, ওকে পার হওয়া অসম্ভব। ওর কাটারির ফলা চক্রাকারে ঘুরছে, ছিন্নভিন্ন করছে অসুরদের। কচুকাটা হচ্ছে অসুররা।

ভৈরবীকে নিরস্ত্র দেখে উৎসাহে ওর দিকে দৌড়ে গেল একদল অসুর সেনা, হাতে তাদের উদ্যত তরবারি। নিজের দু'হাত দু'দিকে বিস্তৃত করল ভৈরবী, যেন এই ডানা মেলল বলে। তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দের সঙ্গে ভৈরবীর জামার দুটো হাত ছিঁড়ে বেরিয়ে এল ভীষণ দর্শন দুটো অস্ত্র। দীর্ঘ হুংকারের সঙ্গে ভৈরবী দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল শত্রুদলের ওপর। বাহু সংলগ্ন দুই অস্ত্রের কৃপায় ভৈরবীর আক্রমণের পরিধি দ্বিগুণ হয়ে গেছে। যেন বাতাসে ভাসছে, ভৈরবী, লাফিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, এক অসুর থেকে আরেক অসুরের মাথার ওপর গিয়ে পড়ছে। ওর অস্ত্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে অসুরদের দেহ।

তিনজন বিকটদর্শন অসুর বর্শা নিয়ে দৌড়ে এল ছিন্নমস্তার দিকে, ছিন্নমস্তা শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে ওদের মাথা টপকে গিয়ে পড়ল ওদের পেছনে। কাটারির একটা চক্রাকার আঘাতে লুটিয়ে পড়ল দু'জন অসুর। ততক্ষণে আরেকজন অসুর ওর দিকে বর্শা চালিয়েছে। কাটারির বাঁটের মধ্যে সেই আঘাতটাকে আটকে দিল ছিন্নমস্তা। কাটারির এক মোচড়ে বর্শা ছিটকে পড়ল, ঘুরিয়ে বাঁটের পেছনটা দিয়ে আঘাত করল প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখে। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে চোখ ধরে বসে পড়ল সেই অসুর।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য অসুর সেনানীরা ওর দিকে এলোপাথাড়ি বর্শা ছুঁড়তে আরম্ভ করল। একঝাঁক বর্শা ধেয়ে এল। ভৈরবী আড়াল করে দাঁড়াল ছিন্নমস্তাকে। হাতদুটোকে প্রচণ্ড গতিবেগে ঘোরাতে শুরু করল ভৈরবী। এক অদৃশ্য বলয় তৈরি হলো ওদের ঘিরে, সবকটা বর্শা সেই বলয়ে স্পর্শ করে ছিটকে পড়লো।

মড়মড় শব্দ করে ভেঙে পড়ল বাঁশের কেল্লার একদিক। কেল্লা হেলে পড়ল পরিখার ওপর। তার সঙ্গেই জ্বলন্ত কেল্লার মধ্যে থেকে পরিখার জলে আছড়ে পড়ল কাঠের তৈরি কয়েকটা সিন্দুক। সেই সিন্দুকগুলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি উজ্বল নীল পাথর। নীল হীরে? নাকি বৈদুর্যমণি? দেখা দিয়েই পাথরগুলো টুপ্ করে ডুব দিল জলে। হায় হায় করে চিৎকার করে উঠল সজহঙ্গ। তখনই ষোড়শী খেয়াল করল, গোলমালের সুযোগ নিয়ে সজহঙ্গ হাঁচড় পাঁচড় করে পরিখা ছেড়ে উঠে পড়ার চেষ্টা করছে। হুংকারের সঙ্গে বিরাট একটা লাফ দিল ষোড়শী। পড়ল গিয়ে সজহঙ্গর ঠিক সামনে। হাতের অঙ্কুশ সব শক্তি দিয়ে চালিয়ে দিল সজহঙ্গর বুক লক্ষ্য করে। এক অনুচর ঝাঁপিয়ে পড়ল সজহঙ্গকে বাঁচাতে, অঙ্কুশ বিদ্ধ করল তার বক্ষ। সেই সুযোগে বাকি অসুররা ঝাঁপিয়ে পড়ল ষোড়শীর ওপর।

নীচু হয়ে বসে কোমরে জড়ানো নাগপাশ খুলে একটা ঘুরপাক খেয়ে গেল ষোড়শী, নিজের অক্ষের চারধারে। সাপুড়ের ঝুড়ির মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা শঙ্খচুড় সাপ যেমন করে মুহূর্তের মধে লাফিয়ে উঠে ছোবল মারে, ষোড়শীর নাগপাশ ঠিক তেমন করেই তার পাক খুলল, ফণা মেলল। বাতাসে অদ্ভুত একটা ধাতব শব্দ হলো, চাঁদের আলো বিচ্ছুরিত হলো নাগপাশের গায়ে। নমনীয় ধাতুর তৈরি নাগপাশ। চাবুকের মতো নমনীয়, তরোয়ালের মতো ধারালো। সামনে পাঁচজন অসুর ছিল, একসঙ্গে সবার পা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল।

সবার সামনে যে অসুর ছিল, সবচেয়ে লম্বা, পেছন থেকে তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ল ষোড়শী। হাতের নাগপাশ অসুরের গলায় পেঁচিয়ে ঝুলে পড়ল, দু-টুকরো হয়ে গেল অসুরের গলা। মাটিতে পড়তে না পড়তেই ষোড়শী আবার লাফ দিল, সঙ্গে একটা ঘুরপাক, কুণ্ডলী পাকানো নাগপাশ আবার খুলে হয়ে গেল দু-ফলা তরোয়াল। সেই তরোয়ালের আওতায় এসে গেল তিনজন অসুর, সবাই আর্তচিৎকার করে ভূমিশয্যা নিল। একটা বিরাট লাফ দিয়ে ষোড়শী গিয়ে পড়ল অসুরদের দলের ঠিক কেন্দ্রে। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল অসুরদের মধ্যে। সবাই একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে ষোড়শীর



ওপর, কিন্তু ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে ষোড়শী। ওর নাগপাশ যেন এক চলমান ঘূর্ণিস্রোত, সে ঘুর্ণির সংস্পর্শে যেই আসছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

গোলমালের সুযোগে পরিখা ছেড়ে উঠে পড়ল সজহঙ্গ। পেছন ফিরে দেখল, তিন নারীযোদ্ধাই ব্যস্ত। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত দরকার। এখান থেকে সোজা দৌড়লেই জঙ্গল, একবার সেখানে গা ঢাকা দিতে পারলে আর কেউ ছুঁতে পারবে না।

হঠাৎ সজহঙ্গর সামনে আবির্ভূত হল লয়।

''এই, তুই এখানে ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে কী করছিস,'' হুংকার দিল সজহঙ্গ, ''যা, ওই মেয়েগুলোকে ধরে মার!''

যেন উত্তর দিতেই সজহঙ্গর গলা জড়িয়ে ধরল লয়। ঝাঁপ দিল পরিখার জলে। হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণপণ চেষ্টা করল সজহঙ্গ, লয়ের দু'বাহুর বাঁধন ছিঁড়ে বেরোতে। কিন্তু লয়ের বুড়ো হাড়ে আজ প্রেতের শক্তি। ঘুঁষি, লাথি, আঁচড়, কামড় কিছুতেই সেই মরণ-আলিঙ্গন মুক্ত হলো না। পরিখার কাদাজলের নীচে ছটফট করতে করতে একসময় স্থির হয়ে গেল সজহঙ্গর শরীরটা। লয় তার অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে। হাতদুটো তবু আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে সজহঙ্গর গলাটাকে। চোখ ফেটে জল এল ভৈরবীর। ''উমহহহঃ!'' হাড় হিম করা এক হুংকার বেরিয়ে এল ভৈরবীর গলা থেকে। ওর ডাকে সাড়া দিয়ে জঙ্গলের আঁধার ভেদ করে বেরিয়ে এল গতরাতের সেই বাঘ। বেরিয়ে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ভৈরবীর শত্রুদের ওপর।

দলপতি সজহঙ্গ নিহত। কেল্লা পুড়ে ছাই। অধিকাংশ সৈনিক হতাহত। তার ওপর আচমকা এই বাঘের আক্রমণ। প্রাণভয়ে নদীর দিকে পালাতে লাগল অসুররা। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ওরা তিনজন দৌড়ল জঙ্গলের দিকে। ষোড়শী উত্তরের দিকে যাচ্ছিল, নদীর পানে। কিন্তু ভৈরবী ইশারা করল দক্ষিণের দিকে। ওরা দৌড়ল টক-সুঁদরির সেই ঝোপের দিকে, যেখান থেকে সুড়ঙ্গ গেছে জলপ্রপাতে।

''ওদিকে যাচ্ছ কেন?'' দৌড়োতে দৌড়োতেই বলল ষোড়শী, ''এখন তো আর লুকিয়ে-চুরিয়ে দ্বীপ থেকে পালানোর বালাই নেই! সোজা নদীতে গিয়ে পড়লেই তো হলো!''

''সব অসুররা সেদিকেই দৌড়োচ্ছে,'' ঠাট্টার ছলে বলল ভৈরবী, ''আমরাও ওদের সঙ্গে দৌড়োব? সেটা কি ভালো দেখায়? ওরা লজ্জা পাবে না? তাছাড়া, ওদিকে একটা কাজ আছে। বিশেষ দরকার আছে ওদিকে যাওয়ার। দেখাচ্ছি, একটু সবুর করো!''

টক-সুঁদুরির লাল-সবুজ লতার আড়াল ছিঁড়ে লাফিয়ে পড়ল ওরা সুড়ঙ্গের মধ্যে। এবার আর সতর্ক পদক্ষেপ নয়,

সশব্দে প্রাণপণে দৌড়ল ওরা। পথে পড়ল সেই পাতাল-জলা, কুমিরদের বাসস্থান। জায়গাটা পেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়ালো ভৈরবী।

পায়ের শব্দ পেয়ে এক ডজন কুমির এগিয়ে এল ওদের দিকে। তাদের বীভৎস হাঁ-করা মুখ যেন মৃত্যুর পরোয়ানা। দ্রুত নিজের পিঠের পোঁটলা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে ভৈরবী তার মধ্যে থেকে বার করে আনল একমুঠো নারকেলের ছোবড়া। ক্ষিপ্রহাতে চকমকি ঠুকে ছোবড়ায় আগুন ধরাল। তারপর সেই আগুনের গোলা ছুঁড়ে দিল জলার দিকে। তারপর ঊর্ধশ্বাসে দৌড়ল জলপ্রপাতের অভিমুখে যাওয়া সুড়ঙ্গের দিকে। জলার পাঁকে জন্মানো দাহ্য বাস্পে আগুন ধরে গেল এক লহমায়। আলোয় আলো হয়ে গেল অন্ধকার গুহা। হুড়মুড় শব্দে পাথর খসে পড়তে লাগল গুহার ছাদ থেকে। ধস নেমে বন্ধ হয়ে গেল জলা থেকে জলপ্রপাতের দিকে যাওয়ার পথ। ভয় পেয়ে কুমিরের দল দৌড়ল উলটোদিকে, দ্বীপের উপরিভাগে যওয়ার সুড়ঙ্গের অভিমুখে।

সুড়ঙ্গের মধ্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোনদিকে পথ, কিছুই বোঝার উপায় নেই। এরই মধ্যে জল বাড়ছে সুড়ঙ্গে। পা ছাড়িয়ে জল উঠছে কোমর, বুকের দিকে।

''দুশ্চিন্তার কিছু নেই,'' বলল ভৈরবী, ''শুধু জলের স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও!''

নিকষ-কালো অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে জলের স্রোতে ভেসে চলল ওরা। ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গ প্রশস্ত হচ্ছে, জলের গতি বাড়ছে। শেষে খ্যাপা মোষের মতো ছুটে চলল জলস্রোত। হঠাৎ সুড়ঙ্গ শেষ হলো জল সেখানে পাহাড় ছেড়ে ঝাঁপ দিচ্ছে সমুদ্রে। একরাশ জলের সঙ্গে ওরা ছিটকে পড়ল নীচে, অনেক নীচে। যেখানে রাশি রাশি সাগরের জল তাথৈ তাথৈ নৃত্য করছে, সাদা ফেনার বুদ্বুদ ছড়িয়ে। মারাত্মক একটা ধাক্কা। অনুভূতিগুলো কয়েক মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল চোখ। জলের অনেক নীচে, রাশি রাশি সবুজ জল ও অজস্র রংবেরঙ্গের মাছের মধ্যে আবার আলো ফিরল চোখে। যন্ত্রণা, দমবন্ধ-ভাব। কিছুক্ষণ পরে জলের ওপর ভেসে উঠল তিনটে মাথা।

''বাকি যে কটা অসুর প্রাণে বেঁচেছে,'' লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলল ভৈরবী, ''তাদের কুমিরে খাবে। সজহঙ্গর স্মৃতিতে বাতি জ্বালাবার জন্য কেউ বেঁচে থাকবে না।''

সাগরের ঢেউয়ের উজান ঠেলে ছোট্ট একটা নৌকো এগিয়ে এল ওদের দিকে। সে নৌকোর চালকের আসনে বসে আছে ব্রঙ্গার গুপ্তচর প্রধান বিরূপাক্ষের প্রধান সহচর কৃতান্ত। ওপর থেকে পাথর ও জ্বলন্ত গাছপালা ক্ষেপণাস্ত্রের মতো ক্রমাগত জলে এসে পড়ছে। সে সবের পাশ কাটিয়ে দ্রুত এসে পড়ল কৃতান্ত।

''ওদিকের কী খবর?'' নৌকোয় উঠতে উঠতে ভৈরবী প্রশ্ন করল কৃতান্তকে।

''সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে,'' বলল কৃতান্ত, ''পাহাড়ের ওপারে বাসুকী তার পার্বত্য সেনা নিয়ে ওত পেতে আছে। আর এদিকে যাবতীয় জলপথ ব্রঙ্গার নৌসেনা ঘিরে রেখেছে। দ্বীপ থেকে যেই পালাক, ধরা পড়বেই।''

''যদি পালানোর যোগ্য কেউ বেঁচে থাকে,'' খিকখিক করে হেসে উঠল ষোড়শী, ''ওঃ, কী মারপিটটাই না হলো, জম্পেশ মারপিট। তবে দুঃখ রয়ে গেল, ওই দেড়েল সজহঙ্গটাকে নিজে হাতে কুচি কুচি করে...।''

''বকবক না করে তাড়াতাড়ি নৌকোয় উঠে পড়ো,'' ধমক দিয়ে বলল ভৈরবী, ''জলে কিলবিল করছে হাঙ্গর। কুচ করে পা কেটে নিয়ে পালিয়ে যাবে, টেরও পাবে না!''

ওদের তিনজনকে নৌকোয় তুলে নিয়েই কৃতান্ত দাঁড়ের প্রবল এক ধাক্কায় নৌকোকে এনে ফেলল সমুদ্রের স্রোতে। জোরে নড়ে উঠল নৌকো, তারপর উল্কাবেগে ছুটল সমুদ্রের দিকে। দূরে পড়ে রইল বহ্নিমান নয়ঞ্জট দ্বীপ।

''একটা খটকা লাগছে,'' নৌকোয় ওঠার পর প্রথম কথা বলল ষোড়শী।

''কী সেটা?'' প্রশ্ন ভৈরবীর।

''বাঁশের কেল্লায় সিন্দুকভর্তি দামি পাথর,'' বলল ষোড়শী, ''ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়?''

''তুমি ঠিক দেখেছিলে,'' বলল ছিন্নমস্তা, ''ওগুলো দামি পাথর?''

''কম দামি পাথর সিন্দুকে কেন রাখবে?'' মাথা নেড়ে বলল ষোড়শী।

''সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে,'' বলল কৃতান্ত, ''মহিষ নাকি স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে গোমেদ ইত্যাদি রত্ন দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের দাম দিচ্ছে, কর্মচারীদের বেতন মেটাচ্ছে।''

দূরে দিকচক্রবালের কাছে দেখা দিল ব্রঙ্গার নৌসেনার জাহাজ। এগিয়ে আসছে ওদের দিকেই। পেছন ফিরে দেখল ষোড়শী। এখান থেকে নয়ঞ্জট দ্বীপটাকে দেখতে লাগছে, ঠিক যেন সমুদ্রের চওড়া নীল কপালে একটা সিঁদুরের টিপ।



চোখের জল মুছে গিরিপথ ধরে এগিয়ে চললেন গুরু শব্দপালন। আজকাল এই এক সমস্যা হয়েছে। যেখানেই যান, চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাজার হাজার বছরের ঘটনাবলী। কী সব মানুষ জন্মেছিল এই দেশে! স্মৃতি বড়ো কষ্টের। সব

ভুলে যেতে পারলেই বোধহয় ভালো ছিল। কিন্তু বিবেক যে ভুলতে দেয় না। সমাজের উত্তরদায়িত্ব ভুলতে দেয় না।

হতাশ হলে চলবে না। আজকের শূন্যতার মধ্যে দিয়েই আগামীযুগের সোপান নির্মাণ করতে হবে। অসুররা আবার ফিরে এসেছে। কে হবে এ যুগের দুর্গা? কে নিজের কাঁধে তুলে নেবে মহিষাসুর বধের দায়িত্ব?

মা আদ্যাশক্তি! তুই কোথায়, মা? কোথায় তোর দশ মহাবিদ্যা? ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ষোড়শী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, কালী...আবার কি তারা জন্ম নেবে কখনো?

কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ি জঙ্গলের ঘোমটা সরিয়ে দূরে অনেক নীচে পাকদণ্ডীর ধারে দেখা দিল ছোট্ট একটা পাহাড়ি গ্রাম।

একজটা। আমার জন্মভূমি। এতগুলো শতাব্দী পার হয়ে গেল, গ্রামটা আজও একইরকম রয়েছে।

গলার রুদ্রাক্ষ মালাটা একবার ছুঁয়ে দেখলেন গুরু শব্দপালন। তারপর জোরপায়ে এগিয়ে চললেন জন্মভূমি গ্রামের দিকে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার আগে অসীম মায়ায় আরেকবার পেছন ফিরে তাকালেন ফেলে আসা পথের দিকে। সুন্দভূমির দিকে। প্রলয়ের আগে ওই সবটাই ছিল এক অখণ্ড ভূমি। সমুদ্রের গ্রাসে তা হয়ে দাঁড়ালো খণ্ড বিচ্ছিন্ন অসংখ্য দ্বীপ। সেই সহস্রাধিক দ্বীপকে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্যে পরিণত করা সহজ কাজ ছিল না। সব পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু তাই কি? সুন্দভূমির মানুষ কি ভুলে যাবে মাজাপাহিত সাম্রাজ্যের কথা?

পাঁচশো বছর পার হয়ে গেল তারপর।



মাঝরাত। রুপোর থালার মতো বড়ো একটা চাঁদ উঠেছে। চট্টলা সৈকত থেকে পাহাড় পর্যন্ত বান ডেকেছে জ্যোৎস্নার। সেই জ্যোৎস্নার ফিনকি ফুটেছে ডাইন পাহাড়ের মাথার ওপরেও। দূরে মোবাইল টাওয়ারে আলো জ্বলছে, নিবছে, জ্বলছে, নিবছে। ঘ্যানঘ্যানে স্বরে রেডিয়োতে গান চলছে, অনেক দূরে কোথাও। সাবান দিমু ডইল্যা, সাবান দিমু ডইল্যা।

দলে দলে গ্রামবাসী হাঁটছিল পাহাড়ের দিকে। হাতে লাঠি, সড়কি, তরোয়াল, মশাল। সবাই আজি ক্ষিপ্ত। আর ক্ষিপ্ত হবে নাই-বা কেন। গ্রামের ছেলে আনোয়ার, বয়স মাত্র সাত। বাপ ধর্মভীরু চাষা, ছেলেকে অল্প বয়সেই গ্রামের মাদ্রাসায় ভর্তি করেছিল। সেই আনোয়ারের দেহ পাওয়া গেছে নদীর ধারে, কাদায় পোঁতা অবস্থায়। এ নিশ্চয়ই ওই মালাউন ডাইনিটার কাজ, বলেছিল মাদ্রাসার হুজুর। পাক এই গ্রামে একটাও মালাউন আর বাকি নেই, ওই বুড়িটা ছাড়া। জমিদার পরিবারের শেষ বংশধর, পাহাড়ের মাথায় জমিদার বাড়িটাতে বুড়ি একাই থাকে। মরেও না বুড়ি। কুফুরি জাদু জানে ইবলিশের চর ওই ডাইনিটা। গ্রামের কয়েকজন ছেলেছোকরা বুড়িকে ভয় দেখিয়ে বাড়িছাড়া করার চেষ্টা করেছিল, উলটে নিজেরাই ভয় পেয়ে ফিরে এসেছে। বাড়িটাতে নাকি শয়ে শয়ে ভূতের আড্ডা। ঢোকার চেষ্টা করলেই মারতে আসে।

কিন্তু আজ আর ভূতের ভয়ে ঘরে বসে থাকা যাবে না। গ্রামের ছেলেটাকে খুন করে কাদায় পুঁতে রেখেছে ডাইনিটা, এর একটা শেষ দেখতেই হবে। মালাউনটাকে নিকেশ করে গ্রামটাকে পাক সরজমিন করতে হবে। দলে দলে গ্রামবাসী তাই আজ চলেছে পোড়ো জদিারবাড়ির দিকে।



পাহাড়ের নীচে মশালের মিছিল এঁকেবেঁকে এদিকেই এগিয়ে আসছে, দূর থেকে তাই দেখছিল ধূমাবতী। নিয়তির মতোই এগিয়ে আসছিল আলোর রেখাটা। আজ আর ভয় করছে না। অনেক বছর তো হলো। এই দেশে হিন্দু হয়ে জন্মানো হলো সবচেয়ে বড়ো অপরাধ। হিন্দু হলো ওয়াজিব-উল-কতল। কী পূর্ব পাকিস্তান, কী বাংলাদেশ, হিন্দুদের ভাগ্য শুধু মরে বাঁচা। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ধর্মান্ধতার মাঝে ফলিত বিজ্ঞানের জ্ঞান আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে ধূমাবতীকে। কিন্তু একদিন না একদিন সেটার মেয়াদ তো শেষ হতোই।

''দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখবে, নাকি পালাবে?'' বলল মাতঙ্গী।

''ওই ছেলেটাকে কিন্তু আমি মারিনি। মাদ্রাসার হুজুর ছেলেটাকে রোজ রাতে রেপ করত। ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়তে ছেলেটাকে মেরে কাদায় পুঁতে দিয়েছে ওই পিশাচটা। তারপর আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে...''

''আমি জানি সব। এখন সময় নষ্ট না করে, চলো পালাই।''

''দু'দিন পরে কালীপুজো,'' অস্ফুটস্বরে বলল ধূমাবতী, ''ভিটেতে এই প্রথম প্রদীপ জ্বলবে না। পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে কোথায় পালাবো?... না না... তার চেয়ে বরং এখানেই মরব...''

''দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরে কী লাভ? মরতে চাও, কিছু কাজের মতো কাজ করে মরো। সে সুযোগ আমি পাইয়ে দেবো, কথা

দিচ্ছি। এখন চলো!"

"দাঁড়াও," একটু ভেবে বলল ধূমাবতী, "একটা কাজ সেরে তারপর যাবো। জমিদারবাড়ির ওপর লোভ ওদের অনেকদিনের। এ বাড়ি ওদের ভোগে লাগতে দেব না।"

দশ মিনিট। তারপর পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে শেষবারের মতো বেরিয়ে এল ধূমাবতী। কাঁধে ব্যাগ, দু'হাতে দুটো মস্তবড়ো ধাতব স্যুটকেস।

"এই এতসব কী?" মালপত্রের বহর দেখে অবাক হলো মাতঙ্গী, "তোমার কি মনে হয়, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি?"

"আরে, আমার ল্যাপটপ, একডজন ডাটা ডিস্ক, তারপর আমার আবিষ্কৃত রকমারি কেমিক্যালসের স্যাম্পল... আমি স্বর্গে গেলেও এসব তো আমার সঙ্গেই যাবে।"

ধাতব স্যুটকেস দুটো ধূমাবতীর হাত থেকে জোর করে নিজের হাতে তুলে নিয়ে মাতঙ্গী বলল,

"আর সময় নষ্ট নয়, এবার চলো। টেনে দৌড়তে হবে কিন্তু।"

জঙ্গল ভেঙে দুড়দাড় করে দুজনে নেমে চলল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। পাহাড়ি ঝরনা যেখানে কর্ণফুলী নদীর ওপর আছড়ে পড়েছে, সেখানে ঝরনার পেছনে লুকানো ছিল মকর। সেটাতে চড়ে বসামাত্র টুলু পাম্প চালু হওয়ার মতো একটা ঘড়ঘড় শব্দ হলো, তারপর নদীর জলে বুড়বুড়ি কেটে ডুব দিল। অদৃশ্য হলো দুজনে।



ঠিক সেই সময়, জমিদারবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে গ্রামবাসীরা। প্রথমে ডাইনির ভূতের ভয়ে সাবধানে পা ফেলছিল। তারপর যখন বুঝতে পারল বুড়ি ডাইনিটা নিজের পোষা ভূতগুলোকে নিয়ে পালিয়েছে, তখন শুরু হলো বেপরোয়া লুটতরাজ।

মাদ্রাসার হুজুর ঢুকেছিল জমিদারবাড়ির নাচঘরে। রকমারি শিশি বোতল আর দুর্গন্ধময় রাসায়নিক পদার্থে ভর্তি সে ঘরে ঢুকে নাক সিঁটকালো হুজুর। ভেবেছিল সোনা, রুপো, মণি-মুক্তো কী কমপক্ষে ঝাড়লণ্ঠন আর স্ফটিকের পানপাত্র পাওয়া যাবে এখানে, কিন্তু তার বদলে এসব কী ইবলিশি সামান? হঠাৎ করেই অন্ধকারে কী একটা সরু তারে পা জড়িয়ে গেল। সেই তারের অন্য প্রান্তে ছিল একটা প্লাগ, সেটা প্রোথিত ছিল দেওয়ালে আটকানো একদলা প্লাস্টিকের মধ্যে। তারে টান লেগে প্লাগটা খুলে গেল প্ল্যাস্টিকের দলা থেকে।

পরমুহূর্তেই একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল পাহাড়। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল বাড়ির ছাদ। খাঁচায় আটকে পড়া ইঁদুরের মতো ছোটাছুটি শুরু করল প্রাণভয়ে ভীত দাঙ্গাবাজের দল। যেখানেই যায়, দেখে আগুনের স্রোত। তীব্রগন্ধী কেমিক্যালের স্রোত বইছে বাড়ি জুড়ে। সেই কেমিক্যালের স্রোতে ভর করে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। তার সঙ্গে ঘটছে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ। বিশাল বাড়ির প্রতিটি কোণ আজ হয়ে উঠেছে মৃত্যুফাঁদ। আগুনে পুড়ে আর ইট-কংক্রিটের নীচে চাপা পড়ে এন্তেকাল হলো গ্রামের যত দাঙ্গাবাজের। ঢাকিসুদ্ধু ঢাক বিসর্জন।



সূর্যের প্রথম রশ্মি জলতল স্পর্শ করার সঙ্গেই মাতঙ্গীর কার্বন ফাইবার নির্মিত উভচর জলযান 'মকর' সাপের মতো বাঁকা নদীখাত বেয়ে কর্ণফুলীর মোহনায় পৌঁছল। বাংলাদেশ নৌসেনার কড়া পাহারা এখানে। তাদের সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়ে, শিপবিল্ডিং ডক পাশ কাটিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ল। তারপর পাড় ঘেঁষে ঝড়ের গতিতে দক্ষিণপানে এগিয়ে চলল। কখনো জলের উপরে একটু মাথা উঁচিয়ে, কখনো-বা জলতলের কয়েক ইঞ্চি নীচ দিয়ে এগিয়ে চলল মকর। বাঁশখালী, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, টেকনাফ পার হয়ে সন্ধ্যের মধ্যেই ইরাবতীর মোহনায় পৌঁছে গেল। অনেক জাঙ্কবোট সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে সাবধানে ড্রাইভ করতে হবে। কোনো জাঙ্কবোটের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেলে মুশকিল হবে।

"আর কতদূর পরে থামবে?" মুখ ভেটকে বলল ধূমাবতী, "বসে বসে কোমর যে ব্যথা হয়ে গেল।"

"আরও কয়েক ঘণ্টা, "বলল মাতঙ্গী, "শহর পেরিয়ে নিরালা কোথাও নোঙ্গর করব। মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য কিন্তু। তারপর লম্বা পথ। সময়মতো বালিক-পাপান পৌঁছতে হবে।"

"বালিক-পাপান?" হেসে বলল ধূমাবতী, "বালিক-পাপান, বালিক-পাপান। বাঃ, বেশ মজার নাম তো। মনে হচ্ছে যেন একটা বাচ্চার ডাকনাম। কোথায় জায়গাটা?"

"দক্ষিণ বোর্নিও," বলল মাতঙ্গী, "ক'দিন পরেই দেখতে পাবে। খুব সুন্দর জায়গা।"

"দক্ষিণ বোর্নিও," ধূমাবতীর স্বরে আগ্রহের সুর, "শুনেছি ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী সেখানেই তৈরি হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, জাকার্তার পুরোনা রাজধানী ছেড়ে..."

"এই নিয়ে শুনলাম অনেক গোলমাল শুরু হয়েছে? ইন্দোনেশিয়ায় নাকি খুব শিগগিরই প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান হবে? সেই ভয়ে কাঁপছে মালয়েশিয়া।

জাভায় একটা আগ্নেয়গিরি আছে, নাম তার সুমেরু। সেই আগ্নেয়গিরি হঠাৎ করেই জেগে উঠেছে। এটা নিয়ে নাকি একটা ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে। যেদিন আগ্নেয়গিরি জাগবে, সেদিন নাকি হিন্দু ইন্দোনেশিয়াও জেগে উঠবে। তা, সে আগ্নেয়গিরি তো জেগেছে। এখন ইন্দোনেশিয়া...''

উত্তরে মাতঙ্গী শুধু একটু মুচকি হাসল।

''ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং,'' বলল ধূমাবতী, ''তোমাকে একটা গল্প বলি, শোনো। এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নাম তার কৌণ্ডিন্য। ভারতের পূর্ব উপকূলের হয়তো বাঙ্গলা কী ওড়িশার কোনো গ্রামের লোক ছিল সে। জাহাজে করে যাচ্ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, চাকরির খোঁজে। তখনকার দিনে এমনটা নিয়মিত ঘটত। প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমার ভোরে বণিকেরা পণ্যসামগ্রী ভর্তি জাহাজ নিয়ে দলে দলে পাড়ি দিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।''

''হুঁ, সেই জন্যই গ্রামবাঙ্গলায় আজও প্রথা আছে, কার্তিক পূর্ণিমার দিন বাচ্চারা কলাগাছের কাণ্ড দিয়ে খেলনার নৌকো বানিয়ে পুকুরে কী নদীতে ভাসিয়ে দেয়।''

''একই প্রথা ওড়িশাতেও আছে,'' বলল ধূমাবতী, ''সেখানে আরও বড়ো আকারে হয়। ওরা বলে—বালীযাত্রা। তা, যেটা বলছিলাম। সেইসব বণিকদের সঙ্গে যেত জ্ঞানী ও গুণী পণ্ডিত ও নাটকের দল। ছ'মাস বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য করার পর নতুন পসরায় জাহাজ ভরে বণিকেরা ফিরে আসত বাঙ্গলা, ওড়িশায়। মজার ব্যাপার হলো ওইসব জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ও নাটকের দল, এরা বেশিরভাগ সময়েই রয়ে যেত দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায়। পরিবর্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত গাইয়ে বাজিয়ে নাটকের দল জাহাজে চড়ে আসত ভারতে। কালচারাল এক্সচেঞ্জ, সেই যুগে, ভেবে দেখো!''

''আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি,'' অধৈর্য স্বরে বলল মাতঙ্গী, ''কৌণ্ডিন্যর কী হলো?''

''পথে কৌণ্ডিন্যর জাহাজ আক্রমণ করল জলদস্যুর দল। কৌণ্ডিন্য ছিল মস্ত বীর। তার নেতৃত্বে বণিক জাহাজ জোরদার লড়াই করে হারিয়ে দিল জলদস্যুদের। কিন্তু সেই যুদ্ধে বণিক জাহাজের খোল গেল ভেঙে। বাধ্য হয়েই তারা নোঙ্গর করল ছোট্ট একটা দ্বীপে। জাহাজ সারাই হচ্ছে এমন সময় জলদস্যুরা ফিরে এল আরোও অনেক সৈন্য নিয়ে। কৌণ্ডিন্য ভাবলো, মরতে তো হবেই, শেষ লড়াই করেই মরব। তা, সেই শেষ লড়াইয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় অবাক একটা কাণ্ড ঘটল। জলদস্যুদের নেত্রী বণিকদের কাছে গিয়ে বলল, ওই যে পণ্ডিত, যে খুব বীরের মতো লড়াই করল, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। বিয়ে করতে রাজি না হলে কিন্তু আবার লড়াই হবে। কৌণ্ডিন্য বিয়ে করতে রাজি হলো। ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের।''

''হতে যাচ্ছিল যুদ্ধের গল্প, হয়ে দাঁড়ালো প্রেমের গল্প। বাঃ!''

''গল্পের কিন্তু এখানেই শেষ না। বরং বলতে পারো, সেখানেই গল্পের শুরু। সেই কৌণ্ডিন্য আর সেই জলদস্যু নেত্রী, যার নাম ছিল সোমা, তারা দু'জনে মিলে তৈরি করল এই অঞ্চলের প্রথম সাম্রাজ্য।''

''হুঁ,'' অন্যমনস্ক স্বরে বলল মাতঙ্গী, ''কৌণ্ডিন্য যে ডাকাতরানিকে বিয়ে করল, সেটা কি রানির রূপে মুগ্ধ হয়ে, নাকি বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে, নাকি স্রেফ লড়াই এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, সেটা নিশ্চয়ই ইতিহাসে লেখা নেই। তবে যাই বলো, এরকম নারী চরিত্রই আমার পছন্দ। মিনমিনে নয়, প্যানপ্যানে নয়, বীর। যাকে ভালোবাসবে, তাকে বীরত্বে মুগ্ধ করবে। চিত্রাঙ্গদার মতো। জয় হোক সেই ডাকাতরানির। তা, তুমি তো খুব ভালো গল্প বলো!''

''এই অঞ্চলের পাঁচটা প্রাচীন সাম্রাজ্য।'' উৎসাহের স্বরে বলল ধূমাবতী, ''মায়ানমার, থাই, ভিয়েত চম্পা, শ্রীবিজয় আর মাজাপহিত। প্রত্যেকটা নিয়েই এরকম অনেক গল্প ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপর ভারতের অবদান, আর ভারতের ওপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবদান, দুটোই এতটা গভীর, যে ভাবতে বসলে অবাক হতে হয়। তুমি কি জানো, এই যে আমরা পান-সুপারি খাই, সেটার উৎস আসলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া? কী সব যুগ ছিল, কী সব মানুষ জন্মেছিল সেই সময়ে। ওরকম মানুষ কী আর কখনো জন্মাবে?''

''মানুষ তো আর জন্মায় না, জন্মায় শিশু। সেই শিশুকে আমরাই গড়ে তুলি। ওরকম মানুষ আবার জন্মাবে, যদি ওরকম বাবা-মা জন্মায়।''

গেরুয়া আলোয় রঙিন হয়ে আছে জল। দ্রুত জল কেটে রেঙ্গুন শহরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল মকর। ইরাবতীর তীর জুড়ে এখন সাদা বালির পাড়, ঘন জঙ্গল আর নারকেল গাছের সারি। মাঝে মাঝে প্যাগোডার মতো দেখতে সাদা কাঠের বাড়ি, তাদের মাথার ওপর সোনালি রঙের পেইন্ট। ধীরে ধীরে জলের নীচে ডুব দিল মকর। মাতঙ্গী ওর গলার রুদ্রাক্ষ মালাটা ছুঁয়ে দেখল অন্যমনস্কভাবে। যেন নিজেকে ভরসা দিল, মালাটা ঠিকঠাক সুরক্ষিত আছে। রুদ্রাক্ষ মালার নীচে লকেটের মতো একটা শকুনের করোটি ঝুলছে। বহু যুগের পুরোনো করোটি, শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে। গালার প্রলেপ তার ওপরে। গালার লাল রঙে করোটিটাকে আরও ভীতিপ্রদ দেখাচ্ছে। সূর্যাস্তের আলোয় জলের নীচের রংও লাল। ফাইবার গ্লাসের মধ্যে দিয়ে লাল আলো ঢুকে পড়েছে মকরের ভেতরে। জগৎ সংসার রক্তের রঙে রক্তাভ হয়ে গেছে। জলের নীচে ছড়িয়ে আছে শ্যাওলা ঢাকা অনেক ভাঙা জাহাজের অংশ। লাল আলোয় শ্যাওলার রংও লাল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে

With Best Compliments from :

PIONEER PAPER AND STATIONERY PVT. LTD.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,
ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২৬৮-২৮৩৩
২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

কাঁচড়াপাড়া ঃ ৬৯/ডি, বাগ স্টেশন রোড, বাগ মোড়, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩ ১৪৫
ফোন ঃ ৭০৪৪০৬২০০০, ২৫৮৫ ৩৩৩৩

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

জাহাজডুবি হয়েছে এখানে, তার ইতিহাস আঁকা আছে জলের তলায়।



পরদিন ভোরবেলা সূর্য ওঠার ঠিক পরেই মালাক্কা প্রণালী পৌঁছে গেল ওরা। সমুদ্র, কিন্তু সমুদ্র নয়। দু'দিকেই পাড় দেখা যাচ্ছে। পাড় জুড়ে অসংখ্য জাহাজ। প্রত্যেকটা জাহাজ ভর্তি কন্টেইনার, একটার পর আরেকটা চাপিয়ে এত উঁচু হয়েছে, যে জাহাজটার ওপারে কী আছে, দেখা যাচ্ছে না। উঁচু উঁচু ক্রেন ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে জাহাজের দিকে হাতছানি দিচ্ছে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া আর সিঙ্গাপুর—তিন দেশের রণতরী পাহারা দিচ্ছে জলপথ। অয়েল ট্যাঙ্কার জাহাজ, শিপিং কন্টেনার জাহাজ, বড়লোকদের লাক্সারি ইয়ট, মাছ ধরার ট্রলার, কতই না রকমের জাহাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বল্পপরিসর এই জায়াগাটুকুর মধ্যে। গতিবেগ অনেকটা কমিয়ে দিল মাতঙ্গী। জলপুলিশের নজরে না পড়াই ভালো। পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই এমন একটা আন্তর্জাতিক শিপিং লেনে ঢুকে পড়েছে ওরা, তার ওপর এমন একটা মিলিটারি রেড উভচর যান নিয়ে। জানাজানি হলে তিনটে দেশের সঙ্গে ডিপ্লোম্যাটিক সমস্যা তৈরি হবে।

''তুমি কি জানো,'' বলল ধূমাবতী, ''সারা পৃথিবীর যত ব্যবসা-বাণিজ্য, তার তিনভাগের একভাগই হয় এই মালাক্কার মধ্যে দিয়ে?''

''জানি,'' বলল মাতঙ্গী, ''আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানো? ভারতের পূর্বে মালাক্কা আর পশ্চিমে হরমুজ, এই দুই প্রণালী দিয়ে পৃথিবীর আশি শতাংশ ব্যবসা হয়। তাই বোধহয় আমাদের পূর্বজরা পূর্বে হনুমান আর পশ্চিমে সুখধারা—দুটো স্ট্র্যাটেজিক দ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিলেন, যেখান থেকে এই দুটো প্রণালীর ওপরে নজর রাখা যায়। দুঃখের কথা হলো—সুখধারা, যাকে লোকে এখন সোকোট্রা বলে, সেটা আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।''

''হনুমানও হাতছাড়া হয়ে যেত,'' বলল ধূমাবতী, ''যদি না দলে দলে বাঙ্গালি হিন্দু স্বাধীনতা সংগ্রামী সেখানে কালাপানির শাস্তি ভোগ করতে যেত। তাদের আত্মত্যাগের ফল, সেই হনুমান অর্থাৎ আন্দামান আমাদের হাতে রয়েছে। আর সেটাই একটামাত্র কারণ, যার জন্য চীন আমাদের ভয় পায়।''

পাড় ক্রমশ কাছে আসছে, জলপথ হচ্ছে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর। এখন জলতলের প্রায় এক মিটার তলা দিয়ে যাচ্ছে মকর, খুব ধীরে ধীরে। জলের ওপরে একটু ঢেউ ছাড়া আর কোনোভাবেই বোঝার জো নেই। মকরের ড্যাশবোর্ড জুড়ে এখন জলের টপোগ্রাফিক ম্যাপ। বুঝিয়ে দিচ্ছে, কোথায় জলের গভীরতা কতখানি, কোনখান দিয়ে কোন জাহাজ কোন ডুবোজাহাজ যাচ্ছে।

সামনে সিঙ্গাপুর। ওপারেই বোর্নিও সমুদ্র। একটু বোধহয় অধৈর্য হয়ে পড়েছিল মাতঙ্গী, গতিবেগ সামান্য বাড়িয়েছিল। ফাইবার গ্লাসের স্বচ্ছ ছাদে হঠাৎ করেই আঁধার ঘনিয়ে এল। কন্ট্রোল প্যানেলে হাতের চাপ মকরকে দ্রুত সরিয়ে দিল বাঁদিকে। ঠিক পরমুহূর্তেই ওপার থেকে খসে পড়ল বিশাল একটা মেটাল কন্টেইনার। জলের মধ্যে চাপা একটা গর্জনের শব্দ, ঘোলা জলে লাল-হলুদ আভা। বিস্ফোরণের ধাক্কায় মকর ছিটকে গেল অনেকদুর, ধাক্কা খেল জলের নীচের চড়ায়। কন্ট্রোল প্যানেল জুড়ে একরাশ লাল আলো জ্বলছে নিভছে। কয়েকবার আর্তনাদ করে কাত হয়ে এলিয়ে পড়ল মকর।



ওপরে একরাশ জল। তার ওপর দিয়ে একটার পর একটা জাহাজের ছায়া চলে যাচ্ছে। মাতঙ্গী আর ধূমাবতীর সেদিকে দেখার হুঁশ নেই। গভীর জলের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা মকরের নেই। ভাগ্যিস এখানে জলের গভীরতা বেশি নয়। কিন্তু এই চাপটুকুও দীর্ঘ সময় সহ্য করতে পারবে না। মকরকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলতে না পারলে এখানেই জলসমাধি হবে।

''অ্যাকসিডেন্ট?'' কন্ট্রোল প্যানেলের ঢাকনার ভেতর উঁকি দিয়ে বলল মাতঙ্গী।

''তা ছাড়া আর কী হতে পারে?'' ন্যাকড়ায় হাতের তেলকালি মুছে বলল ধূমাবতী, ''আক্রমণ?''

''সেটা কীভাবে সম্ভব হবে?'' মাথা নাড়লো মাতঙ্গী, ''মকর বিশেষ ধরনের কার্বন ফাইবার দিয়ে তৈরি, সোনারে ধরা পড়ে না। তাহলে কেউ কীভাবে টের পাবে?''

''মকরের ইঞ্জিনের কোনো এমিশন নেই?'' প্রশ্ন ধূমাবতীর।

''মকরের ইঞ্জিন ম্যাগনেটো হাইড্রো ডায়নামিক প্রপালশন প্রিন্সিপালে চলে,'' বলল মাতঙ্গী, ''ওর এমিশন তো শুধু জলের জেট। মাছের মতো জল কেটে চলে মকর। কেউ সোনারে দেখলে ভাববে, একটা বড়ো হাঙ্গর সাঁতার কেটে যাচ্ছে।''

''কিন্তু হাজার হলেও তো একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র,'' বলল ধূমাবতী, ''ইঞ্জিন ইলেকট্রনিক্সের তো একটা রেডিয়ো সিগনেচার আছে।''

''এখানে এত জাহাজ,'' বলল মাতঙ্গী, ''তাদের সবার আলাদা আলাদা ইলেকট্রনিক সিগনেচার রয়েছে। সবার মধ্যে মকরের সিগনেচার আলাদা করে কী করে কেউ ধরবে?''

''যদি কেউ মকরের সিগনেচার আগে থেকে জানে?''

''তাহলে ... তাহলে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু এটা একটা প্রোটোটাইপ ভেসেল, এর সিগনেচার তো টপ মিলিটারি সিক্রেট।''

''সিগনেচারটা কি বদলানো যায়?'' প্রশ্ন করল ধূমাবতী।

''নাঃ,'' বলল মাতঙ্গী, ''অন্তত আমি করতে পারব না।''

দীর্ঘ ছ'ঘণ্টা চেষ্টার পর মকর আবার চালু হলো। কিন্তু জলের নীচে দিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এখনো নেই। সেটা করতে গেলে ইঞ্জিন আবার বিগড়ে যেতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই ধীরে সন্তর্পণে জলের ওপর উঠে এল।

''সামনে কালীপুজো'', ''দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ধূমাবতী,'' এই প্রথম প্রদীপ জ্বালানো হবে না, বাজি ফাটানো হবে না।

''ওই দ্যাখো,'' হেসে বলল মাতঙ্গী, ''তোমাকে স্বাগত জানাতে সিঙ্গাপুর কত আলো জ্বেলেছে।।''

ওপরে তখন রাত নেমেছে। সামনে আলো ঝলমলে সিঙ্গাপুর। লক্ষ লক্ষ আলোর মেলায় এখানে প্রতি রাতেই দীপাবলী। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মালাক্কা প্রণালীর বাকি অংশ পার হয়ে এল মকর। প্রণালী যেখানে হাঁ মুখ খুলেছে, সেখানে অন্ধকার একটা পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। তারপরেই খোলা সমুদ্র।



সাগরে পড়ল মকর। এখন আর দু'দিকে পাড়ের ভরসা নেই। যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু নোনা জল। সাবলীল গতিতে জল কেটে এগিয়ে চলল ওরা। পথে বেশ কয়েকবার দেখা মিলল কয়েকটা চীনা বাণিজ্যিক জাহাজ ও মালয়েশিয়ার যুদ্ধপোতের। মকর তাদের এড়িয়ে গেল সন্তর্পণে। এরমধ্যে একবার জলে ডুব দেওয়ানোর চেষ্টা করেছিল মাতঙ্গী, মকরের ইঞ্জিন তাতে আর্তনাদ করে উঠেছিল। বাধ্য হয়েই জলের ওপর দিয়ে চলেছে ওরা।

''সামনে কালীপুজো,'' মন খারাপের সুরে বলল ধূমাবতী, ''কত বাজি বানিয়েছিলাম, সেগুলো কিছুই ফাটানো হলো না।

''কেন?'' ঠাট্টার স্বরে বলল মাতঙ্গী, ''বাজিসুদ্ধু বাড়িটাই তো উড়িয়ে দিলে। কী রোশনাই হয়েছিল, কল্পনা করো!''

''ধুর,'' বলল ধূমাবতী, ''সেটাকে কী আর বাজি ফাটানো বলে! আচ্ছা, এই যে আমরা বালিক-পাপান যাচ্ছি, সেটা তো কালীমন্থন দ্বীপে। তা, সেই কালীমন্থন দ্বীপের লোকজন নিশ্চয়ই কালীপুজো করে? বাজি ফাটায়?''

''ধুর!'' বলল মাতঙ্গী, ''ঠাট্টা করছ?''

কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে গেল মাতঙ্গীর।

''পেছনে ফেউ লেগেছে!''

''তার মানে?'' প্রশ্ন করল ধূমাবতী।

''এই দেখো,'' ড্যাশবোর্ডের কয়েকটা আলোকবিন্দুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল মাতঙ্গী, ''এই তিনটে অবজেক্ট তিনদিকে থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার আমি ট্র্যাজিক্টারি বদলেছি। প্রত্যেকবার এই বিন্দুগুলোও ওদের রাস্তা বদলেছে।''

''এগুলো কী হতে পার?'' ধূমাবতী প্রশ্ন করল।

''যুদ্ধজাহাজ?''

''তোমার পেছনে তিনটে যুদ্ধজাহাজ লেগেছে! কেন?''

''ঐইভাবে চলতে থাকলে,'' কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল মাতঙ্গী, ''আগামী একঘন্টার মধ্যে ওরা আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে। মকর এখনো জলে ডুব দিতে পারছে না। এই অবস্থায় তিনটে যুদ্ধজাহাজের মুখোমুখি হওয়ার মানে কী, বুঝতেই পারছো।''

বিমর্ষ দেখায় ধূমাবতীকে।

''কী ভাবছো? বলল মাতঙ্গী, ''চট্টগ্রামে থেকে গেলেই ভালো হতো?''

''নাঃ'' মাথা নেড়ে বলল ধূমাবতী, ''সেখানে দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বাড়ির মধ্যে আগুনে পুড়ে মরতাম, আর এখানে উন্মুক্ত সাগরে তিনটে যুদ্ধজাহাজের মোকাবিলা করতে গিয়ে মরবো। এটাই ভালো।''

''এত তাড়াতাড়ি মরার কথা ভাবার দরকার নেই,'' বলল মাতঙ্গী, ''তার চেয়ে বরং পরিস্থিতির একটা অবজেক্টিভ অ্যানালিসিস করা যাক। প্রথম কথা হলো, কীভাবে ওরা টের পাচ্ছে, আমরা কোথায় আছি।''

''দ্বিতীয় সমস্যা হলো,'' বলল ধূমাবতী, ''ওই বিন্দু তিনটে আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে এই খোলা সমুদ্রে আমরা কোথায় লুকোবো।''

''একটা কাজ করা যেতে পারে,'' বলল মাতঙ্গী।

''কী?''

''এখান থেকে উত্তর-পূর্বদিকে আধ ঘণ্টা দূরে একটা দ্বীপ আছে। সেখানে গিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে লুকিয়ে থাকলে হয়তো বেঁচে যাবো।''

''দ্বীপটায় লোকজন থাকে না?'' বলল ধূমাবতী, ''তারা টের পাবে না?''

''ন্যাভিগেশন চার্ট বলছে,'' মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, ''ওটা একটা বিতর্কিত দ্বীপ। মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়া দুটো দেশই দ্বীপটাকে নিজের বলে দাবি করে। তাই ওখানে কেউ থাকে না।''

''ঠিক আছে,'' বলল ধূমাবতী, ''এবার দ্বিতীয় সমস্যার



একটা সমাধান চাই।"

"কী করে আমাদের অবস্থান জেনে ফেলছে," বলল মাতঙ্গী, "সেটার একটাই মানে হতে পারে। কেউ ইঞ্জিনের ইলেকট্রনিক সিগনেচার মনিটর করছে। যেটা তুমি বললে। তার অর্থ, মকরের ইউনিক ইলেকট্রনিক সিগনেচার কী, সেটা আমার শত্রুরা জানে। কিন্তু ব্যাপারটা এতটাই অবিশ্বাস্য যে, কিছুই মাথায় আসছে না।"

"তুমি বলেছিলে," বলল ধূমাবতী, "এই ইলেকট্রনিক সিগনেচারটা বদলানো যায় না। সেটা কেন বলেছিলে?"

"সেটা করতে গেলে পুরো ইঞ্জিনটাকেই খুলে নতুন করে বানাতে হবে। এই মাঝসমুদ্রে সেটা সম্ভব নয়, আর সেটা করার মতো বিদ্যে আমার নেই।"

"আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে," বলল ধূমাবতী, "হয়তো সেটা কাজে লাগবে। কিন্তু তার জন্য ইঞ্জিন খুলতে হবে। তাই ডাঙায় উঠতে হবে।"

"তাহলে আপাতত সেই দ্বীপটাতেই যাচ্ছি। মুশকিল হলো,

With Best Compliments From -

Willowood Chemicals Private Limited

With Best
Compliments from :-

A

Well

Wisher

আমাদের পিছু পিছু ওই তিন মক্কেলও দ্বীপটাতে পৌঁছে যাবে। তিন জাহাজ বোঝাই সৈন্য যদি দ্বীপ তোলপাড় করে আমাদের খোঁজ শুরু করে, তাহলে দ্বীপের যেখানেই লুকোই, কোনো লাভ নেই।"

''যা হবে,'' বলল ধূমাবতী, ''তখন দেখা যাবে। আপাতত ওখানেই চলো। খোলা সমুদ্রে চাঁদমারি হবার থেকে সেটা ভালো।"

দুপুর নাগাদ মকর পৌঁছল গন্তব্যস্থলে। নিরক্ষীয় সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপর। দিগন্ত পর্যন্ত সমুদ্রের মাঝে দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা দ্বীপ। ঘন নীল সমুদ্র হাল্কা নীল হয়ে উজ্জ্বল সবুজ রং ধরেছে পাড়ের কাছে। সাদা শঙ্খবেলার ওপারে ঘন জঙ্গল আর নারকেল গাছের সারি, পূবের ঝোড়ো হাওয়ার তালে তালে মাথা নাড়াচ্ছে তারা। দ্বীপের ভেতরদিকে খাড়া পাহাড়, অনেক উঁচু থেকে ঝরনা ঝরে পড়ছে পাড়ের বালির ওপর। দ্বীপটাকে বেড় দিয়ে ঘুরলো মকর। পেছনের খাড়া পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল। সেখানে একটা জায়গা কিছুটা সমতল, তার পেছনে পাহাড়ে খোদাই একটা ভাঙা মন্দির। চূড়ায় বিষ্ণুর মুখ। নাকি বুদ্ধর? এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকেরা বিষ্ণু আর বুদ্ধর মূর্তি অনেকটা একই রকমভাবে গড়ে। সাবধানে পাড়ে উঠে পড়ল মকর। জঙ্গলের মধ্যে আশপাশ থেকে ডালপালা লতাপাতা এনে নৌকোটাকে ঢেকে ফেলল ওরা, যাতে দূর থেকে বোঝা না যায়। এমনিতেই মকর দেখতে অতিকায় একটা কুমিরের মতো। দেখলে কেউ ভাবে, একটা কুমির জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে আছে।

মেরামতি শুরু হলো।

সাগরের ডাক শুনতে লাগে ওঙ্কারধ্বনির মতো। একটার পর একটা ঢেউ আসছে, ফিরে যাচ্ছে। ওঁওঁওঁওঁওঁ, ওঁওঁওঁওঁওঁওঁ... । মেরামতির কাজে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ওরা দুজনে যে, ঘণ্টাদুয়েক কীভাবে কেটে গেল, বোঝাই গেল না। হঠাৎ করেই দূর থেকে শোনা গেল ভটভট শব্দ, অনেকগুলো লোকের গলার স্বর, সঙ্গে লোনা বাতাসে ভেসে এল ডিজেল মোটরের উৎকট গন্ধ।

''ওরা এসে পড়েছে,'' ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বলল ধূমাবতী।

''তুমি সারাই চালিয়ে যাও,'' বলল মাতঙ্গী, ''আমি দেখছি।"

মাতঙ্গীর হাতের ইশারায় ওর ড্রোন উড়ে গেল আকাশে। বাঁ হাতের কবজি থেকে জামার হাতা সরিয়ে দেখল মাতঙ্গী। রবারের মতো একরকমের জিনিস দিয়ে তৈরি চওড়া মণিকঙ্কন দিয়ে ঢাকা ওর কবজি বাহু। সেই মণিকঙ্কনে ফুটে উঠল অসংখ্য আলোর বিন্দু। দেখে মাতঙ্গী বলল,

''মিলিটারি নয়, একটা মাছধরা নৌকো।"

''তাহলে তো কোনো চিন্তা নেই,'' বলল ধূমাবতী।

''নামেই এগুলো মাছধরা নৌকো,'' বলল মাতঙ্গী, ''এরা আসলে চীনা নেভির এজেন্ট। এরকম হাজার হাজার মাছধরা নৌকো ছড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে। এরা শুধু আন্তর্জাতিক জলসীমাতেই নয়, বিভিন্ন দেশের জলসীমার মধ্যেও ঢুকে পড়ে মাছ-ডাকাতি করে, সঙ্গে দেশগুলোর ওপর নজর রাখে। সবচেয়ে বেশি যেটা করে সেটা হলো, সবাইকে ভয় দেখানো। এদের আসল উদ্দেশ্য পৃথিবী জুড়ে চীনা প্রভুত্ব তৈরি করা।"

''তুমি কি জানো,'' বললো ধূমাবতী, ''আজ থেকে পাঁচশো বছর আগেও চীন ঠিক এটাই করেছিল? চীনা অ্যাডমিরাল জং-হে বিশাল এক জাহাজের মিছিল নিয়ে ঘুরে বেড়াতো সমুদ্রে, ভয় দেখাতো, গুন্ডামি করত, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলাতো। দুই দেশের ঝগড়া লাগিয়ে দিত, তার থেকে সুবিধে আদায় করত। ইতিহাস বারবার ফিরে আসে!"

ড্রোনের চোখ দিয়ে মাতঙ্গী দেখল, ইতিমধ্যে জাহাজ নোঙর করেছে, সেখান থেকে চারটে নৌকো নামানো হয়েছে, জনা কুড়ি লোক নৌকো বেয়ে দ্বীপের দিকেই আসছে। ইশারায় ধূমাবতীকে কাজ চালিয়ে যেতে বলে মাতঙ্গী এগোলো জঙ্গলের দিকে। যাওয়ার আগে গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে তুলে নিল একটা লিকলিকে সরু ছুরি। জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থেকে মাতঙ্গী দেখল, লোকগুলো নৌকো থেকে বালির পাড়ে নামলো। কারোর হাতে একে-ফিফটিসিক্স জাতের অটোমেটিক রাইফেল, কারোর হাতে গ্লক পিস্তল, কারোর হাতে তরোয়াল বা কাটারি। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে, হট্টগোল করতে করতে, বেপরোয়া গুলি চালাতে চালাতে জঙ্গলের দিকেই এগিয়ে এল লোকগুলো। প্রথম যে লোকটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল, সে একটু এগোতেই লোকটাকে নিঃশব্দে পেছন থেকে আক্রমণ করল মাতঙ্গী। মুখ চেপে ধরে এক মুহূর্তে গলার নলি কেটে দিল। তারপর নিমেষে লাশটাকে লুকিয়ে ফেলল ঝোপের মধ্যে। পরের লোকটা কি একটু সাবধান হয়ে গেল? ঝোপঝাড় থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছে। হাতে লম্বা কাটারি, বেপরোয়াভাবে এদিক ওদিক ঘোরাতে ঘোরাতে যাচ্ছে, জঙ্গলের লতাপাতা সাফ করতে করতে। লোকটার হৃদপিণ্ড লক্ষ্য করে ছুরিটা ছুঁড়ে দিল মাতঙ্গী, একটা চাপা শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। এদিক ওদিক দেখল মাতঙ্গী, আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। এগিয়ে গিয়ে ছুরিটা বার করার চেষ্টা করল মাতঙ্গী। নীচু হয়ে ছুরির বাঁট ধরে টান দিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে ভারী একটা আঘাত নেমে এল মাথার ওপর।

ফাঁদ! লোকটাকে ইচ্ছে করেই এগিয়ে দিয়েছিল ওর সঙ্গীরা, নিজেরা লুকিয়ে পড়েছিল গাছের আড়ালে। যাতে অদৃশ্য শত্রুকে বার করে আনা যায়।

ঝাপসা চোখে মাতঙ্গী দেখল, সবকটা লোক একসঙ্গে ওকে ঘিরে ধরেছে। মাথার পেছনে তীব্র যন্ত্রণা, মাথা ঘুরছে। সামলে নিয়ে লড়াই শুরু করল মাতঙ্গী। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারল না। লোকগুলো হাতাহাতি লড়াইয়ে তুখোড়। শাওলিন ট্রেইনড? রগে আরেকটা আঘাত, চোখে আঁধার ঘনিয়ে এল। জ্ঞান ফিরল যখন, দেখল ওর হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, বালির পাড়ে একটা নারকেল গাছের সঙ্গে।

ধূমাবতী? ও কোথায়? এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল মাতঙ্গী। ও যদি না ধরা পড়ে থাকে, তাহলে হয়তো এখনও একটা সুযোগ আছে!

''তুমি কি আমাকে খুঁজছ?''

মাতঙ্গী ডানদিকে তাকিয়ে দেখল, ওরই মতো ধূমাবতীও পিছমোড়া করে বাঁধা, আরেকটা গাছে।

''ব্যাস, তাহলে তো হয়ে গেল।'' হেসে বলল হতাশ মাতঙ্গী।

''হ্যাঁ,'' বলল ধূমাবতী, ''বুড়ো মানুষ আমি, মারপিট কি আর আমার সাজে? হেরে গেলাম। তার আগে লুকোনোর চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু সেখানেও ফেল। ধরা পড়ে গেলাম।''

''এরা কেউ সাধারণ জেলে নয়,'' বলল মাতঙ্গী, ''সার্চ অ্যান্ড ফাইন্ড, জাঙ্গল কম্ব্যাট, হাতাহাতি যুদ্ধে এদের ট্রেনিং মিলিটারিদের সমতুল্য। তাই হেরে গেছ, তাতে লজ্জার কিছু নেই। এখন প্রশ্ন হলো, মালাটাকে কী করে ওদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখব।''

''মালা?'' রেগে উঠল ধূমাবতী, ''প্রাণ যেতে বসেছে, আর এখন তুমি গয়নাগাঁটি নিয়ে ভাবছ?''

একটা লোক এগিয়ে এল মাতঙ্গীর দিকে, বোধহয় ওদের দলপতি। হাতে ছোট্ট একটা প্ল্যাস্টিকের লাঠি। মালয় উচ্চারণে ইংরিজিতে বলল,

''জিনিসটা কোথায়?''

''কোন জিনিসটা?'' মাতঙ্গী পালটা প্রশ্ন করল।

উত্তরে লোকটা ওর হাতের লাঠিটা মাতঙ্গীর পেটে ছুইঁয়ে দিল। তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে প্রবল একটা ঝাঁকুনি, ইলেকট্রিক শক্!

'এবার বলো, জিনিসটা কোথায়?'' লোকটা আবার প্রশ্ন করল।

''কোন জিনিসটা?'' মাতঙ্গী আবার পালটা প্রশ্ন করল।

কয়েক ঘণ্টা ধরে এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি চলল। একবার মাতঙ্গীকে, একবার ধূমাবতীকে ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে চলল লোকটা।

''আমি চললাম,'' দুর্বল গলায় বলল ধূমাবতী, ''আর পারছি না। এবার আমার হার্টফেল করবে। যদি আমাকে বাঁচাতে চাও, কী গয়নাগাঁটি ওরা চাইছে, দিয়ে দাও।''

চোখে আবার অন্ধকার দেখছিল মাতঙ্গী। হঠাৎ শুনতে পেল, একটা গোলমালের শব্দ। চোখ মেলে দেখল, কোথা থেকে কে জানে, প্রায় শ'খানেক বন্য বরাহ জড়ো হয়েছে সেখানে। রাগে ফুঁসছে তারা, খুরের আঘাতে বালি উড়ছে।

''এইসব নাপাক জন্তুগুলোকে মেরে শেষ কর!'' চেঁচিয়ে বলল দলপতি লোকটা। যাদের হাতে রাইফেল ছিল, তারা গুলি চালিয়ে দিল। কয়েকটা শুয়োর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু বাকিগুলো আরও জেদ নিয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলোর ওপর। ধাক্কা মেরে মাটির ওপর ফেলে পেট ফাটিয়ে নাড়িভুঁড়ি বার করে দিল। অনেক শুয়োর মারা গেল, কিন্তু সবকটা লোক নিকেশ হলো।

''বরাহ অবতার!'' আনন্দে আটখানা হয়ে বলল ধূমাবতী, ''তিনি সাক্ষাৎ এসেছেন, আমাদের সাহায্য করতে।''

''ধুর!'' বলল মাতঙ্গী, ''লোকগুলো যখন এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছিল, বোধহয় কয়েকটা শুয়োরের গায়ে লেগেছিল। বন্য বরাহ খুব প্রতিশোধ পরায়ণ হয়!''

''যাই হোক,'' বলল ধূমাবতী, ''মনে হয় এই যাত্রায় বেঁচে গেলাম। এখন হাতের বাঁধন খুলতে পারলেই হলো।''

ঠিক এই সময় একাধিক জাহাজের ভোঁ শোনা গেল। আরও দুটো মাছধরা জাহাজ পৌঁছে গেছে, দ্বীপের কাছে নোঙ্গর ফেলছে।

''বরাহ অবতার সাহায্য করলেন,'' কান্নাভেজা স্বরে বলল ধূমাবতী, ''কিন্তু শেষরক্ষা হলো না!''

পিছমোড়া অবস্থাতেই মাতঙ্গী ওর কবজির ওপর আঙুল দিয়ে ইশারা করল। আকাশ থেকে ড্রোন নেমে এল। বারবার ছোঁ মারতে লাগল কবজির ওপর। কবজি রক্তাক্ত হলো, কিন্তু শেষমেশ হাতের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। দ্রুত ধূমাবতীর হাতের বাঁধন খুলে দিল মাতঙ্গী। ততক্ষণে জাহাজদুটো থেকে নৌকো নামনো হচ্ছে। দৌড়, দৌড়, দৌড়। সারাই যতটুকু বাকি ছিল, শেষ করে মকরে উঠে পড়ল ওরা। ততক্ষণে শ'খানেক লোক তোলপাড় করছে জঙ্গল।

শত্রুদের ফাঁকি দিয়ে জলের নীচে অদৃশ্য হলো মকর।



ভোররাতে ইন্দোনেশিয়ার জলসীমার মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। মকর থামলো কিছুক্ষণের জন্য।

''তোমার মেরামতি কাজ দিয়েছে মনে হচ্ছে,'' বলল মাতঙ্গী, ''ফেউগুলো আর পিছু ধাওয়া করছে না। কী করেছিলে বলো তো?''

''ইঞ্জিনের সঙ্গে একটা এক্সট্রা সার্কিট লাগিয়ে দিয়েছি,''

একগাল হেসে বলল ধূমাবতী, ''সেটার ইলেক্ট্রনিক নয়েজ আর ইঞ্জিনের ইলেক্ট্রনিক নয়েজ দুটো মিলে একটা নতুন নয়েজ তৈরি হয়েছে, যেটা মকরের ইঞ্জিনের অরিজিনাল ইলেক্ট্রনিক নয়েজ থেকে অনেকটাই আলাদা।''

''দাঁড়াও, একটা কাজ করি,'' এই বলে নৌকোর গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলে একটা স্যাটেলাইট ফোন বার করল মাতঙ্গী। দেখতে পুরোনো দিনের কর্ডলেস ফোনের মতো। সুইচ অন করে একটা নম্বর ডায়াল করল। তারপর দৃঢ় অথচ সাবধানী কণ্ঠে বলল,

''ওয়ান ডট ও সেভেন এইট ও সিক্স থ্রি সেভেন এস, ওয়ান ওয়ান সেভেন ডট জিরো এইট সেভেন সিক্স সেভেন ওয়ান ওয়ান ই। লোকাল টাইম নাইনটিন হান্ড্রেড আওয়ার।''

বৃষ্টি শুরু হলো হঠাৎ করেই। মকরের কার্বন ফাইবার শরীরে চড়বড় চড়বড় মৃদঙ্গ বাজছে। ফোনের সুইচ অফ করে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টের ভেতর রেখে দিল মাতঙ্গী। আবার মকর ডুব দিল অথই সাগরের জলে। পাড় থেকে অনেকদূর পর্যন্ত স্বচ্ছ অগভীর জল, তলা পর্যন্ত দেখা যায়। প্রায় কুড়ি হাত নীচে রুপালি বালির ওপর নানা রঙের প্রবাল। সবুজ শাওলা ঢাকা ব্যাঙের ছাত আর মতো দেখতে পাথরের থাম। পাথরের মতো গা-ওলা কয়েকটা মাছ বুকে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ফাঁকে ফাঁকে। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি বড়ো বড়ো রঙিন তারামাছ প্রবালের বিছানার উপর শুয়ে আছে আয়েশে। লম্বা ধারালো ল্যাজ দুলিয়ে শঙ্কর মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। রংবেরঙের কুচোমাছ ঝাঁক বেঁধে মকরের পাশ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, যেন রঙ্গীন জলের স্রোত।

''ওই লোকগুলো কারা?'' প্রশ্ন করল ধূমাবতী, ''চীনা নেভির এজেন্ট?''

''তারা তো পেছনে আছেই,'' বলল মাতঙ্গী, ''কিন্তু ওদের দলপতি লোকটা মালয় উচ্চারণে কথা বলছিল। তারমানে ওরা লস্করের লোক।''

''লস্কর?''

''লস্কর আল শাহাদা। ইন্দোনেশিয়ার একটা জেহাদি গ্রুপ। লোকে বলে, দলটার বয়স নাকি পাঁচশো বছর। সেই পঞ্চম ব্রবিজয়ের জেহাদের সময় কিছু ডিপ স্টেট অপারেটিভ মিলে তৈরি করেছিল গ্রুপটাকে। সেটাই কালেদিনে লস্কর আল শাহাদার রূপ নিয়েছে। ওদের পেছনে আছে মালয়েশিয়া আর চীন। লস্কর চায়, ইন্দোনেশিয়ায় শরিয়া ভিত্তিক একটা শাসনব্যবস্থা পত্তন করতে।''

''নাপাক জন্তু শুয়োর,'' খিলখিল করে হেসে উঠল ধূমাবতী, ''পাক জেহাদিদের লোক-লস্করের কেমন বারোটা বাজালো। ওহ, বাঁধিয়ে রাখার মতো দৃশ্য!''



আরও এক দিন সমুদ্রযাত্রার পর মকর পৌঁছল দক্ষিণ-পূর্ব বোর্নিওর উপকূলে। তখন সবে সন্ধ্যে নেমেছে। বালিক-পাপান বন্দরের উত্তরে জঙ্গলে ঘেরা একটা জায়গা আছে। বন্দর শহরের হইচই এখান পর্যন্ত পৌঁছয় না। সেখানেই হুশ করে জলের উপর মাথা তুলল মকর। ঝিঁঝিপোকার ডাকের সঙ্গে সন্ধে নামছে খাঁড়ির সবুজ জলে। খাঁড়ির জল যেখানে একটু গভীর, সেখানে একটা চীনা মাছধরা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। একফালি বালির পাড়ের ওপাশে জঙ্গলের মাঝে মাথা উঁচু করে আছে অনেকগুলো আলো ঝলমলে আধুনিক বাড়ি। সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত কাঁচের বড়ো বড়ো জানালা, তার সংলগ্ন কাঠের খোলা বারান্দা, জঙ্গলের ওপর ঝুলন্ত। বারান্দার ছাদ থেকে রঙিন লণ্ঠন ঝুলছে, দেখতে অনেকটা ফানুসের মতো। বাড়িগুলোর পেছনে উঁকি দিচ্ছে ম্যাকডোনাল্ড বার্গার জয়েন্টের ঢাউস একটা হলুদ 'এম'। মকরের ফাইবার গ্লাসের ঢাকনা সরে যেতে মাতঙ্গীর হাত থেকে টিয়ারঙা ড্রোন ছটফট করে উড়ে গেল আকাশে, জঙ্গলের দিকে। জামার হাতা সরিয়ে দেখল মাতঙ্গী, মণিকঙ্কনে ফুটে উঠল কয়েকটা আলোর বিন্দু। ভুরু কোঁচকালো মাতঙ্গী। মণিকঙ্কনের ওপর আঙ্গুল বুলিয়ে দিল, ড্রোন নিঃশব্দে উড়ে গেল উলটোদিকে, জলের দিকে। সেখানে মাছধরা জাহাজটাকে চুপিসাড়ে প্রদক্ষিণ করল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে এল মাতঙ্গীর হাতে।

''জঙ্গলের মধ্যে পাঁচটা লোক ওত পেতে বসে আছে,'' বলল মাতঙ্গী, ''পাড়ে উঠলেই গুলি দিয়ে আমাকে ঝাঁঝরা করে দেবে। ইট ইজ অ্যান অ্যামবুশ।''

''এরাও কি সেই লস্কর আল শাহাদা?'' অবাক ধূমাবতী প্রশ্ন করল।

''হ্যাঁ,'' বলে নৌকোর পেছনদিকে গেল মাতঙ্গী।

''তোমার অনেক কিছুই আমার কাছে রহস্য ঠেকে,'' বলল ধূমাবতী, ''একটা বিরাট সন্ত্রাসী দল তোমার পেছনে লেগেছে, সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু কেন?''

''এই মালাটার খোঁজে,'' নিজের গলার রুদ্রাক্ষ মালাটার দিকে দেখিয়ে বলল মাতঙ্গী, ''এটার খোঁজে ওরা ইন্ডিয়া পর্যন্ত গিয়েছিল।''

''তোমার গলার এই মালাটা?'' অবাক হলো ধূমাবতী, ''কেন, রুদ্রাক্ষ কি ইন্দোনেশিয়ায় পাওয়া যায় না?''

''পাওয়া যাবে না কেন?'' বিরক্ত স্বরে বলল মাতঙ্গী। নৌকোর দেওয়াল আলমারি খুলে একটা ওয়েটস্যুট বার করে

আনল, ''অঢেল পাওয়া যায়! পৃথিবীর যত রুদ্রাক্ষ, তার প্রায় সবই হয় ভারত বা নেপালের, না হয় ইন্দোনেশিয়ায়। ওরা খুঁজছে মালার এই লকেটটা।''

''কেন লকেটাই কী এমন...''

''আর কথা নয়,'' এই বলে ক্ষিপ্রগতিতে কালচে-সবুজ রবারের ওয়েটস্যুটে আপাদমস্তক ঢেকে ফেলল মাতঙ্গী। মুখ ঢাকলো গ্যাসমাস্কের মতো একটা মুখোশে। পায়ে হাঁসের মতো পাখনা। টুপ করে ডুব দিল শ্যাওলা-সবুজ সমুদ্রের জলে।

মিনিট পনেরো পার হয়ে গেল। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। হতভম্ব ধূমাবতী ভাবছিল হলো কী। এমন সময় প্রায় নিঃশব্দে মকরে উঠে পড়ল মাতঙ্গী, একরাশ নোংরা জল ঝরিয়ে।

''অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া জলে ডুব দিলে কী করে?'' প্রশ্ন করল অবাক ধূমাবতী।

মুখ থেকে গ্যাসমাস্কের মতো জিনসটা খুলে সেটা দেখিয়ে বলল মাতঙ্গী, ''এটা নিঃশ্বাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে অক্সিজেন তৈরি করে। যতক্ষণ এটার চার্জ আছে, আমি জলে ডুবে থাকতে পারি, কেউ টেরও পাবে না।''

''জলে ডুব দিলে কেন?'' প্রশ্ন করল ধূমাবতী, ''কী করতে গিয়েছিলে?''

With Best Compliments from :-

A Well Wisher

''আজ কালীপুজো না?'' বলল মাতঙ্গী,'' এখানে তো কেউ বাজি ফাটায় না। তোমার দুঃখ হচ্ছিল, তাই বাজির ব্যবস্থা করে এলাম।''

নৌকোর ড্যাশবোর্ডের ওপর বসে ছিল টিয়ারঙা ড্রোন। মাতঙ্গীর হাতের ইশারায় সেটা আবার উড়ে গেল আকাশে। কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল, সমুদ্রের সাদা পাড়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মাতঙ্গী। ওকে দেখেই ঝোপের মধ্যে থেকে পাঁচটা লোক বেরিয়ে এল, পরনে আইসিসের ইউনিফর্ম কালো পোশাক, হাতে একে ফর্টিসেভেন। ''আল্লাহ আকবর'' হুংকারের সঙ্গে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে দিল মাতঙ্গীর ওপর। মাতঙ্গীর ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল গুলিগুলো, ছবিটা শুধু কেঁপে কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তেই শিষের মতো কয়েকটা শব্দ হলো। নৌকোয় বসে থাকা আসল মাতঙ্গীর হাতের বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে প্রতিটি ঘাতককে নিঃশব্দে জীবনের পরপারে পাঠিয়ে দিল। তার ঠিক সঙ্গেই সঙ্গেই দুড়ুম আওয়াজের সঙ্গে চীনা মাছধরা জাহাজটা আলোয় আলো হয়ে গেল। বিস্ফোরণের শব্দে ভয় পেয়ে একরাশ বাদুড় আশেপাশের গাছ ছেড়ে উড়ে গেল আকাশে। দাউদাউ আগুন জ্বলতে লাগলো জাহাজে।

নিঃশব্দে জলে ডুব দিল মকর। পাড়ে তখন হইচই শুরু হয়ে গেছে। দূরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা যাচ্ছে।

''ব্যাপারটা কী হলো, একটু বুঝিয়ে বলবে?'' অসহায় স্বরে বলল ধূমাবতী, ''এরকম গুলিগোলা, বোমাবাজি, জাহাজ উড়িয়ে দেওয়া...''

''ভুল একটা জিপিএস কো-অর্ডিনেট ফাঁস করেছিলাম,'' বলল মাতঙ্গী, ''দলটার থেকে পিছু ছাড়াতে। পুরো দলটা ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল ওই মাছধরা জাহাজটার মধ্যে। ওদের টপলিডার আমির সুলতানও ছিল ওখানেই। ফাঁদ পেতে ওদের ওখানে টেনে নিয়ে গিয়ে শেষ করলাম। সবশুদ্ধ পুড়ে মরলো। লস্করের কোমর ভেঙে দিয়েছি আজ রাতে।''

জলের তলা দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল মকর।

''ভুল জিপিএস কো-অর্ডিনেট কার কাছে ফাঁস করেছিলো?'' প্রশ্ন ধূমাবতীর।

''আমাদেরই একটা লোক। মালাক্কার অ্যাক্সিডেন্ট থেকেই সন্দেহ শুরু হয়েছিল, বোধহয় ও পালটি খেয়েছে। এখন নিশ্চিত হলাম।''

মিনিট কুড়ি চলার পর থামলো মকর। এখানে জঙ্গল বেশ ঘন, জনবসতি নেই কোথাও। সমুদ্র এখানেও ঢুকে পড়েছে খাঁড়িতে। একরাশ জোনাকি দীপাবলীর প্রদীপের মতো মিটিমিটি জ্বলছে, ঘুরে ফিরে বনদেবীকে আরতি করছে। খাঁড়ির মুখে তিনটে হাউসবোট ঢেউয়ের তালে নাচছে। দূরে কয়েকটা সাম্পান নোঙ্গর করে রেখেছে। ফাইবার গ্লাসের ঢাকনা সরতেই

শুঁটকি মাছ রান্নার কড়া গন্ধ বাতাসে ভেসে এল। মাতঙ্গীর হাতের টিয়ারঙা ড্রোন আবার উড়ে গেল আকাশে, চারিদিক দেখে আবার ফিরে এলো মাতঙ্গীর হাতে।

''ঠিক আছে,'' মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, ''সেফ টু এনগেজ।''

গোঙানির মতো শব্দ করে এক ধাক্কায় মকর জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এল। জলের ওপর অনেক শিকড় ঝুলছিল, সেগুলো ছিঁড়ে মাড়িয়ে কাদা ঘষটে ডাঙ্গার অনেকটা ভেতরে চলে এল। হুপহাপ শব্দ করে কয়েকটা অন্ধকার ছায়া লাফিয়ে পালালো গাছ থেকে গাছে। মাতঙ্গী আর ধূমাবতী সন্তর্পণে নৌকো থেকে নেমে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো। তার কয়েক মিনিট পরেই খড়খড় শব্দে জঙ্গলের পথে ছড়িয়ে থাকা শুকনো পাতার পুরু আস্তারণ মাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একজন মহিলা সুন্দরী, মধ্যবয়স্কা, পরনে স্থানীয় পোশাক, নাকের ডগায় সোনালি চশমা।

''সুপুত্রী!'' হাত জোড় করে নমস্কার করল মাতঙ্গী।

''আমাকে কালী বলেও ডাকতে পারেন।''

''কালী?''

''হ্যাঁ। কালীমন্থন দ্বীপের মেয়ে আমি। ডাকনাম তাই কালী। তা, গুরু শব্দপালন আপনার সঙ্গে এলেন না?''

''বয়স তো কম হলো না গুরুর,'' বলল মাতঙ্গী, ''ত্রিপুরা আর পার্বত্য চট্টগ্রামের মাঝখানে নো ম্যানস ল্যান্ডে ছোট্ট একটা গ্রাম আছে, নাম একজটা। সেখানেই থাকেন। আজকাল আর এদিকে সেদিকে কোথাও যান না । তবে উনি বলে পাঠিয়েছেন, যেদিন ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী নুস-অন্তরার পার্লামেন্টে প্রথম অধিবেশন বসবে, সেদিন উনি ঠিক হাজির হবেন।''

''এখনো বিশ্বাস হতে চায় না,'' বলল কালী, ''গুরু শব্দপালন আমাদের সাম্রাজ্যের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আছেন। অতিমানব উনি! গুরু বলেছিলেন, নুস-অন্তরা যেদিন জেগে উঠবে, সেদিনই নাকি শেষ হবে মাজাপাহিত সাম্রাজ্যের পাঁচ শতাব্দীর অভিশাপ। কিন্তু অনেক সমস্যা আছে, জানি না সব ঠিকঠাক হবে কিনা। কোভিড অতিমারীর জন্য দেশের আর্থিক অবস্থা খাস্তা হয়ে রয়েছে। সময়মতো নতুন রাজধানী তৈরির খরচ জোগাড় হবে তো? আরেকটা সমস্যাও রয়েছে। আমার পূর্বপুরুষ গজ-মদ এই নুস-অন্তরায় বসে সুমাত্রা থেকে ফিলিপিন্স বিস্তীর্ণ ভূভাগ জলভাগ শাসন করতেন। মদমত্ত গজরাজের মতোই শক্তিশালী ছিলেন তিনি। নুস-অন্তরা নতুন করে জেগে উঠছে, শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মালয়েশিয়া তাই আজ নতুন করে গজ-মদর বংশধরদের ভয়ে কাঁপছে। চীনারা ওদের উসকাচ্ছে, মদত জোগাচ্ছে। ঠিক যেমন পাঁচশো বছর আগে, চীনা অ্যাডমিরাল জং-হে শ্রীবিজয়দের মদত দিয়েছিল, কৌশলে



With Best Compliments From :

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

ADMINISTRATION OFFICE :
1A, Raja Subodh Mullick Square, (5th Floor) Kolkata-700013
Phone : 2237 5919 / 2090 / 2822
Mobile : 9830020245 / 9831010261 / 9051060808 / 9163311779
E-mail : Kolkata@allindiatpt.com/airtalogistics@gmail.com
Web-site : www.allindiatpt.com
(H.O- 28, Black Burn Lane, Kolkata-700 012)

TIME GURANTEED DELIVERY TRANSPORTERS FOR ALL OVER INDIA MARINE TYPE ISO CONTAINER TRUCKS AVAILABLE.
SPECIALIST IN ODC CARGOES BY HEAVYDUTY TRUCKS & TRAILERS.
SPECIALISTS IN PACKING OF HOUSEHOLD GOODS & TRANSPORTATION BANK APPROVED (IBA)

BRANCHES & ASSOCIATES ALLOVER INDIA

ধর্মান্তরিত করেছিল ওদেরকে। গুপ্তচর খবর পাঠিয়েছে, আমাদের কোমর ভেঙে দিতে ওরা সীমান্তে আক্রমণ চালাতে পারে। এই কালীমন্থন দ্বীপে আগুন জ্বলে, প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হবে। পাঁচশো বছর পরেও পুরোনো সম্পর্কগুলো ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, একটুও বদলায়নি। ভাবতে অবাক লাগে।"

নিজের গলার রুদ্রাক্ষ মালাটা খুলে সুপুত্রীর হাতে দিল মাতঙ্গী। বলল,

"মালাটা সাবধানে রাখবেন। যক্ষযন্ত্রর পূর্ণাহুতি যেন ঠিক সময়ে হয়, গুরু বারবার সেকথা বলেছেন। তার আগে মালাটা হাতছাড়া হলে অনর্থ ঘটে যাবে। লস্কর এটা হাতানোর চেষ্টা করছে, সেকথা জানেন নিশ্চয়ই। ওদের লোকেরা এটার খোঁজে তো ইন্ডিয়া পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। এখানে আসবার পথে বারবার আমাকে আক্রমণ করেছে, একবার তো মালাটা প্রায় পেয়েই গিয়েছিল। ওরা বেপরোয়া হয়ে গেছে, জানে ওদের হাতে আর বেশি সময় নেই। মালাটা যেন কোনোভাবেই ওদের হাতে না পড়ে।"

"ফিরে গিয়ে গুরুকে বলবেন, পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনের দিন উনি না এলে কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার নবজাগরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

"গুরুজী নিশ্চয়ই আসবেন, কথা দিয়েছেন উনি। পাঁচ শতাব্দী আগে দেওয়া কথা, উনি কি না রেখে পারেন?"

"অভিমান করে চলে গিয়েছিলেন, ভয় হয় সেই অভিমান আজও হয়তো রয়ে গেছে। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। আমার দেশের ভবিষ্যতে আপনার এতটা আগ্রহ কেন? এত ঝুঁকি নিয়ে, দীর্ঘ জলপথ পাড়ি দিয়ে এলেন, এত লড়াই করলেন, শুধু যাতে সময়মতো এই যক্ষযন্ত্রর পূর্ণাহুতি হয়। এতে আপনার স্বার্থ কী?"

"স্বার্থ আছে রে ভাই," উৎসাহের স্বরে বলল মাতঙ্গী, "আপনারাই তো পথ দেখাবেন। আমরা পারিনি, হেরে গেছি। আপনাদের দেখানো পথে সোনার বাঙ্গলার শাপমুক্তি হবে, সেটাই আমার আশা। ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ অনুসরণ করে তারা শতাব্দীর জঞ্জালকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। নেশামুক্তি ঘটবে, নবজাগরণ হবে বাঙ্গলার। এটা আমার বিশ্বাস। জানি না সত্যিই কি তা হবে, নাকি হবে না। আশায় মরে চাষা, আশায় বাঁচে চাষা। সেই আশার জন্য আমি প্রাণ বাজি রাখতেও রাজি আছি। ও হ্যাঁ, গুরুজী আপনাদের জন্য একটা জিনিস পাঠিয়েছেন।"

"কী সেটা?"

নৌকো থেকে একটা সিন্দুক বার করে আনলো মাতঙ্গী। তার ঢাকনা খুলতেই নীল আলোতে ঝলমল করে উঠল সন্ধ্যের বনপথ।

"মায়ানমার আর চট্টগ্রামের মাঝে একটা দ্বীপ আছে, নাম তার নয়ঞ্জট। সেখানে এই পাথরগুলো পেয়েছেন গুরুজী। কত হাজার বছর ধরে এগুলো মাটির তলায় চাপা পড়ে ছিল, কে জানে। এগুলো হাই কোয়ালিটির ব্লু ডায়মন্ড। আমি চেক করেছি, খোলা বাজারে প্রায় ত্রিশ বিলিয়ন ডলার দাম হবে এতগুলো পাথরের। পাথরগুলো বেচে যা টাকা পাওয়া যাবে, তাতে নতুন রাজধানী তৈরির খরচ কিছুটা হলেও জোগাড় হয়ে যাবে। গুরু বলেছেন, নতুন নুস-অন্তরা যেন পৃথিবীর ঈর্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পৃথিবীকে দেখিয়ে দিন, সনাতনী সভ্যতা আবার জেগে উঠেছে। তাকে ঠেকিয়ে রাখে, এমন সাধ্য আছে কার?"

রাত নামছে কালীমন্থনে। একে একে তারা ফুটছে আকাশের বুকে। যেন একটা সলমা জরির শাড়ি। এই তারাগুলো সেদিনও এমনি করেই ফুটেছিল, যেদিন এই মাটিতে কৌণ্ডিন্য ও তার নববিবাহিত বধূর পায়ের ধুলো পড়েছিল। এই তারাগুলো ঠিক এমনি করেই অসীম স্নেহে তাকিয়ে ছিল ধরাতলের দিকে, যেদিন মহাবলী গজ-মদ মদমত্ত গজরাজের মতোই সবলে এক ধর্মরাজ্যে বেঁধে দিয়েছিলেন অসংখ্য দ্বীপের সমাহার এই মণিহারটিকে। ঝিঁঝিপোকার ডাক ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে নবনগরী নির্মাণের খুটখাট আর শ্রমিকদের সমবেত কণ্ঠের হুল্লোড়, গান। রাত হলেও এ তো রাত নয়, এ হলো সূর্যোদয়ের আগের অন্ধকার। প্রাচীন সনাতনী সাম্রাজ্য মাজাপাহিত নবকলেবরে জেগে উঠছে, নতুন ভোরের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। যক্ষযন্ত্র হাতে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হলো কালী। মকরে চড়ে বসল ওরা দু'জন। মাতঙ্গী আর ধূমাবতী।

"তোমার পরিচয়টা আজও ঠিক করে জানা হলো না," বলল ধূমাবতী, "কে তুমি?"

"আমার নাম তো তুমি জানোই," নীরস গলায় বলল মাতঙ্গী, "পরিচয় বলতে বিশেষ কিছু নেই। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা-য়ের এজেন্ট ছিলাম আগে। এখন রিটায়ার করে ছোটোখাটো একটা এনজিও চালাই।"

"এনজিও!" অবাক হল ধূমাবতী, "কী ধরনের এনজিও?"

"জেহাদিদের কবল থেকে বাঙ্গলাকে মুক্ত করাই আমাদের এনজিও-র লক্ষ্য। তুমি যোগ দেবে, আমাদের এনজিও-তে? তোমার মতো ট্যালেন্টেড লোকজনই আমাদের দরকার।"

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। যেখানে চেতনা, সেখানেই দেবীর অধিষ্ঠান। আর যেখানে দেবী, সেখানেই নবজাগরণ। ফাইবার গ্লাসের ঢাকনা বন্ধ হলো মকর অদৃশ্য হলো কালীমন্থনের কালো সমুদ্রে।



অদ্বিতীয়া কাদম্বিনীর অনন্যা হওয়ার কথা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

অন্তঃপুরের মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার পর্ব শুরু ১৮৩০-এর দশক থেকে। সমাজে তখন তীব্র বিরোধিতা, নিন্দা, সমালোচনা। নারীশিক্ষার প্লাবনের প্রথম জলাধার তখন আস্তে আস্তে নির্মাণ হচ্ছে। কম কথা শুনতে হয়নি কিন্তু! যখন ১৮৪৯-এ বেথুন স্কুল স্থাপন হলো, সেদিন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিতাও বুনে ফেললেন। ব্যঙ্গরসের কবিতা। মেয়েরা কি মেম সেজে পড়াশোনা করবে?

''যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এ বি শিখে বিবি সেজে, বিলাতি বোল কবেই কবে।
লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল তারাই এখন চড়বে ঘোড়া
ঠাই ঠমকে চালাক চতুর সভ্য হবে থোড়া থোড়া
পর্দা খুলে ঘোমটা খুলে সেজে গুজে সভায় যাবে
ড্যাম হিন্দুয়ানী বলে বিন্দু বিন্দু ব্রান্ডি খাবে।''

মেয়েদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যের আলো প্রবেশ করত না তেমনই মনকক্ষেও জ্ঞানের আলো জ্বলেনি। নারী পুরুষের সহাবস্থান কী তা জানতই না সমাজ। তারা সবাই সুগৃহিণী থাকবে। ''সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্ত...এক রন্ধন শিক্ষা করিতে যাইয়া, আমাদিগকে উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন ও উত্তাপ তত্ত্ব শিখিতে হয়''! ভারী মজার। স্ত্রী শিক্ষা মানেই স্ত্রী বিপথগামী হবে। তাই ঘরে ঘরে তখন ''মেয়েরা চর্ব্যচোষ্য রাঁধিতে পারিলেই, বিবিধ সেলাই করিতে পারিলেই হইবে''—এমতাবস্থায় যদি এমন ঘটনা ঘটে, কোনো এক বাড়ির সবচেয়ে আদুরে কন্যা অসুস্থ। গাড়ি খটাখট খটাখট করে দৌড় দিল ডাক্তার আনতে। কলে ডাক্তার আসলেন—অমনি বাড়ির সবাই বলে উঠল ''ওমা, ডাক্তারই কই? এ তো মেয়ে''!

পালটে যাবে তো সমাজের ভাবনার যাত্রাপথ? দৃষ্টিকোণের অভ্যাস? ঈশ্বর গুপ্তর কবিতা আরও ছুটবে নিশ্চয়ই। খুব অসম্ভব দৃশ্য কি সামনে এনেছিলেন সেই ডাক্তার না মেয়ে যাই বলি না কেন, তিনি এনে তো ছিলেন। তাই আজকের সমাজ ভাবনাতেও তিনি প্রাসঙ্গিক। ব্রাহ্ম সংস্কারক ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনী সেই অসম্ভবকে নিয়ে চ্যালেঞ্জের সাথে মোকাবিলা করা এক অহংকারের নাম।

বাঙ্গলার প্রথম মহিলা চিকিৎসক হিসেবে কাদম্বিনী নারী স্বাধীনতা এবং স্ত্রী শিক্ষার এক সর্বকালীন রোল মডেল। এ কোনো একক ব্যক্তিচরিত্র নয়। তৎকালীন বঙ্গসমাজের দ্বন্দ্বগুলির প্রেক্ষাপটে তাঁর নারী স্বাধীনতা এবং বৌদ্ধিক বিকাশে পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার যে প্রগতিশীল ভূমিকা তা সব প্রতিবন্ধকতার বিপ্রতীপে এক মুক্ত জীবনদর্শনের সন্ধান দেয়। তবে সেই প্রসঙ্গে যাবার আগে একটা মিষ্টি প্রেমের গল্প হয়ে যাক। রেনেসাঁ বাঙ্গলার প্রথম লাভ ম্যারেজ কারা করেছিলেন, এ প্রশ্ন কেউ করেন না। সাধারণত ওঠেই না এ কথা। এ কাজটাও কাদম্বিনীই করেছিলেন। চূড়ান্ত রক্ষণশীল সমাজকে তোয়াক্কা না করে, বাইশ বছর বয়সে, ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে পছন্দ করে বিবাহ করেন কাদম্বিনী। তাতেও বন্ধুমহলে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল; প্রথমত অসমবর্ণ বিবাহ, দ্বিতীয়ত অসমবয়সি বিবাহ। তৎকালীন সমাজের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা আমন্ত্রণ পেলেও উপস্থিত ছিলেন না এই বিয়েতে। রক্ষণশীলতা আর প্রগতিশীলতা যে কী মাত্রায় দড়ি টানাটানি করছিল তা স্পষ্ট হয়, যখন ১৮৮৩-তে ওই বিয়েতে তথাকথিত অতি প্রগতিশীল ১২ জন দল বেঁধে অনুপস্থিত হলেন। এই বিয়ের উল্লেখ করতেই হবে, কারণ কাদম্বিনীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন তাঁর জীবনসঙ্গী। তিনিও সহযোদ্ধা। পাত্রের বয়স কাদম্বিনীর দ্বিগুণ। ব্রাহ্ম সমাজের কাছে এটা মোটেই পছন্দ ছিল না। তারপর আবার দ্বারকানাথের প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর এটা ছিল দ্বিতীয় বিবাহ। ক্ষোভ এতোটাই প্রবল হয় যে, আর্য নারীসমাজের মুখপত্র 'পরিচারিকা'য় প্রকাশ পায় সংবাদ। 'বিএ পরীক্ষা উত্তীর্ণ শ্রীমতী কাদম্বিনী বসুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে, শুনিলাম এই বিবাহে শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দত্ত বি.এ, শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য এম.এ, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্নবাবু প্রমুখ ভদ্র মহোদয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়াও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বিবাহসভায় উপস্থিত হন নাই। শুনা যায় দ্বারিবাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি, অথচ তাঁহার বিবাহে সাধারণ সমাজের উচ্চশ্রেণীর সভ্য ও প্রচারকগণ উপস্থিত হইলেন না। কেন যে উপস্থিত হইলেন না তাহা আমরা বুঝিতে কষ্ট পাই'। এই 'বুঝিতে কষ্ট পাই' শব্দবন্ধটিকে কিন্তু এতো সহজ করে নিলে চলবে না। অক্ষয় কুমার দত্তের 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) ও 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫২-৫৩) শীর্ষক রচনা দুটি তখন পাঠ্যসূচিতে ছিল। দ্বিতীয়টির একটা অংশে জ্ঞানতপস্বী অক্ষয় কুমার দত্ত উল্লেখ করেছিলেন ''অল্প বয়সে এবং বৃদ্ধকালে বিবাহ করা উচিত নহে...''—এবার বোঝা যাচ্ছে কেন উপস্থিত ছিলেন না তাঁরা। তখন জাতীয় চেতনা বিকশিত হচ্ছে, শিক্ষার প্রসার ঘটছে, তা সত্ত্বেও সমাজের মানসিকতা যে কোন তলানিতে তা স্পষ্ট। এই প্রতিবন্ধকতায় পাল টেনে ডাক্তার হয়েছেন কাদম্বিনী। সহকাণ্ডারী ছিলেন অবশ্যই দ্বারকানাথ। স্রোতের প্রচণ্ড বিরুদ্ধে এ শুধু একজন মহিলার চিকিৎসক হয়ে ওঠা নয়, এ ছিল এক নতুন যুগের সৃষ্টি।

প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট এবং ডাক্তার কাদম্বিনীকে প্রতিটা ধাপে এগোতে হয়েছে লড়াই করে। সমাজপতিদের রক্ষণশীলতা তাঁর জেদকে যেন আরও প্রজ্বলিত হতে সাহায্য করেছে। প্রতিটা দিন ছিল নাটকীয়তায় আর যুদ্ধে মোড়া। আপোশহীন লড়াই। তিনি শুধু বাঙ্গালি নন, সমগ্র দেশ জাতিকে কৃতার্থতার স্পর্শ দিয়েছেন। উনিশ শতকে যখন মেয়েদের জন্মমুহূর্তে শঙ্খধ্বনি ছিল না, যখন বহু সতীনের সাথে ঘর করার যন্ত্রণা, কৈশোর থেকে শুরু হতো সন্তানের জন্ম দেবার পক্রিয়া, ঠিক তখন রাধাকান্ত দেব, রামমোহন অনুরাগী প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মানুষরা এগিয়ে এলেন স্ত্রীদের মানুষ করতে। ১৮৬১-তে ভাগলপুরে যখন কাদম্বিনী জন্মগ্রহণ করেন তখন সেখানেও ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম প্রসারিত হচ্ছে। ব্রাহ্ম পণ্ডিত ব্রজকিশোর ভাগলপুরে প্রথম নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। গঠন হয় মহিলা সমিতি। উনিই কাদম্বিনীর প্রথম গুরু। ১৮৭৬-এ পড়াশোনার জন্য কাদম্বিনী কলকাতায় আসেন এবং বালিগঞ্জ হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীতে এটি বেথুন স্কুলের সাথে যুক্ত হয়।



সত্যি বলতে বালিগঞ্জ স্কুলে ভর্তিই কাদম্বিনীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বিষয়টা খুলে না বললেই না। ১৮৭৬-এর মার্চ মাসে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় উঠে যায়। তার ঠিক এক মাসের মধ্যে ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে দ্বারকানাথ বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তা আবার কয়েক বছরের মধ্যে বেথুন স্কুলের অন্তর্গত হয়। শুধু লেখাপড়াই না, মেয়েদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা, সেলাই, আঁকা সবকিছু শেখানো হতো। সে এক মহান কর্মযজ্ঞ। মেয়েরা কী খুশি! দ্বারকানাথ সবার প্রিয় মানুষ তখন। ১৮৭৫-এ কাদম্বিনী যখন এই স্কুলে ভর্তি হলেন তখন তাঁর বয়স কত আর—তেরো কী চোদ্দ। প্রথম দেখাতেই শিক্ষক দ্বারকানাথ কাদম্বিনীর মনে গভীর ছাপ ফেলেন। যা পরবর্তীতে অন্তঃসলিলার মতো প্রবাহিত হয়, গভীর হয়। দ্বারকানাথ পরবর্তীতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিষয়ে আরও সিরিয়াস হলেন। সে সময় বেথুন স্কুলের দুই ছাত্রী কাদম্বিনী ও সরলা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষার উপযুক্ত হলেও বাধ সাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নিয়ম। তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য স্যার আর্থার হবহাউসের দ্বারস্থ হন দ্বারকানাথ। উপাচার্য অত্যন্ত নারীহিতৈষী এবং মুক্তমননের শিক্ষাবিদ হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করলেন। শিক্ষাবিদ মনমোহন ঘোষ এ বিষয়ে তৎপর হয়েছিলেন। শেষমেশ দরজা খুলল। বিশ্ববিদ্যালয় কাদম্বিনী ও সরলার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল। সরলার বিবাহ হয়ে যায়, তিনি আর পরীক্ষায় এলেন না, একা কাদম্বিনী পরীক্ষায়। ১৮৭৮-এর ডিসেম্বরে অত্যন্ত কঠিন প্রবেশিকার কাঠগড়া পার করলেন বিদুষী। মাত্র এক নম্বরের জন্য তিনি প্রথম বিভাগ পাননি। এ এক ইতিহাস রচনা হলো যা মূলস্রোতের বিরুদ্ধে মেয়েদের শিক্ষা এবং স্বাধীনতার দুর্বার মুক্ত জোয়ার ঘোষণা করল। শুধু কি তাই? বাঙ্গলার লেফটেন্যান্ট কাদম্বিনীর জন্য মাসিক পনেরো টাকার বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তবে এটাও শর্ত ছিল ওঁকে এফ এ পড়তে হবে। একা কাদম্বিনীর জ্ঞানসমুদ্র সামলাতে বেথুন স্কুলের সাথে কলেজ খোলার প্রস্তাব আসে। খুললও কলেজ। প্রথম অধ্যাপক শশীভূষণ দত্ত এবং একমাত্র ছাত্রী সেদিন কাদম্বিনী। ১৮৮০-তে কাদম্বিনী এফ এ পাশ করেন এবং বেথুন কলেজে ভর্তি হন। এবার তিনি সহপাঠী পেলেন চন্দ্রমুখী বসুকে। ১৮৮২-তে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী একসাথে বি. এ গ্রাজুয়েট হন। সারা ভারত সেদিন বিস্ময়ে বিহ্বল। অভিনন্দনের প্লাবন। তখনও ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দরজায় মহিলারা তালা খোলার চেষ্টা করছে আর দুই ভারতীয় বঙ্গতনয়া শিক্ষাঙ্গনে কিনা ভেল্কি দেখাল। সবার মুখে কুলুপ এঁটে দিল কাদম্বিনীর জেদ, শ্রম, অধ্যবসায়। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় বাঙ্গালি নারীকুলের পশ্চাৎপদ ভঙ্গিমা দেখে বিদ্রূপ করে 'বাঙালীর মেয়ে' লিখেছিলেন, তাঁর কলম মাথা নত করে অভিবাদন জানাল। বঙ্গ তনয়ার সাফল্যে তাঁর আপ্লুত কলম দোয়াতে ঝাঁপ দিয়ে বলল—

''হরিণ নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদির মালা।
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন,
অই বেশ ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি 'বাঙালীর মেয়ে'
তারি মতো সুখ আজি তোমা দোঁহে পেয়ে।
বেঁচে থাক, সুখে থাক চিরসুখে আর।
কে বলে রে বাঙালীর জীবন অসার?
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে?

ভাসিল আনন্দভেলা কালের জুয়ারে।
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে''।।

এই বোধহয় প্রথম বাঙ্গালি নারীর সামনে পুরুষতান্ত্রিকতার নত মস্তক। বাঙ্গালি প্রথমবার স্বীকার করল হ্যাঁ মেয়েরাও পারছে।

১৮৮৩, কাদম্বিনী-দ্বারকানাথ পরিণয়। যা নিয়ে আগেই কিছু আলোচনা হয়েছে। তবে কাদম্বিনী যে কতটা উচ্চ মননের এবং মুক্ত ভাবনার ছিলেন তা আরও স্পষ্ট হয় এই বিবাহের পর। দ্বারকানাথ যে শুধু বিপত্নীক ছিলেন তাই না, তিনি দুই সন্তানের পিতাও তখন। কন্যা বিধুমুখী ও পুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন মানসিক ভারসাম্যহীন। কাদম্বিনী সবাইকে গ্রহণ করেছিলেন সাদরে। প্রকৃত শিক্ষা একজনকে একদিকে যেমন দৃঢ় চিত্ত করছে অন্য দিকে তাঁকে ততটাই সুকুমার সহিষ্ণুতা প্রদান করছে। বিয়ে নিয়ে বাকবিতণ্ডার কথা উল্লেখ হয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে 'রেইস অ্যান্ড রাইয়ৎ' পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ''একালের বিখ্যাত কন্যা কাদম্বিনী যাঁর কাছে সমাজের অনেক প্রত্যাশা ছিল, তিনি দুম করে বিয়ে করে বসলেন তাঁর চেয়ে অনেকটা অযোগ্য ব্যক্তিকে। অবশ্য এটা তাঁর এবং আশাহত প্রেমিকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে আবার একটা ভাঙন না দেখা দেয়'' —এতো বিতর্ক একটা বিয়ে নিয়েও যখন হয় বুঝতে হবে তা সাধারণ দাম্পত্য প্রেম নয়। সবাই আসলে ঈর্ষান্বিত ছিল। ওই বিয়েই যে কাদম্বিনীর টার্নিং পয়েন্ট তা দ্বারকানাথের উদার মন এবং সহযোগিতা প্রমাণ করে দিল। দ্বারকানাথ মানসচক্ষে দেখেন কাদম্বিনী ডাক্তার হবে। তাঁর 'বীরনারী' নাটকের সংলাপে তা স্পষ্ট। যেখানে দেবকী প্রশ্ন করছেন—'আমি ধন্বন্তরী হব কেমন করে'। সুরঙ্গমার উত্তর ছিল, 'কেন চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ে'? দেবকী সে নাটকে আশা হারাচ্ছে। কেমন করে মেয়েমানুষ এতো লেখাপড়া করবে? সুরঙ্গমার দৃঢ় প্রত্যয়—'লোকে কথায় বলে যে ইচ্ছে থাকলে পথ পাওয়া যায়। দ্বারকানাথ যেন সুরঙ্গমার ভূমিকায় বাস্তবে অবতীর্ণ। যিনি কাদম্বিনীর কণ্টকের ধার ভোঁতা করেছেন ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। যখন সামাজের নারীর অবস্থান বলছে ''স্ত্রী শুদ্ধ হইয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বামীকে প্রণাম করিবেন, পরে গোময় বা জল দ্বারা প্রাঙ্গণে মণ্ডল দিবেন। গৃহকার্য শেষ করিয়া গৃহদেবতার পূজা করিবেন। তদনন্তর সমুদয় গৃহকার্য শেষ করিয়া পতিকে ভোজন করাইবেন, পরে অতিথির সেবা করিয়া চারিটি আহার করিবেন'' (সৎসঙ্গ ১৩০১)—ঠিক সে সময় কাদম্বিনীর পদযাত্রা লড়াই সংগ্রামের ও প্রতিকূলতার ছিল তা বোধহয় আমাদের হিসেবের তলানিতেও আসবে না। ১৮৮২-তে তিনি এফএ পাশ করলেন এবং মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিলেও তা সম্ভব হলো না, কারণ তখনও যে তিনি স্নাতক নন। পরের বছর গ্রাজুয়েট হলে আবার তিনি আবেদন করেন মেডিক্যাল কলেজে। মহিলাদের ডাক্তারি পঠনপাঠনে মেডিক্যাল কাউন্সিল অবশ্য সম্মতি দিল না। শিক্ষা দপ্তর বিষয়টি নিয়ে উৎসাহী ছিল তাই ১৮৮৩-র ৪ জুন ডি পি আই পত্র প্রেরণ করলেন মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছে। কাউন্সিল কাদম্বিনীর মেডিক্যাল পড়ার ছাড়পত্র দিল না। শুরু হলো আন্দোলন। দ্বারকানাথের নেতৃত্বে নারী শিক্ষামননের ব্যক্তিরা জোর বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে ডিপিআই আবার নড়েচড়ে বসলেন। তিনি সরকারের কাছেই জানতে চাইলেন কী হবে এই মেধাবী ছাত্রীর? কী হবে তাঁর ভবিষ্যৎ? কেন ফেরানো হচ্ছে তাঁকে? বিষয়টিতে তৎকালীন ছোটলাট অগস্টন টমসন হস্তক্ষেপ করলে ১৮৮৩-র ২৯ জুন সরকার মেডিক্যাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে ওভাররুল করে মেডিক্যাল কলেজে মহিলা ভর্তির অনুমতি প্রদান করে। সেও এক প্রবল ঝড়। একজন হ্যাঁ বলে তো অন্যজন না। এমন দিন যে আসতেও পারে তা তো আর সাহেবরাও ভাবেনি। স্ত্রীলোক কিনা লাশকাটা ঘরে অ্যানাটমি শিখবে! ফিজিওলজি পড়বে! ডক্টর কোটস এর সমর্থন করলেও ডক্টর হার্ভে রে রে করে ওঠেন। সরকারি আদেশ থাকা সত্ত্বেও কী ছি ছি থু থু। একজন মহিলা কিনা পুরুষদের সাথে একঘরে দিনরাত ক্লাস করবে। মানব শরীর কাটাছেঁড়া হবে। কী অস্বস্তিকর! সবকিছুকে একদিকে সরিয়ে রেখে ১৮৮৩-র কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যাচ এক ইতিহাসের অববাহিকা রচনা করল—প্রথম মহিলা ছাত্রী হলেন কাদম্বিনী। নানা অসন্তোষের সাথে তিনবছরের পথ অতিক্রম করে যখন প্রথম এম বি পরীক্ষা এল তখন কাদম্বিনী মেটিরিয়া মেডিকা এবং অ্যানাটমিতে গ্রেস নিয়ে উত্তীর্ণ হন। ব্যাস আবার হই চই। নানান পত্রপত্রিকা আবার সমালোচনার মশলা পেয়ে গেল। ২৮-৮-১৮৮৬, ভারতবাসী পত্রিকা আপত্তি জানিয়ে বলছে, ''It is not proper to show grace to a particular sex in public examination'', ১৯-৪-১৮৮৬ সোমপ্রকাশ পত্রিকা ট্যারাভাবে লিখছে, ''বাস্তবিক স্ত্রীলোকদিগের উপর এত অধিক অনুগ্রহ দেখাইলে সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক অল্পই মিলিবে।'' এসব চড়াই উতরাই তখন কাদম্বিনীর রোজকারের অঙ্গ। ১৮৮৮-র মার্চ, তিনি মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা দেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মেডিসিনে অনুত্তীর্ণ হন। পরে একটা বিশেষ কোর্স করলে তারপর তিনি গ্রাজুয়েট অব বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ উপাধি পান। এ ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় স্ত্রীধন। তিনি প্রাকটিসের সুযোগ পান। ইডেন হাসপাতালের চিকিৎসক হন কাদম্বিনী।

স্বামী দ্বারকানাথের স্নেহ, ঐকান্তিক ইচ্ছে কাদম্বিনীর পথকে আরও বিস্তীর্ণ করে। ১৮৯২-র ২৬ ফেব্রুয়ারি কাদম্বিনী একা বিদেশ যাত্রা করেন। তাঁদের এক আত্মীয় ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ অবশ্য তখন বিলেতে ছিলেন তাই কাদম্বিনীর থাকার বিষয়ে সুবিধা হয়েছিল। ''...কিন্তু দ্বারকানাথ এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হইতে পারিয়া কাদম্বিনীকে ইংলন্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে প্রেরণ করিলেন। কাদম্বিনী এডিনবরা এবং গ্লাসগো হইতে এল আর সি পি এবং এল আর সি এস, ও এল এফ পি এস উপাধি লইয়া ফিরিলেন''—প্রভাতচন্দ্রের বাংলা নারী জাগরণে এমনটাই উল্লেখ আছে। বিলেত

থেকে মেধাবী কাদম্বিনী ফিরলেন বটে কিন্তু গৃহিণী কাদম্বিনীও বেশ শৌখিন হয়ে গেছেন ততদিনে। দ্বারকানাথের প্রথম স্ত্রীর কন্যা বিধুমুখীর মেয়ে পুণ্যলতা একবার লিখছেন, ''দিদিমা বিলেত থেকে ফিরলেন, নতুন কায়দায় তাঁর ড্রয়িংরুম সাজানো হলো। দেশ বিদেশ থেকে আনা কতরকম সুন্দর সুন্দর জিনিস। আমরা সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে, আস্তে আস্তে সব নেড়ে চেড়ে দেখতাম। দাদামশাইয়ের ঘরের কোণে তাঁর ছড়িগুলি সাজানো থাকত। একটা ছিল বুলডগমুখো মোটা লাঠি, হলদে কাচের চোখওয়ালা বুলডগটা দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে। আর একটা ছিল দারুচিনি ডালের তৈরি লাঠি, সেটা কামড়ালেই দারুচিনির স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যেত।'' ভারী প্রাণময় বর্ণনা। যাইহোক এতো গেল এক অজানা অচর্চিত ঘরোয়া কাদম্বিনীর কিছু সুললিত দিক। কিন্তু দেশে ফিরেও তাঁকে কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি। ইডেন হাসপাতালে প্রথম দিকে না ছিল প্রাপ্য মর্যাদা—তাকে ধাত্রীর কাজ করতে বাধ্য করিয়েছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ডাক্তারেরা। যার বেতন তিনশো টাকা এবং একক ওয়ার্ডের দায়িত্ব পাওয়ার কথা সে কিনা এতো বঞ্চিত? কাদম্বিনী কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথকে খোলা চিঠি লিখলেন। আদায় করতে হলো নিজের প্রাপ্য মর্যাদা। অনেকগুলো কাজের পথপ্রদর্শক হলেন কাদম্বিনী। তিনিই প্রথম ডাফরিন হাসপাতালে শিশুবিভাগ খোলেন। চাঁদা তুলে চব্বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। শিশু মৃত্যু ঠেকাতে কটেজ তৈরির প্রস্তাব তিনিই প্রথম দেন। শহরে ক্রেস তৈরির প্রস্তাব তাঁর মাধ্যমেই আসে। আর একটা বিষয় প্রায়ই খেয়াল থাকে না, বিদেশ থেকে ফিরে যখন ইডেন হাসপাতালে ইনচার্জ হিসেবে যোগ দিলেন তখন তিনি ক্যাম্পবেল স্কুলে স্ত্রীরোগ পড়ানোর দায়িত্বও পান। সে অর্থে তাই কাদম্বিনী প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষক। কিন্তু তাঁর যা যোগ্যতা তাতে আরও ভালো পদ পাওয়া উচিত তাঁর। তিনি প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করলেন। কী রমরমা পসার তাঁর। এতো বাঙ্গালি চক্রান্ত, যা তাঁকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

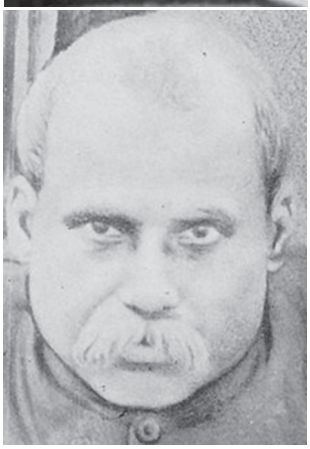

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়



রাধাকান্ত দেব



প্রসন্নকুমার ঠাকুর

হতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল বলে অনেকের ধারণা, তার পরেও কলকাতার বাঙ্গালির চোখের মণি হলেন সেবাব্রতী কাদম্বিনী। ১৫/৫, বেনিয়াটোলা লেনের বিজ্ঞাপন যখন বেঙ্গলি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তখন কাদম্বিনীর পুর্ণশশী রূপ ভেসে ওঠে।

A card
Mrs Ganguli, B.A
15/5 Beniatola lane, College Square

North East Corner, Calcutta having studied in the Medical College for five years and obtained a college diploma to practice : Medicine, Surgery and Midwifery has commenced practice and treats Women and Children. Consultion free for poor patients at her home between 2 and 3 pm. daily.

নেপালের রাজমাতার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে তিনি এক মাইলস্টোন নির্মাণ করেছেন। রাজপরিবার থেকে সাধারণের দালান সর্বত্র তাঁর ডাক পড়ত।

জীবন একটা চ্যালেঞ্জ। কাদম্বিনী তা প্রতিদিন আকণ্ঠ পান করেছেন। ১৮৭৫-এ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট লিখেছিল ,That females of any kind are fit to be doctor is a very doubtful point. সেই কাদম্বিনীই ডাক্তার হয়ে নীলরতন সরকারের মতো ডাক্তারের সাথে কাঁধে কাঁধ রেখে সমানাধিকারের জমি তৈরি করেন। লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধে প্রথম আইকন কাদম্বিনী। বাঙ্গলার শিল্প সংস্কৃতি বিদেশে গিয়েছিল কাদম্বিনীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। মার্কিন মুলুকে প্রথম ভারতীয় শিল্প যায় প্রদর্শনীতে। ১৮১৪ শকাব্দ ১ চৈত্রের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা জানিয়েছে, ''আমাদের শ্রদ্ধেয় ভগ্নী শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া চিকাগো প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে তথায় গমন করিয়াছেন। এদেশের দুর্দশাগ্রস্ত রমণীকুলের উন্নতির জন্য সেখানে কোনও উপায় করিতে পারেন, এই মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তথায় যাত্রা করিয়াছেন''। ১৮৮৯ জাতীয় কংগ্রেসের

অধিবেশনে প্রথম দুই নারী সদস্যের মধ্যে তিনি একজন। তিনিই প্রথম ভারতীয় কংগ্রেসের মহিলা বক্তা।

কাদম্বিনীর নিষ্ঠার কথা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ এক চিঠিতে লেখেন। যাতে বলা ছিল, ''কে এই মিসেস গাঙ্গুলী, আমায় কিছু জানাতে পারো? সে নাকি এর মধ্যেই ফার্স্ট লাইসেনসিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি পাশ করে ফেলেছে আর আগামী মার্চ মাসে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। এই তরুণী বিয়ে করে ফেলেছে, ডাক্তার হবে ঠিক করার পরে! তারপর অন্তত একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে, যদি না দুটি জন্মে থাকে। কিন্তু ছুটি নিয়েছিল মাত্র ১৩ দিন। আর শুনছি নাকি একটাও লেকচার মিস করেনি''। কাদম্বিনী বিশ্বের জ্ঞানীগুণী সেবক মহলে কতটা আদরের ছিলেন এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু বোধহয় হয় না।

কিন্তু কাদম্বিনীর পিছনে বাঙ্গালিরা বিদ্রূপ করতে ছাড়েনি। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে গিরিজাসুন্দরী নামক এক বিধবা খুন হলে রটনা ওঠে ব্যর্থপ্রণয় তার জন্য দায়ী। ঘটনাটা এক ব্রাহ্ম বাড়ির সামনে ঘটেছিল। 'বঙ্গনিবাসী' পত্রিকায় এ নিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। যেখানে কাদম্বিনী দ্বারকানাথকে কুৎসিতভাবে জড়ানো হয়। নটী অপবাদ দেওয়া হয় কাদম্বিনীকে। পত্রিকার পরিচালক মহেন্দ্র চন্দ্র পালের বিরুদ্ধে মামলা করে জয়ী হন কাদম্বিনী ও দ্বারকানাথ। মহেন্দ্র ক্ষমা চাইলেও দ্বারকানাথ অনড়। তার ছ' মাস হাজত ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়। কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন সত্ত্বেও মহেন্দ্রর হাজতবাস মকুব হয়নি। দ্বারকানাথের মামলার ব্যয় এবং আদালতের নির্দেশে তিন হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয় মহেন্দ্রকে। পরিমল গোস্বামীর থেকে কিছু সেকেন্ডারি রেফারেন্সের মাধ্যমে জানা যায় আরও একটি পত্রিকা কাদম্বিনীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ কার্টুন প্রকাশ করলে দ্বারকানাথ সম্পাদকের দপ্তরে গিয়ে কাগজ মুখে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন Eat your words–তারপর লেখা প্রত্যাহার পর্যন্ত করিয়েছিলেন। দশভুজা কাদম্বিনী। এক্কাগাড়ি চড়ে রোগী দেখতে গেলে তিনি লেস বুনতেন। কর্মজীবন ঘরকন্না স্বামীর সেবা দেশসেবা কোনটা বাকি রেখেছেন তিনি। মৃত্যুপথের দ্বারকানাথকে সেবা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ডক্টর বার্চ। জীবনের গতিপথ নির্ণয় করতে নিখুঁত ছিলেন এই বঙ্গতনয়া। কাজের প্রতি দরদ তাঁকে অমর করে রেখেছে। দ্বারকানাথের যেদিন মৃত্যু হয় সেদিনও জমিদার বাড়ি থেকে প্রসবের 'কল' এসেছিল। সকালে স্বামীহারা চিকিৎসক বিকেলে দায়িত্ব পালনে বেরিয়ে গেলে সবাই অসন্তুষ্ট এবং হতভম্ব। ইতিহাস এভাবেই তৈরি হয়। যেখানে নিয়ম ভেঙে নতুন নিয়ম তৈরি করতে সাহস লাগে। ঘরকন্না সব সামলে তিনি সম্পূর্ণা। চিকিৎসক কাদম্বিনীর শেষ দিনে ৩ অক্টোবর ১৯২৩, অপারেশন করে আসার পর শ্রান্ত দেহে পুত্রবধূ সরলাকে বলেন, ''বউমা লোকে বলতে শুরু করেছে ডাক্তার গাঙ্গুলি নাকি বুড়ো হয়ে গেছে। তাঁর হাত আর আগের মতো চলে না। আজ যে অপারেশন করে এলাম সেটা দেখলে তারা আর একথা বলতে সাহস করবে না।'' এই আত্মবিশ্বাস তাঁকে মৃত্যুঞ্জয়ী করেছে। সবকিছুতে সেরা হতে বোধহয় এক মাহেন্দ্রক্ষণের দরকার। কাদম্বিনী সেই সুলগ্না যিনি রবি ঠাকুরের সমবয়সি। দ্বারকানাথ কাদম্বিনীর ছয় নম্বর গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ মহোৎসবের গান শেখাতে আসতেন। যারা অনুশীলনে আসতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নরেন্দ্র দত্ত। বেহালা ধরতেন উপেন্দ্রকিশোর। একদিকে ঠাকুরবাড়ি, যার মধ্যে সরলা ছিলেন কাদম্বিনী ঘনিষ্ঠ। অন্যদিকে রায়চৌধুরী পরিবার। উপেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী বিধুমুখী কাদম্বিনীর স্বামীর আগের পক্ষের কন্যা। দুঁদে ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষের আত্মীয়া। আর তেজপ্রতাপ আলোকদীপ্ত 'অবলাবান্ধব' সম্পাদক দ্বারকানাথ স্বামী এবং প্রিয়বন্ধু। নক্ষত্রপুঞ্জে কাদম্বিনী এক জ্যোতিষ্ক। তাঁকে মাপা আজও আমাদের সাধ্য নেই। তিনি প্রথমা।

With Best
Compliments from :-

A
Well
Wisher

K3N LIFE STYLES

তথ্যসূত্র :

কালজয়ী কাদম্বিনী—ড. সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রানি রাসমণি ও আলোকধাত্রী কাদম্বিনী—ডাঃ জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝড়ের মেয়ে কাদম্বিনী—নারায়ণ দত্ত। অনন্যা কাদম্বিনী—ডাঃ সুবীর কুমার চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গলার নারী জাগরণ—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

গোপাল ভাঁড়ের গল্প অন্য চোখে

সুজিত রায়



"A word is said to be comic when it makes us laugh at the person who utters it, and witty when it makes us laugh either at a third party or at ourselves."

–Henry Bergson in *laughter*

গোপাল ভাঁড় রসরাজ। গোপাল ভাঁড় বিদূষক। অতএব সাধারণ্যে তাঁর গল্প মানেই ভাঁড়ামি। সস্তার কৌতুক। বটতলা থেকে আধুনিক প্রকাশন সংস্থা—সবার অনবদ্য বদান্যতায় গোপাল ভাঁড় তাই ভাঁড় হয়েই রইলেন। পরবর্তীকালে বেশ কিছু একপেশে গবেষকের গবেষণাপত্রেও ওই বিখ্যাত বঙ্গীয় চরিত্রটি হয়ে রইলেন 'শিল্পীত সৃজন' অথবা 'সাধারণ মানুষের মনন দিয়ে গড়া' ভাঁড়, বিদূষক নন। কিন্তু ঘটনা কি সত্যিই তাই?

না, গোপাল ভাঁড় নামে পরিচিত গোপালচন্দ্র নাই নামে আপাত তথাকথিত চরিত্রটির অস্তিত্ব নিয়ে এই প্রবন্ধে বিতর্ক তুলব না। এই প্রবন্ধের মুখ্য অভিমুখ হলো—গোপাল ভাঁড়ের গল্প। সে গল্পগুলো কি সত্যিই গপ্পো? নেহাতই সাধারণ মানুষের শিল্পীত সৃজন? কোথাও কি ছিটেফোঁটা হলেও ছড়িয়ে নেই সাম্যবাদ, মানবিকতা, পুঁজিবাদী ও হিটলারি মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ? এবং অবশ্যই তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজের কুসংস্কারপূর্ণ মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধী ভূমিকা?

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও গবেষক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁর গবেষণা পুস্তক *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের*

ধারা-তে লিখেছেন, ''প্রকৃত হাস্যরসিকের হাস্য তরল ও বহির্মুখী নহে, তাহা গাম্ভীর্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন এবং অপরের প্রতি অব্যর্থ শরসন্ধানী। শেক্স পিয়ারের *As you Like it* নাটকের টাচস্টোনের মতই গোপালকে উপহাস করিবার উপায় নাই, তাহারা উপহাসে যোগ দিয়াই কৌতুক বোধ করিতে চায়। সে যখন কোনো আপাতনির্বোধ অথবা অর্থহীন উক্তি করে তখন মনে করিতে হইবে, তাহার মধ্য দিয়া কোনো সুক্ষ্ম ব্যঙ্গ অথবা ব্যঙ্গের ইঙ্গিতই তাহার অভিলষিত। গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলির মাঝে মাঝে ঘটনার উদ্ভটত্ব সৃষ্টি করিয়া কৌতুকরস পরিবেশন করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু গল্পগুলির হাস্যজনকতার মূলে রহিয়াছে প্রধানত গোপালের বাগবৈদগ্ধতা, তাহার তীব্র শ্লেষাত্মক উক্তি ও ব্যঙ্গকষায়িত গূঢ়ার্থক ইঙ্গিত।''

কেমন ইঙ্গিত?

সে ইঙ্গিত কখনও নবাব, মহারাজা, জমিদারদের সস্তার ক্ষমতা জাহির করার আচরণের বিরুদ্ধে। কখনও-বা গরিবের ওপর বড়োলোকের, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের অত্যাচারের প্রতিবাদে, আবার কখনও তা সামাজিক কুসংস্কারের প্রতিরোধে বিদ্রোহী সংগ্রামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

এই প্রবন্ধে আমি গোপাল ভাঁড়ের বিভিন্ন চরিত্রের গল্পগুলি তুলে ধরে প্রতিটি গল্পের চরিত্র বিশ্লেষণ করব এবং পাঠকদের কাছে পৌঁছতে চাই এই বার্তা নিয়ে যে প্রতিটা গল্পই এক একটি অব্যর্থ শর যা সন্ধানী লক্ষ্যে গিয়ে সপাটে আঘাত হানতে সক্ষম।

প্রথম গল্প : অন্যায়ের যোগ্য জবাব

একবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সপার্ষদ বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছেন দিঘির ধারে। শীতকাল, তাই অন্ধকার ঘন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই বেশ শীতার্ত আবহাওয়া। হঠাৎ মহারাজের মাথায় একটু মজা করার মতলব এল। তিনি পারিষদদের বললেন, ''এই দিঘির জলে যদি আজ সারারাত তোমরা কেউ গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে থাকতে পার ভোর না হওয়া অবধি তাহলে তোমরা হাতে হাতে নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে।''

আত্মহত্যার শামিল এই চ্যালেঞ্জ কেউই নিতে রাজি হলেন না। সবাই মনে মনে ভাবছেন, সারারাত জলে থেকে নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে শেষে কি স্বর্গের পথে পা বাড়াব? দরকার নেই বাপু দশ হাজার টাকার। মহারাজ মিটিমিটি হাসছেন এই ভেবে যে তিনি তো জানতেনই একাজে রাজি হবে না কেউই।

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন এক হতদরিদ্র বৃদ্ধ। পরনে ময়লা শতচ্ছিন্ন আট হাতি ধুতি আর গায়ে উড়নি। বৃদ্ধ হাতজোড় করে মহারাজের সামনে নত হলেন। মহারাজ বললেন—''কী চাই?'' ব্রাহ্মণ বললেন, ''মহারাজ একটু আগে পারিষদদের আপনি যে কথা বলেছেন, তা আমি শুনেছি। কিন্তু ওরা তো কেউ রাজি হননি। মহারাজের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, অর্থ রোজগারের জন্য আমার এই সুযোগটি দিন।''

মহারাজ চমকে উঠলেন। বলে কী লোকটা! একে বৃদ্ধ তায় ব্রাহ্মণ। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মহত্যার দায়ে পড়ব নাকি! বিপ্রভক্ত মহারাজ ব্রাহ্মণকে নিরস্ত করার জন্য বললেন, ''এ বড় ভয়ানক সিদ্ধান্ত। তবে আগে আমি জানতে চাই, আপনি এত অর্থ নিয়ে কী করবেন?'' ব্রাহ্মণ বললেন, ''মহারাজ, আমি অতি গরিব। অথচ ঘরে রয়েছে আমার বিবাহযোগ্যা কন্যা। অর্থের অভাবে বহু সুপাত্রকে ত্যাগ করতে হয়েছে। আপনার পুরস্কারের অর্থ হাতে পেলে আমি কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাই।'' মহারাজ একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ''ঠিক আছে। আমিই আপনার মেয়ের বিবাহের যাবতীয় খরচ বহন করব, কথা দিলাম।'' বিপ্র ঘাড় নাড়লেন। বললেন, ''না মহারাজ। আপনি মহানুভব। কিন্তু আমি আমার অর্জিত অর্থ দিয়েই আমার কন্যার বিবাহ দিতে চাই। দানের অর্থে নয়।''

মহরাজ যতটা অবাক হলেন ঠিক ততটাই রেগেও গেলেন। বললেন, ঠিক আছে, তোমার যখন তাই ইচ্ছে তো তাই হোক। মন্ত্রীকে ডেকে বলে দিলেন, ''ওই বুড়োকে সারারাত গলাডুব জলে থাকার ব্যবস্থা করে দিন।''

রাজার আদেশ। সন্ধ্যা ঘনাতেই মন্ত্রীমশাই দুটি সান্ত্রীর হাতে দুটি জ্বলন্ত হারিকেন ধরিয়ে ঘাটে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দিঘির বরফশীতল জলে নামার নির্দেশ দিলেন। বৃদ্ধ শীতে ঠকঠক করতে করতে জলে নামার পর মন্ত্রীমশাই সান্ত্রীদের চোখ রাঙিয়ে বলে গেলেন, ''দেখো, যেন রাতের অন্ধকারে বুড়োটা পালিয়ে না যায়। তেমন ঘটলে তোমাদেরও গর্দান যাবে।''

ভোরের আলো ফুটতে প্রায় অর্ধমৃত শরীরটাকে কোনো রকমে টানতে টানতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জল থেকে উঠে এলেন। হাজির হলেন মহারাজের দরবারে পুরস্কার হিসেবে নির্দিষ্ট দশ হাজার টাকা নেবেন বলে। মনে খুশির প্লাবন। যাই হোক, এবার মেয়েটার অনূঢ়া নাম ঘোচানো যাবে। মহারাজও যারপরনাই আনন্দিত। যুগপৎ বিস্মিতও। খুশি মনেই সোনার মোহরের থলি এগিয়ে দিতে গিয়েই কিন্তু বাধা পেলেন রাজসভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণ পারিষদবর্গের কাছ থেকে।

—''একটু বিলম্ব করুন মহারাজ। এই শীতে গলাডুব জলে সারারাত কাটানো, তাও এই বয়সে, এতো চাট্টিখানি কথা নয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও চালাকি আছে। সেটা আগে পরিষ্কার হোক মহারাজ। অন্যান্য পারিষদরাও বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ''পরিষ্কার হোক। পরিষ্কার হোক। চালাকিটা পরিষ্কার হোক।'' তাঁরা তো তখন হিংসার জ্বলনে

জ্বলছেন। দ...শ...হাজার স্বর্ণমুদ্রা বলে কথা! ওই বুড়োটা মুফতে পেয়ে যাবে? মহরাজ চমকে গেলেন। বললেন, ''মন্ত্রীকে ডাকা হোক'', মন্ত্রীমশাই দরবারে এলেন। মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, ''ওই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে সারারাত দিঘির জলে গলাডুব জলে কাটিয়েছেন, তার প্রমাণ কী?'' মন্ত্রী করজোড়ে নিবেদন করলেন, ''আজ্ঞে মহারাজ, দুজন সান্ত্রী সারারাত পাহারা দিয়েছে বৃদ্ধকে। পালিয়ে যাওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না।'' পারিষদ প্রধান এবার টিকি নেড়ে বললেন, ''ঘন অন্ধকারে সান্ত্রীরা কী করে বুঝলো, লোকটা জলে ছিল নাকি ডাঙায় ছিল? মন্ত্রীর জবাব, ''আজ্ঞে দুই সান্ত্রীর হাতেই তো ছিল দুটো জ্বলন্ত হারিকেন। সেই আলোয়....''

মন্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই পারিষদ প্রধানের টিকি ফের দুলে উঠল—''মহারাজ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''এতে চালাকিটা কী ধরলেন?'' টিকিধারী হেঁ হেঁ করে হাসতে হাসতে বললেন, ''বুঝলেন না মহারাজ, দু দুটো হারিকেন জ্বলেছে দিঘির পাড়ে, সাররাত। সে কি কম কথা। দিঘির জল তো হারিকেনের উত্তাপে গরম হবেই। হয়েওছিল তাই। তাহলে আর দিঘির জলে গলাডুব জলে রাত কাটাতে কীসের অসুবিধা? পারিষদরা বলে উঠল ''ঠিক ঠিক। বাবা, ঠকিয়ে পয়সা নিয়ে যাবে? তো আমরা অছি কী করতে? ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। মহারাজ নিরুপায়। শূন্য হাতেই বিদেয় নিতে হলো দরিদ্র ব্রাহ্মণকে। বিপ্র চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিপ্রভক্ত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবার ত্যাগ করলেন।

গোপাল সেদিন সভায় ছিলেন না। থাকলে একটা হিল্লে হয়ে যেত। পরে যখন সব শুনলেন, তিনি মনে মনে মহারাজের ওপর বেশ বিরক্ত হলেন। এ কী অন্যায় বিচার। কিন্তু সরাসরি তো আর মহারাজকে বলা যায় না যে তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ঠকিয়েছেন।

অতএব ফন্দি আঁটতে শুরু করলেন। কীভাবে মহারাজকে এই অবিচারের সমুচিত জবাব দেওয়া যায়। পরদিন রাজসভায় গিয়ে গোপাল ভাঁড় মহারাজকে বললেন, ''মান্যবর মহারাজ, আগামী কল্য আপনাকে এবং আপনার পারিষদবর্গকে আমার বাড়িতে একবার পদধূলি দিতে হবে। আমার বহুদিনের সাধ, আপনাকে সপারিষদ আমি স্বহস্তে রান্না করে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাওয়াবো।'' মহারাজ বললেন—''এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। আশা করি পারিষদরা এই নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করছেন।'' পরিষদদের জিভ ততক্ষণে বিনি পয়সায় ভোজের লোভে লালাসিক্ত। সকলেই একবাক্যে খাড়া।

পরদিন দ্বিপ্রহর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সপারিষদ গোপালের বাড়িতে হাজির। বাইরে থেকে হাঁক দিলেন, ''কই হে গোপাল। গেলে কোথায়?'' হাঁকডাক শুনে এক হাত ঘোমটা টেনে গোপালের স্ত্রী মহারাজকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভিতর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। পারিষদদেরও। মহারাজকে ঘোমটার আড়াল থেকে বললেন, ''একটু অপেক্ষা করুন মহারাজ। ও এখন রান্নায় ব্যস্ত। এখুনি ডাকছি।'' ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যায়। সবার পেটে খিদেয় ছুঁচো ডন মারছে। গোপালের দেখা নেই। ধৈর্য হারিয়ে শেষ পর্যন্ত মহারাজ নিজেই চললেন, গোপাল কী রান্না করছে তা দেখার জন্য। সব দেখে তো মহারাজা চক্ষু চড়কগাছ। চড়ক গাছের মতোই উঁচু একটা খেঁজুরগাছের মাথায় ঝুলছে একটা হাঁড়ি। আর গোপাল সেই গাছের নীচে মাটিতে বসে কাঠ জ্বেলেছেন। সবাই থ।

গোপাল যথারীতি মহারাজকে দেখতে পেয়েই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। বললেন—মহারাজ ওই খেজুর গাছে বাঁধা হাঁড়িতে চাল চাপিয়েছি। আর এই নীচে থেকে কাঠের জ্বাল দিচ্ছি। গরম গরম ফুটে উঠলেই খেতে বসবেন।''

মহারাজ রেগে টং! ''তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ গোপাল? ও চাল জীবনেও ফুটবে? গোপাল জিভ কেটে বললেন—''কী বলছেন মহারাজ। দিঘির পাড়ে দুটো হারিকেনের আলোয় যদি পুরো দিঘির জল শীতের রাতে গরম হতে পারে, তাহলে খেজুর গাছের মাথায় বাঁধা হাড়িতে চাল ফুটবে না কেন মহারাজ?''

মহারাজা নির্বাক। পারিষদরা নতমুখ। পারিষদ প্রধানের টিকিও স্থির। মহারাজা গোপালের হাত দুটো ধরে বললেন—''গোপাল তুমি আমায় উচিত শাস্তি দিয়েছ। ওই দরিদ্র কন্যাগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে এখনই ডেকে পাঠাও। আমি এখনই তাঁর হাতে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা তুলে দেব।'' ব্রাহ্মণকে ডাকা হলো। পুরস্কারও পেলেন। যাবার সময় গোপালকে বলে গেলেন, ''গোপাল তুমি গরিবের ভগবান। তুমি শতায়ু হও।''

শুধুমাত্র গল্প হিসেবে এটি সত্যিই হাসির গল্প। কিন্তু গরিবের দারিদ্র্য নিয়ে বড়লোকের তামাশার মুখে ঝামা ঘসে দেওয়ার কাহিনি হিসেবেও গল্পটি ভিন্ন মাত্রার আবেদন রাখে। মধ্যযুগের বঙ্গলায় সেই নবাবদের খাজনা আদায়ের অত্যাচারে আর তৎকালীন ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাদের অশেষ ক্ষমতার যে সামাজিক ইতিহাস আজও লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে, এ গল্প যেন তারই প্রতিচ্ছবি। আর গোপাল ভাঁড় সেই সমাজের বুকেই এক প্রতিবাদী বিদ্রোহী। তাঁর হাতে ঝান্ডা ছিল না, তাঁর মুখে স্লোগান ছিল না। তিনি গরিব আর পুঁজিপতিদের ব্যবধান নিয়ে কখনও দীর্ঘ ভাষণ দেননি। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিভার মধ্য দিয়েই সমাজকে লোকশিক্ষায় শিক্ষিত রাখার চেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয় গল্প : নেকনজরে ভদ্দরলোক

একদিন এক বর্ষার রাতে গোপাল

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

2, Ganesh Chandra Avenue

Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape,
Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जान लेवा हो सकता है ।



SHREE ULTRA
RED-OXIDE

जंग रोधक सीमेंट

SHREE CEMENT LIMITED

Registered Office :
Bangur Nagar, Beawar, Dist. Ajmer
(Rajasthan) 305 901
Phs. : +91 01462 228101-106
Fax : 01462 228117/119
e-mail : scibwr@shreecementltd.com

Corporate Office :
21 Strand Road, Kolkata 700 001
Phs. : +91 33 2230 9801-04
Fax : +91 33 2243 4226
e-mail : scical@shreecementltd.com

Marketing Office :
1 Bahadur Shah Zafar Marg
122/123, Hans Bhawan, New Delhi 110 002
Ph. : 09313565826
Fax : +91 11 22370499
e-mail : scidel@shreecementltd.com

website: www.shreecementltd.com

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—



Usha Kamal

ভাঁড় রাজসভা থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবেমাত্র বিছানায় শুয়েছেন। হঠাৎ দরজায় টোকা। বিরক্ত গোপাল। এত রাতে আবার কে এল। ব্যাজার মুখে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলেলেন। দেখলেন, বেশ দামি ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক বৃষ্টির জলে ভিজে সপসপে হয়ে দাঁড়িয়ে। গোপাল জিজ্ঞাসু চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখে বললেন, ''বৃষ্টিতে ভিজে বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি রাতের জন্য এখানে একটু আশ্রয় চাই।'' ভদ্রলোক তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে। গোপাল ঠোঁটের ফাঁকে হাসলেন। বললেন, ''আপনাকে ধন্যবাদ আমার কাছে অনুমতি চাওয়ার জন্য। তবে কী জানেন, ওই রাস্তাটা আমার নয়। আমার বাবারও নয়। আমার ঠাকুর্দা কেন, চৌদ্দ পুরুষেরও নয়। তা আপনি যদি রাস্তায় রাত কাটাতে চান, কাটান। আমার অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।'' ভদ্রলোক গোপালের জবাব শুনে বিভ্রান্ত। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। গোপাল আরও একটু মজা লুটতে চাইলেন। বললেন, ''ও বুঝেছি কারও অনুমতি ছাড়া আপনি রাস্তায় থাকতে চাইছেন না। তা ভালো, তাহলে তো আপনাকে একবার মহারাজার দরবারে যেতে হয়। এ রাজ্যটার মালিক উনিই কিনা।''

''না, মানে'' বলে ভদ্রলোক থেমে গেলেন। মুখে আর কথা সরে না। গোপাল বুঝলেন, ভদ্রলোক রীতিমতো ঘাবড়ে গেছেন। আর হেনস্তা না করে ওই রাতের জন্য নিজের বাড়িতেই গোপাল ভদ্রলোকটিকে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

গল্পটি পড়ে বোঝা যায়, তথাকথিত 'ভদ্রলোক''দের প্রতি গোপালের মনোভাব। তৎকালীন সমাজে হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত তেমন ছিল না। কিন্তু ভদ্রলোক আর ছোটলোক তথা ধনী ও দরিদ্রের মানসিক সংঘাত ছিল যথেষ্ট। ভদ্রলোকদের কাছে ছোটলোকদের কোনো মানবিক মূল্যই ছিল না। গোপাল ভাঁড়ের বহু গল্পে তাই ভদ্রলোকদের হেনস্তা করার একটা প্রবণতা লক্ষণীয়। এই প্রবণতার মাধ্যমে গোপালের চারিত্রিক বিশ্লেষণ আরও সহজতর হয়ে ওঠে। তবে গোপাল ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাই রসিক গোপাল ভদ্রলোকদের হেনস্তা করতেন এমনভাবে যাতে সবটুকুতেই মাখা থাকে রঙ্গরস আর কেউ নালিশও ঠুকতে না পারেন।

তৃতীয় গল্প ঃ ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী গোপাল

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মা মারা গেছেন। বিষণ্ণ মহারাজের পাশে বয়স্যের মতো সব সময়েই হাজির গোপাল ভাঁড়। একদিন মহারাজ সভার সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, ''মৃত্যুর আগে আমার পরম শ্রদ্ধেয়া মাতাঠাকুরাণী আম খেতে চেয়েছিলেন। আমি মুর্শিদাবাদ থেকে সবচেয়ে ভালো জাতের আম আনার জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে আম নিয়ে ফিরে আসার আগেই আমার মা ইহলোক ত্যাগ করলেন। মায়ের শেষ ইচ্ছে আমি পূরণ করতে পারিনি। এ ব্যথা আমার বুকে বড়ো বাজে। এখন আপনারা বলুন, শাস্ত্রমতে এই অপূরিত ইচ্ছে কীভাবে পূরণ করা সম্ভব''

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নানা শাস্ত্র ঘেঁটে, নানা সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন এবং মহারাজকে বললেন, ''মহারাজ দুঃখ পাবেন না। হিন্দু শাস্ত্রে সমস্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্র বলেছে, ব্রাহ্মণকে দান করা হলো শ্রেষ্ঠ দান। আর মানুষের যে কোনো ইচ্ছে পূরণই সম্ভব ব্রাহ্মণকে দান করার মাধ্যমে। অতএব মহারাজ, আপনি এই সভার ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে একটি করে রৌপ্যপাত্রে একটি করে সোনার তৈরি আম দান করুন। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন মহারাজ, এই দানের ফলে আপনার মাতাঠাকুরাণীর পরপারের যাত্রাপথে কোনো কষ্ট হবে না, সব বাধাবিঘ্ন কেটে যাবে। কারণ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণআম্র দান করা মানেই আপনার পরলোকগতা মাতার শেষ ইচ্ছে পূরণ হয়ে যাওয়া।''

মহারাজ খুশি হলেন। ব্রাহ্মণদের পরামর্শ শিরোধার্য করে একদিন শুভক্ষণে ব্রাহ্মণ সভাসদদের রৌপ্যপাত্রে একটি করে স্বর্ণআম্র দান করলেন নিজ হস্তে। গোপাল সব দেখেশুনে ব্রাহ্মণদের চালাকির জবাব দেবার জন্য মতলব ভাঁজতে শুরু করলেন। পরদিন রাজার সভায় পৌঁছে তিনি ব্রাহ্মণ সভাসদদের বললেন, ''আগামীকাল আমার মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, আমার ইচ্ছা আপনারা সকলে আগামীকাল আমার বাড়িতে এসে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে অংশ নেবেন। আহা! ব্রাহ্মণ ভোজন করালে আমার মায়ের আত্মা শান্তিলোকে অবস্থানের সুযোগ পাবে।'' বলে গায়ের উড়নি দিয়ে চোখের জল মোছার অভিনয় করলেন। ব্রাহ্মণ পারিষদদের প্রধান গোপালের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ''আহা, কেদোঁ না বাছা। তোমার মায়ের আত্মার শান্তির জন্য আমরা আগামীকল্য অবশ্যই তোমার বাড়িতে ভোজন গ্রহণ করব। তা দেখো বাবা। একটু ভালমন্দ ব্যবস্থা করো। মায়ের আত্মার শান্তি বলে কথা!''

পরদিন ব্রাহ্মণকুল তাঁর বাড়িতে পৌঁছনোর আগেই বেশ মোটাসোটা একটা লোহার রড উনুনের আগুনে গুঁজে দিল। যথাসময়ে ব্রাহ্মণরা হাজির হলেন। সবার জিভে জল গড়াচ্ছে। গোপাল গদগদ চিত্তে তাঁদের সকলকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করে বসালেন। বললেন, ''আমি এক্ষুনি আপনাদের ভোজনের ব্যবস্থা করছি।'' বলে ভিতরে গিয়ে

আগুনে পোড়া লাল টকটকে লোহার রডটি নিয়ে এলেন গোপাল। বললেন, ''আমার মায়ের ছিল বাতের অসুখ। এত ব্যথা ছিল যে মা প্রায় হাঁটতেই পারতেন না। তা মা একদিন আমায় বললেন, গোপাল ওই লোহার রডটা পুড়িয়ে আমার পায়ে চেপে ধর। তবে আমার ব্যথাটা কমবে। আমি একটু শান্তি পাব। আমি আর কী করি। লোহার রডটা পুড়িয়ে মায়ের ঘরে এসে দেখি, মা শেষ। মায়ের শেষ ইচ্ছে পূরণ হয়নি। যেমন হয়নি মহারাজের মায়ের শেষ ইচ্ছেও। আমি তাই মায়ের শেষ ইচ্ছে পূরণের জন্য আপনাদের সাহায্য চাই। আপনারা প্রত্যেকে হাত পাতুন। আমি এই গরম লোহা এক এক করে আপনাদের হাতে চেপে ধরতে চাই। শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণদান না হলে তো আমার মায়ের শান্তি হবে না।''

গোপালের কথা শুনে ব্রাহ্মণদের চক্ষু চড়কগাছ। ''বাবা গোপাল! বাছাধন আমাদের। ঢের হয়েছে। আমাদের ক্ষেমা দাও বাবা। মহারাজের দেওয়া সব রৌপ্যপাত্র আর স্বর্ণআম্র আমরা ফেরত দিয়ে দেব কথা দিচ্ছি। এখন তুমি আমাদের রেহাই দাও বাবা গোপাল।''

গোপাল বলল, ''ঠিক তো কথার খেলাপ হবে না তো?'' ব্রাহ্মণরা ''না বাবা না, কখনো না', বলে কাছা সামলাতে সামলাতে দে দৌড়।

ফিচেল গোপাল মুচকি হাসলেন আর অলক্ষ্যে চোখের ইশারায় যেন বলে উঠলেন, ''দ্যাখ কেমন লাগে।''

কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে তৎকালীন ব্রাহ্মণরা কীভাবে মানুষের ক্ষতি করত, অত্যাচার করত, এ গল্পটি তার একটি উদাহরণ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন বিপ্রভক্ত মানুষ। কিন্তু বিদূষক গোপাল ছিলেন কুসংস্কারপন্থী ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী। তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ মানেই শিক্ষার গরিমায় ভেসে চলা এক মানুষ, অহংকারে যাঁর পা মাটিতে পড়ে না। ব্রাহ্মণ মানেই হাজার সংস্কারের বেড়া দিয়ে সমাজকে বন্দি করে নিজের প্রভাব খাটানো এবং সমাজের নেতৃত্ব দেওয়া আর গরিবের পেটে লাথি মারা। গোপাল এঁদের একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাই সুযোগ পেলেই এদের যে কোনো উপায়ে অপদস্থ করে শাস্তি দেওয়াতেন। এই গল্পটি রসিকতার মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের শয়তানির মুখোশ খুলে দিয়েছে। গোপাল পথ দেখিয়েছেন এক কুসংস্কারমুক্ত সুস্থ সমাজ গঠনের চিন্তাভাবনার। এ কী কম কথা!

চতুর্থ গল্প ঃ রেহাই নেই মহারাজেরও

একবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ভাঁড়ের পুত্রসন্তান হয়েছে শুনে গোপালের বাড়িতে হাজির হলেন। গোপালের ছেলের মুখ দেখলেন স্বর্ণমুদ্রা দান করে কিন্তু একই সঙ্গে গোপালকে একটু হেনস্থা করারও ইচ্ছে হলো তাঁর। তাই বললেন, ''ও গোপাল, তোমার ছেলের তো দেখছি আমার মুখ বসানো।'' গোপাল নিমেষে বুঝে নিলেন, মহারাজ অশ্লীল ইঙ্গিত করে তাঁকে পথে বসাতে চাইছেন। গোপাল মনে মনে ভাবলেন, রোস, দিচ্ছি জবাব।

গোপাল হাস্যমুখে জবাব দিলেন, ''এতে আর আশ্চর্যের কী আছে মহারাজ। শাস্ত্রেই তো বলেছে, নরাণাং মাতুলাক্রম; অর্থাৎ মানুষ তো মামার মতোই দেখতে হয়। আমার ছেলেই -বা হবে না কেন?'' অর্থাৎ মহারাজ গোপালের স্ত্রীর সঙ্গে কল্পিত শারীরিক মিলন প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে নিজেই অপদস্থ হলেন। সামান্য কথায় গোপাল নিমেষে মহারাজকে তাঁর শ্যালক (শালা) বানিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রীর ভাই হিসেবে।

এই গল্পটি স্বয়ং মহারাজকে অপদস্থ করার গল্প। অর্থাৎ, এই গল্পটি প্রমাণ করে, গোপাল ভাঁড় ব্যক্তিসম্মান এবং পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে মহারাজকেও অপদস্থ করতে পিছপা হতেন না। প্রমাণ হয়, গোপাল ভাঁড় ছিলেন সোজা মেরুদণ্ডের মানুষ। তিনি কখনও নিজের মাথা বা মেরুদণ্ড স্বয়ং নবদ্বীপাধিপতির কাছেও বিকিয়ে দেননি; যা সত্য তার অকপটে বলতেন, রসিকতার মোড়কে। আর সেখানেই কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠেন গোপাল ভাঁড়।

পঞ্চম গল্প ঃ ছোটলোকের ইলিশ কেনা

সেবার ভরা বর্ষায় গঙ্গায় যেন উপছে পড়েছে ইলিশের ঝাঁক। জলের রুপোলি শস্য সেবার মানুষের হাতে হাতে আর যাঁর হাতেই ইলিশ তাঁর দিকেই হাজারো প্রশ্নবাণ—''দাদা কত নিল?'' ইলিশ নিয়ে মাতামাতি এমন তুঙ্গে যে রাজ্যের কাজকর্ম প্রায় মাথায় উঠেছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জরুরি সভা তলব করলেন। গোপালও হাজির। মহারাজ গোপালকে আদেশ করলেন—''আমি চাই, তুমি বাজারে গিয়ে বেশ বড়ো দেখে একটা ইলিশ কিনে নিয়ে এস। কিন্তু একটা শর্ত আছে। কেউ যেন তোমায় ইলিশ নিয়ে কোনো প্রশ্ন না করে। আমার মন্ত্রীরা তোমার ওপরে কড়া নজর রাখবে। যদি সফল হও, তাহলে পুরস্কার পাবে। বিফল হলে কিন্তু শূলে চড়বে।''

গোপাল চ্যালেঞ্জে হেরে যাবার পাত্র নন। 'যথা আজ্ঞা মহারাজ' বলে গোপাল বাড়ি ফিরে বউকে বলল—একটা বেশ পুরনো ছেঁড়া ময়লা জামা আর ধুতি বের করো তো। আর একখানা নোংরা ছেঁড়া চট।

গোপালকে ভালোই চেনেন তাঁর স্ত্রী, বুঝে গেলেন, একটা মতলব তো কিছু আছেই।

পুরনো তোরঙ্গ খুলে ছেঁড়াছেঁড়া ময়লা পোশাক আর চট বার করে দিলে গোপাল সেগুলো পরে নিল। র‍্যাপারের মতো করে জড়ানো চটের ফালি। তারপরে চললেন বাজারের পথে। যাওয়ার সময় গিন্নিকে বলে গেলেন—তুমি ইলিশ মাছ রান্নার জন্য যা যা লাগে সব জোগাড় করে রাখ। আমি

একটা দশাশই ইলিশ নিয়ে ফিরছি।"

ওইরকম পোশাকে গোপালকে অনেকে চিনতেই পারল না। তাতে গোপালের আরও সুবিধা হলো। তিনি নিশ্চিন্তে বাজারের সেরা ইলিশটি ওজন করতে বললেন। মাছওয়ালা ভাবল এ পাগলটা পয়সা দেবে তো? এই ভেবে মাছটা সরিয়ে রাখার উপক্রম করতেই গোপাল ট্যাঁক থেকে টাকা বার করে গুঁজে দিলেন মাছওয়ালার হাতে। মাছওয়ালার বিস্ময়ের ঘোর আর কাটে না।

যাই হোক, মাছের কানকোয় দড়ি বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে লোককে দশাশই ইলিশটা দেখাতে দেখাতে বাড়ির পথ ধরলেন। লোকে দেখে আঁর হাসে। দুচারজন টিটকারিও দেয়—পাগলেও তাহলে ইলিশ খায় হেঁ হেঁ। দু-চারটে ইট পাথরও ছোঁড়ে কেউ কেউ। আর গোপাল সে সব তোয়াক্কা না করে আড়চোখে দেখে নেয়, রাজার সান্ত্রীরা তাঁর ওপর কড়া নজর রেখেছে।

গোপাল বাড়ি ফিরে স্নানটান সেরে পেট ভরে ইলিশ ভাজা, ইলিশ ভাপা, ইলিশ পাতুরি, ইলিশের সর্ষে ঝাল ইত্যাদি খেয়ে রওনা হলেন রাজসভার পথে। ইতিমধ্যে সান্ত্রীদের কাছ থেকে মহারাজা সব রিপোর্ট পেয়ে গেছেন যে গোপালের সঙ্গে কেউ কথাই বলেনি। গোপাল রাজসভায় ঢুকতেই মহারাজ তাঁকে সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—'ধন্য তুমি গোপাল'। এই বলে নিজের গলা থেকে একটি সোনার হার তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। দিলেন সোনার মোহরের একটি ছোট থলিও।

গল্পটা এমনিতে সাদামাটা। কিন্তু বঙ্গসমাজের যে বহুরূপী চরিত্র—তা এই গল্পে স্পষ্ট প্রতীয়মান। গোপাল যদি ভদ্রলোকের মতো পোশাক পরে ইলিশ কিনতেন তাহলে মাছ বিক্রেতা ও অন্য ক্রেতারাও তাঁকে সম্মান করত। কথা বলত। কিন্তু যেহেতু তিনি গরিবের পোশাকে ছিলেন, তাই তাঁর কপালে জুটেছে টিটকারি। ইঁট পাটকেল। একটা ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে গরিব মানসিক প্রতিবন্ধী ও নীচু জাতের মানুষের প্রতি সমাজের এই নৈর্ব্যক্তিক ব্যবহারটিকেই গোপাল তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ দূরদর্শিতায়। অন্ধ সমাজের চোখ খুলে দিয়েছেন।

ষষ্ঠ গল্প ঃ ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত

একবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবাড়িতে নিত্যপূজার জন্য পুরোহিত আসছিলেন তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে। পথে হঠাৎ তাঁর বাহ্যক্রম উপস্থিত হয়। পুরোহিত তখন বাধ্য হয়েই তাঁর কণ্ঠে বাঁধা শালগ্রাম শিলাটিকে মাটিতে রেখে একটি ঝোপের আড়ালে বসে বাহ্যক্রিয়া করেন। দুর্ভাগ্য পুরোহিতের। প্রাতর্ভ্রমণরত মহারাজের চোখে পড়ে ঘটনাটি। তিনি বিধান দেন, ওই পুরোহিত শালগ্রাম শিলাকে অপবিত্র করেছেন। এতবড়ো পাপী পুরোহিত যেন তাঁর প্রাসাদে না ঢোকে। আর ওই পুরোহিত কখনই পূজা-যজ্ঞাদি করার কোনও অধিকার পাবে না।

গোপাল শুনলেন। কষ্ট পেলেন এই ভেবে যে, গরিব ব্রাহ্মণ সপরিবারে না খেতে পেয়ে মারা পড়বেন। তিনি সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। এই কুসংস্কারের যোগ্য জবাব দেবার জন্য।

আর একদিন মহারাজা ঘোড়ায় চড়ে বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সঙ্গী হিসেবে রয়েছেন গোপাল ভাঁড়ও। হঠাৎ রাজার ঘোড়া পথিমধ্যে মলত্যাগ করল। গোপাল চিৎকার করে উঠলেন, ''সর্বনাশ! এই শীতের সন্ধ্যায় আপনাকে আবার স্নান করতে হবে মহারাজ। আপনি অপবিত্র হয়ে গেছেন।" মহারাজ বললেন, ''আমার ঘোড়া মলত্যাগ করেছে তো আমি কেন অপবিত্র হব?" গোপাল জবাব দিলেন, ''ঠিকই বলেছেন মহারাজ। তাই আপনার যুক্তি মেনেই বলছি, পুরোহিত মলত্যাগ করেছিলেন, তাতে শালগ্রাম শিলা অপবিত্র তো হয়নি।" মহারাজ আর রা কাড়লেন না। কিন্তু গোপাল তো ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। তিনি বললেন, ''মহারাজ, এই ঘোড়াটির এখনই প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত। ও আপনাকে অপবিত্র করেছে। এই অপরাধের কোনও ক্ষমা হয় না।"

মহারাজ নিজের ভুল বুঝে গোপালের কাছে ক্ষমা না চাইলেও নতমুখে বললেন, ''ওই পুরোহিত মশাইকে খবর পাঠাও, কাল থেকে উনিই শালগ্রাম শিলা নিয়ে রাজবাড়ির নিত্যপূজা করবেন।" মুচকি হাসলেন গোপাল।

ধর্মীয় কুসংস্কার যে কখনও কখনও প্রাণঘাতীও হতে পারে তার প্রমাণ এই সমাজ বহুকাল ধরেই দেখেছে। গোপাল ভাঁড়ের এই গল্পটি সেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ এবং প্রতিবিধানও।

গোপাল ভাঁড়ের গল্প একাধারে যেমন ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ, অন্যদিকে তেমনই ধর্মরক্ষারও পরাকাষ্ঠা। এবারের আলোচ্য গল্পটি তারই প্রতীক।

সপ্তম গল্প ঃ ধর্মরক্ষক গোপাল

দিল্লির বাদশা তখন কৃষ্ণনগরে রয়েছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অতিথি হিসেবে। হঠাৎই একদিন মহারাজ গোপালকে জরুরি তলব পাঠালেন। গোপাল সভায় তড়িঘড়ি হাজির হয়ে দেখলেন মহারাজার মুখ থমথমে। গোপালকে দেখতে পেয়েই মহারাজ বলে উঠলেন, ''খুব বিপদে পড়েছি গোপাল। এ বিপদ থেকে একমাত্র তুমিই উদ্ধার করতে পার।"

গোপাল বললেন, ''সমস্যা থাকলে সমাধানও আছে মহারাজ। আগে

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

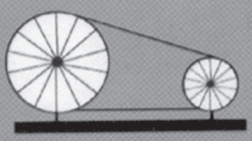

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম



চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩



সমস্যাটা কী তা যদি বলেন।”

মহারাজ বললেন, ‘‘আর বলো না। ধর্মের নামে আমি একটি বৃষকে গতবছর উৎসর্গ করেছিলাম। সেই ধর্মের ষাঁড় এখন গোটা শহরে ঘুরে বেড়ায়। লোকে তাকে মান্যি করে, ভক্তি করে। তা সেই বৃষ এখন খেয়েদেয়ে ঘুরেফিরে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে আর হঠাৎই নজরে পড়েছে বাদশার। তিনি আমায় বার্তা পাঠিয়েছেন, ঐ বৃষটির মাংস খেতে তাঁর সাধ হয়েছে। তাই ওই বৃষটিকে ধরে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে। বুঝতে পারছ কী কঠিন সমস্যায় পড়েছি? এখন ধর্মরক্ষা করাই দায় হয়ে পড়েছে।”

গোপাল হাসলেন। বললেন, ‘‘মহারাজ আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমি আজই এই সমস্যার বিহিত করে দেব। আপনার ধর্মের ষাঁড়ও বহাল তবিয়েতে বেঁচে থাকবে আর বাদশাও আপনার ওপরে কুপিত হবেন না।” মহারাজ বললেন, ‘‘কীভাবে গোপাল? ওই সব বাদশাদের তুমি চেন না।”

গোপাল বরাভয়ের ভঙ্গিমায় হাত তুলে বললেন— ‘‘আমিও খুব সহজ মানুষ নয় মহারাজ। আপনি বাদশার কাছে বার্তা পাঠান। ষাঁড়টির সম্বন্ধে কথা বলার জন্য আপনার প্রতিনিধি হিসেবে আমায় বাদশার দরবারে পাঠাচ্ছেন।”

মহারাজা গোপালের ওপর ভরসা করে বার্তা পাঠালেন বাদশার কাছে। নানা অলংকারাদি সজ্জিত ভাষায় সম্ভাষণ করে ধর্মের ষাঁড়টির প্রসঙ্গ তুলেন গোপাল। লোভে বাদশার চোখ চকচক করে উঠল।

গোপাল হাত কচলে হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, ''ঠিকই তো, ঠিকই তো, অমন নাদুস নুদুস চেহারা। লোভ তো হবেই।'' বাদশা জানতে চাইলেন, ''আপনি কি বৃষটিকে ধরে এনেছেন?'' গোপাল বললেন, ''ও তো আমার কড়ে আঙুলের কাজ জাহাঁপনা। আপনি যখন বলবেন তখনই ধরে আনব। কিন্তু তার আগে একটা বিষয়ে আপনার অনুমতি চাই।''

বাদশা বললেন, ''কী অনুমতি চান নির্ভয়ে বলুন।''

গোপাল বললেন, ''আজ্ঞে জাহাঁপনা, ষাঁড়টা বড়ো বজ্জাত। ব্যাটা কলাটা মুলোটা লোকে কত কী দিচ্ছে। তাই খা। তা নয়। শুধু নোংরা জিনিসের ওপরে লোভ।

—''নোংরা জিনিস মানে?'' জানতে চাইলেন বাদশা।

গোপাল মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, ''কী বলব বাদশাজাদা, বৃষটির সবচেয়ে পছন্দের খাবার হলো মানুষের বিষ্ঠা। তাই আপনাকে জানাতে এলাম.....।

বাদশা সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, ''বিষ্ঠা খায়? ছিঃ! ছিঃ!

—''সেই জন্যই তো বলছিলাম.....''

—''আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। আপনি এক্ষুনি বিদেয় হোন। আর মহারাজকে বলুন, ওই বৃষটি যেন আমার নজরে আর না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে।''

গোপাল হাসিমুখে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে ফিরে এলেন। সব শুনে মহারাজা বললেন, ''গোপাল তুমি হিন্দুধর্ম রক্ষা করেছে। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।''

এ গল্পে গোপালের ভূমিকা স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র মহারাজার অনুরোধ রাখতে ধর্মীয় সংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। হিন্দু ধর্মীয় আচারকে রক্ষা করেছেন। তবে রক্ষা করেছেন একটি নিরীহ প্রাণীর জীবন। গোপাল ভাঁড়ের গল্পে তাই আলোচ্য গল্পটি একটি স্বতন্ত্র ভূমিকার দাবি রাখে।

অষ্টম গল্প ঃ ক্ষমতাশালীদের গালে চপেটাঘাত

নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে তৎকালীন বাঙ্গলার জমিদার তথা সামন্ত রাজাদের সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিল না। ফলত কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গেও যথাবিহিত সিরাজদৌল্লার সম্পর্ক ছিল অনেকটা আদায় কাঁচকলায়।

একদিন সিরাজ মহারাজকে হেনস্তা করার জন্য খবর পাঠালেন— তিনি

With Best Compliments from :-

A

Well

Wisher

বহুদিন ধরে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন কিন্তু পাচ্ছেন না। মহারাজ যদি তাঁর সভাপণ্ডিতদের পাঠান, তাহলে উত্তরগুলি হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু শর্ত হলো উত্তর না দিতে পারলে, ওই পণ্ডিতদের কারাবন্দি করা হবে। নবাবের আদেশ। পালন না করে উপায় নেই। তাই মহারাজ সভার পাঁচ পণ্ডিতকে মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে পাঠালেন। কিন্তু টিকিধারী ওইসব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেউই নবাবের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। ফলে তাঁরা সকলেই বন্দি হলেন। প্রশ্ন ছিল একটাই—মাটির নীচে কী আছে?

চিন্তায় পড়লেন কৃষ্ণচন্দ্র। একে তিনি বিপ্রভক্ত মানুষ। তাঁরই আদেশে পাঁচ ব্রাহ্মণ বড়ো কষ্টে আছে ভেবে দুঃখে কাতর মহারাজা অগতির গতি গোপাল ভাঁড়কে ডেকে পাঠালেন।

গোপাল মহারাজের কাছে সব শুনে বললেন—''আমি আগামীকালই নবাবের দরবারে গিয়ে সঠিক জবাব দিয়ে আসব আর মুক্ত করে আনব পাঁচ পণ্ডিতদের। আপনি চিন্তা করবেন না।''

পরদিন শুভক্ষণে রীতিমতো পণ্ডিতের সাজে গোপাল মুর্শিদাবাদ রওনা হলেন। পরনে সিল্কের ধুতি। গায়ে সিল্কের উড়নি। পায়ে খড়ম, কপালে চন্দনের টিকা, হাতে লাল শালুতে মোড়া একটা প্যাকেট।

গোপাল সোজা প্রবেশ করলেন নবাবের দরবারে। বললেন, ''জাহাঁপনা, আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া জন্য মহারাজ আমায় পাঠিয়েছেন।''

নবাব বললেন—''তা বেশ। আপনাকে নিয়ে তাহলে কারাবাস হবে ছয় হিন্দু পণ্ডিতের। আপনি প্রস্তুত তো।''

গোপাল নির্ভীক চিত্তে বললেন—'আমি সঠিক জবাব দেব বলেই এসেছি জাহাঁপনা। কারাগারের বন্দি হবার কথা ভাবছিই না। প্রত্যেক মানুষেরই উচিত ইতিবাচক ভাবনা ভাবা। নেতিবাচক ভাবনাকে প্রশ্রয় না দেওয়াই শ্রেয়। আপনার প্রশ্নটা বলুন জাহাঁপনা।

নবাব একটু রুষ্ট হয়েই বললেন—''দেখব কত ধানে কত চাল। প্রশ্ন আমার একটাই—বলুন তো মাটির নীচে কী আছে?''

গোপাল এবার তাঁর হাতে শালুতে মোড়া প্যাকেটটি খুললেন। দেখা গেল—প্যাকেটে ছিল একটি ভাঙা খাটের পায়া। বললেন—এটি ১৮টি হিন্দু পুরাণের মধ্যে সব পুরনো পুরাণ কথা। নাম খট্টাঙ্গ পুরাণ। এতে লেখা আছে—

সর্বশাস্ত্র সারং ইদম খট্টাঙ্গ পুরাণম্।
হিন্দু পণ্ডিত্য ন কদাপি শক্যং ভূতল গণনম্।।

অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রের সেরা শাস্ত্র হলো খট্টাঙ্গ পুরাণ। আর এতে লেখা আছে—কোনো হিন্দু পণ্ডিতই কখনো বলতে পারবেন না, মাটির নীচে কী আছে? কেন জানেন জাহাঁপনা? এই খট্টাঙ্গ পুরাণে লেখা রয়েছে—

যদা হিন্দু পণ্ডিত্য মরিষ্যন্তি
তথা তেষাং চিতাং জ্বলতি তে
তথা ঊর্দ্ধলোকং গমিষ্যন্তি।

অর্থাৎ হিন্দু পণ্ডিতদের মৃত্যুর পর তাদের দেহ চিতাশয্যায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তাদের মৃতদেহ ধোঁয়া হয়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠে যায়। সুতরাং তারা বলতে পারবেন মহাশূন্যে কী আছে। মাটির নীচের কথা তাঁরা জানবেন কী করে জাহাঁপনা? আপনি বৃথাই পাঁচ পণ্ডিতকে কারাদণ্ড দিয়েছেন। এর ফলে আপনার পাপ জমা হচ্ছে। তাঁদের এখনই মুক্তি দেওয়া উচিত।''

নবাব বিচলিত—''তাহলে কী করে জানব মাটির নীচে কী আছে?''

গোপাল হাসলেন। বললেন—খট্টাঙ্গ পুরাণে তার উত্তর আছে মহারাজ। বিচলিত হবেন না। আমি এখনই তা পড়ে শোনাচ্ছি। এই দেখুন এখানে লেখা রয়েছে—

যবনং বা ম্লেচ্ছং যদা মরিষ্যন্তি
কবরং তে তদা গচ্ছন্তি
তথা তে শক্যং ভূতল গমনম্।

অর্থাৎ যবন বা ম্লেচ্ছজাতি অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ মারা গেলে তাদের মাটিতে কবর দেওয়া হয়। সুতরাং মাটির নীচে কী আছে তা শুধু মুসলমানরাই বলতে পারবেন হুজুঁর।''

নবাব গোপালের উত্তর শুনে বললেন—''ঠিকই তো। ঠিকই তো। আমি এখনই মৌলভিদের ডাকছি। তার আগে আপনার পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ আমার গলার এই মোতির হারটুকু গ্রহণ করুন।'' কিন্তু গেপালের নাটক তখনও শেষ হয়নি। বললেন—''নবাবজাদা, আমার এই বহুমূল্য উপহারের বদলে আমি অন্য উপহার চাই—তা হলো পাঁচ পণ্ডিতের মুক্তি।''

নবাব গোপালের উদার মনের পরিচয় পেয়ে তখনই পাঁচ পণ্ডিতকে মুক্তির বিধান দিলেন।

এই গল্পটি মূলত সম্রাট নবাব তথা দেশের ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী মানুষের অন্যায়ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের আতিশয্যের গালে চপেটাঘাত, সেইসঙ্গে টিকিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতি তীব্র ভর্ৎসনাও।

নবম গল্প ঃ মোসাহেবদের মুখোশ খোলা

ক্ষমতাবানদের চিরকালই ঘিরে থাকে মোসাহেবের দল। একবার নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র কিছু মোসাহেব নিয়োগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু মন্ত্রী ও আমলাদের নির্বাচিত মোসাহেবদের মহারাজের পছন্দ হল না। এবার দায়িত্ব পড়ল গোপালের উপর।

মোসাহেব নেওয়া হবে শুনে রাজপ্রাসাদের মূল তোরণের বাইরে বিরাট লাইন পড়ে গেল মানুষের কারণ মোটা মাইনের ঘোষণাটিও করা হয়েছিল আগেভাগেই।

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

গোপাল এক একজনকে ডাকেন আর একটাই কথা জিজ্ঞাসা করেন—''আমার মনে হয় মোসাহেবের কাজটা তুমি ঠিক পারবে না। তাই না?''

কে আর বলে পারব না। বেশ পারব না। একবার সুযোগ দিন।'' যেই একথা বলে সেই-ই বাতিল হয়ে যায়।

অনেক পরে একটি লোক দুহাত জোড় করে মাথা নীচু করে গোপালের সামনে হাজির হলো। গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন— ''তুমি বোধহয় মোসাহেবের কাজটা ঠিক পারবে না।''

লোকটি পালটা প্রশ্ন করল—''আপনার কি তাই মনে হচ্ছে?''

গোপাল বললেন—''আমার তো মনে হচ্ছে পারবে না।''

লোকটি মাথা নীচু করেই বলল—''তাহলে পারব না হুজুর।''

গোপাল বুঝলেন, এতক্ষণে বোধহয় সঠিক লোকটাকে পাওয়া গেল। তবু ভালো করে যাচাই করে নেওয়া দরকার। তাই গোপাল বললেন—''না না, তা কেন? আমার মনে হয় কাজটা তুমি পারবে।''

লোকটা সেই ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা নীচু করে জোর হাতেই বলল—''আপনি বলছেন? তাহলে পারব।''

—''আচ্ছা বলতো, সূর্য যে রোজ পশ্চিমদিকে ওঠে, তা কি তুমি মানো?'' গোপালের প্রশ্ন।

লোকটির উত্তর—''আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি যখন বলছেন তাহলে মানি।''

গোপাল আর দ্বিধা না করে লোকটিকে নিয়ে গেলেন মহারাজের কাছে—''আপনাকে একজন বাস্তবিকই মোসাহেব দিয়ে গেলাম মহারাজ।''

এই গল্পটিতে মোসাহেব চরিত্রের মানুষদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রতিও তীব্র ধিক্কার ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। এত তীব্র শ্লেষ যে তা সহ্য করা শক্ত।

দশম তথা শেষ গল্প ঃ আলোর পথের দিশা

একবার খুব সকাল সকাল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে যাওয়ার কথা গোপালের। সময়ে না পৌঁছতে পারলে হয়তো মহারাজ শূলেই চড়িয়ে দেবেন। ভয়ংকর টেনশনে ভোর চারটে নাগাদ ঘুম ভেঙে গেল গোপালের। স্ত্রীকে বললেন— ''জানালা খুলে দেখ তো রোদ উঠেছে কিনা।''

গোপালের স্ত্রী জানালা খুলে বললেন—বাইরে তো অন্ধকার গো।''

গোপাল বললেন—''তাতে কী! হ্যারিকেনটা নিয়ে দেখ না সূর্য উঠেছে কী না।''

গোপাল ভাঁড়ের গল্প টেনশনে ভোগা বাঙালির কাছে ওই হ্যারিকেনের আলো যা ঘন অন্ধকারেও পথ দেখায় নতুন দিনে সূর্যের কাছে পৌঁছনোর জন্য।

যেসব পণ্ডিতপ্রবর গবেষকরা মাথার চুল ছিঁড়ছেন গোপাল ভাঁড়কে বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাস থেকে নস্যাৎ করে দিতে তাঁরা যদি তাঁর প্রচলিত গল্পগুলিরও অন্তর্নিহিত অর্থ খোঁজার চেষ্টা করতেন, তাহলেও বোঝা যেত, তাঁরা বাঙ্গলার রসরাজ প্রসঙ্গে ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছেন। না সে চেষ্টাও কখনও হয়নি; যতদিন না অনিসন্ধিৎসু মন নিয়ে গোপালের ঐতিহাসিক সত্যাসত্য জানতে 'পেনসিল ও নোটবুক হাতে' নিয়ে ময়দানে নেমে পড়ি এবং প্রকাশিত হয় গোপাল ভাঁড় প্রসঙ্গে গবেষণাগ্রন্থ 'গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে।' ২০০৯ সালে বইটি প্রকাশের পর থেকেই হুড়োমুড়ি পড়ে যায় গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে গবেষণার। অথচ সত্যি বলতে কী 'গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে' প্রকাশিত হওয়ার আগে একমাত্র 'যোগশিখা' পত্রিকাই (কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত) এ ব্যাপারে জোরদার প্রচেষ্টা নিয়েছিল। কৃষ্ণনগর সাধারণ পাঠাগারে পত্রিকাটির একটি সংখ্যা অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থায় কালাতিপাত করছে। এটির পুনর্মুদ্রণ এখনই প্রয়োজন। যাঁরা এখন গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে গবেষণা (ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক) করছেন বা ইতিমধ্যেই করেছেন, তাদের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাতেই হয়। সেইসঙ্গে একথাও বোধ হয় বলা প্রয়োজন— গোপাল ভাঁড়কে এখন আর শুধু অতীতের বটতলার হালকা অশ্লীল রসিকতার গল্পে সাজিয়ে রাখা উচিত হবে না। উচিত হবে না সেই ভিত্তির ওপর একটা অতি পরিচিত এবং বাঙালির ভালোবাসার সম্পদকে নিয়ে নেতিবাচক গবেষণার ইমারত গড়ে তোলা।

দুঃখের বিষয়, এমন একটি অসাধারণ চরিত্রের কোনো মূল্যায়ন সেভাবে হয়নি। হবে না। ইতিহাসবেত্তা গবেষকরাও মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন কেন, তা বোঝা দুঃসাধ্য।

গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে তাই বাঙ্গালির নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। তিনি হাজার পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন তাঁর গল্পের মাধ্যমে। আমরা অন্তত একটিবার সেকথা স্মরণ করে কাল্পনিক অথবা বাস্তবিক চরিত্রটিকে সম্মান জানাই। নমস্কার জানাই। পথ চলি তাঁর দেখানো হ্যারিকেনের আলোয় পথ চিনে।

(তথ্যঋণ : গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে—সুজিত রায়)

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, লেখক ও অধ্যাপক।)



Saraogi Udyog Private Limited

Merchants & Importer for Coal and Coke

Corporate Office :

Marlin Infinite, 9th Floor, Suite No. 910

Salt Lake City, Sector-V, DN-51, Kolkata- 700 091

Regd. Office :

21, Hemanta Basu Sarani, "Centre Point" Suite No - 212

2nd Floor, Kolkata - 700 001

Fax : +91-33-2243-5334, +91-33-22138782

Phone : +91-332248-1333 / 0674, +91-33-2213-8779 / 80 / 81

E-mail : info@saraogiudyog.com, ops@saraogiudyog.com

Web : www.saraogiudyog.com



ছেলেটা

সিদ্ধার্থ সিংহ

ঝিলম আড়চোখে দেখল, ছেলেটা তার এগরোলের দোকান থেকে কী একটা হাতে নিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে তার দিকে তড়িঘড়ি আসছে।

হ্যাঁ, সে যখন স্কুল থেকে ফেরে, খেয়াল করে দেখেছে, ছেলেটা তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু না, কোনও দিনও তাকে কিছু বলেনি! এমনকী কোনও দিন কোনও ইশারাও করেনি।

HONDA

India's Two Wheels





eSP Technology

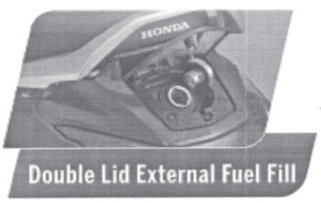

Double Lid External Fuel Fill


Telescopic Suspension



10%* More Mileage


Engine Start/Stop Switch

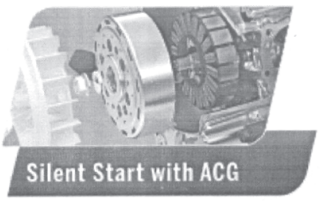
Silent Start with ACG

Showroom : Todi Honda - 225C, A. J. C. Bose Road, Kolkata-700 020
Backbagan - Minto Park, Ph. 9007035184, (O) : 033-22809028

Service Centre : Todi Honda - 8/2C, Abinash Chowdhury Lane, Kolkata-700 046
Customer Care : 9007035186, **Service Booking :** 9831447711
Spare Parts : 9007035188

BOOK ONLINE NOW!
CLICK
BOOK
RELAX

সে শুনেছে, কোনও ছেলে যদি কোনও মেয়েকে প্রোপোজ করে আর সেই মেয়ে যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে নাকি এমন অনেক ছেলে আছে যারা সেটা মেনে নিতে পারে না। ওই প্রত্যাখ্যানটাকে অপমান বলে মনে করে। তাই ছলে-বলে-কৌশলে তাকে রাজি করানোর জন্য যাতায়াতের পথে তাকে রাস্তার মধ্যে ধরে। কেন সে রাজি নয়, জিজ্ঞেস করে। তার সম্পর্কে কেউ তাকে কোনও আজেবাজে কথা বলেছে কি না, জানতে চায়। নানা রকম ভাবে বোঝায়। কাকুতি-মিনতি করে। তাতে কাজ না হলে তাকে রাস্তায় যেতে দেখলে তার পিছন পিছন যায়। ফোন নম্বর জোগাড় করে বারবার ফোন করে। তাতেও কাজ না হলে ভয় দেখায়। জোরজুলুম করে। তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়। এবং শেষ পর্যন্ত যখন আর কোনও পথ খোলা থাকে না, তখন 'আমি না পেলে অন্য কেউ যাতে তার দিকে আর ফিরেও না তাকায়, তার ব্যবস্থা করব'— এমনই এক জিদের বশে অ্যাসিড বাল্ব ছুড়ে মেয়েটার মুখ বীভৎস করে দেয়। তাহলে কি ওই ছেলেটা সেই অ্যাসিড বাল্ব মারার জন্যই তার দিকে আসছে!

আরও দ্রুত পা চালাল ঝিলম।

ক্লাস এইট পর্যন্ত ওর মা-ই ওকে স্কুলে দিয়ে আসত। নিয়ে আসত। নাইনে ওঠার পর ঝিলমই বলেছিল, এবার থেকে আমি একা-একাই যাতায়াত করতে পারব। ওর বাবাও তাতে সম্মতি দিয়েছিল। বলেছিল, ও তো বড়ো হচ্ছে! ওকে এবার একটু একা-একা ছাড়ো। সারা জীবন তো তুমি ওকে এইভাবে আগলে রাখতে পারবে না। একদিন না একদিন ছাড়তেই হবে। আর ছাড়তেই যখন হবে, তখন না হয় একটু আগে থেকেই ছাড়লে! কতটুকু আর রাস্তা! ও যখন বলছে একা-একা যাতায়াত করতে পারবে, তখন তোমার অসুবিধে কোথায়?

তার পর থেকে ও একা-একাই স্কুলে যায়। আগে মাঝে মধ্যে বাবিন থাকত। পাশের পাড়ার ছেলে। ওর সঙ্গে কোচিঙে পড়ত। প্রায় প্রতিদিনই স্কুলের গেট থেকে একেবারে বাড়ির দোরগোড়া অবধি পৌঁছে দিত। একদিন যখন ওকে পৌঁছে দিয়ে ফিরছে, তখন নাকি ওই ছেলেটা বাবিনকে মাঝপথে ধরে খুব আস্তে আস্তে অথচ অত্যন্ত কর্কশ গলায় বলেছিল, ও তোর কে হয় রে?

বাবিন বলেছিল, বন্ধু।

ছেলেটা বলেছিল, বন্ধু? তোর চালচলন ওই বন্ধুত্ব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখ। তার থেকে বেশি এগোস না, কেমন? এমন কিছু করিস না, যাতে আমাকে আবার পুরনো রূপ ধরতে হয়, বুঝেছিস?

বাবিন কী বুঝেছিল, ঝিলম জানে না। তবে তার পর থেকে বাবিন আর ওর ধারেকাছেও ঘেঁসেনি। বাবিন না থাকলেও, ওর ক্লাসের না হলেও, ওর স্কুলের কোনও না কোনও বন্ধু, যাদের বাড়ি ওর বাড়ির দিকে, তারা ওর সঙ্গে প্রায়ই থাকে। কিন্তু আজ ও একা। একদম একা। একা-একাই বাড়ি ফিরছে।

একবার এক বাইকচালক রাস্তা ফাঁকা সত্ত্বেও ঝিলমের পাশ দিয়ে এমন ভাবে ফুল স্পিডে কায়দা করে গিয়েছিল যে, আর একটু হলেই ঝিলমের গায়ে লাগত। সেদিন সেই বাইকচালক যখন ফিরছিল, তক্কে তক্কে থেকে ও তাকে ধরেছিল। কী বলেছিল, কেউ জানে না। তবে সেই চালক তার পর থেকে চিরজীবনের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল ওই পথ।

ছেলেটার একটা এগরোলের দোকান আছে। ফুটপাথের ওপর। বিকেলের পরে খোলে। কিন্তু দুপুর থেকেই তার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। আনাজপত্র কাটাকাটি, ময়দা মেখে রাখা, মোমো রেডি করা।

না, ও দামি কোনও জিনিস ব্যবহার করে না। বেলার দিকে বাজার উঠে যাওয়ার সময় প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া ক্যাপসিকাম, ফেলে দেওয়ার মতো ছালবাকড় ওঠা গাজর, হলদেটে হয়ে যাওয়া পাকা-পাকা শশা কিনে আনে। সসও তাই। আগে একটা মাঝবয়সি লোক সাইকেল করে এসে কম দামের টমেটো সস, চিলি সস, কাসুন্দি দিয়ে যেত। এখন আরও অনেক সস্তায় পাউচ প্যাকে যে হাফ কিলো করে সস পাওয়া যায় ও সেগুলোই কেনে। মাদার ডেয়ারির মতো সেই প্যাকেটগুলোর একটা কোণ দাঁত দিয়ে টান মেরে ছিঁড়ে কিসানের লেবেল লাগানো বোতলে ভরে রাখে। যাতে কেউ বুঝতে না পারে ও সস্তার মাল দিচ্ছে।

ছেলেটা আগে আরও খারাপ ছিল। আশপাশের কোনও এলাকায় নতুন কোনও বাড়ি শুরু হলেই দলবল নিয়ে চড়াও হতো। বলত, আমাদের কাছ থেকে বালি-সিমেন্ট নিতে হবে। বলত ঠিকই, কিন্তু ওরা তো ইমারতির কারবার করত না। ইনভেস্ট করার মতো অত টাকাও ছিল না। যখন অর্ডার পেত, তখন লামসাম কাটমানি খেত।

ইট, সিমেন্ট, লোহার রড লুচ্চাদার কাছ থেকে নিলেও, সরাসরি বেশি লাভ করার জন্য কিছু দিন পর থেকে ওরা নিজেরাই দামোদর থেকে ট্রাকে করে বালি এনে সাপ্লাই দিতে লাগল। আর যারা ওদের কাছে থেকে মাল নিতে চাইত না, তাদের কাছে ওরা মোটা টাকা দাবি করত। না দিলেই হুজ্জুতি করত। জানে মেরে দেওয়ার হুমকি দিত।

না, বাড়ি নির্মাতা বা প্রোমোটাররা থানা পুলিশ করে ওদের বিরুদ্ধে কিচ্ছু করতে পারত না। কারণ, ওরা বুঝতে পেরেছিল, এ সব করতে গেলে শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকতে হবে। তাই তত দিনে তারা স্থানীয় কাউন্সিলরকে ফিট করে ফেলেছিল। কাউন্সিলরকে ধরে শুধু লোকালেরই নয়, আশপাশের এম এল একেও কবজা করে ফেলছিল। সবাইকেই যে ওরা বখরা দিত, তাও নয়। ওদের হয়ে কাজ করত। কারও কারওকে ভয় দেখাত। চমকাত। ডাকামাত্র দল বেঁধে বাইক নিয়ে

হাজির হয়ে যেত। কোথাও কোনও গণ্ডগোল হলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ত। ভোটের সময় জান লড়িয়ে দিত।

একদিন সে রকমই একা প্রমোটারকে চমকাতে গিয়ে সেই প্রোমোটারই যখন উলটে ওদের চমকাতে লাগল, এই এম এল এ, ওই এম পি দেখাতে লাগল, তখন আর মাথা ঠিক রাখতে পারল না ওরা। যখন বুঝতে পারল, এর কাছ থেকে টাকা বের করা খুব মুশকিল, তখনই ওরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিল।

না, শুধু টাকা দিচ্ছে না বলে নয়, কেউ তাদের মুখের উপর 'না' বলার মতো হিম্মত দেখিয়েছে, আর এই হিম্মতের কথা যদি কোনও ভাবে চাউর হয়ে যায়, তা হলে ওদের একেবারে বারোটা বেজে যাবে। অন্য প্রমোটাররাও এক-এক করে সেই হিম্মত দেখাতে শুরু করবে। তাই তাদের মুখের উপরে আর কেউ যাতে কখনও 'না' বলতে না পারে, বললে তার পরিণাম যে কত ভয়ংকর হতে পারে, শুধু সেই বার্তাটুকু বাকি প্রোমোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই, ওদের মধ্যে থেকেই একজন—যেটা শুধু ভয় দেখানোর জন্যই ওরা সঙ্গে রাখত, কোমর থেকে সেই পাতি ওয়ান শর্টারটা বের করে ফটাস করে চালিয়ে দিয়েছিল সেই প্রোমোটারের কপালের ঠিক মাঝখানে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই, ওই গুলির শব্দে শুধু ওই বিল্ডিংয়ে কাজ করতে থাকা রাজমিস্ত্রি আর হেল্পাররাই নয়, ছুটে এসেছিল আশপাশের লোকেরাও। বাকিরা পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ে গিয়েছিল ওদের দলেরই একজন। তাকে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে বেঁধে পাবলিক এমন মার মেরেছিল যে, আর দু'ঘা দিলে বুঝি মরেই যেত। সেদিন লোকজন এতটাই মারমুখী হয়ে উঠেছিল যে, সেই ছেলেটাকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য লোকাল ওসিকে আশপাশের থানা থেকে ফোর্স আনতে হয়েছিল। চালাতে হয়েছিল লাঠি। ফাটাতে হয়েছিল তিন-তিনটে কাঁদানে গ্যাসের সেল।

তাকে জেরা করেই বাকিদের গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তখনই ওরা জেনেছিল, ওরা আসলে কোনও প্রোমোটারের নয়, প্রোমোটারের বকলমে শাসক দলের এক দাপুটে মন্ত্রীর লেজে পা দিয়ে ফেলেছে।

ভাগ্যিস সেদিন এই ছেলেটি ছিল না! তাই প্রথমে গ্রেপ্তার হলেও সাত দিন পিসিতে কাটালেও, শেষপর্যন্ত প্রমাণের অভাবে ও বেকসুর খালাস হয়ে গিয়েছিল।

তার পর থেকেই ও নাকি একেবারে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যায়। ঘোরার আর একটা কারণ, যে মেয়েটির সঙ্গে ও মিশত, সেই অপর্ণাকে নিয়ে তার বাবা-মা রাতারাতি এলাকা ছেড়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল! হাজার খুঁজেও ও আর তাদের হদিশ পায়নি। না, যে মোবাইলটা ও মেয়েটিকে গিফট করেছিল, সেই নাম্বারটায় ফোন করলেও বারবার ভেসে আসছিল রেকর্ডেড ভয়েস—আপনি যে নম্বরে ফোন করছেন, সেই নম্বরের কোনও অস্তিত্ব নেই....

তার পরেই ছেলেটা একেবারে পালটে গেল। ওই সব মস্তানি-টস্তানি ছেড়ে যেটুকু টাকাপয়সা ছিল তার সঙ্গে বাইক বিক্রির টাকা দিয়ে রাস্তার উপরে একটা এগরোল-চাওমিনের দোকান করে বসল। এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সেটা বেশ রমরম করে চলতেও লাগল।

বিকেলের পর থেকে চালু হলেও দুপুরের অনেক আগেই ও দোকানে চলে আসত। খাবারদাবার তৈরি করত ওরই এক পুরনো বন্ধু। সে নাকি অগে এখটা ফাস্টফুডের দোকানে কাজ করত। তিন বছরেও এক পয়সা মাইনে বাড়ায়নি দেখে কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল। সত্যি কথা বলতে কী, তারই পরামর্শে ও এই এগরোলের দোকানটা খুলেছিল। পুরোটা সে সামলালেও তার হাতে হাতে ও অনেকটা কাজ এগিয়ে দিত।

ঝিলম বুঝতে পারে, সে যখন স্কুল থেকে ফেরে ছেলেটি তখন তাকে হাঁ করে দেখে। আজও দেখছিল। কিন্তু হঠাৎ কী হলো তার? ওভাবে পড়িমড়ি করে তার দিকে এগিয়ে আসছে কেন! তা হলে কি আজ তাকে ও প্রপোজ করবে! যদি করে, তা হলে কী বলবে সে! কী বলবে!

ও যেতে যেতে না তাকিয়েও বুঝতে পারল, ছেলেটি তার একদম পিছনে চলে এসেছে। সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ালে না হয় একটা কথা ছিল। পাশে হাঁটতে হাঁটতে আর পাঁচটা ছেলের মতো বিড়বিড় করে, কী বলতে চাইছে, স্পষ্ট করে শোনা যাক, আর না যাক, এটা তো পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তার উদ্দেশ্য কী!

কিন্তু ও পিছনে কেন? তা হলে কি ও পিছন দিক থেকে তার গায়ে অ্যাসিড বাল্ব ছুড়ে মারবে! বা সে রকম কিছু করবে!

যারা খারাপ হয়, যারা একবার খারাপ পথে চলে যায়, অপরাধের খাতায় যাদের নাম একবার উঠে যায়, সাত দিন কেন, একদিনের জন্য হলেও যদি লকআপে থাকে, তারা যতই ভালো হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, তাদের ভিতরের সেই 'খারাপ'টা কিন্তু মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তা হলে কি সেই খারাপটাই ওর ভিতরে এখন নড়েচড়ে উঠেছে! কী করতে পারে ও! কী করতে পারে! ও কিছু করার আগেই কি সে চিৎকার করবে! লোকজন জড়ো করবে! নাকি একবার দেখবে, ও কী করতে চায়!

ভাবামাত্র ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ঝিলম। আর ঘোরার আগেই বুঝতে পারল, হাফ কিলোর একটা টমাটো সসের পাউচ দু'হাতে চেপে এমন জোরে ফচাত করে ও ফাটাল যে, একেবারে পিচকারির মতো ঝপাত করে এসে তার স্কার্টের পেছনটা একেবারে ভরিয়ে দিল।

ছেলেটা যে এ রকম ন্যক্কারজনক একটা কিছু করতে পারে, সে তা কল্পনাও করতে পারেনি। তাই তার কী করা উচিত সেটা ভেবে ওঠার আগেই, ছেলেটি বলে উঠল, সরি সরি সরি। বুঝতে পারিনি গো। কিছু মনে কোরো না। একটা কাজ করো,

বিচ্ছিরিভাবে সসটা স্কার্টে লেগে গেছে তো, বলেই, নিজের ফুলহাতা জামাটা ঝপ করে খুলে ঝিলমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, জামাটা দিয়ে পেছনের দিকের স্কার্টটা ঢেকে জামার হাতা দুটো সামনের দিকে টেনে নিয়ে গিঁট দিয়ে নাও, তা হলে আর কোনও অসুবিধা হবে না। পারলে জামাটা পরে আমাকে ফেরত দিয়ে যেও, কেমন? ওই যে এগরোলের দোকানটা, ওখানে দিলেই আমি পেয়ে যাব।

ঝিলম বুঝতেই পারল না, ছেলেটা এরকম কেন করল। আর করলই যদি, তা হলে ও কেন ওর জামাটা খুলে তাকে দিল! কাজটা করার সময় ঝোঁকে পড়ে করে ফেলেছে। কিন্তু করার পরেই হয়তো ভয় পেয়ে গেছে। জানে তো, পাবলিকের মার কাকে বলে। তার এক বন্ধু এক প্রোমোটারকে গুলি করার পর পাবলিকের হাতে ধরা পরে কেমন মার খেয়েছিল, সেটা নিশ্চয়ই মনে পড়ে গেছে—নাঃ, এই সব ছেলেদের সঙ্গে কখনও মুখ লাগাতে নেই। কী থেকে কী হবে কিচ্ছু বলা যায় না। তাই ছেলেটার কথামতোই স্কার্টটা ঢেকে জামাটা পেছন দিকে ঝুলিয়ে হাতা দুটো সামনে টেনে নিয়ে গিঁট দিয়ে নিল। তার পর হনহন করে চলল বাড়ির দিকে।

দোকানে আসতেই ওর দোকানে যে বন্ধুটি কাজ কর, সে বলল, তুই ওটা কী করলি? তোকে এখন এসব মানায়? একটা বাচ্চা মেয়ে! এবার তুই আবার একটা বিচ্ছিরি ঝামেলায় জড়াবি।

—কীসের ঝামেলা?

—তুই কি ভেবেছিস ও বাড়ি গিয়ে ওর বাবা-মাকে কিছু বলবে না? আর ও যদি ওর বাবা-মাকে বলে, তারা কি চুপচাপ বসে থাকবে?

—থাকবে।

—থাকবে? তোর এই গাজোয়ারি মস্তানির যুগ কিন্তু আর নেই, এটা মনে রাখিস।

—মনে আছে।

—মানে?



—আসলে মেয়েটাকে আমি প্রায়ই দেখি। খুব সুন্দর ফুটফুটে একটা মেয়ে। একেবারে অপর্ণার মুখটা বসানো...

—সে কী রে! এখানে আবার অপর্ণা এল কোথা থেকে! আর তা ছাড়া অপর্ণার বয়েস আর এর বয়েস?

—না, বয়সের কথা বলছি না। বলছি, মুখটার কথা। ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবি, এর মুখটা একেবারে অপর্ণার মতো। ওর মধ্যে আমি অপর্ণাকে দেখতে পাই। আমি ওকে রোজ দেখি। আজও দেখছিলাম, হঠাৎ দেখি, ওর স্কার্টের পিছনে দিকটা রক্তে ভিজে যাচ্ছে।

—রক্তে?

—হ্যাঁ, রক্তে। এটা আজই বোধহয় ওর প্রথম হলো। তাই হয়তো ও টের পায়নি। বাচ্চা তো! কিন্তু যারা ওকে দেখছিল, তারা মুখ টিপে টিপে হাসছিল। ওরা হয়তো ভুলেই গেছে, ওদের বাড়িতেও মেয়ে আছে। এবং একটা সময়ের পর প্রত্যেকটা মেয়েরই এটা হয়। এটা খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এটা নিয়ে হাসাহাসি করার কিছু নেই। আজ যদি তাদের বাড়ির কোনও মেয়ের এ রকম হতো, তাহলে কি ওরা এইভাবে হাসতে পারত? তাই ওকে দেখে আর কেউ যাতে হাসাহাসি করতে না পারে, সে জন্যই আমি এটা করলাম।

—এভাবে নাটক না করে, সেটা তো ওকে গিয়ে ডাইরেক্ট বলতে পারতিস।

ছেলেটি বলল, ওটা সরাসরি বলতে গেলে যে শিক্ষার দরকার, যে বুকের পাটা দরকার, গুছিয়ে কথা বলার মতো যে যোগ্যতা থাকা দরকার, সে সব আমার নেই। তাই আমি যে ভাবে পেরেছি, সে ভাবেই হাস্যকর হয়ে ওঠার হাত থেকে ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। আজ হয়তো ও আমাকে খারাপ ভাববে, ভাবুক। কিন্তু আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু, ও ঠিকই একদিন না একদিন বুঝতে পারবে, আমি কেন এটা করেছিলাম।

ওরা কথা শুনে দোকানের বন্ধুটা একেবারে থ' হয়ে গেল। আর, যেন কিছুই হয়নি এমন ভান করে ও ফের দোকানের কাজে হাত লাগল। □

With Best
Compliments from :-

A

Well

Wisher